ইউভাল নোয়া হারারি
সেপিয়েন্স
মানুষের ইতিহাস
ভাষান্তর
সুফিয়ান লতিফ, শুভ্র সরকার, রাগিব আহসান

ইউভাল নোয়া হারারি

সেপিয়েন্স

মানুষের ইতিহাস

ভাষান্তর

সুফিয়ান লতিফ
শুভ্র সরকার
রাগিব আহসান

সম্পাদনা

মোস্তাক আহমেদ

সেপিয়েন্স: মানুষের ইতিহাস

ইউভাল নোয়া হারারি

গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ: ফাহিম আনজুম

প্রুফ সংশোধন: কমল কর্মকার

ভূ মি কা

ইউভাল নোয়া হারারির লেখা *সেপিয়েন্স* এই সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বই। বইটি *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর বেস্ট সেলার হয়েছে, এখন পর্যন্ত ৪৫টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, সব ধরনের মানুষের কাছে প্রবলভাবে আলোচিত হয়েছে। বহুল আলোচিত বই মানেই কিন্তু বহুল পঠিত বই নয় কিন্তু *সেপিয়েন্স*-এর বেলায় নির্দ্বিধায় বলা যায়, এটি একইসঙ্গে বহুল আলোচিত এবং বহুল পঠিত একটা বই। সত্যি কথা বলতে কি, বইটি এর মধ্যেই একটা প্রবাদবাক্যের রূপ নিয়েছে। কারণটা খুব সহজ, এটা খুব সহজপাঠ্য একটা বই। এর মধ্যে ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন কিংবা অর্থনীতি সবই আছে কিন্তু বইটি পড়ার সময় কেউ জ্ঞানের চাপে ভারাক্রান্ত হয় না। হারারি বইটিতে নিজের যুক্তিকে প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য তথ্য উপস্থাপন করেছেন, সেই সেই তথ্যগুলো প্রায় সময়ই এত চমকপ্রদ যে পাঠক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।

বইটির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হচ্ছে প্রচলিত নানা ধ্যানধারণা নিয়ে লেখকের ব্যাখ্যা। কিছু কিছু ব্যাখ্যা প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন, সবাই সবকিছু মেনে নিয়েছেন তাও নয় কিন্তু এসব ব্যাখ্যা সবাইকে যে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, তাই বিজ্ঞানের সব বিশ্লেষণই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে– তা নয় কিন্তু তাঁর যুক্তিতর্ক এবং বিশ্লেষণ আমাকে ভাবিত করেছে– সেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

তবে আমি এই ভূমিকায় *সেপিয়েন্স* বইটি নিয়ে লিখতে বসিনি, আমি এর অনুবাদ নিয়ে লিখতে বসেছি। যাঁরা জীবনে কখনো কোনো কিছু অনুবাদ

করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন, কাজটি মোটেও সহজ একটি কাজ নয়। সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা অনুবাদসাহিত্য, পৃথিবীর নানা ভাষায় নানা সাহিত্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারি শুধু অনুবাদের কারণে। কাজেই সারা পৃথিবীতেই ভালো অনুবাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমি বিশ্বাস করি, বাংলা সাহিত্যের যদি যথাযথ অনুবাদ হতো, তাহলে এতদিনে আমাদের একটামাত্র নোবেল পুরস্কারে সন্তুষ্ট থাকতে হতো না। আমি নিশ্চিত, শুধু ভালো অনুবাদ নেই বলে নানা ভাষার অনেক মহৎ সাহিত্য পৃথিবীতে অজানা থেকে গেছে।

কাজেই যখন দেখেছি সুফিয়ান লতিফ, শুভ্র সরকার ও রাগিব আহসান নামে বুয়েটের তিনজন প্রাক্তন ছাত্র মিলে *সেপিয়েন্স* বইটি অনুবাদ করেছে, আমি অনেক আনন্দ পেয়েছি। যখন বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি দেখার সুযোগ পেয়েছি, আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে গিয়েছে; কারণ তখন আবিষ্কার করেছি এটা মোটেও দায়সারা একটি অনুবাদ নয়। মূল বইয়ের মতোই এই অনুবাদটি সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ। শুধু অনুবাদ স্বচ্ছন্দ নয় বলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা শেষ পর্যন্ত অপঠিত থেকে যায়।

সেপিয়েন্স বইটির চমৎকার এই অনুবাদটি দেখে আমি যেটুকু আনন্দ পেয়েছি তার থেকেও বেশি আনন্দ পেয়েছি এই অনুবাদকর্মের পেছনের ইতিহাসটি জেনে। অনুবাদক তিনজন হারারির কাজকর্ম দেখে এবং শেষ পর্যন্ত বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এটি অনুবাদ করে দেশের মানুষ, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেবে। এর পেছনে বিন্দুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য একটিই, নতুন প্রজন্ম যেন প্রচলিত ধ্যানধারণাকে নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে শেখে। অনুবাদের কাজটি শেষ করতে তাদের দুই বছর সময় লেগেছে, এর মধ্যে আরো একটি অনুবাদ বের হয়ে গেছে, তবু তারা নিজেদের কাজে নিরুৎসাহিত হয়নি। ভালো কাজ একের অধিক হলেও ক্ষতি নেই। অনুবাদ শেষ হওয়ার পর তারা মোস্তাক আহমেদকে দিয়ে তিন-তিনবার সম্পাদনা করিয়েছে, আমাদের দেশের প্রকাশনাশিল্পের জন্য যেটি একটি মাইলফলক। এই দেশে সরাসরি বই লেখা হয়, কখনো সেটি যত্ন করে সম্পাদনা করা হয় না! ২০১৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারা বইটিকে পাঠকদের জন্য ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করে দেয়। খুবই সংগত কারণে সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা এবং পৃথিবীর নানা জায়গার বাঙালিরা সেটা পড়তে শুরু করে দেয়। বইটির এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা দেখে তাদের মনে হয়েছে, এটাকে এখন কাগজে মুদ্রিত বই

হিসেবেও বের করা যেতে পারে। আমার ধারণা, প্রত্যেকটি বই-ই এভাবে লেখা উচিত, যদি দেখা যায় নেটে একটি বইকে পাঠকেরা গ্রহণ করেছে, শুধু তাহলেই সেটা কাগজের বই হিসেবে ছাপানো যায়। (হাজার হলেও এক টুকরো কাগজের অর্থ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একটা গাছের মৃত্যু!)

আমি অবশ্যই এই বইটির সাফল্য কামনা করি। আমি চাই– নতুন প্রজন্ম বইটি পড়ুক, বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করুক, একে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করুক। সারা পৃথিবীতে তরুণ প্রজন্মকে সোশাল নেটওয়ার্ক নামক মাদক দিয়ে যে স্বল্পবুদ্ধি তরল পদার্থে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, তারা সেই ষড়যন্ত্র থেকে বের হয়ে আসুক। আমি চাই অন্য তরুণেরা এই চমৎকার কাজটি দেখে অনুপ্রাণিত হোক, তারাও এই তিনজন উৎসাহী তরুণের মতো চমৎকার অন্য একটি বই অনুবাদ করুক।

আমি সুফিয়ান লতিফ, শুভ্র সরকার ও রাগিব আহসানকে তাদের এই চমৎকার কাজের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি এখন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকব দেখার জন্য, তারা এরপর আমাদের নতুন কী উপহার দেয়!

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
২৬.৫.২০১৮

মূল বই প্রসঙ্গে

ইতিহাসের বই বললে চোখের সামনে যে অজস্র সাল-মাস-তারিখ, রাজা-উজিরের যুদ্ধ ভেসে ওঠে এই বই মোটেই সেই ঘরানার নয়। এই পৃথিবীতে মানুষ নামক প্রাণীটির সামগ্রিক উত্থান, তার টিকে থাকার লড়াই আর সুখ শান্তির অনন্ত খোঁজের এক চমকপ্রদ গল্প এটা। গল্পটা যিনি বলেছেন তাকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে ইতোমধ্যে। প্রফেসর হারারি ২০০২ সালে তাঁর পিএইচডি শেষ করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখন তিনি জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু বিশ্ব ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস আর সামরিক ইতিহাস হলেও তাঁর পছন্দের বিষয়ের বিস্তৃতি অনেক বড়। বর্তমানে তিনি মানুষের সামগ্রিক ইতিহাসের বৃহত্তর প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। সেরকম কিছু প্রশ্ন হল: ইতিহাস আর জীববিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক কী? হোমো সেপিয়েন্সের সাথে অন্যান্য প্রাণীর মূল পার্থক্যটা কী? ইতিহাসে কি ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়? ইতিহাসের কি কোন নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আছে? যত সময় গড়িয়েছে মানুষ কি তত সুখী হয়েছে? একুশ শতকে এসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কী ধরনের নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে?

এইসব প্রশ্ন যে একেবারে নতুন তা নয়। মানুষের সামগ্রিক ইতিহাস নিয়ে বইও লেখা হয়েছে বিস্তর। সেসব বইয়ের মত সেপিয়েন্সেও মোটা দাগে কয়েকটা স্তরে ইতিহাসকে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু প্রফেসর হারারির সামগ্রিক বর্ণনায় কিছু বিশেষত্ব লক্ষণীয়। তিনি ইতিহাসের অনেক প্রচলিত ধারণার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কিছু অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে যা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করবে। তিনি বিভিন্ন তত্ত্বের পরস্পরবিরোধী মনোভাবগুলোকে একই সমান্তরালে এনে মূলত পাঠককে শিখিয়েছেন কেন ঐতিহাসিক বিষয়গুলোতে চট করে

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া সমীচীন নয়। তিনি তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে সমাজের গঠন ও পরিবর্তনের পেছনের কারণগুলো খুঁজেছেন অত্যন্ত স্বচ্ছ মাপকাঠিতে।

তাঁর বর্ণনায় ইতিহাসের কিছু নির্দিষ্ট মুহূর্তকে আলাদা করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে নিতান্ত সাধারণ কিছু ঘটনা কিভাবে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে তার এক রোমাঞ্চকর বর্ণনা আছে এই বইতে। কীভাবে ভাষার মত অসাধারণ এক হাতিয়ার আমাদের নিজেদের মধ্যে ভাবনার আদান প্রদানের সুযোগ করে দিল। সেই হাতিয়ার দিয়ে আমরা কেমন করে শুরু করলাম পরচর্চা। আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন মনে হলেও এই পরচর্চাই কীভাবে আমাদেরকে পরস্পরের আরও কাছাকাছি আসতে সাহায্য করল। এর ফলে কীভাবে তৈরি হল আরও বড় সমাজ। এই বড় সমাজ পরিচালনার তাগিদ থেকে কীভাবে জন্ম হল ধর্ম ও সংস্কৃতির। কীভাবে নানা ধরনের নিতান্ত সাধারণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তুচ্ছ এই মানুষ আস্তে আস্তে আজকের ঈশ্বরে পরিণত হল তার এক মনোমুগ্ধকর বর্ণনা পাওয়া যায় এই বইয়ে।

প্রফেসর হারারির যখন বলেন, "আমরা গমকে পোষ মানাইনি, বরং গমই আমাদের পোষ মানিয়েছে" - তখন আমাদের চিন্তার জগতে ধাক্কা লাগতে বাধ্য। এই ধাক্কাটাই তিনি দিয়ে গেছেন পুরো বই জুড়ে। তিনি বললেন- কৃষিভিত্তিক বিপ্লব ছিল "ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধোঁকা"। বাজে খাদ্যাভ্যাস, বেশি সময়ের খাটুনি, রোগ বালাইয়ের বেশি ঝুঁকি এমন আরও অনেক কারণ দেখানো যাবে যেসব জানলে এমনটা মনে হতেই পারে যে, এই কৃষি না এলেই হয়তো ভাল ছিল!

পুরো বইজুড়ে একটা প্রশ্নের প্রতি প্রফেসর হারারির আলাদা রকমের আগ্রহটা বেশ চোখে পড়ার মত। সেটা হচ্ছে, ইতিহাসের এই সময় পরিক্রমায় মানুষ কি আগের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছে? অনেক রকম যুক্তিতর্কই তিনি উপস্থাপন করেছেন যা ভাবতে বাধ্য করবে পাঠককে। আসলেই কি আমরা এখন বেশি ভাল আছি? নাকি ১৫,০০০ বছর আগের গুহা-জীবনই এর চেয়ে বেশি সুখের ছিল?

অতীত আর বর্তমানের মেলবন্ধন করে ভবিষ্যতের দিকেও তাকিয়েছেন প্রফেসর হারারি। বইয়ের শেষ অংশে মানবজাতিকে আশার আলো দেখানোর পাশাপাশি ঈশ্বর হয়ে ওঠা মানুষের বাড়তি

দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি তিনি। তিনি শেষ করেছেন ভয়ংকর এক সাবধান বাণী দিয়ে- "পৃথিবীজোড়া অনেকগুলো প্রচণ্ড ক্ষমতাবান, অতৃপ্ত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ঈশ্বর যারা নিজেরাই জানে না তারা কী চায়, তাদের চাওয়ার শেষ কোথায়- এর থেকে মারাত্মক পরিস্থিতি আর কী হতে পারে?"

গত পাঁচ-দশ বছরে পড়া বইগুলোর মধ্যে সেপিয়েন্স শ্রেষ্ঠ কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, এই বইটা যে আমাদের উপর সীমাহীন একটা প্রভাব ফেলেছে সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমাদের মনে হয়, প্রতিটা মানুষের এই বইটা অন্তত একবার পড়া উচিত। বইয়ের প্রতিটা লাইনের সাথে আপনার একমত হতে হবে তা নয়, কিন্তু তবুও পড়ুন।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

আমাদের এই দীর্ঘ সময় ধরে চলা প্রথম অনুবাদ প্রচেষ্টার রোমাঞ্চকর গল্পটা পাঠকদের সাথে ভাগাভাগি করে নেবার তাগিদ থেকেই এই লেখাটির সূত্রপাত। মোটামুটি বড় কলেবরের এবং মহাকাব্যিক আঙ্গিকের এই বইটি অনুবাদের ব্যাপারে আমাদের যে আগ্রহ তার শতভাগ কৃতিত্ব দিনশেষে বইটিকেই দিতে হয়। বইটি সম্পর্কে কমবেশি এখন অনেক পাঠকই জানেন। কিন্তু বইটি অনুবাদের ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টার শুরুটা আসলে মূল ইংরেজি বইটি প্রকাশেরও বেশ আগে থেকে!

প্রফেসর ইউভাল নোয়া হারারির এই অসাধারণ কাজটির সাথে আমাদের পরিচয় ২০১৩ সালে Coursera নামক শিক্ষামূলক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। তখন একই শিরোনামে সাইটটিতে একটি অনলাইন কোর্স চালু ছিল যেখানে প্রফেসর হারারি ভিডিও লেকচারের মাধ্যমে তার অসাধারণ ভাবনাগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমরাও সেই থেকেই প্রফেসর হারারির গুণমুগ্ধ ছাত্র। আমরা তিনজনই একই কর্মস্থলে কাজ করার সুবাদে ভাবনার আদানপ্রদান আর আলোচনা হত হরহামেশাই। সেইসব আলোচনা থেকেই প্রথমে চিন্তা এসেছিল ভিডিও লেকচারগুলো অনুবাদ করবার। সেখান থেকেই শুরু।

একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। যেহেতু আমরা কাজটির সাথে মূলত পরিচিত হয়েছি প্রফেসর হারারির ভিডিও লেকচারের মাধ্যমে,তাই আমাদের চোখে এবং কানে প্রফেসর হারারির নির্লিপ্ত, নির্মোহ অসাধারণ বর্ণনা যতটা প্রভাব ফেলেছে, ছাপার হরফ সম্ভবত ততটা নয়। সেটা মানুষটাকে চোখের সামনে কথা বলতে দেখতে পারার কারণেই হোক কিংবা অসম্ভব কৌতূহলোদ্দীপক যুক্তিতর্কের সাথে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার প্রথম সংঘাতের কারণেই হোক। সেই প্রভাব থেকে

মুক্ত হওয়াটা সহজ কথা নয়। মন্ত্রমুগ্ধের মত একের পর এক তাঁর বর্ণনা শুনে গিয়েছি আমরা সেই সময়ে। এর ফলে যেটা হয়েছে, বইয়ের অনুবাদ করার সময়ও আমরা তাঁর সেই নির্মোহ, নির্লিপ্ত গল্প বলার ঢংটাকে অনুসরন করার চেষ্টা করেছি নিজেদের অজান্তেই। আমরা যতটুকু না অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি, তার চেয়ে বেশি আসলে গল্প বলতে চেয়েছি।

কাজটা শুরু করার পর আমরা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম নিতান্ত সহজ ভাষায়, সব মানুষকে বোঝানোর মত করে গল্প বলাটা নেহায়েত সহজ কাজ নয়। যদিও প্রফেসর হারারির এই বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই সেটা, কিন্তু বাংলায় এই কাজটা মোটেই সহজ ছিলো না। তার নানাবিধ কারণের মাঝে অন্যতম প্রধান একটা কারণ ছিলো বিজ্ঞান ও ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় গল্পের ঢঙে লেখা রচনার অপ্রতুলতা। এটা একইসাথে আমাদেরকে একটা পরীক্ষায় যেমন ফেলল, তেমনি একটা বিরাট সুযোগও এনে দিল সামনে। সেই সুযোগটা কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছি সে রায় পাঠকের, আমরা শুধু সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করেছি।

বাংলা ভাষায় এরকম লেখার অভাবের কথা উল্লেখ করলেও, যা কিছু আমাদের পড়া হয়েছে সেগুলো যথেষ্টই মুগ্ধ করেছে আমাদের। বিজ্ঞানভিত্তিক লেখার একটা বড় বাধা থাকে পরিভাষা। শুরুর দিকে আমরা বেশ চিন্তিত ছিলাম পরিভাষা নিয়ে। সেই চিন্তা থেকে যে পুরোপুরি নিষ্কৃতি পেয়েছি এমন দাবি করা দুষ্কর। কিন্তু নূরুন নাহার বেগম ও আবদুল হালিমের তিন খণ্ডে প্রকাশিত "মানুষের ইতিহাস" আমাদের অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছে, বিশেষত পরিভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। অথচ অসাধারণ এই বইটার কথা আমরা আগে জানতামই না। যেগুলো জানতাম, সেটাও নতুন করে পড়া হল- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এর "পৃথিবীর ইতিহাস", এম. ইলিন ও ইয়ে. সেগালের "মানুষ কী করে বড় হল", ইয়েকাতেরিনা আগিবালভা ও গ্রিগোরি দনস্কই এর লেখা "পৃথিবীর ইতিহাস", বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের ঢঙে লেখা "স্থাবর" সহ আরও বেশ কিছু বই। এই বইগুলোর প্রাঞ্জলতাও আমাদেরকে অনেকটা সাহস দিয়েছে। এর বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত জানার জন্যেও পড়া হয়েছে আরও বই। Jared Diamond এর *Guns, Germs, and Steel*, Desmond Morris এর *The Naked Ape*, H. G. Wells

এর *A Short History of the World* তাদের মধ্যে অন্যতম। এই অনুবাদের দীর্ঘ যাত্রার মধ্যে এইগুলো আমাদের অনেক বড় পাওয়া।

আমরা বেশ কজন মিলে অনুবাদটি করেছি। অনেকজন মানুষের লেখার ধরনকে এক সুতোয় বাঁধাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্যে এতটা সময় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গল্প করে কাটিয়েছি যে একেকজনের চিন্তার সাথে অন্য সবার চিন্তার সমন্বয় সাধনে ব্যাপারটা অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছে। পুরো লেখাটায় একটাই ছন্দ ধরে রাখার জন্য আমরা বার বার কথা বলেছি নিজেদের মধ্যে। যে অধ্যায় যে প্রথম লিখছে, সে বাদে বাকিরা সেটা সংশোধন কিংবা পরিমার্জন করেছে একাধিকবার। তারপর প্রথমজনের সাথে বসে শেষ মুহূর্তের ঘষামাজা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটা অধ্যায়েই আসলে সকলের হাতের ছোঁয়া আছে, আছে সবকটা মানুষের সুরকে এক সুতোয় বাঁধার প্রাণান্তকর চেষ্টা। সেই চেষ্টায় এবং সর্বোপরি একাধিকবারের সম্পাদনায় মোস্তাক আহমেদ ভাইয়ের পরিশ্রম এবং অবদান অনস্বীকার্য।

অনুবাদকদের সকলেই কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় এবং যুগটা ইন্টারনেটের হওয়ায় কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। এই অনুবাদের পুরোটাই লেখা হয়েছে গুগল ডকসে। বাংলায় লেখার কাজটা সহজ করার জন্য টুকটাক ইঞ্জিনিয়ারিংও করা হয়েছে সেখানে। পুরোদস্তুর পেশাগত সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে কাজ ভাগাভাগিতে। কিন্তু এই জায়গাটায় যে আমাদের অনেক কিছু করা দরকার আছে সেই উপলব্ধিটাও হয়েছে বারবার। যেহেতু প্রযুক্তি এখন জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তাই প্রযুক্তিতে বাংলাকে আরও সহজভাবে যুক্ত করতে পারলে আরও অনেকেই হয়তো এগিয়ে আসবে বাংলাকে সমৃদ্ধ করতে।

অনুবাদের পুরোটা সময় ধরেই একটা সম্পূর্ণ কাজ করার ব্যাপারে আমাদের মনোযোগ ছিল। কিন্তু ছাপার হরফে যাবার আগে মনে হয়েছে অনেক অপূর্ণতা রয়ে গেছে। আরও অনেক কিছু করার ছিল। গল্প বলতে গিয়ে প্রফেসর হারারি অনেক আঞ্চলিক উদাহরণ টেনে এনেছেন যেটা খুব দরকার ছিল পাঠকের কাছে সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপন করা। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল পাশ্চাত্যের আঞ্চলিক উদাহরণগুলোকে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির আদলে লেখার। শেষ পর্যন্ত আর তা করা

হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে এই অপূর্ণতাটা ঘোচানোর চেষ্টা করব আমরা।

একটা দীর্ঘ সময় ধরে একটা কিছুর পিছনে শ্রম দিয়ে যেতে কাছের মানুষদের অনুপ্রেরণাটা খুব বেশি প্রয়োজন হয়। সে দিক থেকে আমরা সৌভাগ্যবান। বন্ধুবান্ধব, বড় ভাইবোন, সহকর্মী, পরিবার- উৎসাহের কমতি ছিল না কোনো। সময়ে অসময়ে, চায়ের কাপের আড্ডায় কিংবা স্কাইপ কলে, অজস্র সময় ধরে আলোচনা সমালোচনার সঙ্গী যারা, বারবার কাটাকুটি করে ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে বাঁচালেন যারা, হতাশার তলানিতে ঠেকে যাওয়ার সময়গুলোতে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে আসলেন যারা- তাদের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। ভুলত্রুটি শুধরে দিয়ে অনুবাদটিকে ছাপার হরফে আনার যোগ্য করে তোলার জন্য কমল কর্মকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সবশেষে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে হয় অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবালকে এই বইটির একটি যুতসই ভূমিকা লিখে দেবার জন্য।

যে বই চিন্তার খোরাক যোগায় সেটা শুধু একা একা পড়ায় একটা অপূর্ণতা থেকে যায়। আশেপাশের মানুষের সাথে সেই চিন্তার আদানপ্রদানটা এক রকম দায়িত্ব হয়ে পড়ে। সেই তাড়না থেকেই আমাদের এই চেষ্টা। বইটিকে আরও প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য এবং সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছ পর্যন্ত যদি আমাদের শ্রম এবং আন্তরিকতার ফসলটুকু পৌঁছাতে পারে, যদি দুটো মানুষও বইটা পড়ে ভাবতে বসে, তর্ক করে, জীবনের কঠিন প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে- সেটাই হবে আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া।

সূচিপত্র

ইতিহাসের দিনলিপি

সময়কাল	কী ঘটেছিল
১৩৫০ কোটি বছর	পদার্থ ও শক্তির উদ্ভব। পদার্থবিদ্যার সূচনা। পরমাণু ও অণুর উৎপত্তি। শুরু হলো রসায়নবিদ্যার।
৪৫০ কোটি বছর	তৈরি হলো ‘পৃথিবী’।
৩৮০ কোটি বছর	প্রাণের আবির্ভাব। জীববিদ্যার সূত্রপাত।
৬০ লাখ বছর	মানুষ ও শিম্পাঞ্জি দুজনের সর্বশেষ পূর্বপুরুষকে দেখা যায়।
২৫ লাখ বছর	আফ্রিকায় আদি মানুষের বিকাশ লাভ। পাথরের হাতিয়ারের উদ্ভাবন।
২০ লাখ বছর	মানুষ আফ্রিকা থেকে ইউরেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাব।
৫ লাখ বছর	ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ান্ডার্থাল মানুষ বিকাশ লাভ করে।
৩ লাখ বছর	প্রাত্যহিক কাজে আগুনের ব্যবহার।
২ লাখ বছর	পূর্ব আফ্রিকায় আধুনিক মানুষের বিকাশ।
৭০ হাজার বছর	বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব ইতিহাসের শুরু : আধুনিক মানুষ আফ্রিকা থেকে বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
৪৫ হাজার বছর	মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী আবাস গড়ে। সেখানকার আগের প্রাণিকুলকে ধ্বংস করে ফেলে।
৩০ হাজার বছর	নিয়ান্ডার্থালের বিলুপ্তি।
১৬ হাজার বছর	মানুষ আমেরিকায় স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। আমেরিকার পূর্ববর্তী প্রাণবৈচিত্র্য বিলুপ্তির কবলে পড়ে।

১৩ হাজার বছর	ফ্লোরেসিয়েন্সিস মানুষের বিলুপ্তি। আধুনিক মানুষই মানবপ্রজাতিগুলোর মধ্যে একমাত্র টিকে থাকা প্রজাতি।
১২ হাজার বছর	কৃষিবিপ্লব। উদ্ভিদ ও প্রাণীর গৃহপালিতকরণ। মানুষের এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনা।
৫ হাজার বছর	প্রথম রাজ্য, রাজত্ব, হস্তলিপি ও মুদ্রার প্রচলন। বহু-ঈশ্বরবাদী বা বহুদেববাদী (Polytheistic) ধর্মের প্রচলন।
৪২৫০ বছর	প্রথম সাম্রাজ্য– সারগন-এর আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের শুরু।
২৫০০ বছর	পয়সার উদ্ভাবন– সর্বজনীন মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন। পারস্য (বর্তমান ইরান) সাম্রাজ্য– 'সব মানুষের স্বার্থে' সর্বজনীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার– 'জগতের সমস্ত প্রাণী দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাক'– এই সর্বজনীন সত্যে আস্থা।
২ হাজার বছর	চীনে হান সাম্রাজ্যের সূচনা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার। খ্রিষ্টধর্মের আগমন।
১৪০০ বছর	ইসলামের সূচনা।
৫০০ বছর	বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। মানুষ তার অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতাকে বুঝতে এবং নজিরবিহীন শক্তি অর্জন করতে শুরু করে। ইউরোপীয়রা আমেরিকা আর সাগর জয় করতে শুরু করে। সারা পৃথিবী একটিমাত্র ঐতিহাসিক স্থানে পরিণত হয়। পুঁজিবাদের (Capitalism) উদ্ভব।
২০০ বছর	শিল্প বিপ্লব। পরিবার ও সম্প্রদায় পরিণত হয় রাষ্ট্র ও বাজারে। বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটে এ সময়।
বর্তমান সময়	মানুষ পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করেছে। রাসায়নিক অস্ত্র মানবজাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণীর বৈশিষ্ট্য এখন আর প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে না, হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত নকশার (Intelligent Design) মাধ্যমে।
ভবিষ্যৎ সময়	আগামীর বুদ্ধিদীপ্ত নকশাই কি মানুষের ভবিষ্যৎ মূলমন্ত্র হতে যাচ্ছে? আধুনিক মানুষের জায়গা কি দখল করে নেবে অতিমানব (Superhumans)?

প্রথম পর্ব

বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব

১। প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে ফ্রান্সের দক্ষিণে শভে পুঁদ্যার্ক (Chauvet-Pont-d’Arc) গুহার দেওয়ালে আঁকা একটি মানুষের হাতের ছাপ। কেউ হয়তো বলতে চেয়েছিল ‘আমিও ছিলাম’!

অধ্যায় ১

নিতান্ত সাধারণ একটি প্রাণীর গল্প

আজ থেকে প্রায় সাড়ে ১৩০০ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাং (Big Bang) নামে পরিচিত এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় পদার্থের, উৎপত্তি লাভ করে শক্তি, সূচনা ঘটে সময়ের আর রচিত হয় মহাশূন্য। জ্ঞানের যে শাখা মহাবিশ্ব-সম্পর্কিত এসব মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে আমরা বলি পদার্থবিজ্ঞান।

পদার্থ ও শক্তি তৈরি হওয়ার প্রায় ৩ লাখ বছর পর তারা একত্রিত হয়ে পরমাণু (Atom) নামে একটি জটিল কাঠামো গঠন করে। পরমাণু হলো মৌলের ক্ষুদ্রতম একক, যা সরাসরি রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশ নিতে পারে। এই পরমাণুগুলো পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত হয়ে আরো জটিল প্রকৃতির কাঠামোর সূচনা করে, যা অণু নামে পরিচিত। পরমাণু, অণু ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গল্পই হলো রসায়ন।

এরও অনেক পরে, আজ থেকে প্রায় ৩৮০ কোটি বছর আগে, এই মহাবিশ্বের পৃথিবী নামক একটি গ্রহে নির্দিষ্ট কিছু অণু মিলিত হয়ে বড়ো আকারের ও আরো জটিল ধরনের বিশেষ কিছু কাঠামো গঠন করে। এদেরকে আমরা এক কথায় বলি ‘জীব’। সমস্ত জীবজগৎ ও তাদের কার্যপ্রণালি নিয়ে আলোচনা করে যে শাস্ত্র তার নাম জীববিজ্ঞান।

প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে, সমস্ত জীবজগতের মধ্যে হোমো সেপিয়েন্স (*Homo Sapiens*) নামের একটি বিশেষ প্রজাতি সম্মিলিতভাবে সংস্কৃতি (Culture) নামে একটি ধারণার সূত্রপাত ঘটায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কোনো একটি প্রজাতির ব্যবহৃত সব

বাস্তব উপকরণ– খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎপাদন পদ্ধতি এবং আচার-আচরণকে একসঙ্গে বলা হয় তার সংস্কৃতি। আর হোমো সেপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের সংস্কৃতির ক্রমাগত পরিবর্তনের গল্পকেই বলা হয় ইতিহাস।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ইতিহাসকে আজকের অবস্থানে এনে দিয়েছে। প্রথমটি হলো বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব (Cognitive Revolution), যা প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে। এরপর বিকাশ ঘটে কৃষিভিত্তিক বিপ্লবের (Agricultural Revolution), যা প্রায় ১২ হাজার বছর আগে মানুষের ইতিহাসকে দেয় নতুন গতি। সবশেষে, মাত্র ৫০০ বছর আগে সূচনা হয় বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের (Scientific Revolution)। এই বিপ্লব রাতারাতি পালটে দিয়েছে ইতিহাসের গতিপথ। হয়তো একদিন বিজ্ঞানের এই বিপ্লব মানুষের ইতিহাসের ইতি টেনে সূচনা করবে সম্পূর্ণ নতুন কোনো যুগের। এই বইয়ে আমরা এই তিন বিপ্লবের প্রভাবে মানুষ ও জীবজগতের অন্যান্য সদস্যদের পালটে যাওয়ার গল্পটাই জানার চেষ্টা করব।

বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ ইতিহাসের সূচনার বহু আগে থেকেই পৃথিবীতে মানুষের বিচরণ ছিল। আধুনিক মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে প্রায় ২৫ লাখ বছর আগে। এর আগে হাজার হাজার প্রজন্ম ধরে মানুষের পূর্বপুরুষেরা অন্য দশটা সাধারণ প্রাণীর মতোই জীবন যাপন করে এসেছে। তাদের ছিল না হাতির মতো বিশাল আকার-আকৃতি, আলাদা করে চেনার মতো প্রখর বুদ্ধিমত্তা কিংবা খাদ্যশৃঙ্খলে একক কোনো আধিপত্য।

২০ লাখ বছর আগের পূর্ব আফ্রিকার কোনো গ্রামে হাঁটতে বেরোলে মানুষের চরিত্রের চিরচেনা রূপটাই হয়তো আপনার চোখে পড়ত। আপনি দেখতেন ছোটো বাচ্চাদের বুকে আগলে রাখা উদ্বিগ্ন মাকে আর কাছেপিঠেই খেলাধুলায় মেতে থাকা ছোটো ছেলেমেয়েদের। দেখতে পেতেন সমাজের নিয়মভাঙা সাহসী তরুণদের কিংবা এমন সব বুড়োদের, যারা বাকি জীবনটা কোনোরকমে শান্তিতে কাটাতে পারলেই খুশি। হয়তো দেখতেন

শারীরিক শক্তি বা বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে সুন্দরী নারীর মন ভোলাতে ব্যস্ত কিছু যুবককে আর জীবনভর এই সবকিছু দেখে আসা কোনো সবজান্তা, অশীতিপর বৃদ্ধাকেও। এই প্রাচীন মানুষেরা ভালোবেসেছে, খেলাধুলা করেছে, গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। একই কাজ করেছে শিম্পাঞ্জি, বেবুন ও হাতিও। মানুষ তখন কোনোভাবেই প্রাণিকুলের অন্যদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। এ রকম কোনো লক্ষণই তখন তাদের মধ্যে দেখা যায়নি, যেটা দেখে কেউ অনুমান করতে পারবে যে তাদেরই সুদূর বংশধরেরা একদিন চাঁদের বুকে হাঁটবে, পরমাণুকে দ্বিখণ্ডিত করবে, ডিএনএর রহস্য উন্মোচন করবে অথবা ইতিহাসের বই লিখবে। সুতরাং, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্পর্কে জানার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে তা হলো, তখন মানুষ খুবই গুরুত্বহীন একটা প্রাণী ছিল। বনমানুষ, মাছি বা পেঙ্গুইনের থেকে পৃথিবীর ওপর বেশি প্রভাব মানুষের ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ইতিহাস তাই প্রাণিবিদ্যা বইয়ের সাধারণ একটি অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীববিজ্ঞানীরা জীবজগৎকে বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভক্ত করেছেন। দুটি প্রাণী মিলনের মাধ্যমে যদি সফলভাবে বংশধর তৈরি করতে সক্ষম হয়, তবে তাদেরকে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। দুটো উদাহরণ থেকে আমরা বিষয়টি আরেকটু সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। আমরা জানি, বিবর্তনের পরম্পরায় একই পূর্বপুরুষ থেকে গাধা ও ঘোড়ার উৎপত্তি হয়েছে এবং সে কারণেই তাদের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষ করা যায়। কিন্তু, তারা একে অপরের প্রতি খুব কমই যৌন আকর্ষণ বোধ করে। মানুষ চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের মিলনের ফলে উৎপাদিত সন্তান হয় বন্ধ্যা, সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। এদেরকে আমরা 'খচ্চর' নামে চিনি। উৎপাদিত সন্তান বন্ধ্যা হওয়ার কারণ হলো, গাধার রূপান্তরিত ডিএনএ কখনোই ঘোড়ার ডিএনএর সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খায় না, ঘোড়ার ডিএনএর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ কারণে গাধা ও

ঘোড়া একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হলেও তারা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতি, বিবর্তনের সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে তাদের দুজনের যাত্রা। অন্যদিকে বুলডগ ও স্প্যানিয়েল দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা বলে তাদেরকে ভিন্ন প্রজাতির মনে হলেও আসলে তারা কিন্তু একই প্রজাতির সদস্য। কারণ, তারা দুজনেই একই রকম ডিএনএ বহন করছে। তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই যৌনক্রিয়ায় আবদ্ধ হতে পারবে, তাদের খুব সুন্দর বাচ্চা হবে এবং সেই বাচ্চারাও পরিণত বয়সে অনেক বাচ্চার জন্ম দিতে পারবে।

যেসব প্রজাতি একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে তাদেরকে একই ‘গণ’ বা ‘জাতি’র (Genus, বহুবচন Genera) অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। সিংহ, বাঘ, চিতা ও জাগুয়ার– এরা প্রত্যেকেই প্যানথেরা (*Panthera*) নামক জাতের আলাদা আলাদা প্রজাতি। জীববিজ্ঞানীরা প্রাণীদের নামকরণ করেন দুটি পৃথক ল্যাটিন শব্দের মাধ্যমে। আগে গণ বা জাতির নাম, পরে প্রজাতির নাম। যেমন, সিংহের নাম প্যানথেরা লিও (*Panthera Leo*) যার অর্থ প্যানথেরা শ্রেণির সিংহ প্রজাতি। ধরে নেওয়া যায়, এ বই যারা পড়বে তাদের প্রত্যেকেই হোমো সেপিয়েন্স (*Homo sapiens*) অর্থাৎ মানুষ (Homo অর্থ মানুষ) শ্রেণির জ্ঞানী (Sapiens অর্থ জ্ঞানী) প্রজাতির।

কয়েকটি ‘গণ’ আবার একটি ‘পরিবার’ (Family) তৈরি করে। যেমন– সিংহ, চিতা বাঘ, পোষা বিড়াল– এরা বিড়াল পরিবারভুক্ত; নেকড়ে, খ্যাঁকশিয়াল এবং শেয়াল– এরা কুকুর পরিবারের সদস্য এবং হাতি, ম্যামথ, মাসটোডোন– এরা হাতি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। একই পরিবারের সমস্ত সদস্য অতীতের কোনো পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী থেকে বিকাশ লাভ করেছে বা বিবর্তিত হয়েছে। গৃহস্থের আদরের পোষা বিড়াল এবং বনের হিংস্র বাঘ আসলে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত, প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ছিল যাদের বসবাস।

জীবজগতের অন্য প্রাণীদের মতো মানুষও অনেকগুলো গণ বা জাতি নিয়ে গঠিত একটি পরিবারের অংশ। আশ্চর্যজনকভাবে, এই নিতান্ত সাধারণ ব্যাপারটিকে অদ্ভুত কারণে মানুষ বারবার গোপন করতে চেয়েছে। ‘হোমো সেপিয়েন্স’ নামের এই প্রাণীটি বরাবরই

নিজেদেরকে বাকি প্রাণিজগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখতে চায়, দেখে এসেছে। ভাবখানা এমন, যেন তারা অনাথ একটা প্রজাতি, তারা কোনো পরিবারের অংশ নয়, তাদের কোনো ভাইবোন নেই, এমনকি পিতা-মাতা বা অন্য কোনো পূর্বপুরুষও নেই। তা কিন্তু একেবারেই সত্য নয়। পছন্দ করুন আর না-ই করুন, আমরা গ্রেট এপ (Great Ape) নামের বিশাল জনবহুল এক পরিবারের অংশ। আমাদের পরিবারের জীবিত নিকটাত্মীয়দের মধ্যে শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও ওরাং-ওটাং উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে শিম্পাঞ্জিরা আমাদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। প্রায় ৬০ লাখ বছর আগে এক নরবানর (Ape) মায়ের দুটি কন্যাসন্তান ছিল। এদের একজন সমস্ত শিম্পাঞ্জির আদিমাতা এবং অন্যজন হলো আধুনিক মানুষের প্রাচীনতম নানি।

গল্প বলা কঙ্কাল

হোমো সেপিয়েন্স আরো বিব্রতকর একটা সত্য এতদিন গোপন করে এসেছে। সেপিয়েন্সের যে কেবল অনেকগুলো অসভ্য, বন্য জ্ঞাতিভাই আছে তা-ই নয়, ইতিহাসের একটা পর্যায়ে আমাদের বেশ কিছু আপন ভাইবোনও ছিল। আমরা এতদিন নিজেদেরই একমাত্র মানুষ হিসেবে জেনে এসেছি, কারণ গত ১০ হাজার বছর ধরে শুধু এই সেপিয়েন্সরাই পৃথিবীতে মানুষ গোত্রের প্রাণী হিসেবে টিকে আছে। আমরা ইতিমধ্যে যে জীববৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি দেখেছি সেই পদ্ধতি অনুযায়ী ‘মানুষ’ শব্দটার সত্যিকার মানে হলো ‘হোমো (Homo) গণের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী’। অতীতে এই ‘হোমো’ নামক গণটির আরো অনেক প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। এই বইয়ের শেষের অধ্যায়ে আমরা দেখব, অদূর ভবিষ্যতেও হয়তো আমাদের এই হোমো গণের অন্য প্রজাতির মানুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে। এই নামকরণের ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্য, আমরা অধিকাংশ সময়ই ‘সেপিয়েন্স’ বলতে শুধু হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিটিকে বোঝাব, আর ‘মানুষ’ শব্দটা হোমো গণের সব প্রজাতির মানুষের জন্য সংরক্ষিত রাখব।

মানুষের প্রথম সন্ধান মেলে পূর্ব আফ্রিকায়, প্রায় ২৫ লাখ বছর আগে। তারা কিন্তু শূন্য থেকে আসেনি, প্রথম দিককার নরবানরের একটি শ্রেণি অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus) থেকে বিবর্তনের মাধ্যমেই তাদের উদ্ভব। এ জটিল আকারের নামের সঙ্গে কিন্তু ভূগোলের অস্ট্রেলিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। অস্ট্রালোপিথেকাস-এর শাব্দিক অর্থ হলো দক্ষিণের নরবানর (Southern Ape)। প্রায় ২০ লাখ বছর আগে কিছু মানুষ পূর্ব আফ্রিকা ত্যাগ করে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি নতুন জায়গায় এরা বিরূপ অবস্থা, নতুন ধরনের আবহাওয়া ও জলবায়ু, ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থা, নতুন নতুন প্রাণী, অচেনা গাছপালা ইত্যাদির সম্মুখীন হয়। এতসব অচেনা অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন-ভিন্নভাবে বিবর্তিত হতে থাকে। অনেক অনেক বছর ধরে এরকম চলার পর মানুষের অনেকগুলো আলাদা আলাদা প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করে এবং পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের মতো করে সবগুলো প্রজাতির আলাদা আলাদা ল্যাটিন নামকরণ করেন।
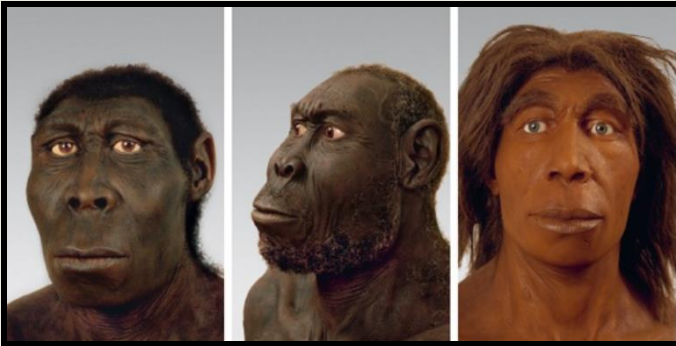
২. কাল্পনিক পুনর্গঠন অনুসারে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সহোদরেরা (বাঁ থেকে ডানে): হোমো রুডলফেনসিস (পূর্ব আফ্রিকা), হোমো ইরেক্টাস (পূর্ব এশিয়া) ও হোমো নিয়াল্ডার্থালেনসিস (ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া)। এরা সবাই মানুষ।

পশ্চিম ইউরেশিয়ায় (ইউরোপ ও এশিয়া) মানুষের যে প্রজাতি বিকাশ লাভ করে বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন হোমো নিয়ান্ডার্থালেনসিস (*Homo Neanderthalensis*) বা সংক্ষেপে নিয়ান্ডার্থাল (Neanderthals)। এর সহজ মানে হলো– নিয়ান্ডার উপত্যকার মানুষ। নিয়ান্ডার্থালরা আমাদের থেকে আকারে অনেক বড়োসড়ো এবং পেশিবহুল ছিল। এরা বরফযুগে পশ্চিম ইউরেশিয়ার ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খুব ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। এশিয়ার একদম পূর্বের দিকে মানুষের যে প্রজাতি বিকাশ লাভ করে তাদের নাম হোমো ইরেকটাস (*Homo Erectus*) বা 'খাড়া মানুষ'। এরা প্রায় ২০ লাখ বছর পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতে পেরেছে। মানুষের আর কোনো প্রজাতি পৃথিবীতে এত বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। আজকের আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্সও এই ২০ লাখ বছরের রেকর্ড ভাঙতে পারবে কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের পক্ষে আরো ১ হাজার বছর পৃথিবীতে টিকে থাকা সম্ভব হবে কি না সেটাই প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়, লাখ লাখ বছর তো অনেক দূরের ব্যাপার!

এবারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে মানুষের আরেকটি প্রজাতি বিকাশ লাভ করে, যাদেরকে বলা হয় হোমো সলোয়েনসিস (*Homo Soloensis*) বা সলো উপত্যকার মানুষ। এদিকে ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস নামের ছোট্ট একটি দ্বীপে তখন লেখা হচ্ছে ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিকাশ হচ্ছে ছোটো আকারের এক প্রজাতির মানুষের, সেপিয়েন্স প্রজাতির বিজ্ঞানীরা অনেক পরে যার নাম দেবেন হোমো ফ্লোরেসিয়েনসিস (*Homo Floresiensis*) বা ফ্লোরেস দ্বীপের মানুষ। মানুষ যখন প্রথম ফ্লোরেস দ্বীপে পৌঁছায় তখন সমুদ্রের পানির উচ্চতা ছিল একেবারেই কম। ফলে মানুষ সহজেই ফ্লোরেস থেকে মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে পারত। সময় যতই অতিবাহিত হলো সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়তে থাকল। একসময় ফ্লোরেস দ্বীপ মূল ভূখণ্ড থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এর ফলে কিছু লোক ফ্লোরেস দ্বীপেই আটকা পড়ে গেল। ফ্লোরেস ছিল খুবই ছোটো একটি দ্বীপ। এরকম ছোটো একটি দ্বীপে অনেক লোকের জন্য

যথেষ্ট পরিমাণ খাবারের সরবরাহ থাকে না। ফলে লম্বা ও মোটা-তাজা লোকজন, বেশি বেশি খাবার ছাড়া যাদের চলে না, প্রথমেই তারা খাবারের অভাবে মারা পড়ল। কিন্তু ছোটোখাটো লোকজন ও প্রাণী, যাদের বেঁচে থাকার জন্য কম খাবারের প্রয়োজন হয় তারা কোনোরকমে বেঁচে থাকল।

অনেক অনেক বছর ধরে এই ঘটনা ঘটে চলল। ছোটো আকারের মানুষদের কম খাবার খেয়েও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি ছিল। এ কারণে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছোটো আকারের মানুষরাই বেশি সংখ্যায় টিকে থাকল। এভাবে ফ্লোরেস দ্বীপের মানুষ একসময় বামনে (ছোটো আকারের মানুষ) পরিণত হলো। হোমো ফ্লোরেসিয়েনসিস সর্বোচ্চ এক মিটার (৩ ফুট) উচ্চতার এবং ২৫ কিলোগ্রাম ওজনের হতো। কিন্তু, আকারে ছোটো হলেও তারা মানুষের অন্যান্য প্রজাতির মতোই বর্শাসহ পাথরের নানা রকম হাতিয়ার তৈরি করতে পারত এবং এসব হাতিয়ার দিয়ে তারা মাঝে মাঝে হাতিও শিকার করত! যদিও, সত্যি কথা বলতে কি, সেই হাতি অন্যান্য এলাকার হাতির মতো দশাসই আকারের হাতি ছিল না, ছিল বামন হাতি! এই হলো বামনরাজ্য ফ্লোরেস-এর গল্প।

২০১০ সালে বিজ্ঞানীরা সাইবেরিয়ার ডেনিসোভা গুহায় খননকাজ চালাতে গিয়ে মানুষের একটি আঙুলের ফসিলের সন্ধান পান, যা কিছুদিন পর আমাদের সামনে নিয়ে আসে মানুষের হারিয়ে যাওয়া আরেকটি প্রজাতিকে। জিনগত গবেষণা থেকে বোঝা যায়, এই ফসিলটি থেকে প্রাপ্ত জিন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মানুষের সবগুলো প্রজাতির থেকে আলাদা। বিজ্ঞানীরা মানুষের নতুন এই প্রজাতির নাম দিয়েছেন হোমো ডেনিসোভা (*Homo Denisova*) বা ডেনিসোভা গুহার মানুষ। কে জানে কোন দেশে, কোন অচেনা গুহায়, কোন নির্জন দ্বীপে মানুষের নাম-না-জানা কত প্রজাতির নিদর্শন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আবিষ্কৃত হওয়ার প্রত্যাশায়।

যখন ইউরোপ ও এশিয়ায় বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের এসব নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে, তখন পূর্ব আফ্রিকাতেও কিন্তু বিবর্তন থেমে থাকেনি। সেখানেও মানবজাতির আঁতুড়ঘরে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন প্রজাতি। তৈরি হয়েছে হোমো রুডলফেনসিস

(*Homo Rudolfensis*) বা রুডলফ হ্রদের মানুষ, হোমো ইরগেস্টার (*Homo Ergaster*) বা কর্মঠ মানুষ এবং সবশেষে তৈরি হয়েছে আমাদের প্রজাতি, নিজেদের যারা হোমো সেপিয়েন্স বা জ্ঞানী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা মানুষের বিভিন্ন প্রজাতিগুলোর মধ্যে কিছু ছিল বিশাল আকারের, কেউ ছিল বামন। কেউ কেউ ছিল তুখোড় শিকারি আবার কেউ শুধু ফলমূল খেয়েই বেঁচে থাকত। কোনো প্রজাতি একটি দ্বীপের মধ্যেই সারাটা জীবন কাটিয়েছে, কেউ আবার ভ্রমণ করেছে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশ। কিন্তু তারা সকলেই ছিল এক মানবজাতির অংশ। তারা সবাই ছিল মানুষ।

মানুষের এই বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে একটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা হলো, মানুষের একাধিক প্রজাতি একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে কখনোই একসঙ্গে বসবাস করেনি, বরং প্রজাতিগুলোর একটি থেকে অন্যটির জন্ম হয়েছে। যেমন, ইরেকটাস-এর জন্ম হয়েছে ইরগেস্টার থেকে, নিয়ান্ডার্থালের জন্ম হয়েছে ইরেকটাস থেকে এবং নিয়ান্ডার্থাল থেকে আমরা এসেছি। মানুষের একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির তৈরি হওয়ার এই ধারণা আমাদের এটা ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে যে, মানুষের একের অধিক প্রজাতি কখনো একসঙ্গে পৃথিবীর বুকে বসবাস করেনি, একটি নতুন প্রজাতি মানুষের পূর্ববর্তী আরেকটি প্রজাতির উন্নত সংস্করণ মাত্র। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ২০ লাখ বছর আগে থেকে শুরু করে ১০ হাজার বছর আগেও পৃথিবী ছিল মানুষের অনেকগুলো প্রজাতির বাসভূমি। কেন নয়? আজকের পৃথিবীতে একই সময়ে অনেক প্রজাতির শেয়াল, ভালুক আর শূকর বসবাস করছে। একইভাবে ১ লাখ বছর আগের পৃথিবীতে একই সঙ্গে মানুষরে অন্তত ছয়টি প্রজাতি হেঁটে বেড়িয়েছে, বসবাস করেছে পৃথিবীর বুকে। প্রাণিজগতে অন্যদের দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায়, একসঙ্গে একাধিক প্রজাতির সহাবস্থানের ব্যাপারটাই স্বাভাবিক, বরং আজকের আধুনিক বিশ্বে যে মানুষের কেবল একটি প্রজাতি বসবাস করছে সেই ব্যাপারটি অস্বাভাবিক, খাপছাড়া। একটু পরেই আমরা দেখব, আধুনিক মানুষ

তাদের নিজেদের স্বার্থেই মানুষের অন্যান্য প্রজাতির ইতিহাস ধামাচামা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

মগজের মাশুল

এতক্ষণ আমরা মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি এবং তাদের নানা রকম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানলাম। মানুষের এই প্রজাতিগুলোর মধ্যে আকার-আকৃতি, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয়ে নানা রকম পার্থক্য থাকলেও তাদের সবার মধ্যেই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে যেটা সবার আগে চোখে পড়ে, সেটা হলো বড়ো আকারের মস্তিষ্ক। দৈহিক গঠন অনুপাতে মানুষের মস্তিষ্কের আকার অন্য যে-কোনো প্রাণীর থেকে বেশ বড়ো। সাধারণত ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক গড়পড়তায় ২০০ ঘনসেন্টিমিটার হয়। অন্যদিকে প্রায় আড়াই লাখ বছর আগের আধা-মানুষদের মস্তিষ্কের আকার ছিল প্রায় ৬০০ ঘনসেন্টিমিটার। বর্তমানের আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের আকার প্রায় ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ ঘনসেন্টিমিটার। মানুষের আরেকটি প্রজাতি নিয়ান্ডার্থালের মস্তিষ্ক এর চেয়েও বড়ো আকারের ছিল।

আমরা জানি, যেসব বৈশিষ্ট্য কোনো প্রাণীকে টিকে থাকার জন্য বেশি সুবিধা দেয়, সেই বৈশিষ্ট্যগুলোই সাধারণত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিকশিত হয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এ কথা মনে হতেই পারে যে, মাথা বড়ো মানে বেশি বুদ্ধি, বেশি চিন্তাভাবনা করার সুযোগ এবং বেশি চিন্তাভাবনা করতে পারলে টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং, প্রাকৃতিক বিবর্তনে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বড়ো মাথার মানুষগুলোই টিকে থাকবে। কিন্তু, এ অনুমান যদি সত্যি হতো, তাহলে মানুষের পাশাপাশি বিড়াল, বাঘ, সিংহ এদের মধ্যেও বিবর্তনের মাধ্যমে বড়ো বড়ো গণিতবিদ বা বিজ্ঞানী তৈরি হতো। বাস্তবে তা হয়নি, কেবল মানুষই বিশাল আকারের চিন্তাশীল মগজের অধিকারী হয়েছে এবং তাদের মধ্যেই তৈরি হয়েছে গণিতবিদ, বিজ্ঞানী, কবি ও দার্শনিক। প্রশ্ন হলো, কেন?

এক কথায় বলতে গেলে, 'যত মাথা, তত ব্যথা'। অর্থাৎ, বড়ো আকারের মগজ শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুবিধাই দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম সমস্যা ও সংকটেরও সৃষ্টি করে। বড়ো মগজের কাজ করার জন্য বেশি শক্তি দরকার, যেটা আসে খাদ্য থেকে। আধুনিক মানুষের মস্তিষ্ক দেহের মোট ওজনের ২-৩ শতাংশ, কিন্তু মানুষ যখন বিশ্রামে থাকে, তখন দেহের মোট শক্তির শতকরা ২৫ ভাগ শুধু মস্তিষ্ককে সচল রাখার জন্যই ব্যয় হয়। অন্যদিকে, বিশ্রামকালীন অন্যান্য নরবানরের মস্তিষ্ক পরিচালনার জন্য দেহের মোট শক্তির মাত্র ৮ শতাংশ ব্যয় করতে হয়। এই বড়ো আকারের মগজের মাশুল প্রাচীনকালের মানুষদের দুইভাবে দিতে হয়েছে। প্রথমত, বড়ো মস্তিষ্কের জন্য খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তাদের খাদ্য খোঁজার জন্য অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মস্তিষ্কের বড়ো হওয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাদের পেশির ক্ষয় হয়েছে, শারীরিক সামর্থ্য কমে এসেছে। সরকার যেমন সামরিক খাত থেকে বাজেট কমিয়ে শিক্ষা খাতে দেয়, তেমনি মানুষও পেশিকে শক্তিশালী না করে নিউরনকে পুষ্ট করেছে। মানুষের শিকারি-সংগ্রাহক জীবনে টিকে থাকার ক্ষেত্রে এটা মোটেই কোনো ভালো কৌশল ছিল না। কারণ, সেকালের একটি শিম্পাঞ্জি কখনো মানুষের সঙ্গে তর্কে জিততে পারত না ঠিকই, কিন্তু ওই শিম্পাঞ্জিটিই শারীরিক শক্তির কারণে একটি মানুষকে নিমেষে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত।

তবে আনন্দের কথা এই, বড়ো মস্তিষ্কের জন্য অনেক কাল আগে নেওয়া ঝুঁকিটা আজকের এই আধুনিক সমাজে আমাদের বেশ কাজে আসছে। এর কারণে আমরা এখন গাড়ি বানাতে পারি, বন্দুক বানাতে পারি। গাড়ি আমাদেরকে শিম্পাঞ্জিদের থেকে অনেক দ্রুত চলাচল করতে সাহায্য করে আর বন্দুকের কারণে আমরা এখন শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে না গিয়েই দূর থেকে গুলি করে তাদের মেরে ফেলতে পারি। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে, গাড়ি কিংবা বন্দুক আবিষ্কার তো এই সেদিনের কাহিনি। এর আগে প্রায় ২০ লাখ বছর ধরে মানুষের মস্তিষ্কের আকার ও ক্ষমতা ক্রমাগত বেড়েছে। কিন্তু সেই বড়োসড়ো

মগজ দিয়ে তারা শুধু কিছু বাহারি চাকু আর কিছু বর্শা ছাড়া আর তেমন কিছুই তৈরি করতে পারেনি। উপরন্তু, বড়ো মস্তিষ্ক অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য অস্তিত্বের সংকট তৈরি করেছে। সুতরাং, বিবর্তনের নিয়মানুযায়ী যেহেতু মানুষের বড়ো মস্তিষ্ক টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদেরকে তেমন কোনো সুবিধা দেয়নি, সেহেতু মগজ বড়ো হওয়ার বৈশিষ্ট্যটা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়ানোর ও বিকাশ লাভ করার কথা নয়। কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেটাই হয়ে এসেছে। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনো জানি না।

বড়ো মস্তিষ্কের পর মানুষের সব প্রজাতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যটি আমরা দেখতে পাই তা হলো, তারা সবাই দুই পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটে। মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে আশপাশের শত্রু বা শিকারের সন্ধান করা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। এ ছাড়াও এর ফলে আমাদের দুটো হাত হাঁটার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পাথর ছুঁড়ে মারা বা অন্যকে ইশারা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। যার হাত যত বেশি দক্ষ, সমাজে তার টিকে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। সে কারণে, বহু বছরের বিবর্তনের ফলে ক্রমাগত সূক্ষ্ম পেশি, অধিকতর স্নায়ুসংযোগ, সূক্ষ্ম কাজের জন্য উপযুক্ত হাতের তালু ও আঙুলসমৃদ্ধ মানুষের বিকাশ হতে থাকল। ফলে মানুষ তার হাত দিয়ে অনেক সূক্ষ্ম কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে শিখল। বিশেষ করে, উন্নত এই হাত তাদের অনেক সূক্ষ্ম অস্ত্র তৈরি এবং ব্যবহারের সুযোগ করে দিল। সবচেয়ে পুরোনো এরকম যে হাতিয়ারটি পুরাতত্ত্ববিদেরা পেয়েছেন সেটা প্রায় ২৫ লাখ বছর আগের। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ওই সময় থেকেই হাতে বানানো হাতিয়ারের প্রচলন ছিল।

কিন্তু সোজা হয়ে হাঁটার কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে। আমাদের শরীরের কঙ্কালটা লাখ লাখ বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে একটা চারপেয়ে, অপেক্ষাকৃত ছোটো মাথার প্রাণীর শরীরকে বহন করার জন্য। সুতরাং হঠাৎ করেই সেই কঙ্কালের পক্ষে একটি দুই পায়ে দাঁড়ানো, বড়ো মস্তিষ্কের প্রাণীকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া বেশ কষ্টসাধ্যই ছিল। আর এই কষ্টসাধ্য কাজের মূল্যও

মানুষকে দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। মানুষ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর দক্ষ হাতের বিনিময়ে কিছু কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে– সেগুলো হলো পিঠ আর ঘাড়ের ব্যথা।

মেয়েদের আরো অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে হলে কোমর হতে হবে চিকন, যা জন্মনালিকে সরু করে দেয়। তার ওপর সেটা এমন সময়ে ঘটল যখন নবজাতকদের মাথার আকার বড়ো থেকে আরো বড়ো হচ্ছিল। ফলে জন্মকালীন মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গিয়েছিল। যেসব মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাচ্চা প্রসব করতে সমর্থ হয়েছে তারাই বেঁচে থাকল এবং আরো বাচ্চা নিতে সমর্থ হলো। সেইসব বাচ্চার মস্তিষ্ক ও মাথা পুরোপুরি বড়ো হয়ে ওঠেনি। বিবর্তনের ধারা এইসব সময়ের আগে প্রসবকারীদের প্রাধান্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখল। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানবশিশু পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই জন্মগ্রহণ করে। জন্মলাভ করার সময় বেশিরভাগ শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করার যথেষ্ট সময় পায় না। একটি অশ্বশাবক জন্মের পরপরই দৌড়াতে পারে, একটি বিড়ালশাবক জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মাকে ছেড়ে নিজের মতো বাঁচতে থাকে। সে তুলনায় মানবশিশুরা খুবই অসহায়– বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা এবং শিক্ষার জন্য বড়দের কাছে অনেক বছর তাদের নির্ভরশীল থাকতে হয়।

এই সত্যটি মানবজাতির সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নিঃসঙ্গ মায়েরা তাদের এবং বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট খাবার জোগাড় করতে পারে না। বাচ্চাকে বড়ো করতে হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং প্রতিবেশীদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় সব সময়। একটি মানবশিশুকে বড়ো করতে একটি গোত্রের প্রয়োজন হয়। বিবর্তন তাদেরই সহায়তা করেছে, যারা নিবিড় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছে। আর তা ছাড়া, মানুষ যেহেতু অপরিপক্ব অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তাই অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষকে অনেক সহজে প্রয়োজনমতো শিখিয়ে নেওয়া যায় এবং সামাজিক প্রাণী হিসেবে গড়ে তোলা যায়। ইট, মাটির পাত্র, চুনাপাথর ইত্যাদি পোড়ানো বা শুকানোর জন্য ব্যবহৃত চুল্লি থেকে যেভাবে চীনামাটির পাত্র বের হয়, ঠিক সেভাবে বেশিরভাগ

স্তন্যপায়ীর জরায়ু থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে। এটা একটা পরিপক্ব এবং তৈরি অবস্থায় বের হয়ে আসে। এখন আপনি যদি এই চীনামাটির ফুলদানির আকারের কোনো পরিবর্তন করতে চান, তাহলে এটাতে হয় দাগ ফেলতে হবে না হয় ভাঙতে হবে। অন্যদিকে মানুষ বের হয়ে আসে মায়ের জরায়ু থেকে ঠিক যেমন কাচ বের হয়ে আসে চুল্লি থেকে প্রায় গলিত অবস্থায়। চুল্লি থেকে কাচ বের হওয়ার সময় বেশ নমনীয় একটা অবস্থায় থাকে বলে বের করে আনার পরও এটাকে প্যাঁচানো বা লম্বা করা কিংবা যে রকম ইচ্ছা আকার দেওয়া যায়। একই ঘটনা ঘটে মানবশিশুর ক্ষেত্রেও। জন্মের পর তাকে আপনি শিক্ষাদান করতে পারেন এবং সামাজিক রীতিনীতিতে গড়ে তুলতে পারেন। আর এজন্যই আজ আমরা একজন মানবশিশুকে চাইলেই খ্রিষ্টান কিংবা বৌদ্ধ, পুঁজিবাদী কিংবা সাম্যবাদী, যুদ্ধপ্রিয় বা শান্তিপ্রিয় হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

আমরা সাধারণত অনুমান করি যে, বড়ো একটা মস্তিষ্ক থাকা, হাতিয়ার বা যন্ত্র বানানো এবং ব্যবহার করা, জটিল সমাজ থাকা– এগুলো বিশাল সুবিধার ব্যাপার। এটাও খুব স্পষ্ট যে, এমন সব সুযোগসুবিধা তৈরি করার ক্ষমতা মানবজাতিকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, মানুষ আসলে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করেছে প্রায় ২০ লাখ বছর ধরে, যখন তারা দুর্বল ও সাধারণ একটা প্রজাতি হিসেবে টিকে ছিল। সুতরাং প্রায় লাখ বছর আগে যেসব মানুষ বসবাস করত, বড়ো আকারের মস্তিষ্ক আর পাথরের ধারালো অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা সারাক্ষণ হিংস্র জন্তুর ভয়ে তটস্থ থাকত। খুব কম ক্ষেত্রেই বড়ো প্রাণী শিকার করতে পারত তারা। বেশিরভাগ সময়ই তারা নানা রকম ফলমূল সংগ্রহ করে কিংবা ছোটোখাটো প্রাণী শিকার করে বা কীটপতঙ্গ খুঁজে বের করে খেয়ে অথবা কোনো বড়ো প্রাণীর শিকারের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকত।

একদম প্রথম দিককার যেসব পাথরের তৈরি হাতিয়ার পাওয়া যায় সেগুলো মূলত হাড় ভেঙে মজ্জা বের করার জন্যই বেশি ব্যবহৃত হতো। কিছু কিছু গবেষক বিশ্বাস করেন যে, এই অস্থিমজ্জা খাওয়াটা

মানুষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রত্যেক প্রাণীরই এরকম একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যেটা দিয়ে তাকে আলাদা করে চেনা যায়। কাঠঠোকরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমন গাছের কাণ্ড থেকে পোকামাকড় খুঁজে বের করা, ঠিক তেমনি প্রথম দিককার মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল হাড় ভেঙে তার থেকে অস্থিমজ্জা বের করে খাওয়া। মজ্জা কেন? কল্পনা করুন ১০ লাখ বছর আগের কথা। ধরে নিন, আপনি সেই সময়ের একজন মানুষ। আপনি দেখলেন একদল সিংহ একটি জিরাফকে শিকার করেছে। আপনার খুব ইচ্ছে হলো জিরাফের সুস্বাদু মাংস খাওয়ার। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত সিংহের আশপাশে যাবেন না। কারণ, সেটা করলে শেষমেশ জিরাফের মতো আপনিও সিংহের খাবারে পরিণত হতে পারেন। সুতরাং আপনি দূরে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে থাকবেন। সবার আগে আয়েশ করে জিরাফের মাংস খেয়ে গেল সিংহ মামা। কিন্তু তখনো আপনার পালা আসেনি। সিংহের পর এলো হায়েনা আর হিংস্র শেয়ালেরা। তারা সিংহের ফেলে যাওয়া সব খাবার খেয়ে নিল। এরপর আপনার খাবারের পালা। কিন্তু, এতক্ষণে আপনার জন্য জিরাফের হাড়ের ভেতরের অস্থিমজ্জা ছাড়া খাওয়ার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এই হলো ১০ লাখ বছর আগেকার মানুষের অবস্থা। আজকের দিনেও মানুষের ইতিহাস ও মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রায় ২০ লাখ বছর আগের কাছাকাছি সময়ে মানুষ ছিল খাদ্যচক্রের মাঝামাঝি পর্যায়ের প্রাণী। লাখ লাখ বছর ধরে আমরা খাদ্যচক্রের এই মাঝামঝি অবস্থানেই অবস্থান করেছি। এটা ঠিক যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কচ্ছপ, পাখিসহ আরো ছোটো ছোটো প্রাণী যা পেত, সব সময়ই শিকার করত। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তারা অন্য বড়ো হিংস্র প্রাণীর শিকার হতো। মাত্র ৪ লাখ বছর আগে, নিয়ান্ডার্থালের মতো কিছু প্রজাতির মানুষ নিয়মিতভাবেই বড়ো প্রাণী শিকার করা শুরু করে। আর আজ থেকে প্রায় এক লাখ বছর আগে– হোমো সেপিয়েন্সের উত্থানের সময়টাতে– মানুষ হঠাৎ করে খাদ্যচক্রের একদম ওপরে উঠে যায়।

খাদ্যচক্রের মধ্যম অবস্থান থেকে একলাফে মানুষের শীর্ষে ওঠার এই ঘটনা একটা বড়ো প্রভাব ফেলে পরবর্তীকালের পৃথিবীতে।

সিংহ কিংবা হাঙরের মতো খাদ্য চক্রের ওপরের দিকে থাকা প্রাণীরা খুব ধীরে ধীরে তাদের ওই অবস্থানের জন্য বিবর্তিত হয়েছিল। ওই অবস্থানে যেতে তাদের লাখ লাখ বছর সময় লেগেছে। এর ফলে সমস্ত বাস্তুতন্ত্রটাও যথেষ্ট সময় পেয়েছিল নিজেই এমন কিছু ব্যবস্থা করতে, যাতে সিংহ কিংবা হাঙরেরা সমস্ত বাস্তুতন্ত্রটা লন্ডভন্ড করে ফেলতে না পারে। সিংহের হিংস্রতা বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হরিণগুলোও শিখে নিয়েছে আরো দ্রুত দৌড়াতে, হায়েনারা অভ্যস্ত হয়েছে একে অন্যকে সাহায্য করার রীতিতে আর গন্ডারও হয়ে উঠেছে ক্রমশ বদমেজাজি। অন্যদিকে মানুষেরা এত দ্রুত খাদ্যচক্রের ওপরে উঠে এলো যে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাস্তুতন্ত্র সবকিছু মানিয়ে নেওয়ার সুযোগই পেল না। এমনকি মানুষ নিজেকেও ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারল না এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে। এর আগে যেসব প্রাণী এই শীর্ষ আসনে বসেছে তারা সবাই ছিল বেশ অভিজাত, রাজকীয় প্রাণী। লাখ লাখ বছর ধরে অর্জন করা আধিপত্য তাদের আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। অন্যদিকে, সেপিয়েন্স ছিল অনেকটা ভুঁইফোড় একনায়ক। কদিন আগেই তৃণভূমিতে চরে বেড়ানো এক মামুলি প্রাণী থেকে হঠাৎ শীর্ষে ওঠার ফলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ভয় আর উৎকণ্ঠা কাজ করত নিজেদের অবস্থান হারানোর কথা ভেবে। এই অনিশ্চয়তা তাদের করে তুলল আরো নৃশংস ও ভয়ংকর। ভয়ংকর যুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ইতিহাসের বড়ো বড়ো বিপর্যয়ের অনেকগুলোই সংঘটিত হয়েছে মূলত খাদ্যচক্রে মানুষের এই অপ্রত্যাশিত লাফের কারণে।

আগুনের কেরামতি, রান্নার জাদু

শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল আগুনকে বশীভূত করা। আমরা এখনো সঠিকভাবে জানি না ঠিক কখন, কোথায় এবং কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা আগুনকে আয়ত্তে এনেছে। প্রায় ৮ লাখ বছর আগে হয়তো কিছু কিছু মানুষ মাঝেমধ্যে আগুন ব্যবহার করত। কিন্তু প্রায় ৩ লাখ বছর আগে হোমো

ইরেকটাস, নিয়ান্ডারথাল আর হোমো সেপিয়েন্সের পূর্বপুরুষরা প্রায় প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজেই আগুনের ব্যবহার করেছে। আগুন অন্ধকারে আলো দিয়েছে, ঠান্ডায় দিয়েছে উষ্ণতা। এমনকি সিংহ ও ভালুকের মতো বিপজ্জনক প্রাণীদের ঘায়েল করার মোক্ষম অস্ত্রও ছিল আগুন। এর কিছুদিন পরেই মানুষ তার আশপাশের বনজঙ্গল আগুন দিয়ে পোড়ানো শুরু করে। একবার বন পোড়া শেষ হলে এবং আগুনের শিখা নিভে গেলে মানুষ অনায়াসে সেখান দিয়ে রাস্তা করে যেতে পারত। পাওয়া যেত আগুনে পোড়া অনেক প্রাণী যেগুলো অনায়াসে খাওয়া যেত। খাদ্যের সহজ সমাধান ছিল এই বন পোড়ানো। এটা ছিল আগুনের বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি সুবিধা।

কিন্তু, মানুষকে রান্না করার ক্ষমতা দেওয়াটাই সম্ভবত আগুনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। আমরা সাধারণত মানবজাতির ইতিহাসে রান্নাকে খুব বড়ো একটা পদক্ষেপ বা উন্নতি হিসেবে দেখি না। অথচ ভেবে দেখলে, মানুষের ইতিহাসে রান্নার গুরুত্ব অপরিমেয়। রান্নার ফলে প্রকৃতির খাদ্যসম্ভারে নতুন নতুন খাবারের একটি বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। প্রকৃতিতে এমন অনেক খাবারই ছিল, যেগুলো রান্না করা ছাড়া খেয়ে মানুষ হজম করতে পারত না। উদাহরণস্বরূপ, গম, আলুর মতো খাবারগুলোই মানুষ রান্না করা ছাড়া খেতে পারত না। রান্না শেখার ফলে মানুষ অনেক নতুন নতুন খাবার খাওয়া শুরু করল। আরেকটি সুবিধা হলো, রান্নার ফলে জীবাণু ও পরজীবী প্রাণী মারা যায়। বিশেষ করে মাংসের ক্ষেত্রে। অন্য আরো অনেক খাবারের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটে। ফলে একবার যখন মানুষ রান্না করে খাবার খাওয়া শুরু করল, তখন থেকে অনেক রকম স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে তারা রক্ষা পেল। অন্যথায় নানা রকম জীবাণু তাদের শরীরে প্রবেশ করত, বসবাস করত, বংশবৃদ্ধি করত এবং মানুষের মৃত্যুর কারণ হতো। রান্না করার ফলে খাবার চিবানোর সময় কিংবা হজমের সময়টাও গেল কমে। আমাদের খুব কাছের আত্মীয় শিম্পাঞ্জি গড়ে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা খাবার চিবোয়। তাদের পরিপাকতন্ত্র যাতে সহজে এ খাবার হজম করতে পারে, এর জন্যই তারা এমনটি করে। যারা আগুন দিয়ে খারার রান্না করে খায় তাদের জন্য সারা দিনে এক ঘণ্টাই এ কাজের জন্য যথেষ্ট এবং

খাবার হজম করার জন্যও তাদের অনেক কম শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রান্নার আবিষ্কারের ফলে মানুষের খাবার হজমের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। ফলে মানুষ ছোটো ছোটো দাঁত, অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী চোয়াল এবং ছোটো খাদ্যনালি বা অন্ত্র (Intestine) দিয়েও অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারল। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে রান্না করে খাবার খাওয়া শুরুর সঙ্গে মানুষের অন্ত্র বা খাদ্যনালি ছোটো হওয়া এবং মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির সরাসরি যোগাযোগ আছে। যেহেতু দীর্ঘ অন্ত্র আর বড়োসড়ো মস্তিষ্ক– দুটোরই অনেক বেশি বেশি শক্তির দরকার হতো চলার জন্য, তাই ও দুটো একসঙ্গে থাকাটা বেশ ঝামেলার ব্যাপার। তাই, অন্ত্রের আকার ছোটো করে তার শক্তির ব্যবহার কমিয়ে রান্না আমাদের আরো বড়ো মস্তিষ্কের অধিকারী প্রাণীতে রূপান্তরিত হওয়ার পথ সুগম করে দিল। আর তার ফলেই পরবর্তীকালে নিয়ান্ডার্থাল আর সেপিয়েন্সের উদ্ভব হলো।[১]

আর এজন্যই বহু বিজ্ঞানী বলে থাকেন যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রথম যে বড়ো রকম পার্থক্য তৈরি হয়, সেটা আগুনের কারণেই। আগুনকে আয়ত্তে এনেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেদেরকে উঁচু পর্যায়ে উপনীত করেছে। প্রকৃতিতে প্রায় সমস্ত প্রাণীর শক্তিই মূলত তাদের শারীরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। আর শরীরের শক্তি নির্ভর করে তার পেশির শক্তিমত্তা কিংবা দাঁতের আকারের ওপর। প্রাণীটি যদি পাখি হয়, তাহলে ডানার আকৃতিও তার শক্তি জানান দেয়। যদিও এটা সত্য যে, নিজের শারীরিক শক্তির বাইরে কিছু কিছু প্রাণী প্রাকৃতিক শক্তিকেও কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু সেটার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ তাদের থাকে না। যেমন, ইগলেরা খুব সহজাতভাবেই চিহ্নিত করতে পারে কোনো জায়গায় গরম বাতাস বইছে কি না। তখন তারা সেখানে তাদের পাখা মেলে ধরে যাতে গরম বাতাস তাদের ঠেলে ওপরের দিকে তোলে। কিন্তু গরম বাতাসের এই স্তরগুলো কোথায় ও কখন তৈরি হবে– এ ব্যাপারে ইগলের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি যখন পাখা মেলে তারা এই গরম বাতাস ব্যবহার করে ওপরের দিকে ওঠে তখনো

তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না এই বাতাসের ওপর। বাতাসের কতটুকু শক্তি তারা কাজে লাগতে পারবে, এটা নির্ভর করে তাদের ডানার বিস্তারের ওপর, তাদের ইচ্ছের ওপর নয়।

মানুষ যখন আগুনকে আয়ত্তে আনতে শিখল, তখন তারা এমন একটি শক্তির নিয়ন্ত্রণ হাতে পেল, যার সম্ভাব্য ব্যবহার অফুরন্ত। ইগলের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই গরম বাতাসের স্তরের ওপর। কিন্তু মানুষ যে-কোনো সময় চাইলেই আগুন জ্বালাতে পারে। এটা মানুষের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো আগুনের শক্তি মানুষের শারীরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। একজনমাত্র মহিলা যে একটি বাতি বা চকমকি পাথর ব্যবহার করতে পারে, সে চাইলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুরো একটি বন জ্বালিয়ে দিতে পারে। বস্তুত আগুনকে আয়ত্তে আনাটা ছিল মানুষের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা পূর্বাভাস মাত্র। সে সময় আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল আজকের আণবিক বোমা বানানোর পথে প্রথম পদক্ষেপ!

হারানো ভাইবোনের খোঁজে

আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করার পরেও প্রায় দেড় লাখ বছর আগের মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে নিজেদের খুব একটা আলাদা করে তুলতে পারেনি। হ্যাঁ, আগুনের বদৌলতে তাদের ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে নতুন কিছু দক্ষতা– তারা এখন সিংহকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, শীতের রাতে কৃত্রিম উত্তাপ উপভোগ করে, এমনকি ছোটোখাটো একটা জঙ্গল জ্বালিয়ে দিতেও পারে। তার পরও, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ আর আইবেরীয় উপদ্বীপে (বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল অঞ্চল) তখন সব মিলিয়ে মোট ১০ লাখ মানুষও ছিল না। বিশাল বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সেটা ছিল নিতান্ত নগণ্য।

এ সময়টাতে হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিটি পৃথিবীতে টিকে থাকলেও তাদের সম্পূর্ণ উপস্থিতি ছিল কেবল আফ্রিকার এক কোণে। বিবর্তনের ঠিক কোন পর্যায় থেকে এই প্রাণীটিকে হোমো সেপিয়েন্স বলে ডাকা যায়, সেটা ঠিকঠাক নির্ণয় করা যায় না। তবে এখন থেকে প্রায় দেড় লাখ বছর আগের পূর্ব আফ্রিকার মানুষগুলো

দেখতে যে ঠিক আমাদের মতোই ছিল– এ ব্যাপারে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই একমত। তখনকার একটা মানুষের মৃতদেহ যদি ঘটনাচক্রে আজকের কোনো মর্গে চলে আসে, সে মৃতদেহকে দেখে আপাতদৃষ্টিতে কেউ বলতে পারবে না সেটা এখনকার না দেড় লাখ বছর আগের। সেই দেড় লাখ বছর আগেই মানুষের দাঁত ও চোয়াল ছোটো হয়ে এসেছে, আর মস্তিষ্ক হয়েছে অনেক বড়ো। এর পুরো কৃতিত্ব হলো আগুনের।

বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে কিছু সেপিয়েন্স পূর্ব আফ্রিকা থেকে আরব উপদ্বীপে পৌঁছে। সেখান থেকে তারা খুব দ্রুত পুরো ইউরেশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। ইউরেশিয়া হলো ইউরোপ এবং এশিয়ার একত্রিত এলাকা।

সেপিয়েন্স যখন মধ্যপ্রাচ্যে আসে তখন ইউরেশিয়ার বেশিরভাগ এলাকা অন্যান্য প্রজাতির মানুষে ভরপুর। পরবর্তী সময়ে কোথায় হারাল মানুষের অন্যান্য প্রজাতির সদস্যরা? এ ব্যাপারে দুটো পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব আছে। তার একটা হলো সংকর প্রজনন (Interbreeding) তত্ত্ব। এই তত্ত্ব নিজের প্রজাতির সদস্য এবং অন্য প্রজাতির সদস্যদের সঙ্গে একটি প্রাণীর প্রজনন সম্বন্ধে আলোচনা করে। এ তত্ত্ব অনুসারে, আফ্রিকার মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রজাতির মানুষ আরেক প্রজাতির মানুষের সঙ্গে প্রজননে লিপ্ত হয়। আর আজকের আধুনিক মানুষ এই সংকর প্রজননের ফলাফল।

উদাহরণস্বরূপ, যখন সেপিয়েন্স মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে পৌঁছল তখন তাদের দেখা হলো নিয়ান্ডার্থালদের সঙ্গে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, নিয়ান্ডার্থালরা পেশিবহুল ছিল। তারা সেপিয়েন্সদের চেয়ে ঠান্ডা আবহাওয়ায় অনেক ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। তাদের মস্তিষ্কের আকারও সেপিয়েন্সদের চেয়ে বড়ো ছিল। তারা অস্ত্রের ব্যবহার জানত, আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারত এবং সব রকম শিকারে তারা সেপিয়েন্সদের চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শী ছিল। পুরাতাত্ত্বিকেরা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে অনেকদিন বেঁচে থাকা নিয়ান্ডার্থাল মানুষের দেহাবশেষ পেয়েছেন, যা থেকে ধারণা করা যায় তারা অসুস্থ ও দুর্বলদের যত্ন

নিত। এখনকার বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্রে নিয়ান্ডার্থালদেরকে অসভ্য, নির্বোধ পশুতুল্য গুহামানবরূপে চিত্রিত করা হয়, কিন্তু সাম্প্রতিক প্রমাণ মোটেই তা বলে না।

সংকর প্রজনন তত্ত্ব বলে, যখন সেপিয়েন্স নিয়ান্ডার্থালদের এলাকায়, মানে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ল তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটল। সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডার্থালেরা মিলে সন্তান উৎপাদন শুরু করল। এভাবে দুটি প্রজাতি মিলে মিশে একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলো। সত্যি যদি এ ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা বিশুদ্ধ সেপিয়েন্স নয়, সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডার্থালের মিশ্রণ। একইভাবে সংকর প্রজনন তত্ত্ব অনুযায়ী যখন সেপিয়েন্সরা ৬০ হাজার বছর আগে চীনে পৌঁছায়, তখন সেখানেও একই ঘটনা ঘটে। তারা স্থানীয় হোমো ইরেক্টাসদের সঙ্গে মেশে এবং সন্তান উৎপাদন শুরু করে। ফলে চীন ও পূর্ব এশিয়ার লোকজনও খাঁটি সেপিয়েন্স নয়, স্থানীয় হোমো ইরেক্টাস এবং নবাগত সেপিয়েন্সদের সংমিশ্রণ।

মোটামুটি এই হলো সংকর প্রজনন তত্ত্ব বা Interbreeding Theory। এই তত্ত্বের বিপরীতে আরেকটা তত্ত্ব আছে, যেটার নাম প্রতিস্থাপন তত্ত্ব বা Replacement Theory। এই প্রতিস্থাপন তত্ত্ব পুরো বিপরীত ধরনের একটি গল্প বলে আমাদের। এ গল্প অসহিষ্ণুতার, এ গল্প ঘৃণার এবং সম্ভবত গণহত্যারও।

প্রতিস্থাপন তত্ত্ব অনুযায়ী সেপিয়েন্সের সঙ্গে অন্য কোনো প্রজাতির মানুষের, নিয়ান্ডার্থাল বা ইরেক্টাস কারো সঙ্গে কোনো প্রকার যৌন সম্বন্ধ সংঘটিত হয়নি। সেপিয়েন্স ও নিয়ান্ডার্থালদের দেহের গঠন ভিন্ন ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা যৌনমিলন প্রক্রিয়া ছিল। এমনকি তাদের শরীরের গন্ধও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অন্য কোনো প্রজাতির সঙ্গে যৌন মিলনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতি তাদের খুব কমই আগ্রহ ছিল। যদি কোনো নিয়ান্ডার্থাল রোমিও সেপিয়েন্স জুলিয়েটের প্রেমে পড়েও এবং তাদের যদি কোনো সন্তানও হয়– প্রতিস্থাপন তত্ত্ব অনুযায়ী এ শিশুটি হবে বন্ধ্যা (Infertile)। ঠিক যেভাবে গাধা ও ঘোড়া মিলিত হতে পারে, কিন্তু তারা শুধু প্রজনন-অক্ষম খচ্চরেরই জন্ম দিতে পারে। একইভাবে

নিয়ান্ডার্থাল রোমিও এবং সেপিয়েন্স জুলিয়েট কেবল প্রজনন-অক্ষম সংকর প্রজাতিরই সৃষ্টি করতে পারে।

সুতরাং, প্রতিস্থাপন তত্ত্ব অনুযায়ী সেপিয়েন্স ও নিয়ান্ডার্থাল এই দুই জনসমষ্টি স্পষ্টভাবে আলাদা হয়েই রইল। তারপর যখন নিয়ান্ডার্থালরা মারা গেলো, কিংবা খুন হয়ে গেল, তাদের জিন (Gene)-গুলোও শেষ হয়ে গেল। নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিবর্তনও থেমে গেল তখনই।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেপিয়েন্স অন্য প্রজাতিগুলোর সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক স্থাপন না করেই তাদের স্থান সম্পূর্ণ দখল করে নিল। এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে বলা যায় যে, আজকের পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ সেই ৭০ হাজার বছর আগেকার পূর্ব আফ্রিকার মানুষেরই বংশধর, আমরা সবাই নির্ভেজাল হোমো সেপিয়েন্স।
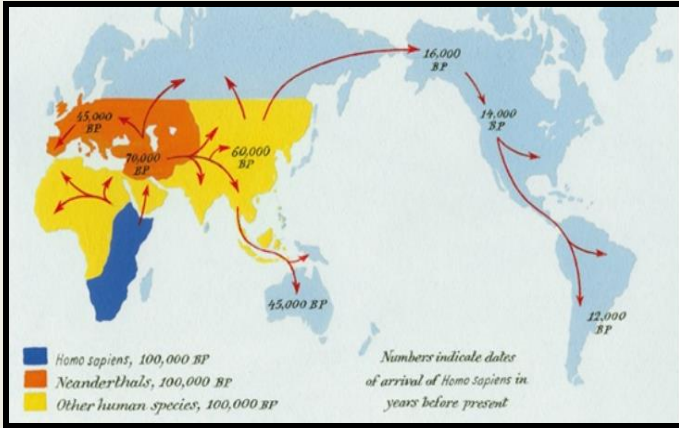
ম্যাপ ১। হোমো সেপিয়েন্স পুরো পৃথিবীকে জয় করে ফেলল

বিবর্তন প্রক্রিয়াটি এত ধীরগতির যে এর জন্য ৭০ হাজার বছর আসলে খুবই কম সময়। প্রতিস্থাপন তত্ত্ব যদি সত্যি হয়, তাহলে এখনকার সব মানুষের সব জিন ঘুরে ফিরে কমবেশি একই রকম হবে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে জিনগত পার্থক্য হবে খুবই সামান্য। আবার সংকর প্রজনন তত্ত্ব সত্য হলে আফ্রিকা,

ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষের জিনে বড়ো ধরনের পার্থক্য দেখা যাবে, যে পার্থক্যের সূচনা হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিস্থাপন তত্ত্ব বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর পক্ষে জোরালো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মিলেছে আর এই তত্ত্ব রাজনৈতিক দিক থেকে অধিক উপযোগী (আর বিজ্ঞানীরাও আধুনিক মানুষের জিনের ভিন্নতা দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক কলহ তৈরি করতে চাননি)। কিন্তু ২০১০ সালে তা আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। চার বছর চেষ্টার পর নিয়ান্ডার্থাল জিনোম (Genome) প্রকাশের ফলে তা আর চাপা থাকেনি। জিন-বিশেষজ্ঞরা ফসিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের ডিএনএ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। এই ডিএনএর সঙ্গে সমকালীন মানুষের ডিএনএ তুলনা করে যে ফলাফল পাওয়া গেল তা চমকে দেওয়ার মতো।

সমীক্ষায় দেখা গেল, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বর্তমান মানুষের ১ থেকে ৪ শতাংশ মৌলিক ডিএনএ হলো নিয়ান্ডারর্থাল ডিএনএ। মিলের পরিমাণটা খুব বেশি না হলেও একেবারে অগ্রাহ্য করার মতো নয়। কয়েক মাস পর আরো বড়ো একটি চমক আসে। ডেনিসোভা গুহায় প্রাপ্ত জীবাশ্মে রূপান্তরিত মানুষের আঙুলের ডিএনএ মানচিত্র তৈরি করা হয়। ফলাফলে দেখা গেল, আধুনিক মেলানেসিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ডিএনএর সঙ্গে ডেনিসোভা মানবের ডিএনএ প্রায় ৬ শতাংশ মিলে যায়।

তবে এখনই কোনো উপসংহার না টানাই উচিত, কারণ এ গবেষণা এখনো শেষ হয়নি; শেষ পর্যন্ত এই ফলাফল নাও টিকতে পারে। যদি এই ফলাফলগুলোই টিকে থাকে, তাহলে সংকর প্রজনন তত্ত্বের সমর্থকদের দাবি আরেকটু জোরালো হবে। তাই বলে প্রতিস্থাপন তত্ত্বকে একেবারে ফেলে দেওয়া যাবে না। আজকের মানুষের জিনে নিয়ান্ডার্থাল ও ডেনিসোভা মানুষের জিনের পরিমাণ খুবই অল্প, তা থেকে বোঝা যায় সেপিয়েন্সদের সঙ্গে অন্যান্য মানব প্রজাতিগুলোর ‘মিশে যাওয়ার’ সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সেপিয়েন্সদের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য প্রজাতির জিনের পার্থক্য এত বেশি ছিল না যাতে তাদের সন্তান জন্মদান ব্যাহত হয়, কিন্তু তার পরেও এমন ঘটনা ছিল বিরল।

তাহলে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সেপিয়েন্স, নিয়ান্ডার্থাল আর ডেনিসোভার মধ্যকার সম্পর্ক কীভাবে বুঝব? এটা পরিষ্কার যে এরা ঘোড়া ও গাধার মতো সম্পূর্ণ আলাদা প্রজাতি নয়, আবার এরা বুলডগ ও স্প্যানিয়েলের মতো একই প্রজাতির আলাদা সদস্যও ছিল না। জীববিদ্যায় পার্থক্যগুলো সব সময় সাদা-কালোর মতো স্পষ্ট হয় না, এর মধ্যে কিছু সন্দেহজনক ব্যাপারস্যাপারও থাকে। একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত ঘোড়া এবং গাধা একসময় একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন ধরনের সদস্যই ছিল, ঠিক বুলডগ ও স্প্যানিয়েলের মতোই। তাহলে নিশ্চয়ই এমন একটা সময় ছিল যখন এই দুই ধরনের প্রাণীর আন্তঃপ্রজননে প্রজননক্ষম সন্তান জন্ম নিতে পারত। তারপর তাদের জিনের কোনো একটা পরিবর্তনের (Mutation) কারণে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল, আর এই দুটি প্রাণীকে বিবর্তন এগিয়ে নিয়ে গেল দুটি ভিন্ন পথে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এমন যে, প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে সেপিয়েন্স, নিয়ান্ডার্থাল ও ডেনিসোভা ঠিক এমন একটা পরিবর্তনের মুখে পড়েছিল। তারা পুরোপুরি না হলেও প্রায় আলাদা আলাদা প্রজাতিতে পরিণত হচ্ছিল। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব, ততদিনে সেপিয়েন্স প্রজাতিটি নিয়ান্ডার্থাল ও ডেনিসোভা প্রজাতির সদস্যদের থেকে শুধু শারীরিক বা জিনগত দিক দিয়েই নয় বরং সামাজিক কার্যকলাপ ও চিন্তাচেতনার দিকে থেকেও অনেকটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিরল ঘটনা হলেও, তখনো সেপিয়েন্স ও নিয়ান্ডার্থালের মিলনে প্রজননক্ষম সন্তান জন্মদান সম্ভব ছিল। ফলে দুই প্রজাতির মানুষ একসঙ্গে মিশে গেল না ঠিকই, কিন্তু কিছু নিয়ান্ডার্থালের খুব সামান্য পরিমাণ জিন সেপিয়েন্সের দেহে সফলভাবে জায়গা করে নিল। এটা চিন্তা করা একই সঙ্গে অস্বস্তিকর এবং রোমাঞ্চকরও যে হোমো সেপিয়েন্স কোনো এক সময়ে অন্য একটি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং সন্তানেরও জন্ম দিয়েছে।

৩. একটি নিয়ান্ডার্থাল শিশুর কাল্পনিক পুনর্গঠন। জিনগত প্রমাণাদি থেকে আন্দাজ করা যায় যে, অন্তত কিছুসংখ্যক নিয়ান্ডার্থাল মানুষেরা উজ্জ্বল চামড়া আর চুলের অধিকারী ছিল।

নিয়ান্ডার্থাল আর ডেনিসোভা মানুষ না হয় সেপিয়েন্সদের সঙ্গে মিশে গেল না, কিন্তু তারা হারিয়ে গেল কেন? একটা সম্ভাবনা হলো সেপিয়েন্সরাই তাদের বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ধরা যাক নিয়ান্ডার্থালদের কয়েক হাজার বছরের আবাস বলকান উপত্যকায় একদিন একদল সেপিয়েন্স এসে পৌঁছাল। তারা ওখানে গিয়েই খাদ্যের জন্য হরিণ শিকার আর গাছের ফলমূল সংগ্রহ করতে লাগল। এগুলোই ছিল নিয়ান্ডার্থালদের প্রধান খাবার। সেপিয়েন্সরা শিকার ও সংগ্রহে অনেক বেশি দক্ষ ছিল, কারণ তাদের প্রযুক্তি ছিল উন্নত আর সামাজিক বন্ধনও ছিল দৃঢ়। ফলে তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হতে থাকল। অন্যদিকে নিয়ান্ডার্থালদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করা

এবং বেঁচে থাকা দিনকে দিন কঠিন হয়ে পড়ল। তাদের মৃত্যুহার বেড়ে গেল, আস্তে আস্তে তারা সংখ্যায় কমতে কমতে বিলুপ্তির কাছাকাছি চলে গেল। কে জানে, নিয়ান্ডার্থালদের শেষ কয়েকজন হয়তো সেপিয়েন্সদের দলেই মিশে গিয়েছিল।

আবার এমনও হতে পারে, যখন সেপিয়েন্স আর নিয়ান্ডার্থালদের মধ্যে খাদ্য নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হলো, তখন এক দলের মানুষ অন্য দলের মানুষকে হত্যা করতে শুরু করল। সহিষ্ণুতা জিনিসটা সেপিয়েন্সদের মধ্যে বরাবরই কম। আজকের দিনেও গায়ের রং, সংস্কৃতি কিংবা ধর্মের পার্থক্যের কারণে যারা অনায়াসে নিজ প্রজাতির অন্য দলের ওপর খড়্গহস্ত হয়, তারা কি ভিন্ন প্রজাতির মানুষের জন্য এর চেয়ে বেশি সহনশীলতা দেখাবে? কাজেই এমনটা হতেই পারে যে, নিয়ান্ডার্থালদের সঙ্গে সেপিয়েন্সদের দ্বন্দ্বের ফলেই ঘটে ইতিহাসের প্রথম গোষ্ঠীগত গণহত্যা (Ethnic-cleansing)।

বিলুপ্তি যেভাবেই ঘটুক, নিয়ান্ডার্থাল এবং অন্যান্য মানব প্রজাতিগুলো 'কী হতো যদি' নামে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখে গেছে আমাদের সামনে। কী হতো যদি নিয়ান্ডার্থাল ও ডেনিসোভা প্রজাতির মানুষেরাও সেপিয়েন্সদের সঙ্গে বাস করত আজকের পৃথিবীতে? কেমন হতো ভিন্ন প্রজাতির মানুষের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা সেই সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো? কীভাবে গড়ে উঠত তাদের ধর্মবিশ্বাস? ধর্মগ্রন্থগুলো কি নিয়ান্ডার্থালদেরও আদম ও ইভের বংশধর বলে স্বীকৃতি দিত? যিশুখ্রিষ্ট কি ডেনিসোভা প্রজাতির মানুষের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে মৃত্যুবরণ করতেন? কোরআনে বর্ণিত জান্নাতে কি প্রজাতিনির্বিশেষে সব পুণ্যবান মানুষই স্থান পেতেন? রোমান সেনাবাহিনী কিংবা চীনের বিশাল রাজতন্ত্রে কি নিয়ান্ডার্থাল প্রজাতির কোনো কর্মচারীকে দেখা যেত? আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে কি 'সব প্রজাতির মানুষকেই সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে'– এ কথাটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হতো? কার্ল মার্কস কি সব প্রজাতির মানুষের জন্যই প্রচার করতেন সাম্যবাদ?

বিগত ১০ হাজার বছর ধরে এই হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিটি নিজেদেরকে পৃথিবীর একমাত্র মানবপ্রজাতি বলে ভেবে আসছে। তাদের এই ধারণা এতই বদ্ধমূল যে তারা এ ব্যাপারে কোনো রকম

ভিন্নমতকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। মানুষের অন্যান্য প্রজাতির উপস্থিতিকে অস্বীকার করে মানুষ খুব সহজে নিজেদের সৃষ্টির সেরা জীব এবং অন্য সব রকম প্রাণী থেকে আলাদা ভাবতে পারে। চার্লস ডারউইন যখন বললেন, মানুষ আর দশটা প্রাণীর মতোই আরেকটি প্রাণী, তখন মানুষের প্রতিক্রিয়া মোটেই ভালো হয়নি। আজকের দিনেও সে অবস্থা তেমন পালটায়নি। নিয়াভার্থালরা যদি আজও টিকে থাকত, তাহলেও কি আমরা নিজেদেরকে সমগ্র প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা করে দেখতাম? সম্ভবত এটাই আমাদের পূর্বসূরিদের হাতে নিয়াভার্থালদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ। তাদের সঙ্গে আমাদের মিল এত বেশি ছিল যা অস্বীকার করা কঠিন, আবার পার্থক্যও এত বেশি যে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করতেও রাজি হয়নি সেপিয়েন্স।

সেপিয়েন্স দায়ী হোক বা না হোক, এটা দেখা গেছে যে তারা যখনই কোনো নতুন জায়গায় পৌঁছেছে তখন সেখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হোমো সলোয়েনসিসের সর্বশেষ অস্তিত্ব নির্ণয় করা হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে। তার কিছু পরেই হোমো ডেনিসোভা প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়। নিয়াভার্থালদের বিলুপ্তি ঘটে প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে। সর্বশেষ বিলুপ্ত হয় ফ্লোরেন্স দ্বীপের বামনাকৃতি মানুষের প্রজাতিটি, প্রায় ১২ হাজার বছর আগে। মানুষের এইসব প্রজাতি হারিয়ে গেছে, কিন্তু তারা পৃথিবীতে রেখে গেছে তাদের দেহাবশেষ, পাথরের হাতিয়ার, আমাদের ডিএনএর মধ্যে কিছু জিন আর অনেক অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন। আর রেখে গেছে আমাদের, মানুষের সর্বশেষ প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্সকে।

সেপিয়েন্সদের এই বিপুল সাফল্যের রহস্য কী ছিল? কীভাবে মানুষ এত দ্রুত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল? কীভাবে এতরকম ভিন্ন পরিবেশে টিকে থাকল তারা? মানুষের অন্য প্রজাতিগুলোকে নিশ্চিহ্নই-বা করল কীভাবে? শক্তসমর্থ, বুদ্ধিমান, শীতসহিষ্ণু নিয়াভার্থালরাই-বা কেন টিকতে পারল না সেপিয়েন্সদের আক্রমণের মুখে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চলছে অন্তহীন বিতর্ক। এসব প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে ভাষা। ভাষার মতো

অনন্যসাধারণ একটি বৈশিষ্ট্যই সেপিয়েন্সদের সাহায্য করেছে পৃথিবী জয় করতে।

অধ্যায় ২

জ্ঞানবৃক্ষের বেড়ে ওঠা

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে, সেপিয়েন্সরা আফ্রিকা মহাদেশে প্রায় দেড় লাখ বছর ধরে বসবাস করে এলেও, তারা আনুমানিক ৭০ হাজার বছর আগে থেকে দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং মানব গোত্রের অন্য প্রজাতিগুলোকে বিলুপ্ত করে ফেলে। এর মাঝামাঝি সময়টাতে, সেপিয়েন্সরা দেখতে আমাদের মতো হলেও এবং তাদের মস্তিষ্ক আমাদের মস্তিষ্কের সমান বড়ো হলেও, তারা তাদের জ্ঞাতিভাইদের থেকে খুব একটা এগোতে পারেনি। তারা এ সময় তেমন কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে পারেনি কিংবা প্রাণিকুলের অন্যদের চেয়ে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের নজিরও রাখতে পারেনি।

এমনকি সেপিয়েন্সদের সঙ্গে তাদের আরেক সমগোত্রীয় নিয়ান্ডার্থালদের প্রথম যে লড়াইয়ের কথা জানা যায়, তাতে নিয়ান্ডার্থালরাই জয়লাভ করেছিল। সে প্রায় ১ লাখ বছর আগের কথা। এই সময়ে কিছু সেপিয়েন্স আফ্রিকার উত্তরে নীল নদ ঘুরে সিনাই উপদ্বীপ পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পৌঁছায়। এই এলাকা তখন নিয়ান্ডার্থালদের দখলে ছিল। সেপিয়েন্সরা এখানে পৌঁছাবার পর প্রাথমিকভাবে এখানে স্থায়ী বসতি গড়তে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় লোকজনের অসহযোগিতা, বৈরী জলবায়ু আর এ অঞ্চলের অচেনা রোগ-বালাই এই ব্যর্থতার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। যে কারণেই হোক, সেপিয়েন্সরা একসময় এই এলাকা থেকে পিছু হটে এবং নিয়ান্ডার্থালরাই মধ্য এশিয়া জুড়ে বসবাস করতে থাকে।

সেপিয়েন্সদের এই পরাজয়ের ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের এই ধারণা দেয় যে, সম্ভবত তাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ গঠন আমাদের থেকে

কিছুটা হলেও আলাদা ছিল। তারা দেখতে আমাদের মতোই ছিল– কিন্তু তাদের শেখার, মনে রাখবার বা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। এই রকম একজন সেপিয়েন্স আমাদের আধুনিক কোনো ভাষা শিখবে, ধর্মকর্মের কথা জানবে বা বিবর্তনের তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে, এমনটা আশা করাই বোকামি। আবার, এরকম একজন সেপিয়েন্সের ভাষা শেখা বা তারা কীভাবে চিন্তা করত সেটা বোঝার চেষ্টা করা আমাদের বর্তমানের মানুষদের জন্যও বেশ কঠিন একটা কাজ।

এর পরের ইতিহাস কিন্তু বেশ চমকপ্রদ। আনুমানিক ৭০ হাজার বছর আগে থেকে সেপিয়েন্সরা তাক লাগানোর মতো কাজকর্ম শুরু করল। এই সময়কালে সেপিয়েন্সরা দ্বিতীয় বারের মতো আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে পড়ে। তবে এইবার তারা নিয়ান্ডার্থাল এবং মানুষের অন্যান্য প্রজাতিকে মধ্য এশিয়া থেকে তো বটেই, এমনকি দুনিয়ার বুক থেকেই পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ায় পৌঁছে যায়। প্রায় ৪৫ হাজার বছর আগে তারা সাগর পাড়ি দিতে শেখে এবং অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে যায়। এর আগে এই মহাদেশে কোনো মানুষেরই পা পড়েনি। ৭০ হাজার বছর আগে থেকে ৩০ হাজার বছর আগের এই সময়টাতে সেপিয়েন্স নৌকা, তেলের প্রদীপ, তির-ধনুক এমনকি সুঁই-সুতা আবিষ্কার করে ফেলে। শীতের দেশে গরম কাপড় বোনার জন্য এই সুঁই-সুতা খুবই জরুরি ছিল।

বেশিরভাগ গবেষকই মনে করেন যে, এতসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পেছনে নিশ্চয়ই সেপিয়েন্সদের বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার কোনো পরিবর্তন দায়ী। তাদের দাবি– যে সেপিয়েন্সরা নিয়ান্ডার্থাল নামের পুরো একটি প্রজাতিকে দুনিয়া থেকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে পারে, সাগর পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপন করতে পারে এবং জার্মানির স্টেডেল গুহায় কাল্পনিক সিংহমানবের মূর্তি বানাতে পারে তারা নিশ্চয়ই আমাদের মতোই বুদ্ধিমান, আমাদের মতোই সৃষ্টিশীল এবং আমাদের মতোই সংবেদনশীল ছিল। সুতরাং কোনোভাবে যদি স্টেডেল গুহায় কাজ করা সেইসব শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়, আমরা তাদেরকে আমাদের ভাষা বোঝাতে

পারব এবং চেষ্টা করলে আমরাও তাদের ভাষা শিখতে পারব। আমরা তাদের শোনাতে পারব অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড-এর মতো কাহিনি বা বোঝাতে পারব কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব। একইভাবে তারাও আমাদের বলতে পারবে তাদের মানুষদের চোখে কেমন ছিল আমাদের পৃথিবী।

৭০ হাজার বছর আগে থেকে ৩০ হাজার বছর আগের এই সময়টায় সেপিয়েন্সদের এই যে নতুনভাবে চিন্তা করার এবং যোগাযোগ করার ক্ষমতার সূচনা হলো, সেটাকে আমরা বলছি– বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব। এই বিপ্লব কীভাবে সম্ভব হলো? আমরা এখনো সঠিকভাবে সেটা জানি না। এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে যে তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সেটা জানবার জন্য আমাদের একটু বিজ্ঞানের আঙিনা থেকে ঘুরে আসতে হবে। বিজ্ঞান বলে– 'জিন' (gene) হলো জীবন্ত প্রাণের বংশগতির আণবিক একক। একটি জীবের বংশগতভাবে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য যা দায়ী, তা-ই জিন। এই জিনগুলোর বিভিন্নতার কারণে একটি জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই ভিন্নতার কারণেই কেউ জন্মগতভাবে একটু রাগী, কেউ চুপচাপ। কেউ খেলাধুলায় চৌকস, কেউ লেখালেখিতে। জিনের অভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তনকে আমরা বলি জিনের 'পরিব্যক্তি' (Mutation)। জিনের পরিব্যক্তির মাধ্যমে জীবের নির্দিষ্ট কোনো বংশধরে নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হতে পারে বা পুরোনো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনও ঘটতে পারে।

এবারে আগের প্রশ্নে ফেরা যাক। সেপিয়েন্সদের 'বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব' এর কারণ হিসেবে সবচেয়ে প্রচলিত মতবাদে বলা হয় মোটামুটি ৭০ হাজার বছর আগে সেপিয়েন্সদের জিনের কোনো আকস্মিক পরিব্যক্তি (Mutation) তাদের মস্তিষ্কের নিউরনের মধ্যে সংযোগের পদ্ধতি পালটে দেয়। এর ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে আরো সার্থকভাবে যোগাযোগ করার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। আমরা এই রূপান্তরের নাম দিতে পারি– 'জ্ঞান বৃক্ষের রূপান্তর' (Tree of Knowledge Mutation)। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে শুধু সেপিয়েন্সদের জিনেই কেন এই রূপান্তর হলো– নিয়ান্ডার্থাল বা মানুষের অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে

এই রূপান্তর হলো না কেন? এর উত্তরে বলা যায়, জিনের এই রূপান্তরের ব্যাপারটা পুরোপুরি আকস্মিক। ঘটনাক্রমে এটা সেপিয়েন্সদের ক্ষেত্রে ঘটেছে– এটা নিয়ান্ডার্থাল বা মানুষের অন্য কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রেও ঘটতে পারত। কিন্তু এই রূপান্তরের কারণের চেয়ে এই 'জ্ঞানবৃক্ষের রূপান্তর'-এর ফলে কী কী পরিবর্তন হলো সেটা জানা অনেক বেশি জরুরি। প্রশ্ন জাগে, সেপিয়েন্সদের এই নতুন ভাষায় এমন কী বিশেষত্ব ছিল, যা তাদেরকে পুরো দুনিয়া জয় করার ক্ষমতা দিয়ে দিল?*

প্রসঙ্গত বলে নেওয়া দরকার, সেপিয়েন্সদের এই ভাষা কিন্তু দুনিয়ার প্রথম ভাষা নয়। যোগাযোগের জন্য প্রত্যেক প্রাণীর নিজেদের ভাষা আছে। প্রত্যেক পোকামাকড়, যেমন পিঁপড়া ও মৌমাছি ভালোমতোই জানে কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে হয়, কীভাবে খাবারের খবরাখবর অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। যদি শুধু মুখের ভাষা বিবেচনা করি, সেই হিসেবেও সেপিয়েন্সদের এই ভাষা প্রথম ভাষা নয়। অনেক প্রাণীর, যেমন– গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং বানরের অনেক প্রজাতির নিজস্ব মুখের ভাষা আছে। উদাহরণ হিসেবে সোনালি-সবুজ পশমওয়ালা এক জাতীয় বানরের নাম করা যায় (Green Monkey বা সবুজ বানর), যারা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন মৌখিক ধ্বনি ব্যবহার করে। জীববিজ্ঞানীরা এরকম একটি ধ্বনিসংকেত শনাক্ত করেছেন যার অর্থ– 'সাবধান! ইগল আসছে'। একটু আলাদা একটা ধ্বনিসংকেত বোঝায়– 'সাবধান! সিংহ আসছে'। গবেষকরা যখন প্রথম ধ্বনিসংকেতটি রেকর্ড করে একদল সবুজ বানরকে শোনাচ্ছিলেন– হুট করে বানরগুলো থেমে গেল এবং ভয়ার্ত চোখ নিয়ে ওপরের দিকে তাকাল। যখন একই বানরের দলকে দ্বিতীয়

---

* এখান থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোতে আমরা সেপিয়েন্সের ভাষা বলতে তাদের সাধারণ ভাষাগত দক্ষতার কথা বুঝব, ভাষার কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক রূপকে নয়। ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, চৈনিক এদের সবগুলোই সেপিয়েন্সের এই সাধারণ ভাষারই নানান রূপ। এমনকি, ধারণা করা হয়, বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের সময়েও সেপিয়েন্সের নানা দল বা গোষ্ঠী ভাষার নানান রূপ ব্যবহার করত।

ধ্বনিসংকেতটি শোনানো হলো– যেটা সিংহ আসার সংকেত– সঙ্গে সঙ্গে বানরগুলো লাফ দিয়ে গাছে চড়ে বসল। সেপিয়েন্স বানরের চেয়ে অনেক বেশি ধরনের ধ্বনিসংকেত তৈরি করতে পারে, তবে তিমি ও হাতিরও এরকম অনেক ধরনের ধ্বনি তৈরির ক্ষমতা আছে। আইনস্টাইন ধ্বনি ব্যবহার করে যা বলতে পারেন, একটা তোতাপাখিও শুনে শুনে সেই কথাগুলোই বলতে পারে, এমনকি সে ফোন বাজার শব্দ, দরজা ধাক্কানোর শব্দ বা দমকলের সাইরেনের শব্দও নকল করতে পারে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, শুধু ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারাটাই আইনস্টাইনের বিশেষত্ব নয়। অনেক রকম ধ্বনি তৈরির ক্ষমতাকে বাদ দিলে, কী সেই বিশেষ বিষয় যার জন্য আমাদের ভাষা এতটা গুরুত্বপূর্ণ, এতটা কার্যকর?

এই প্রশ্নের বেশ সহজ এবং বহুল প্রচলিত একটি উত্তর আছে। সেটা হলো– আমরা মানুষেরা কিছু সীমিতসংখ্যক ধ্বনি এবং প্রতীককে বিভিন্নভাবে জোড়া লাগিয়ে অসীমসংখ্যক বাক্য তৈরি করতে পারি, যেই বাক্যগুলো প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। এইভাবে আমরা পৃথিবী সম্পর্কে অনেক রকম তথ্য জানতে পারি, জমা করতে পারি এবং অন্যদের জানাতে পারি। একটা সবুজ বানর তার সঙ্গীদের চিৎকার করে জানান দিতে পারে– 'সাবধান! সিংহ আসছে'। কিন্তু একজন আধুনিক মানুষ তার বন্ধুকে এভাবে বলতে পারে যে, আজ সকালে নদীর ধারে একটা সিংহ একটা বাইসনকে তাড়া করছিল। সে এটাও বলতে পারে ঠিক কোন জায়গায় সে ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে, কোন কোন রাস্তা দিয়ে জায়গাটাতে পৌঁছানো যায়। এই তথ্যগুলো নিয়ে তার সঙ্গী-সাথিরা আলাপ আলোচনা করতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে এ অবস্থায় বাইসনটাকে শিকার করতে যাওয়াটা উচিত কাজ হবে কি না।

এ ব্যাপারে আরেকটা তত্ত্ব যা বলে তা হলো– সেপিয়েন্সদের এই ভাষার উদ্ভব হয়েছে আমাদের চারপাশের পৃথিবী-সম্পর্কিত তথ্যাদি একে অন্যকে জানানোর জন্য। আর এটা তো জানা কথা যে, সিংহ আর বাইসনের মতো জীবজন্তুর খবরের থেকে অন্যান্য মানুষ-সম্পর্কিত তথ্য আমাদের অনেক বেশি আকর্ষণ করে। আমরা মানুষেরা গল্প শুনতে, মানুষকে নিয়ে গল্প করতে বেশি পছন্দ করি।

তাই বলতে পারি, আমাদের ভাষার উদ্ভব হয়েছে মূলত নিজেদের নিয়ে গল্প করার, আড্ডাবাজি করার এমনকি নিন্দা করার উপায় হিসেবে। এই তত্ত্বানুযায়ী মানুষ জন্মগতভাবেই সামাজিক প্রাণী। সামাজিক সহযোগিতা আমাদের টিকে থাকা এবং বংশবিস্তারের জন্য অপরিহার্য। শুধু সিংহ বা বাইসনের সম্পর্কে জানাই কোনো মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। এর চেয়ে একই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে কে কাকে হিংসা করে, কার সঙ্গে কার বিয়ে হলো, কে সৎ আর কে অসৎ এটা জানা মানুষের জন্য অনেক জরুরি।

৪. হাতির দাঁতের তৈরি একটি সিংহমানবের (সিংহীমানবীও হতে পারে) মূর্তি। এটা পাওয়া গিয়েছে জার্মানির স্ট্যাডেল গুহায় (প্রায় ৩২ হাজার বছর পুরোনো)। মূর্তির শরীরটুকু মানুষের মতো কিন্তু মাথাটা সিংহের মতো। এটাই সম্ভবত মানুষের শিল্পের কিংবা ধর্মের কিংবা অবাস্তব জিনিস কল্পনা করার ক্ষমতার প্রথম অকাট্য প্রমাণ।

মানুষের সঙ্গে মানুষের এই নিয়ত পরিবর্তনশীল সম্পর্ক সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতে গেলে যতখানি তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজন পড়ে তার পরিমাণ বিশাল (৫০ জনের একটি দলে, ১ হাজার ২২৫ ভাবে এক জন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের সম্পর্ক হতে পারে। একজন মানুষের সঙ্গে একাধিক মানুষের সম্পর্কের রকমফেরের হিসাব করাটাই প্রায় অসম্ভব মানুষের পক্ষে)। সব নরবানর নিজেদের এইসব সামাজিক সম্পর্কের তথ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, কিন্তু ভাষা সুবিধাজনক না হওয়ার কারণে তাদের পক্ষে এই সব বিষয় নিয়ে আড্ডা দেওয়া বা গল্প করা বেশ কঠিন ছিল। এমনকি নিয়াভার্থাল বা একদম আদিম যুগের হোমো সেপিয়েন্সদেরও কথা বলার এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এই কথা বলার ব্যাপারটা অনেকজন একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে গেলে নিতান্তই অপরিহার্য ছিল। নতুন ধরনের ভাষা – যেটা সেপিয়েন্সরা মোটামুটি ৭০ হাজার বছর আগে রপ্ত করতে পেরেছিল – এই ভাষা তাদেরকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুনসুটি করার, গল্প করার এমনকি পরনিন্দা করার একটা সুযোগ করে দিল। কথা বলে মানুষ বুঝতে শিখল দলের কার ওপর ভরসা রাখা যায়, আর কার থেকে সাবধানে থাকা ভালো। এই বুদ্ধি ছোটো ছোটো মানবগোষ্ঠীকে বড়ো বড়ো মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দিল। সেপিয়েন্স তার ফলে আরো সঠিকভাবে আরো জটিল সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হলো।[১]

আড্ডা, খুনসুটি বা পরচর্চা করার জন্যই সেপিয়েন্সদের ভাষার বিকাশ ঘটেছে – এরকম একটি তত্ত্বকে আমরা 'পরচর্চা তত্ত্ব' (Gossip Theory) নামে ডাকতে পারি। যদিও পরচর্চার জন্যই ভাষার বিকাশ ঘটেছে – এই কথাটা শুনতে আপাতভাবে অনেক হাস্যকর মনে হয়, কিন্তু এ-সংক্রান্ত অনেক গবেষণাই কিন্তু এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। এমনকি আজকের দুনিয়ার কথা যদি ভাবি–এখনো মানুষের সঙ্গে মানুষের বেশিরভাগ আলাপ-আলোচনার বিষয় জুড়ে থাকে অপরে কী করল, কী খেল, কোথায় কোনো মুখরোচক বা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল–এসব নিয়ে; হোক সে ইমেইলে, ফোনে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায়। পরচর্চা করার ব্যাপারটা

আমাদের এতটাই মজ্জাগত যে মাঝেমধ্যে সত্যিই মনে হয়, বুঝি-বা গল্পগুজব আর পরনিন্দা-পরচর্চা করার জন্যই মানুষের ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে। আপনাদের কি মনে হয় একজন ইতিহাসের অধ্যাপক দুপুরের খাওয়াদাওয়া করার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিয়ে আলোচনা করেন বা একজন নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী কফি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কোয়ার্ক নিয়ে কোনো সম্মেলনের ব্যাপারে আলোচনা করেন? হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে যে করেন না তা নয়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তাদের আলোচনা জুড়ে থাকে কোন অধ্যাপক পরকীয়া করতে গিয়ে বউয়ের কাছে ধরা পড়ল, বিভাগীয় প্রধান কীভাবে ডিনের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধাল কিংবা কোন অধ্যাপক গবেষণার টাকা মেরে বিলাসবহুল গাড়ি কিনল।

সম্ভবত ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ হিসেবে 'পরচর্চা তত্ত্ব' এবং 'নদীর-পাড়ে-একটি-সিংহ-ছিল তত্ত্ব' এ দুটোই সঠিক। যদিও মানুষের সম্পর্কে, সিংহের সম্পর্কে বা দৃশ্যমান পৃথিবী সম্পর্কে আশপাশের মানুষকে জানানোর ক্ষমতাই মানুষের ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এ ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই ভাষায় মানুষ কাল্পনিক ঘটনা বা বস্তু, বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই তার গল্প অন্যদের কাছে করতে পারে। আমরা যতদূর জানি, সেপিয়েন্সই একমাত্র প্রাণী, যারা যেসব জিনিস কখনো চোখে দেখেনি, স্পর্শ করেনি কিংবা ঘ্রাণ নেয়নি সেসব নিয়েও অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে পারে।

'বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব'-এর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমবারের মতো উপকথা, পুরাণ, ঈশ্বর ও ধর্মের উদ্ভব হলো। আগে অনেক প্রাণী, এমনকি সেপিয়েন্সও বলত – 'সাবধান! সিংহ আসছে'। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকেই মানুষ এরকম কথা বলার সুযোগ পেল – 'সিংহ হলো আমাদের গোত্রের কুলদেবতা'। কাল্পনিক কথাবার্তা বলার এই ক্ষমতাই মানুষের ভাষার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ।

এই কথার সঙ্গে সম্ভবত আমরা সবাই একমত হব যে, একমাত্র সেপিয়েন্সই এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে যেগুলোর বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই এবং একদিন সকালের নাশতা করতে বসে তারা ছয়টা বানানো গল্প বিশ্বাস করে বসতে পারে যেগুলো বাস্তবে

অসম্ভব। ধরা যাক, একটা বানরকে আপনি গল্পের ছলে বললেন– আজকে যদি সে আপনাকে একটি কলা দেয়, পরকালে বানরের স্বর্গে সে ১০ হাজার কলা পাবে। বানরকে অনেক কষ্ট করে আপনি এই প্রস্তাবটা বোঝানোর পরপরই সে আপনার হাত থেকে কলাটা নিয়ে নির্লিপ্তভাবে খাওয়া শুরু করবে। সে আপনার বানানো পরকালের গল্প মোটেই বিশ্বাস করবে না। অন্যদিকে, অনেক মানুষই কিন্তু এ ধরনের গল্প বিশ্বাস করে থাকে। কিন্তু, এতসব কথা বানিয়ে বলার প্রয়োজনীয়তা কী? কে না জানে, বানিয়ে বানিয়ে বলা মিথ্যে গল্প আমাদের ভুল পথে চালিত করতে পারে? কোনো মানুষকে যদি পরির মিথ্যে গল্প শোনানো হয় এবং সে পরির খোঁজে বনের আনাচকানাচে ঘুরতে থাকে, তাহলে তার নানা রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে। সে যদি বনে ফলমূল বা হরিণের সন্ধানে যেত, তাহলে তার বিপদের আশঙ্কা কম থাকত – কারণ সে সহজেই ফলমূল বা খাবার সংগ্রহ করে ফেলতে পারত। ঠিক একইভাবে কেউ যদি বনদেবতার বানানো গল্পে বিশ্বাস করে সারা দিন তার আরাধনায়ই ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে কখন, খাবার জোগাড় করবে কখন কিংবা বংশবিস্তারেরই-বা সময় পাবে কখন?

আমরা যে কেবল বাস্তবের বাইরের জিনিস কল্পনা করতে পারি তা-ই নয়, আমরা অনেকে মিলেও একই জিনিস কল্পনা করতে পারি। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে জগৎ কীভাবে সৃষ্টি হলো তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা করি, একেকটা সৃষ্টিতত্ত্ব দাঁড় করিয়ে তাতে বিশ্বাস করতে থাকি। আমরা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের নিয়ে কল্পকাহিনি বানাই, আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য কল্পনা দিয়ে বানাই 'জাতীয়তাবাদ'। এইসব কল্পনাজাত ধারণা মানুষকে অনেক বড়ো একটা দল বা গোষ্ঠী হয়ে জীবন ধারণ করার এক অসাধারণ সুযোগ করে দেয়। পিঁপড়া ও মৌমাছিরাও একসঙ্গে অনেক বড়ো দল হয়ে জীবনধারণ করে; কিন্তু তাদের কাজকর্মের পরিধি খুবই সীমিত এবং তাদের যোগাযোগ শুধু পরিচিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নেকড়ে ও শিম্পাঞ্জির কাজকর্মের পরিধি কিছুটা বেশি, কিন্তু তাদের দলগুলো খুব ছোটো ছোটো হয় এবং দলে শুধু তারাই থাকে, যাদের মধ্যে চেনাজানা অনেক বেশি। অন্যদিকে সেপিয়েন্সরা অপরিচিত অসংখ্য লোকের সঙ্গে খুব

স্বাচ্ছন্দ্যে যোগাযোগ করতে পারে, একসঙ্গে থাকতে পারে। এই কারণেই সেপিয়েন্স সারা দুনিয়ায় রাজত্ব করছে, আর ওদিকে পিঁপড়ারা আমাদের উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে, শিম্পাঞ্জিরা তালাবদ্ধ হয়ে আছে আমাদের বানানো চিড়িয়াখানায় অথবা গবেষণাগারে।

পিউজো – একটি রূপকথা

আমাদের জ্ঞাতিভাই শিম্পাঞ্জিরা ছোটো ছোটো দল তৈরি করে বসবাস করে। প্রতিটা দলে কয়েক ডজনের মতো শিম্পাঞ্জি থাকে। তারা একে অপরের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করে, একসঙ্গে শিকার করে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেবুন, চিতা বা শত্রুপক্ষের শিম্পাঞ্জির সঙ্গে লড়াইও করে। এদের সমাজে একধরনের স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। সাধারণত পুরুষ শিম্পাঞ্জিরাই এসব দলের দলনেতা হয়। দলনেতাকে বলা হয় 'আলফা পুরুষ' (Alpha Male)। প্রজা যেমন রাজাকে মাথা নত করে কুর্নিশ করে, অনেকটা তেমন করেই শিম্পাঞ্জি দলের বাকি সদস্যরা মাথা নিচু করে এবং ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে দলনেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। 'আলফা পুরুষ' তার দলের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। দলের দুজনের মধ্যে মারামারি লাগলে দলনেতা এগিয়ে যায় এবং মারামারি বন্ধ করে। একটু দুষ্টু প্রকৃতির দলনেতা হলে সে অধিকার খাটিয়ে বেশি খাবার খায় এবং নিচের স্তরের পুরুষদের নারী শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে মিলিত হতে বাধা দেয়।

যখন দুজন শিম্পাঞ্জি দলনেতা হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে, তারা তখন অন্যান্য শিম্পাঞ্জিদের নানা কৌশলে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে। নিজের দলের লোকজনের সঙ্গে নেতা পদপ্রার্থীর আন্তরিকতা নির্ভর করে কিছু বিষয়ের ওপর, যেমন – সে তাদের সঙ্গে নিয়মিত আলিঙ্গন করছে কি না, বাচ্চাদের চুমু খাচ্ছে কি না, তরুণদের নানা জিনিস শেখাচ্ছে কি না এবং বিপদে-আপদে সাহায্য করছে কি না। মানুষের সমাজের নেতারা যেমন ভোটের আগে সবার কাছে যান, হাত মেলান, বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, সেরকম শিম্পাঞ্জি দলের নেতা পদপ্রার্থীও এ সময় জড়িয়ে

ধরতে, পিঠ চাপড়ে দিতে এবং বাচ্চাদের আদর করতে অনেকটা সময় ব্যয় করে। মজার ব্যাপার হলো, সবচেয়ে শক্তিশালী শিম্পাঞ্জি 'আলফা পুরুষ' হিসেবে নির্বাচিত হয় না, যার সমর্থক সংখ্যা বেশি এবং যার ধারাবাহিক সমর্থন আছে এমন শিম্পাঞ্জিই 'আলফা পুরুষ' হিসেবে নির্বাচিত হয়। এই সমর্থকশ্রেণি শুধু যে নেতা নির্বাচনে অবদান রাখে এমন নয়, দৈনন্দিন নানা কাজেও এরা সাহায্য করে থাকে। একই দলের লোকজন নিজেদের সঙ্গে বেশি সময় কাটায়, নিজেদের খাবার ভাগাভাগি করে খায় এবং বিপদে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করে।

কিন্তু সামনাসামনি যোগাযোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই যে গোষ্ঠী বা দল, এর একটা সীমাবদ্ধতা হলো – এভাবে খুব বড়ো আকারের দল গঠন করা সম্ভব নয়। দুজন শিম্পাঞ্জি, যারা কখনো একে অপরকে দেখেনি, একসঙ্গে লড়াই করেনি বা একসঙ্গে শলা-পরামর্শ করেনি, তাদের পক্ষে একজন অন্যজনকে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। একজন অচেনা শিম্পাঞ্জি অন্যজনকে সাহায্য করবে কি করবে না, দুইজন অচেনা শিম্পাঞ্জির মধ্যে কার সামাজিক মর্যাদা উঁচুতে, কার নিচুতে– এসব তাদের পক্ষে বোঝা খুবই কঠিন।[২]

একই ধরনের জীবনাচরণ আমাদের পূর্বপুরুষদের সামাজিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিম্পাঞ্জির মতো মানুষের মধ্যেও দলবদ্ধ হওয়ার, একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর, সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি করার, দল বেঁধে শিকার বা লড়াই করার একটা সহজাত প্রবণতা কাজ করত। স্বাভাবিকভাবেই, সহজাত প্রবৃত্তি থেকে গড়ে ওঠা এইসব গোষ্ঠী বা দলগুলো হতো শিম্পাঞ্জিদের দলগুলোর মতোই ছোটো আকারের। যখনই দলগুলো বড়ো হতে শুরু করত, তখন দলের মধ্যে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত এবং দলগুলো নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে যেত। এই যে বড়ো দল হিসেবে থাকতে না পারার ব্যাপার, এটা যে শুধু খাবারের সরবরাহ বা অন্যান্য সুবিধাদির ওপর নির্ভর করত, এমন নয়। একটা উর্বর উপত্যকায় ৫০০ জন লোককে খাওয়ানোর মতো শস্য জন্মালেও তখনকার দিনে ৫০০ জন লোক একসঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব ছিল। কারণ, তখনকার দিনের মানুষ এটা ঠিক করতে পারত না যে

এতগুলো লোকের মধ্যে কাকে তারা নেতা হিসেবে মানবে, কে কোন এলাকায় শিকার করবে এবং কে কার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করবে।

এ অবস্থার অবসান ঘটল বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর। মানুষ কথা বলতে শিখল। প্রতিবেশীর সমালোচনা বা পরচর্চা করতে শিখল এবং আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এই পরচর্চাই মানুষকে বড়ো বড়ো এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী দল বা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সহায়তা করল। কিন্তু একজন মানুষ কতজনের ব্যাপারেই-বা পরচর্চা বা আলোচনা করতে পারে? সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণাগুলো থেকে দেখা যায়, এভাবে একে অন্যের সমালোচনা বা পরচর্চার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১৫০ জনের একটা দল গঠন করা যেতে পারে, এর বেশি নয়। বেশিরভাগ মানুষই ১৫০ জন মানুষকেও কাছ থেকে জানতে বা তাদের সবার সম্পর্কে মন্তব্য বা সমালোচনা করার ব্যাপারে অক্ষম।

আশ্চর্যজনকভাবে, সমাজতাত্ত্বিক এই গবেষণাটির বাস্তব প্রয়োগ কিন্তু আমরা আজকের সমাজেও অনেক দেখতে পাই। একটু খেয়াল করলে দেখব, অনেক বড়ো প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা এই ১৫০ সংখ্যাটির নিচে বা তার কাছাকাছি। এই সংখ্যাটির চেয়ে কম সদস্য সংখ্যা হলে কোনো দল, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক মাধ্যম বা সেনাবাহিনী তেমন কোনো আইনকানুন ছাড়াই একে অপরকে সামনা-সামনি চেনার মাধ্যমে বা একে অন্যের সমালোচনা করার মাধ্যমে তাদের গোষ্ঠী বা দলটি পরিচালনা করতে পারে।[৩] ৩০ জনের এক প্লাটুন সৈন্য বা ১০০ জনের এক কোম্পানি সৈন্য পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনীর মতো কোনো পদবি নির্ধারণ বা কঠোর আইন প্রণয়নের দরকার পড়ে না। সৈন্যদের নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে এবং সবাই কিছুটা নিয়মানুবর্তিতা মেনে চললে সহজেই সেটা করা সম্ভব। এই আকারের একটি কোম্পানিতে একজন সম্মানিত সার্জেন্ট কখনো কখনো কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন, হয়ে উঠতে পারেন তাদের শিরোমণি। একই কথা প্রযোজ্য পারিবারিক ব্যবসায়গুলোর ক্ষেত্রে, যেখানে সাধারণত সদস্যসংখ্যা খুব একটা

বেশি হয় না। এই ব্যবসায়গুলো কোনো পরিচালনা পরিষদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা হিসাবরক্ষণ বিভাগ ছাড়াও স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

কিন্তু যখন গোষ্ঠী বা দলের সদস্যসংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে যায়, এভাবে নিয়মকানুন ছাড়া নিজেদের মতো করে গোষ্ঠী পরিচালনা করা তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক প্লাটুন সৈন্য যত সহজে পরিচালনা করা যায়, হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত একটা ডিভিশন সেই একই উপায়ে পরিচালনা করা অসম্ভব। সফল পারিবারিক ব্যবসায়গুলোও তখনই সংকটের সম্মুখীন হয় যখন তারা আকারে বড়ো হয়ে ওঠে এবং অনেক লোকজনকে তাদের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। তারা যদি এই বাড়তি লোকজনকে সঠিকভাবে পরিচালনার কোনো কৌশল বের করতে না পারে, তাহলে তাদের ব্যবসায় ভণ্ডুল হতে বাধ্য।

এই পর্যায়ে এসে অপরিহার্যভাবেই যে প্রশ্নটা মনে আসে সেটা হলো সেপিয়েন্সরা কীভাবে এই ১৫০ জনের সীমা অতিক্রম করে হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে গড়ে তুলল নগর বা লাখ লাখ সদস্যের সমন্বয়ে গড়ে তুলল সাম্রাজ্য? কল্পনা বা গল্পের উদ্ভবই সম্ভবত এই রহস্যের সমাধান। একটি লোককথা বা পুরাকাহিনিতে বিশ্বাস করার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ লোক গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে।

যে-কোনো বড়ো আকারের মানবসংগঠন– হোক সেটা আধুনিক রাষ্ট্র, মধ্যযুগের চার্চ, প্রাচীন কোনো নগর বা কোনো প্রাচীন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী– প্রতিটির মূলেই আছে কিছু সাধারণ বিশ্বাস, কিছু উপকথা; যার অস্তিত্ব শুধু ওই গোষ্ঠীর সামষ্টিক কল্পনায় বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, চার্চগুলোর মূলে রয়েছে সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাস। দুজন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোক, যারা কেউ কাউকে কোনো দিন দেখেনি, তারাও বিনা যুক্তিতর্কে একসঙ্গে মুসলিম নিধনের জন্য ধর্মযুদ্ধে যেতে রাজি হতে পারে বা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য একসঙ্গে চাঁদা তুলতে পারে। কারণ, তারা দুজনেই এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, স্রষ্টা মানুষের রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং আমাদের দুঃখ দূর করার জন্য স্বেচ্ছায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ‘রাষ্ট্র’ নামক প্রতিষ্ঠানটির মূলে

রয়েছে সবার একই জাতীয়তাবাদের ধারণায় বিশ্বাস। দুজন সার্বিয়ান যাদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের আগে কখনো পরিচয় হয়নি, তারাও কখনো কখনো একে অন্যকে বাঁচানোর জন্য জীবন বাজি রাখতে পারে। এটা সম্ভব হয়, কারণ, তাদের দুজনেই সার্বিয়ান জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করে, সার্বিয়াকে তাদের মাতৃভূমি হিসেবে জানে এবং সার্বিয়ান পতাকাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। বিচারব্যবস্থাগুলোর মূলে আছে 'ন্যায়' নামক ধারণাটির ওপর বিশ্বাস। দুইজন অপরিচিত আইনজীবী একযোগে চেষ্টা করতে পারে তাদের সম্পূর্ণ অচেনা মক্কেলকে বাঁচানোর জন্য। কারণ তারা দুইজনই বিশ্বাস করে আইন, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারকে এবং এসবের রক্ষায় তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া অর্থকে।

এই সবগুলো ধারণারই অস্তিত্ব শুধু মানুষের বানিয়ে তোলা কিছু গল্পে, যেগুলো তারা বিশ্বাস করে এবং একে অপরের কাছে ছড়িয়ে দেয়। মানুষের এই সমষ্টিগত কল্পনার বাইরে সমগ্র মহাবিশ্বে কোনো 'ঈশ্বর' নেই, কোনো 'রাষ্ট্র' নেই, 'টাকা' বলে কিছু নেই, 'মানবাধিকার' নেই, 'আইন' নেই, নেই কোনো 'ন্যায়বিচার'।

মানুষ এ কথাটা সহজেই বুঝতে পারে যে, ভূতপ্রেত কিংবা আত্মায় বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে প্রাচীন মানুষের মধ্যে একধরনের সামাজিক বন্ধন, একধরনের সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়েছিল। এবং এই বিশ্বাসগুলোই তাদের দিয়েছিল প্রতি পূর্ণিমার রাতে আগুনের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচার মতো রীতি বা আচার-অনুষ্ঠান। যেটা আমরা সহজে বুঝতে পারি না বা বুঝতে চাই না সেটা হলো, আধুনিক সামাজিক সংগঠনগুলোও ঠিক একই নিয়মে গড়ে ওঠে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দুনিয়ার কথাই ধরা যাক। আধুনিককালের ব্যবসায়ী ও আইনজীবীরা একেকজন শক্তিশালী জাদুকর। প্রাচীনকালের মানবগোষ্ঠীগুলোতে যে ধরনের জাদুকর থাকত তাদের সঙ্গে এদের একটাই পার্থক্য। সেটা হলো, তারা আগের জাদুকরদের থেকে অনেক বেশি চমকপ্রদ গল্প বলতে পারে। এ ধরনের চমকপ্রদ গল্পের একটা চমৎকার উদাহরণ হতে পারে 'পিউজো' (Peugeot) কোম্পানির ইতিহাস।

প্যারিস থেকে সিডনি পর্যন্ত বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করা মোটরগাড়ি, ট্রাক ও মোটরসাইকেলের গায়ে আধা-সিংহ আধা-মানুষের (Stadel Lion-man) প্রতিকৃতি-সংবলিত একটা চিহ্ন প্রায়ই দেখা যায়। আধা-সিংহ আধা-মানুষের এই চিহ্নটা আসলে জার্মানির স্ট্যাডেল গুহায় পাওয়া যাওয়া অনেক প্রাচীন একটি মূর্তির প্রতিরূপ। এই চিহ্নটা পিউজো কোম্পানির তৈরি করা গাড়িগুলোর জন্য অপরিহার্য এক অলংকার। পিউজো ইউরোপের সবচেয়ে পুরোনো এবং বৃহদাকার গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। পিউজো কোম্পানি ভ্যালেনটিগনি (Valentigney) নামের একটি গ্রামে পারিবারিক ব্যবসায় হিসেবে গাড়ি তৈরি করতে শুরু করে। এই গ্রামটি ছিল স্ট্যাডেল গুহা থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে। বর্তমানে এই কোম্পানিতে প্রায় ২ লাখ লোক কাজ কওে, যাদের বেশিরভাগই একে অপরকে চেনে না। কিন্তু এই অচেনা লোকগুলো পরস্পরের সঙ্গে এত নিখুঁতভাবে কাজের সমন্বয় করে যে ২০০৮ সালে পিউজো কোম্পানি প্রায় ১৫ লাখ বিভিন্ন ধরনের গাড়ি তৈরি করে এবং সেখান থেকে তাদের মুনাফা আসে ৫৫০ কোটি ইউরো।

এখন, কোন অর্থে আমরা বলতে পারি যে, পিউজো (Peugeot SA) কোম্পানিটির অস্তিত্ব আছে? পিউজো কোম্পানির বানানো অনেক গাড়ি আছে, কিন্তু গাড়িগুলোকে কি একটি কোম্পানি বলা যায়? যদি পিউজো কোম্পানির বানানো সবগুলো গাড়ি ভেঙে ফেলা হয় এবং লোহালক্কড়ের দোকানে সেই ভাঙা টুকরোটাকরাগুলো বেচেও দেওয়া হয়, তার পরও কিন্তু পিউজো কোম্পানিটি থেকে যাবে। এটা আরো নতুন নতুন গাড়ি তৈরি করবে এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। কোম্পানিটির গাড়ি বানাবার কারখানা আছে, আছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং বিক্রি করার জন্য দোকান। কোম্পানিতে কাজ করে অনেক শ্রমিক, হিসাবরক্ষক এবং কর্মকর্তা; কিন্তু এ সবকিছুর সমষ্টিকেও কিন্তু পিউজো কোম্পানি বলা যাবে না। কারণ, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোম্পানির সব কর্মচারী মারা যেতে পারে, কোম্পানিটির সব কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং দোকানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে। এর পরও কোম্পানিটি টাকা ধার করতে পারবে, নতুন কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারবে, নতুন করে

কারখানা বানাতে পারবে এবং যন্ত্রপাতি কিনতে পারবে। সুতরাং এসবের সমষ্টিকেও পিউজো কোম্পানি বলা যাচ্ছে না। পিউজো কোম্পানিতে আছে অনেক ম্যানেজার এবং আছে অনেক শেয়ারমালিকও। কিন্তু তারাও কিন্তু কোম্পানির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য নয়। সবগুলো ম্যানেজারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলেও এবং কোম্পানির সবগুলো শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হলেও কোম্পানিটি বহাল তবিয়তে টিকে থাকবে।

৫. পিউজো সিংহ

কিন্তু এতসব কথার মানে কিন্তু এই নয় যে, পিউজো কোম্পানি অমর বা কোনোকিছুতেই তার অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেই মুহূর্তে একজন বিচারক কোম্পানি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দেবেন, এর সব কর্মচারী, কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষক, ম্যানেজার, শেয়ারমালিক সকলে অক্ষত থাকলেও সঙ্গে সঙ্গেই পিউজো কোম্পানির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এ থেকে বোঝা যায়, বাস্তব দুনিয়ার কোনো বস্তু বা ব্যক্তিই পিউজো কোম্পানির টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য নয় এবং পিউজো কোম্পানি বাস্তব জগতের কোনো

ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টি নয়। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, বাস্তব দুনিয়ায় আদৌ কি 'পিউজো' বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব আছে?

পিউজো হলো আমাদের সমষ্টিগত কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট একটি সত্তা। আইনজীবীরা একে বলেন 'আইনসিদ্ধ গল্প' (legal fiction)। আপনি আঙুল তুলে কখনোই একে দেখাতে পারবেন না, কারণ এর কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এটি একটি আইনসিদ্ধ সত্তা হিসেবে সমাজে টিকে থাকে। আপনার আমার মতো এই অদৃশ্য, কল্পিত সত্তাটিও নিজ দেশের প্রচলিত আইনকানুনের অধীন। এই কাল্পনিক সত্তাটি আমাদের মানুষদের মতোই একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে, কিনতে পারে নিজের নামে জমিজমা-সম্পত্তি। এবং মানুষের মতোই এই কোম্পানিতে যারা কাজ করে তারা কোম্পানিকে অভিযুক্ত এবং ধ্বংসও করতে পারে।

পিউজো হলো একটি বিশেষ ঘরানার আইনসিদ্ধ গল্পের নাম, যাকে আমরা বলি– 'সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানি (Limited Liability Company)'। এই ধরনের কোম্পানির উদ্ভব মানুষের অনন্য উদ্ভাবনীশক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। লাখ লাখ বছর মানুষ এইসব কোম্পানি ছাড়াই কাটিয়েছে। ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে কেবল মানুষ নামের এই বড়ো মগজওয়ালা রক্তমাংসের দোপেয়ে প্রাণীটিকেই সম্পদের মালিক হতে দেখা গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ত্রয়োদশ শতকের ফ্রান্সে জিন নামের কেউ যদি একটা মালগাড়ি তৈরির কারখানা দিত, তাহলে জিন নিজেই সেখানে হতো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। জিনের বানানো একটি গাড়ি কেনার এক সপ্তাহ পর সেটাতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে ক্রেতা সরাসরি জিনকে দোষারোপ করতে পারত। ধরা যাক, কারখানা স্থাপনের জন্য জিনকে ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার করতে হলো এবং শেষমেশ ব্যবসায় দাঁড়াল না। সেক্ষেত্রে জিনকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার বাড়ি-ঘর, গবাদিপশু বেচে সেই ধার শোধ করতে হতো। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তাকে বাধ্য হয়ে সন্তানদেরও দাস হিসেবে বিক্রি করতে হতে পারত। যদি এর পরও ধার শোধ না হতো, তাহলে রাষ্ট্র তাকে নিক্ষেপ করত কারাগারে কিংবা সে হয়ে যেত ঋণদাতার দাস। তার

কারখানার যে-কোনো ঘটনা এবং পরিস্থিতির জন্য সে এককভাবে দায়ী থাকত।

আপনি যদি সে সময়ের মানুষ হতেন, তাহলে আপনি নিজের একটা প্রতিষ্ঠান দেওয়ার আগে আপনাকে বারবার এই ঝুঁকিগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হতো। তখনকার দিনে আইন এবং রাষ্ট্রও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছাকে নিরুৎসাহিত করত। মানুষ নতুন নতুন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তৈরির চেষ্টা বা অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিতে ভয় পেত। নিজের ও পরিবারের একেবারে নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকায় এরকম উদ্যোগ নেওয়ার কোনো মানে খুঁজে পেত না তারা।

এইসব কারণেই মানুষ সমষ্টিগতভাবে সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। এই ধরনের কোম্পানির মালিক, বিনিয়োগকারী অথবা ম্যানেজাররা আইনানুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির ভালোমন্দের জন্য দায়ী থাকে না– সব দায় কোম্পানির ওপর বর্তায়। কয়েক শতাব্দী হলো এই ধরনের কোম্পানিগুলোই অর্থনীতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এবং আমরা এসব কোম্পানির ব্যাপারে এখন এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, আমরা ভুলেই গিয়েছি, এই কোম্পানিগুলোর অস্তিত্ব শুধু আমাদের কল্পনায়। যুক্তরাষ্ট্রে 'সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানি'র একটা কেতাবি নাম আছে– সেটা হলো 'করপোরেশন' (Corporation)। নামটির উৎস অনুসন্ধান করা হলে নামটিকে একরকম প্রহসন বলেই মনে হয়। ইংরেজি 'Corporation' নামটি এসেছে ল্যাটিন 'Corpus' শব্দ থেকে। 'Corpus'-এর অর্থ হলো যে-কোনো কাঠামোর প্রধান অংশ বা শরীর। অথচ সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানিগুলোতে এই প্রধান কাঠামো বলে আসলে কিছুই নেই। যেহেতু কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ কোম্পানির কাঠামো গঠন করে না, আমেরিকার আইন কোম্পানিকেই এমনভাবে বিবেচনা করে, যেন কোম্পানিটি একটি রক্ত-মাংসের মানুষ এবং কোম্পানির সব দায়দায়িত্ব এই কল্পিত সত্তার ওপর বর্তায়।

পিউজো কোম্পানির ইতিহাস দেখলে পুরো ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। ১৮৯৬ সাল। আরমান্ড পিউজো (Armand

Peugeot) পৈতৃক সূত্রে একটি ধাতব যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানার মালিক। সে কারখানায় তখন স্প্রিং, করাত, বাইসাইকেল এসব তৈরি হতো। এরপর তিনি গাড়ি তৈরির ব্যবসায়ে নামার ব্যাপারে মনস্থির করলেন। এই লক্ষ্যে তিনি একটি 'সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানি' তৈরি করলেন। নিজের নামে তিনি কোম্পানির নামকরণ করলেন কিন্তু যেহেতু এটা 'সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানি', তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে এর ভালোমন্দের জন্য দায়ী থাকলেন না। সুতরাং, যদি এই কোম্পানির বানানো কোনো গাড়ি ভেঙে যায় বা এতে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, তাহলে ক্রেতা পিউজো কোম্পানিকে অভিযুক্ত করতে পারবেন, ব্যক্তি আরমান্ড পিউজোকে নয়। যদি কোম্পানি লাখ লাখ ফ্রাংক ধার করে এবং ব্যবসায়ে মার খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, তবু 'আরমান্ড পিউজো' ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগকারীদের এক ফ্রাংকও শোধ করার দায় বহন করেন না। কারণ, ধারটা নিয়েছিল পিউজো কোম্পানি, ব্যক্তি আরমান্ড পিউজো নন। মানুষ আরমান্ড পিউজো ১৯১৫ সালে মারা যান। কোম্পানি পিউজো এখনো বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছে।

কৌতূহল জাগতেই পারে, ঠিক কীভাবে মানুষ আরমান্ড পিউজো 'পিউজো' কোম্পানি তৈরি করলেন? আসলে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু অনেককাল আগে থেকেই চলে আসছে। এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেই সাধুসন্ত ও জাদুকরেরা যুগ যুগ ধরে দেবদেবী ও শয়তান তৈরি করে আসছেন, একই পদ্ধতিতে হাজার হাজার ফরাসি যাজক প্রতি রবিবারে চার্চে কল্পনায় যিশুখ্রিষ্টের শরীর তৈরি করেন। এই সবগুলো জিনিসেরই উৎপত্তি হয়েছে একটা গল্প বলা এবং মানুষের কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে। ফরাসি যাজকদের ক্ষেত্রে গল্পটা ছিল ক্যাথলিক চার্চের মারফতে বলা যিশুখ্রিষ্টের জীবন ও মৃত্যুর করুণ কাহিনি। এই গল্প অনুযায়ী, যদি একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক আচারনিষ্ঠভাবে পবিত্র পোশাক পরিধান করে তিথি অনুযায়ী সঠিক স্তোত্র পাঠ করেন, তাহলে সাধারণ রুটি ও মদ হঠাৎ করে ঈশ্বরের মাংস আর রক্তে রূপান্তরিত হয়। ধর্মযাজক পাঠ করতে থাকেন– 'Hoc est corpus meum!' (ল্যাটিন ভাষায় 'এই হলো আমার শরীর')– ব্যস, রুটি যিশুখ্রিষ্টের মাংসে পরিণত হলো! সবাই

দেখে তাদের গুরু কত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে স্তোত্রগুলো পাঠ এবং নিয়মকানুনগুলো পালন করে। এইসব দেখে লাখ লাখ ফরাসি ক্যাথলিক বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ঈশ্বর সত্যি সত্যিই ওই উৎসর্গ করা রুটি এবং মদের মধ্যে আছেন।

পিউজো কোম্পানির ক্ষেত্রে গল্পটা হলো ফ্রান্সের আইনকানুন, যার রচয়িতা ফ্রান্সের আইনসভা। ফ্রান্সের আইনপ্রণেতাদের মতে, যদি একজন সার্টিফিকেটধারী আইনজীবী সব নিয়মনীতি পালন করে, সব দরকারি শর্ত ও প্রতিজ্ঞা একটি সুন্দর কাগজে (দলিল) লিপিবদ্ধ করে এবং সেই কাগজের নিচে তার একটি মূল্যবান স্বাক্ষর দিয়ে কাগজটিকে মহিমান্বিত করে তোলে– 'হোকাস পোকাস'– একটি নতুন কোম্পানির জন্ম হয়ে গেল। ১৮৯৬ সালে আরমান্ড পিউজো যখন কোম্পানি তৈরির পরিকল্পনা করেন, তখন তিনি আইনজীবীকে এইসব পবিত্র কাজের জন্য টাকা দিলেন। যখন আইনজীবী সঠিকভাবে তাঁর আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন এবং সব জাদুকরি মন্ত্র এবং শপথ পাঠ করলেন, লাখ লাখ ফরাসি নাগরিক বিশ্বাস করতে শুরু করল 'পিউজো' নামে সত্যিই একটি কোম্পানি আছে!

অবশ্য বিশ্বাসযোগ্যভাবে গল্প বলাও সহজ নয়। গল্প বলাটা এমনিতে এমন কোনো কঠিন কাজ নয়, সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কাজটাই কঠিন। 'কীভাবে একজন মানুষ ঈশ্বর, জাতি বা সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানিবিষয়ক একেকটা গল্প বানায় যা লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে?'– ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ কেবল এই প্রশ্নের আলোচনা নিয়েই আবর্তিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো– কোনো সেপিয়েন্স যখন এই বিশ্বাসযোগ্যভাবে গল্প বলার কঠিন কাজটিতে সফল হয়, তখন তা সমস্ত সেপিয়েন্সকে এক অসাধারণ ক্ষমতা দেয়। তখন একই গল্পে বিশ্বাস করা লাখ লাখ অচেনা মানুষ একে অপরকে না চিনেও পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে এবং এক ও অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারে। ভেবে দেখুন, আমরা যদি শুধু বাস্তবে আছে এমন জিনিস নিয়ে ভাবতাম (যেমন নদী, গাছ এবং সিংহ) এবং কোনো কাল্পনিক গল্পে বিশ্বাস না

করতাম তাহলে রাষ্ট্র, চার্চ এবং রাষ্ট্রের আইন গড়ে তোলা কতটা কঠিন হতো!

এভাবে বছরের পর বছর ধরে, মানুষ ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর গল্পের জাল বুনে চলেছে। এই বিশালকায় গল্পের জালে ‘পিউজো’র মতো গল্পগুলো শুধু টিকেই থাকে না বরং দিনের পর দিন আরো শক্তিশালী হয়। এই গল্পের জালের মধ্য দিয়ে মানুষ যেসব জিনিসের অস্তিত্ব তৈরি করে সেগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার জগতে ‘কল্পিত গল্প’ (Fictions), ‘সমাজকাঠামো’ (Social Construct) বা ‘কল্পিত বাস্তবতা' (Imagined Realities) নামে ডাকা হয়। সব ‘কল্পিত বাস্তবতা’ই কিন্তু মিথ্যা নয়। এক্ষেত্রে ‘মিথ্যা’ কাকে বলব সেই বিষয়টা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। ধরা যাক, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, নদীর পাড়ে কোনো সিংহ নেই। এ কথা জেনেও আমি সবাইকে এসে বললাম, ‘নদীর পাড়ে একটি সিংহ আছে।’ এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। অবশ্য, মিথ্যা বলা এমন কোনো আহামরি নতুন ব্যাপার নয়। সবুজ বানর ও শিম্পাঞ্জিও মিথ্যা বলতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সবুজ বানর অনেক সময় ইচ্ছা করেই ‘সাবধান, সিংহ আসছে’– এই কথার সংকেত দেয়, যখন আশপাশে আদপে কোনো সিংহই থাকে না। এই সংকেত শুনে আশপাশের কোনো সবুজ বানর যে হয়তো এইমাত্র একটি কলার খোঁজ পেয়েছে, কলা ফেলে ভয়ে সেই জায়গা থেকে পালিয়ে যায়। এবং আমাদের মিথ্যাবাদী সবুজ বানর তখন কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই আরামে সেই কলাটি হস্তগত করে। এখানে মিথ্যাবাদী সবুজ বানর কিন্তু জানে, কোনো বিপদ নেই কিন্তু অন্যরা ভাবে সামনে অনেক বিপদ।

এরকম ‘মিথ্যা’র সঙ্গে ‘কল্পিত বাস্তব’তার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ‘কল্পিত বাস্তবতা’ হলো এমন একটা ব্যাপার যেটা একই গোত্র বা দলভুক্ত সবাই বিশ্বাস করে। যতদিন এরকম একটা কল্পিত বাস্তবতায় সবাই বিশ্বাস করে, ততদিন সেই কল্পিত বাস্তবতা পৃথিবীতে একটি শক্তি হিসেবে কাজ করে। স্ট্যাডেল গুহায় যে শিল্পী কাজ করতেন তিনি হয়তো সত্যি সত্যি সিংহমানব নামে তাদের রক্ষাকারী কোনো দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। কিছু জাদুকর

হয়তো ভণ্ডামি করতে পারেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই হয়তো দেবতা এবং দৈত্যদের দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করেন। অনেক কোটিপতি খুব জোরালোভাবে 'টাকাপয়সা' এবং 'সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানি'র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। বেশিরভাগ মানবাধিকার কর্মী 'মানুষের অধিকার' নামে একটি ব্যাপারের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। সুতরাং, ২০১১ সালে জাতিসংঘ যখন দাবি করে যে, লিবিয়ার সরকার তার নাগরিকদের অধিকারকে মর্যাদা দেয়– এরকম একটি বাক্য আসলে 'মিথ্যা' নয়। যদিও 'জাতিসংঘ', 'লিবিয়া', 'মানবিক অধিকার' এই প্রতিটি ব্যাপারই মানুষের উর্বর মস্তিকের কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

সুতরাং একটা ব্যাপার এখন বোঝা যাচ্ছে, বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকে মানুষ মূলত দুরকম বাস্তবতায় বসবাস করছে। একটি বস্তুগত বাস্তবতা, যেমন– নদী, গাছপালা এবং সিংহ; আর অন্যদিকে কল্পিত বাস্তবতা যেমন দেবদেবী, ঈশ্বর, জাতি, গোষ্ঠী, আইনকানুন ইত্যাদি। যত দিন যাচ্ছে, এই কল্পিত বাস্তবতা, বস্তুগত বাস্তবতার থেকে বেশি শক্তিশালী, বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে মানুষের কাছে। সে কারণে বর্তমানে নদনদী, গাছপালা, পশুপাখি এসবের টিকে থাকা আসলে নির্ভর করে দেবদেবী, জাতি বা কোনো বড়োসড়ো কোম্পানির ইচ্ছার ওপর। অন্যদিকে নদনদী, গাছপালা, পশুপাখি এসবের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর মানুষের কল্পিত বাস্তবতার উপাদানগুলোর অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়।

জিনোমকে ল্যাং মেরে

শুধু কথা দিয়ে কল্পিত বাস্তবতা তৈরির ক্ষমতা অনেকগুলো অচেনা মানুষকে একসঙ্গে কাজ করার একটা অভাবনীয় ক্ষমতা এনে দিয়েছে মানুষের হাতে। কিন্তু এর আরো অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাবও আছে। যেহেতু বড়ো আকারের মানবসংগঠনগুলো কল্পিত গল্পের ভিত্তিতে চালিত হয়, গল্প পরিবর্তন করার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণের ধরনও পালটে ফেলা সম্ভব। কোনো কোনো সময়ে গল্পগুলো অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের জনগণ বলতে গেলে রাতারাতিই 'রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী'– এরকম গল্পে বিশ্বাস হারিয়ে 'জনগণ সর্বময় ক্ষমতার উৎস'– এরকম একটি গল্পে বিশ্বাস করতে শুরু করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে

দেখা যায়, বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকে মানুষ ক্রমাগত তার চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী তাদের নিজেদের পারস্পরিক যোগাযোগ বা আচার-আচরণের পদ্ধতি পালটে ফেলেছে। এভাবেই সূচনা হয়েছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন নামের একটি দ্রুতগামী প্রক্রিয়ার, যা জিনগত বিবর্তনের মতো অত ঢিমে তালের নয়। এই দ্রুতগামী সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ট্রেনে চড়ে সেপিয়েন্সরা খুব দ্রুত পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে সেপিয়েন্সদের অন্যান্য প্রজাতি এবং অন্যান্য প্রাণী থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে পারস্পরিক আচরণের অনেকটাই জিনগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে কেবল ডিএনএ (DNA) প্রাণীদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য দেখায়, এমনটা বলাও ঠিক হবে না। প্রাণীদের আচার-আচরণের পেছনে পরিবেশগত উপাদান এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিরও প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু, তা হলেও, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে একটি প্রজাতির সব প্রাণী মোটামুটি একই রকম আচরণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে জিনগত পরিব্যক্তি (Genetic Mutation) ছাড়া বড়ো কোনো আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না। যেমন, শিম্পাঞ্জির জিনগত স্বভাব হলো তারা একটি স্তরভিত্তিক গোত্র বা গোষ্ঠী আকারে থাকবে, যার নেতৃত্ব দেবে 'আলফা পুরুষ'। শিম্পাঞ্জিদের কাছাকাছি আরেকটি প্রজাতি হলো বোনোবো (Bonobo)। এদের সমাজ অনেকটা সাম্যবাদী ও মাতৃতান্ত্রিক। নারী বোনোবোর একটি দল এদের নেতৃত্ব দেয়। সাধারণ বোনোবোরা কখনো প্রতিবেশীদের সঙ্গে দল বেঁধে একটি নারীবাদী বিপ্লব গড়ে তোলে না। পুরুষ শিম্পাঞ্জিরা কখনো একটি সংসদ ভবনে একত্রিত হয়ে আলফা পুরুষের অফিস ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় না এবং ঘোষণা করে না– আজ থেকে সব শিম্পাঞ্জি সমান। সবার অধিকার সমান। এরকম কিছু কেবল তখনই ঘটতে পারে যদি শিম্পাঞ্জির ডিএনএতে কোনো পরিবর্তন হয়।

ঠিক একই কারণে অনেক প্রাচীনকালের সেপিয়েন্সদের মধ্যেও বিপ্লবের কোনো ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা যতদূর জানি, তাতে মনে হয়, প্রাচীন মানুষের সমাজকাঠামোর পরিবর্তন, নতুন

নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন অভ্যাসের পেছনে সাংস্কৃতিক উদ্যোগের চেয়ে বেশি দায়ী ছিল জিনগত পরিব্যক্তি এবং পারিপার্শ্বিক চাপ। এই কারণেই, এসব কাজ করতে মানুষের হাজার হাজার বছর লেগে গেছে। দুই মিলিয়ন বছর আগে, জিনগত পরিব্যক্তির কারণে 'হোমো ইরেক্টাস' নামে একটি প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল। এই প্রজাতির উদ্ভবের হাত ধরেই পৃথিবীতে এসেছিল পাথরের হাতিয়ার তৈরির প্রযুক্তি। মূলত পাথরের তৈরি এইসব হাতিয়ার এবং সরঞ্জামকেই এই প্রজাতির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। যতদিন পর্যন্ত হোমো ইরেক্টাসের আর কোনো বড়ো ধরনের জিনগত পরিব্যক্তি না হলো, ততদিন পর্যন্ত এই পাথরের হাতিয়ারগুলোর প্রকৃতি এবং প্রযুক্তি মোটামুটি অপরিবর্তিত অবস্থায়ই ছিল এবং এই অপরিবর্তিত থাকার সময়কাল ছিল মোটামুটি ২০ লাখ বছর!

অন্যদিকে, বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকে সেপিয়েন্সরা খুব দ্রুত তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়; কোনো জিনগত বা পরিবেশগত পরিবর্তন ছাড়াই তারা পরিবর্তিত আচরণের বিধান পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। এর একটা বড়ো উদাহরণ হতে পারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষের সন্তানহীন থাকবার প্রথা। ক্যাথলিক চার্চের পুরোহিত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং বিধান অনুসারে নপুংসক হওয়া চীনের সম্ভ্রান্ত শাসকবর্গের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক বিবর্তনের মূলনীতি অনুসারে সমাজে এই ধরনের মানুষ যারা সন্তান উৎপাদন করে না, তাদের যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবার কথা নয়। যেখানে শিম্পাঞ্জির 'আলফা পুরুষ' তার ক্ষমতা ব্যবহার করে যত বেশি সম্ভব নারী শিম্পাঞ্জির সঙ্গে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং নিজে দলের অনেক বাচ্চা শিম্পাঞ্জির বাবায় পরিণত হয়, সেখানে ক্যাথলিক 'আলফা পুরুষ' (ক্যাথলিক পুরোহিত বা যাজক) সম্পূর্ণরূপে যৌন সংসর্গ এবং সন্তান প্রতিপালনের মতো বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকেন। কোনো পরিবেশগত কারণে (যেমন খাদ্যসংকট) যে তিনি সন্তান উৎপাদন থেকে নিজেকে বিরত রাখেন, এমনটা নয়। এমনটাও নয় যে কোনো জিনগত তারতম্যের কারণে তিনি এমনটা করতে বাধ্য হচ্ছেন। ক্যাথলিক চার্চ শত শত বছর হলো টিকে আছে– সেটা

বন্ধ্যত্বের জিন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তর করে নয়, বরং টিকে আছে খ্রিষ্টধর্মের নতুন নিয়ম (New Testament) এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আইনকানুন (Catholic Canon Law)-এর গল্প এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরের মাধ্যমে।

এইসব আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে, যেখানে আদিম মানুষের আচরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন হাজার হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত ছিল, সেখানে সেপিয়েন্সরা তাদের কল্পিত বাস্তবতার ধারণার সাহায্যে মাত্র এক কি দুই দশকের মধ্যে তাদের সমাজকাঠামো, তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন, তাদের অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালি এবং আরো অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আমূল বদলে দিতে পেরেছিল। বার্লিনের একজন অধিবাসীর কথা ধরা যাক। ধরি, তিনি ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করে মোটামুটি ১০০ বছর বেঁচে ছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেলমের হোহেনজোলেরন রাজ্যে (Hohenzollern Empire of Wilhelm II) তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করেছেন, তাঁর তারুণ্য এবং পরিণত বয়স কেটেছে উইমার প্রজাতন্ত্রে (Weimar Republic), হিটলারের শাসনাধীন জার্মান রাষ্ট্রে এবং পরে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানিতে। অবশেষে তিনি মারা গেলেন গণতান্ত্রিক এবং একীভূত জার্মানিতে। তিনি তাঁর জীবনকালে অনেকগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশীদার হলেন, পরিবর্তিত হলো তাঁর আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কের ধরন, যদিও পুরো সময় ধরে তাঁর জিনগত পরিচয় ছিল পুরোপুরি অপরিবর্তিত।

এই নতুন নতুন গল্প তৈরির মাধ্যমে দ্রুত বদলানোর ব্যাপারটিই ছিল সেপিয়েন্সদের সফলতার মূলমন্ত্র। একজন সেপিয়েন্সের সঙ্গে একজন নিয়ান্ডার্থালের সম্মুখযুদ্ধে সম্ভবত সেপিয়েন্সই পরাজিত হবে। কিন্তু, শত শত নিয়ান্ডার্থালের সঙ্গে শত শত সেপিয়েন্সের যুদ্ধ হলে সেখানে নিয়ান্ডার্থাল এর জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। নিয়ান্ডার্থালরা হয়তো সিংহ আসার সংকেত অন্যদের জানাতে পারত, কিন্তু তাদের পক্ষে গোত্রের রক্ষাকারী দেবতার গল্প বলা এবং সে গল্প পরিবর্তন করে আবার বলা অসম্ভব ছিল। গল্প বানাতে না পারার কারণে, ‘কল্পিত বাস্তবতা’ তৈরি করতে না পারার কারণে নিয়ান্ডার্থালদের

পক্ষে বড়ো গোষ্ঠী বা দল আকারে কাজ করা অসম্ভব ছিল এবং একই কারণে তারা দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের নিজেদের সামাজিক আচরণ বদলে ফেলতেও অসমর্থ ছিল।

যদিও কোনো নিয়ান্ডার্থালের মাথার ভেতর ঢুকে বোঝা সম্ভব না যে তারা কীভাবে চিন্তাভাবনা করত, তবু পরোক্ষ কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে সেপিয়েন্সদের তুলনায় তাদের বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা খানিকটা আঁচ করা যায়। কিছু প্রত্নতত্ত্ববিদ ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রে ৩০ হাজার বছর আগেকার সেপিয়েন্সদের বসতির জায়গাগুলোতে খননকাজ চালাবার সময় ঘটনাক্রমে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলের কিছু সামুদ্রিক ঝিনুকের সন্ধান পান। খুব সম্ভবত এই সামুদ্রিক ঝিনুকগুলো বিভিন্ন সেপিয়েন্স-গোষ্ঠীর মধ্যে দূরপাল্লার বাণিজ্যের ফলেই ইউরোপে আসে। নিয়ান্ডার্থালদের মধ্যে এরকম কোনো দূরপাল্লার ব্যবসায়-বাণিজ্যের নজির পাওয়া যায়নি। তাদের প্রতিটা গোষ্ঠী বা দল নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেরাই তৈরি করে নিত হাতের কাছের উপকরণ দিয়ে।[৪]

৬. ক্যাথলিকদের প্রধান পুরুষ নিজেকে সব রকম যৌন সম্পর্ক, সন্তান উৎপাদন ও লালনপালন থেকে বিরত রাখেন, যদিও এর পেছনে কোনো জিনগত কিংবা পরিবেশগত কারণ নেই।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আরেকটি উদাহরণের কথা ধরা যাক। নিউ গিনির উত্তর দিকে, নিউ আয়ারল্যান্ডের একটি দ্বীপে সেপিয়েন্সদের একটি গোষ্ঠী বসবাস করত। তারা আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা শীতল হয়ে তৈরি হওয়া 'অবসিডিয়ান' (Obsidian) নামের একপ্রকার আধাস্ফটিক পদার্থ (Volcanic Glass) দিয়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং ধারালো যন্ত্রপাতি তৈরি করতে জানত। নিউ আয়ারল্যান্ডে প্রাকৃতিকভাবে কোনো অবসিডিয়ানের মজুত থাকবার কথা নয়। ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় প্রমাণ মেলে যে তারা যেই ধরনের অবসিডিয়ান ব্যবহার করত তা ৪০০ কিলোমিটার দূরে নিউ ব্রিটেনের একটি দ্বীপ থেকে আনা। তার অর্থ এই নিউ আয়ারল্যান্ডের দ্বীপের কিছু লোক অবশ্যই দক্ষ নাবিক ছিল, যারা সঠিকভাবে দিঙ্‌নির্ণয় করে দূরের দ্বীপগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারত।[৫]

ব্যবসায়-বাণিজ্যকে একটি স্বাভাবিক দরকারি কাজ হিসেবেই মনে হতে পারে, যার জন্য কোনো কল্পনা বা কল্পিত গল্পের দরকার নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইতিহাসে সেপিয়েন্স বাদে আর কোনো প্রাণীর ব্যবসায়-বাণিজ্য করার কোনো নজির পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে যে, সেপিয়েন্সরা সেকালে এমন জিনিসেরই ব্যবসায় করত, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য নয় বরং যেসব দ্রব্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কেবল বানিয়ে তোলা গল্পের। দুজন লোকের মধ্যে ব্যবসায়ের জন্য দরকার পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। মানুষের স্বভাব হলো একজন অচেনা লোককে সে সহজেই বিশ্বাস করতে পারে না। সে কারণে দুজন অচেনা লোকের মধ্যে আস্থা তখনই গড়ে ওঠে যখন তারা দুজনই তৃতীয় কোনো কিছুর কল্পিত অস্তিত্বে বিশ্বাস করে অর্থাৎ একই 'কল্পিত বাস্তবতা'র অংশীদার হয়। আজকের দিনে দুনিয়াজোড়া চেনা, অচেনা এতসব মানুষের মধ্যে এত ধরনের ব্যবসায়ের ভিত্তি হলো 'ডলার', 'ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক' এবং 'সংস্থার পরিচয়বাহী ছবি বা লোগো'– এসবের কল্পিত অস্তিত্বে বিশ্বাস। আদিমকালেও ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই ছিল। যখন দুটো আদিম গোষ্ঠী বা দলের দুজন মানুষ একে অপরের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে চাইত তখন তাদের পারস্পরিক আস্থার ভিত্তি হতো একই ঈশ্বরে বা

একই কল্পিত পূর্বপুরুষে, একই গোত্রদেবতায় বা একই পবিত্র প্রাণীতে স্থাপিত বিশ্বাস।

যদি প্রাচীনকালের সেপিয়েন্সরা একই গল্পে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঝিনুক, অবসিডিয়ান– এসব নিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারে, তাহলে এটা কল্পনা করাও কঠিন নয় যে, তারা নানা রকম তথ্য বা কৌশলও একে অপরের সঙ্গে বিনিময় করত। এভাবে সেপিয়েন্সদের মধ্যে একটা নিবিড় এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যেটা নিয়ান্ডার্থাল বা তৎকালীন অন্য কোনো মানব প্রজাতির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ তো গেল ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা। শিকার-কৌশলের দিকে লক্ষ করলেও নিয়ান্ডার্থাল ও সেপিয়েন্সের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নিয়ান্ডার্থালরা মূলত একজন বা একটি ছোটো দল নিয়ে শিকার করতে বেরোত। অন্যদিকে সেপিয়েন্সরা ডজন ডজন মানুষ একসঙ্গে মিলে দল গঠন করে শিকার করত, এমনকি অনেক সময় তারা অন্য দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে নিয়েও শিকারে বেরোত। একটা শিকার-কৌশল সেপিয়েন্সদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। সেটা হলো– তারা সবাই মিলে গোল হয়ে একটি বড়ো আকারের পশুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাড়া করত। তারপর তাড়া করতে করতে কৌশলে তাকে নিয়ে যেত কোনো গিরিখাদে অথবা গর্তের কিনারায়। সেখানে নিরুপায় পশুকে তারা সবাই মিলে সহজেই শিকার করতে পারত। এভাবে সেপিয়েন্সরা বন্য ঘোড়ার মতো বড়ো বড়ো পশু শিকার করত। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে এক বিকেলের সমন্বিত প্রয়াসেই সেপিয়েন্সরা জমা করতে পারত টনকে টন মাংস, চর্বি আর চামড়া। এই বিশাল সংগ্রহ নিয়ে হয় তারা একরাতে হই-হুল্লোড় করে একটি জম্পেশ ভোজের আয়োজন করত অথবা শুকিয়ে, সেঁকে বা ঠান্ডা করে জমিয়ে রাখত সামনের দিনগুলোর জন্য। নৃতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে, এভাবে প্রতিবছর তারা অনেক বড়ো পশুর পুরো পালকেই হত্যা করত। এমনও অনেক জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেখানে সব পশুকে তাড়িয়ে এনে হত্যার করার জন্য তারা কৃত্রিম বেড়া বা অন্য কোনো ধরনের ফাঁদ তৈরি করেছিল।

আমরা এটা ধরেই নিতে পারি যে, নিয়ান্ডার্থালদের নিয়মিত শিকারের জায়গা সেপিয়েন্সরা কেড়ে নিয়ে যখন তাদের একচ্ছত্র কসাইখানায় পরিণত করল তখন নিয়ান্ডার্থালরা তাতে মোটেই খুশি হয়নি। আর আগের আলোচনা থেকেই আমরা এটা বুঝতে পারি যে, সেপিয়েন্সদের সঙ্গে নিয়ান্ডার্থালদের যুদ্ধ হলে সে যুদ্ধে নিয়ান্ডার্থালরা কার্যত বুনো ঘোড়ার থেকে শক্তিশালী কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে না। ৫০ জন নিয়ান্ডার্থালের দলের সঙ্গে ৫০০ জন সংঘবদ্ধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বুদ্ধিমান সেপিয়েন্সের লড়াইয়ে নিয়ান্ডার্থালদের টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আর যদি দুর্ঘটনাক্রমে সেপিয়েন্সরা প্রথমবার হেরেও যেত, তারা আবার জোটবদ্ধ হয়ে নিয়ান্ডার্থালদের হারানোর জন্য বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিকই নতুন নতুন কৌশল খুঁজে বের করতে পারত।

কী দিল এই বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব?

নতুন ক্ষমতা	দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
হোমো সেপিয়েন্সের নিজের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে অনেক তথ্য অন্যকে জানাবার ক্ষমতা।	কঠিন কঠিন কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। উদাহরণ– সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচা, বাইসন শিকার করা।
মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে অন্যকে আরো বেশি করে জানাবার ক্ষমতা।	মানুষের বড়ো বড়ো গোষ্ঠী, যেসব গোষ্ঠীর আকার ছিল সর্বোচ্চ ১৫০ জনের।
মানুষকে বাস্তবে অস্তিত্ব নেই এমন কিছুর কল্পিত গল্প বলতে পারার ক্ষমতা। যেমন– গোত্রের জিন-পরি-দেবতা-অপদেবতা, সীমিত দায়বদ্ধতার কোম্পানি ও মানবাধিকার।	১. চেনা-অচেনা মানুষের সমন্বয়ে অনেক বৃহদাকার মানবসংগঠনের উদ্ভব। ২. নানা রকম সামাজিক আচার-প্রথার উদ্ভব।

ইতিহাস ও জীববিজ্ঞান

এই অধ্যায়ে আমরা সেপিয়েন্সের তৈরি করা অনেক রকম 'কল্পিত বাস্তবতা'র উদাহরণ দেখেছি। এইসব কল্পিত বাস্তবতায় বিশ্বাস করা, বিশ্বাস না করা বা কিছু কিছু কল্পিত বাস্তবতাকে বিশ্বাস এবং কিছু কিছুকে অবিশ্বাস করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে নানা রকম আচরণগত বৈচিত্র্যের জন্ম দেয়। বিভিন্ন মানুষের মধ্যকার এই আচরণগত বৈচিত্র্যই 'সংস্কৃতি'র মূল উপাদান। সংস্কৃতির সূচনা হওয়ার পর থেকেই এর ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে, বাড়ছে উৎকর্ষ। সংস্কৃতির এই বিরতিহীন পরিবর্তনের আখ্যানই হলো 'ইতিহাস'।

সুতরাং, এটা বলা যায়, বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবই হলো সময়ের সেই বিন্দু যেই বিন্দুতে ইতিহাস জীববিজ্ঞানের গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের আগেকার সব মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা ছিল কেবল জীববিজ্ঞানের আওতাভুক্ত, অনেকে এই সময়কালকে প্রাগৈতিহাসিক পর্বও বলে থাকেন (কিন্তু, আমার 'প্রাগৈতিহাসিক' কথাটার ব্যাপারে একটু আপত্তি আছে, এই কথাটা এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে যে, বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের আগেও মানুষের একটি ইতিহাস ছিল যা অন্য প্রাণীদের থেকে স্বতন্ত্র)। এই বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন ও বিকাশ ব্যাখ্যা করার জন্য জীববিজ্ঞানের তত্ত্বের থেকে মূলত ইতিহাসের বয়ানই বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। খ্রিষ্টধর্মের উত্থান বা ফরাসি বিপ্লবকে বোঝার জন্য কেবল জীববিজ্ঞানের আওতাধীন বিভিন্ন জিনের আন্তসম্পর্ক, হরমোন বা মানুষের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট নয়। বরং এসব বোঝার জন্য সে সময়কার মানুষের বিভিন্নরকম চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা এবং তাদের কল্পিত আদর্শ সমাজ কেমন ছিল সেসব সম্পর্কে ধারণা রাখা অত্যাবশ্যক।

এ কথার মানে এই নয় যে, হোমো সেপিয়েন্স এবং তাদের সংস্কৃতি জীববিজ্ঞানের নিয়মকানুন মেনে চলে না। যতকিছুই হোক, দিনশেষে আমরাও কেবল একপ্রকার প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নই এবং আমাদের শারীরিক, মানবিক এবং বুদ্ধিভিত্তিক দক্ষতা অনেকাংশেই নির্ভর করে আমাদের ডিএনএর ওপর। আমাদের সমাজের গঠনগত

উপাদান এবং নিয়ান্ডার্থাল বা শিম্পাঞ্জিদের সমাজের গঠনগত উপাদানের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যই নেই। যতই বেশি আমরা এসব গঠনগত উপাদান সম্পর্কে জানব, ততই এ কথা আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে, অনুভূতি, আবেগ এবং পারিবারিক বন্ধনের কথা বিবেচনা করলে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য নরবানর (Ape) প্রজাতির তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

সে কারণে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গণ্ডিতে অন্যান্য নরবানরের প্রজাতির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য খুঁজতে যাওয়াটা একরকম বোকামি। যদি একজন মানুষের সঙ্গে একজন শিম্পাঞ্জির তুলনা করা হয় বা ১০ জন মানুষের সঙ্গে ১০ জন শিম্পাঞ্জির তুলনা করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি চোখে পড়বে। বড়ো ধরনের পার্থক্য তখনই বোঝা যাবে, যখন আমরা ১৫০ বা তার থেকে বেশিসংখ্যক একটি মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে সমসংখ্যক শিম্পাঞ্জি বা অন্য কোনো নরবানর প্রজাতির তুলনা করব। যখন সংখ্যাটা ১ হাজার থেকে ২ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে তখন পার্থক্যের পরিমাণটা হবে আকাশছোঁয়া। কয়েক হাজার শিম্পাঞ্জিকে যদি শাহবাগের মোড়ে, তিয়ানানমেন স্কয়ারে, ওয়াল স্ট্রিটে, ভ্যাটিক্যান নগরে বা জাতিসংঘের সদও দপ্তরে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের সম্মিলিত চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি আর বিশৃঙ্খলায় সমস্ত এলাকাটা তছনছ হয়ে যাবে মুহূর্তেই। অথচ, হাজার হাজার মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রতিনিয়ত এসব জায়গায় জড়ো হয়। অনেকজন মিলে তারা সুশৃঙ্খল হয়ে থাকতে পারে, সবাই মিলে একটি এলাকাকে পরিণত করতে পারে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে, জাঁকজমক করে পালন করতে পারে কোনো উৎসব বা অংশ নিতে পারে কোনো রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে। একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হয়ে এমন অনেক কিছু করতে পারে, যেগুলো একা একা তাদের পক্ষে করা কখনোই সম্ভব হতো না। সুতরাং, শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার পার্থক্য হলো বানিয়ে বানিয়ে বলা সেইসব কল্পিত গল্পের এবং সেইসব কাল্পনিক বিশ্বাসের, যা অনেকগুলো মানুষকে একসুতোয় বেঁধে রাখে– কখনো সেই সুতোটা হয় একটি জাতি, কখনো ধর্ম, কখনো পরিবার, কখনো অন্য কোনো

প্রতিষ্ঠান। এই কাল্পনিক বিশ্বাসের অদৃশ্য সুতোই মানুষকে দিয়েছে সব সৃষ্টির ওপর মানুষের অগাধ প্রভুত্ব।

অবশ্যই বানিয়ে বানিয়ে গল্প তৈরি করা ও তাতে বিশ্বাস করে বড়ো বড়ো দল গঠন করতে পারা ছাড়াও মানুষের আরো অনেক যোগ্যতা আছে; যেমন বুদ্ধি খাটিয়ে নানা রকম যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি তৈরি করা এবং সেসব ব্যবহার করতে শেখা। কিন্তু, নানা রকম যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি তৈরির বুদ্ধি তেমন কোনো ফল দিত না, যদি অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে কাজ করতে সক্ষম না হতো। যেখানে ৩০ হাজার বছর আগে মানুষের হাতে পাথরের তৈরি বর্শা ছাড়া আর তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, সেখানে এখন মানুষের হাতে আছে আন্তমহাদেশীয় নিউক্লিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র। শারীরিকভাবে গত ৩০ হাজার বছরে যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যাপারে মানুষের দক্ষতা বা বুদ্ধির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের শারীরিক শক্তি একজন আদিম শিকারি মানুষের থেকে কমই হওয়ার কথা। শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা একই রকম থাকলেও এই সময়কালের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো মানুষ এমনকি অচেনা অনেকগুলো মানুষ মিলেও একসঙ্গে কাজ করার প্রবণতা বিস্ময়করভাবে বেড়েছে। আদিমকালের একজন মানুষ কয়েক মিনিটে নিজে নিজেই একটি পাথরের বর্শা তৈরি করত। হয়তো তৈরি করার সময় সে আশপাশের দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করত। আর এখনকার একটি নিউক্লিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করা চেনা-অচেনা লাখ লাখ লোককে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। এদের মধ্যে খনি থেকে ইউরেনিয়াম তোলা শ্রমিক থেকে শুরু করে পরমাণুর ভেতরের কণিকাগুলোর মধ্যকার আন্তসম্পর্ক নিয়ে কঠিন কঠিন গাণিতিক সমীকরণ লেখা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীও আছেন।

বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর জীববিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যকার সম্পর্ককে আমরা সংক্ষেপে এভাবে বলতে পারি–

- জীববিজ্ঞান মানুষের আচরণ এবং ক্ষমতার মূল সূত্রগুলো নির্ধারণ করে দেয়। ইতিহাসের সমস্ত খেলা জীববিজ্ঞানের বেঁধে দেওয়া এসব নিয়মকানুনের গণ্ডির মধ্যেই আবর্তিত হয়।

- যেহেতু, জীববিজ্ঞানের এই বেঁধে দেওয়া গণ্ডির পরিসর বিশাল, মানুষ এখানে সহজেই নানা স্বাদের, বিচিত্র নিয়মের খেলা খেলতে পারে। মানুষের গল্প বানানোর ক্ষমতা আছে, মানুষ গল্প শুনতে এবং নানান লোক নানা রকম গল্পে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। সে কারণে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গল্প বানানোর ও তা বলার এই প্রবণতা চলতে থাকে। কখনো একই গল্প নতুন করে নতুন সময়ে বলা হয়, কখনো তৈরি হয় নতুন গল্পের।
- সুতরাং, মানুষের আচরণের প্রকৃতি বুঝতে হলে, আমাদেরকে তাদের কার্যপ্রণালি অতীত থেকে কীভাবে বিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে সেই ইতিহাসটা জানতে হবে। শুধু জীববিজ্ঞানের নিয়মকানুন থেকে মানুষের আচরণ বোঝার চেষ্টা হবে অনেকটা রেডিওতে ক্রিকেটের ধারাবর্ণনাকারীর মতো– যে মাঠে প্রতিটি খেলোয়াড় কখন কী করছে তা উহ্য রেখে প্রতি বলে কত রান হলো, কোথায় বলের অবস্থান এসব বলতে থাকে।
- আমাদের প্রস্তরযুগের পূর্বপুরুষেরা কী ধরনের খেলা খেলত? আমাদের জানামতে, যারা ৩০ হাজার বছর আগে স্ট্যাডেল গুহায় সিংহমানবের মূর্তি বানিয়েছিল তাদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা মোটামুটি আমাদের মতোই ছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তারা কী করত? কী খেত তারা সকালের নাশতায় বা দুপুরের খাবারে? কেমন ছিল তাদের সমাজ? তাদের সময় কি একটা বিয়ের চল ছিল নাকি অনেকগুলো বিয়ের? তাদের কি উৎসব-পার্বণ ছিল, ছিল মানবিকতা-মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় রীতিনীতি? তারা কি যুদ্ধ করত? তারা কি জানত, যুদ্ধ কাকে বলে?

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সময়ের ধুলোপড়া পর্দার আড়ালে এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। বোঝার চেষ্টা করব বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকে কৃষিবিপ্লবের আগ পর্যন্ত কেমন ছিল মানুষের জীবনযাপন।

অধ্যায় ৩

আদম-হাওয়ার দিনলিপি

আমরা যদি নিজেদের স্বরূপ, ইতিহাস ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একটা ভালোরকম ধারণা পেতে চাই, তাহলে আগে আমাদের শিকারি পূর্বপুরুষদের চিন্তার জগৎটা সম্পর্কে অবশ্যই ভালোভাবে জানতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে হোমো সেপিয়েন্সরা শিকারি হিসেবেই বসবাস করেছে! একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, এই যে দলে দলে মানুষের ক্রমাগত শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা, শ্রমিক বা চাকরিজীবী হয়ে শহরে জীবনযাপন করার সংস্কৃতি– এসব কিন্তু মাত্র সেদিনের কথা। বড়োজোর ২০০ বছর হবে। তারও আগের ১০ হাজার বছর তারা কৃষিকাজ ও খেত-খামারে কাজ করেই কাটিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, সেপিয়েন্সের অনেক অনেক দিন ধরে চলে আসা শিকারি জীবনের সময়কালের সঙ্গে তুলনা করলে এই কৃষিকাজ ও শহুরে জীবনযাপনের প্রায় ১০ হাজার ২০০ বছরের সময়কাল নেহাত একটা মুহূর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়!

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার থেকে আমরা জানতে পারি, আমাদের এখনকার সামাজিক আচার-আচরণ এবং মানসিক প্রবণতার অনেক কিছুই আসলে তৈরি হয়েছিল কৃষিভিত্তিক সমাজেরও আগের সেই লম্বা সময়টাতে। এমনকি আজও, এসব বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক ও শরীর উভয়ই আসলে অভিযোজিত হয়েছে শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের জন্য। আমাদের এখনকার খাদ্যাভ্যাস, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব কিংবা আমাদের যৌনতা– এসবই আসলে গড়ে উঠেছে শিল্পবিপ্লবের পর

থেকে গড়ে ওঠা উত্তরাধুনিক পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আমাদের শিকারি মনের নিয়ত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী এই নতুন পরিবেশ ছিল বড়ো বড়ো শহর, বিমান, টেলিফোন আর কম্পিউটারে ভরপুর। এই পরিবেশ আমাদের আরো বেশি বস্তুগত সম্পদ দিয়েছে, দীর্ঘায়িত জীবন দিয়েছে, যা আমরা সেই আগেকার জীবনে পাইনি। কিন্তু একই সঙ্গে এই পরিবর্তিত পরিবেশ আমাদের দিয়েছে একাকিত্ব, হতাশা এবং নানা ধরনের মানসিক চাপ। কেন এমন হলো সেটা বুঝতে হলে, আমাদের সেই শিকারি জীবনের আরো গভীরে যেতে হবে, যে জীবন আমরা এখনো যাপন করি আমাদের অবচেতনে।

একটা সহজ উদাহরণ দেখা যাক। আমরা জানি, খাবারের অতিরিক্ত ক্যালরি আমাদের কোনো উপকারে তো আসেই না, বরং ক্ষতি করে। কিন্তু এটা জানার পরও আমরা ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার লোভ সামলাতে পারি না। এদিকে এই লোভের কারণে শারীরিক স্থূলতা প্রায় মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে আজকের উন্নত দেশগুলোতে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে। যদি আমরা আমাদের শিকারি পূর্বপুরুষদের খাদ্যাভ্যাসটা ভালো করে খেয়াল না করি, তাহলে এই বেশি বেশি মিষ্টি ও চর্বিযুক্ত খাবারের প্রতি আমাদের লোভের কারণটা একটা রহস্যই থেকে যাবে। যেসব তৃণভূমি কিংবা জঙ্গলে তারা বসবাস করত, সেখানে খাবার ছিল অল্প। বিশেষ করে মিষ্টিজাতীয় (শর্করাসমৃদ্ধ) খাবার তো খুবই অল্প। ৩০ হাজার বছর আগের একজন সাধারণ শিকারির একমাত্র যে মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার সুযোগ ছিল তা হলো পাকা ফলমূল। এই কারণেই প্রস্তরযুগের একজন নারী চলতে চলতে হঠাৎ কোনো ফলে ভরা ডুমুরগাছ দেখতে পেলে মোটেই দেরি না করে তৎক্ষণাৎ যতখানি সম্ভব ডুমুরের ফল খেয়ে ফেলত। কারণ সে জানত, দেরি করলে এলাকার বেবুনের দল সেই গাছটা উজাড় করে ফেলবে। সেই সময় থেকে, বেশি ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রতি লোভ আমাদের একদম মজ্জাগত। আজ হয়তো বাস্তবে আমরা সুউচ্চ ভবনে থাকি, আমাদের ফ্রিজ ভর্তি খাবারদাবার থাকে, কিন্তু আমাদের ডিএনএ এখনো মনে করে আমরা তৃণভূমিতেই আছি। এই

কারণেই আমরা এখন এক বাক্স আইসক্রিম এক নিমেষে খেয়ে ফেলতে পারি, এমনকি সঙ্গে একটা বড়োসড়ো কোকাকোলাও!

এই লোভী জিন (Gorging Gene) তত্ত্ব সর্বজনীনভাবে গৃহীত। এ ব্যাপারে আরো কিছু তত্ত্ব আছে কিন্তু সেগুলো বেশ তর্কসাপেক্ষ। যেমন, কিছু কিছু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী বলেন, প্রাচীন গোষ্ঠীগুলো আসলে একবিবাহের রীতিতে তৈরি ছোটো ছোটো পরিবার দিয়ে গঠিত ছিল না বরং শিকারিরা এমন এক সমাজে বসবাস করত যেখানে ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে কিছু ছিল না। সেখানে একবিবাহ কিংবা পিতৃত্বের ধারণাটাই ছিল না! এরকম একটা গোষ্ঠীতে একজন নারী একইসঙ্গে একাধিক পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হতে পারত এবং পুরো গোষ্ঠীর সব প্রাপ্তবয়স্করাই সব ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্বটা নিত। যেহেতু কোনো পুরুষই নির্দিষ্ট করে জানত না কোন শিশুটি আসলে তার, তাই তারা সব শিশুর প্রতিই সমান গুরুত্ব দিত।

মানুষের ক্ষেত্রে এরকম একটা সামাজিক কাঠামো আপাতদৃষ্টিতে আজগুবি মনে হলেও অন্যান্য অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। প্রাণিজগতে আমাদের খুব কাছের আত্মীয় শিম্পাঞ্জি কিংবা বোনোবোর মধ্যেও এই রীতি দেখা যায়। এমনকি, এখনো একাধিক মানবসমাজ আছে, যেখানে যৌথ বা গোষ্ঠীগত পিতৃত্বের চর্চা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বারি ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের (Barí Indians) কথা বলা যায়। এ সম্প্রদায়ের লোকজন বিশ্বাস করে, একটিমাত্র পুরুষের শুক্রাণু থেকে আসলে একটি শিশুর জন্ম হয় না বরং তা হয় নারীর গর্ভে অনেকগুলো পুরুষের শুক্রাণুর পুঞ্জীভূত হওয়ার মাধ্যমে। এই কারণে একজন সচেতন মা হয়তো বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে যুক্ত হওয়াটা উপযুক্ত মনে করেন, বিশেষ করে যখন তিনি গর্ভবতী। তিনি চান তার সন্তান যেন শুধু সেরা শিকারিই নয় বরং সঙ্গে সঙ্গে সেরা গল্প বলিয়ে, শক্তিশালী যোদ্ধা ও স্নেহময় প্রেমিকের গুণাবলিও পায়। এটা যদি খুব অদ্ভুত শোনায়, তাহলে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো– আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের বিকাশের আগ পর্যন্ত কিন্তু মানুষের কাছে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ ছিল

না যে, একটি শিশু সব সময় একজনমাত্র পিতার ঔরসেই জন্মায়, অনেকজনের নয়।

এই 'প্রাচীন বহুগামী সমাজে'র ধারণার প্রস্তাবকদের মতে, আমাদের আধুনিক একবিবাহভিত্তিক সমাজে বৈবাহিক সম্পর্কের যে টানাপোড়েন, দাম্পত্য কলহ, অনাস্থা ও বিবাহবিচ্ছেদের উচ্চ হার এবং সেই সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে যে নানা ধরনের মানসিক জটিলতা তৈরি হচ্ছে সেসবের অন্যতম কারণ হলো মানুষকে একটিমাত্র সঙ্গীর সঙ্গে ছোটো পরিবারে বসবাস করতে বাধ্য করা, যেটা তার দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক সত্তার সঙ্গে একেবারেই মেলে না।[১]

অবশ্য অনেক বিশেষজ্ঞই প্রবলভাবে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁদের যুক্তি হলো, একবিবাহ ও ছোটো ছোটো পরিবার আসলে একেবারেই সাধারণ মানবিক আচরণ। যদিও এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন শিকারি মানুষেরা এখনকার আধুনিক মানুষের তুলনায় ঢের বেশি গোষ্ঠীবদ্ধ ও সাম্যে বিশ্বাসী ছিল, তার পরও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, তাদের গোষ্ঠীগুলো এখনকার মতোই এককেটি ঈর্ষাকাতর দম্পতি ও তাঁদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে গঠিত ছোটো ছোটো পরিবারের সমন্বয়েই গড়ে উঠত। এই কারণেই একবিবাহ ও ছোটো পরিবারের চর্চা এখনকার বেশিরভাগ সংস্কৃতিতেই দেখা যায়। নারী-পুরুষ উভয়েই যে তার সঙ্গীর ওপর খুব অধিকার খাটাতে চায় সে কারণটাও ভিন্ন নয়। বলা বাহুল্য, এই ছোটো পরিবারের চর্চার সঙ্গে গোষ্ঠীর নেতৃত্বের উত্তরাধিকারের একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে সেই আদিকাল থেকেই। আর সেটাই, এমনকি আজও, বিভিন্ন আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিবারতন্ত্রের রূপে দেখা যায়। উত্তর কোরিয়া কিংবা সিরিয়া তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে।

নানা রকম তত্ত্বের মধ্যে এইসব বিরোধ মেটানোর জন্য এবং আমাদের যৌনতা, সমাজ ও রাজনীতিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন যাপন সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানাটা বেশ জরুরি। আর সেটা জানলেই আমরা বুঝতে পারব কীভাবে সেপিয়েন্স প্রজাতি সেই ৭০ হাজার বছর আগের বুদ্ধিভিত্তিক

বিপ্লবের সময় থেকে বিকশিত হয়ে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে কৃষিবিপ্লবের সূচনা করল।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের শিকারি পূর্বপুরুষদের জীবনের খুব অল্প কিছু বিষয় সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। সেই 'প্রাচীন বহুগামী সমাজ' কিংবা 'গোড়া থেকেই একবিবাহ' তত্ত্বের মধ্যকার বিতর্কও আসলে নেহাতই কিছু নড়বড়ে সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে সেই শিকারি যুগের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদরাও প্রমাণ বলতে যা-কিছু পান সেগুলো মূলত কিছু ফসিল কিংবা পাথরের হাতিয়ার। পচনশীল জিনিস দিয়ে তৈরি কোনো দ্রব্যসামগ্রী, যেমন– কাঠ, বাঁশ কিংবা চামড়ার তৈরি জিনিসপত্র শুধু বিশেষ পরিবেশেই অক্ষত থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এরকম পচনশীল জিনিসের কোনো নমুনা প্রায় নেই বললেই চলে। এসব একপেশে প্রত্নতত্ত্বীয় প্রমাণাদির কারণেই সাধারণভাবে আমাদের মনে হয়, কৃষিভিত্তিক সমাজের আগে বুঝি মানুষ পাথরের যুগে বসবাস করত। এই ধারণাটা ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই আসলে বেশি। যেটাকে আমরা 'প্রস্তরযুগ' বলে জানি সেটাকে আসলে বলা উচিত 'কাঠের যুগ' (Wood Age)। কারণ শিকারি মানুষদের বেশিরভাগ হাতিয়ারই সম্ভবত কাঠের তৈরি ছিল।

এখানে আমরা বারবার 'সম্ভাবনা' শব্দটা ব্যবহার করছি। এর কারণ, মানুষের শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের সময়কালের যেসব প্রমাণ আমরা পাই সেগুলো থেকে সে সময়ের মানুষদের জীবনযাপনের গল্পটা নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করা আসলে খুবই দুরূহ ব্যাপার। সেই শিকারিদের সঙ্গে তাদের উত্তরাধিকারীদের (যারা কিনা কৃষি কিংবা শিল্পভিত্তিক সমাজে বসবাস করত) একটা পার্থক্যই খুব স্পষ্টত দৃশ্যমান। সেটা হলো, শিকারি মানুষদের কাছে শুরুতে খুব অল্পসংখ্যক হাতে তৈরি জিনিস ছিল। এটা বেশ বড়ো একটা প্রভাব ফেলেছিল তাদের জীবনে। আধুনিক সচ্ছল সমাজের একজন মানুষ তার সম্পূর্ণ জীবদ্দশায় প্রায় লক্ষাধিক জিনিস ব্যবহার করে। গাড়ি-বাড়ি থেকে শুরু করে ন্যাকড়া কিংবা দুধের বয়াম– এ রকম অজস্র জিনিস। আমাদের এমন কোনো কর্মকাণ্ড, বিশ্বাস কিংবা অনুভূতি

পাওয়া যাবে না, যার সঙ্গে আমাদের নিজেদের তৈরি কোনো জিনিসের সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, শুধু আমাদের খাওয়াদাওয়ার জন্যই যে আমরা কত বিভিন্ন রকম জিনিস ব্যবহার করি ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। চামচ থেকে শুরু করে কাপ-পিরিচ কিংবা জিন প্রকৌশল গবেষণাগার, এমনকি বিশালাকার জাহাজ সবই আমরা ব্যবহার করেছি। খেলাধুলার জন্যও আমরা একগাদা খেলনা ব্যবহার করি, প্লাস্টিক কার্ড থেকে শুরু করে লক্ষাধিক লোকের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন স্টেডিয়াম– সবই লাগে আমাদের। আমাদের প্রণয়ের কিংবা যৌন সম্পর্কগুলোও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় আংটি, বিছানা, সুন্দর জামাকাপড়, যৌনাবেদনময় অন্তর্বাস, কনডম, কেতাদুরস্ত রেস্টুরেন্ট, সস্তা মোটেল, এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ, কমিউনিটি সেন্টার কিংবা খাদ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ধর্মগুলো আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক জগৎকে নিয়ে আসে; সেটাও আবার খ্রিষ্টানদের চার্চ, মুসলমানদের মসজিদ, হিন্দুদের আশ্রম, নানান পবিত্র গ্রন্থ, তিব্বতের প্রার্থনা-চাকা, পুরোহিতের বিশেষ পোশাক, মোমবাতি, আগরবাতি, ক্রিসমাস ট্রি, বিশেষ খাবার, সমাধিসৌধ আর নানান রকম চিহ্নের মাধ্যমে।

আমরা আসলে খেয়ালই করি না আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে আমরা কী বিপুল পরিমাণ জিনিস ব্যবহার করি। যখন আমাদের বাসা বদলাতে হয় তখন আমরা ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু আমাদের শিকারি পূর্বপুরুষেরা কখনো এক জায়গায় বেশি দিন থাকত না। তারা প্রায় প্রতি মাসে কিংবা সপ্তাহে বাসা বদলাত, এমনকি মাঝে মাঝে তো প্রতিদিন! দরকারি জিনিসপাতিগুলো তারা কাঁধে করে নিয়ে যেত। তখন তো আর কোনো কোম্পানি ছিল না কিংবা মজুরও ছিল না যে তাদের জন্য এসব বয়ে নিয়ে যাবে। এমনকি তাদের গাধাও ছিল না ভার বওয়ার জন্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের খুব সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দিয়েই দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিতে হতো। সুতরাং এটা মনে করলে খুব একটা ভুল হবে না যে, তাদের মানসিক, ধর্মীয় কিংবা সামাজিক জীবনের একটা বড়ো অংশ কোনো রকম হাতে তৈরি জিনিস ছাড়াই চলে যেত। আজ থেকে ১ লাখ বছর পরের কোনো এক প্রত্নতত্ত্ববিদ

হয়তো একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ থেকে পাওয়া জিনিসপত্র দিয়ে আমাদের এই সময়ের মুসলমানদের জীবনযাপনের গল্পটা মোটামুটি ভালোই আঁচ করতে পারবেন। কিন্তু আমরা আসলে আমাদের শিকারি পূর্বপুরুষদের সামাজিক বিশ্বাস বা রীতিনীতির ধারণা পাওয়ার ব্যাপারে তেমন একটা সুবিধা করতে পারিনি। ভবিষ্যতের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদও হয়তো এরকমই সমস্যায় পড়বেন। তিনি হয়তো একুশ শতকের একজন তরুণের মনস্তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করবেন শুধু টিকে থাকা কিছু কাগজে লেখা চিঠির মাধ্যমে, কারণ ততদিনে হয়তো তাদের টেলিফোনের কথোপকথন, ইমেইল, ব্লগ কিংবা টেক্সট মেসেজ– কোনো কিছুরই হদিস পাওয়া যাবে না।

সুতরাং আমরা যদি শুধু হাতে তৈরি জিনিস থেকেই শিকারি মানুষের জীবন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি, সেটা বড্ড একপেশে একটা গল্প হবে। অন্য একটা উপায় হতে পারে আজকের শিকারি জনগোষ্ঠীদের দিকে তাকানো। প্রত্নতত্ত্বীয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের ব্যাপারে সরাসরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এই আধুনিক শিকারি সমাজের জীবন থেকে প্রাচীন শিকারি সমাজের জীবন সম্পর্কে অনুমান করতে গেলেও খুব সতর্ক হওয়ার অনেক কারণ আছে।

প্রথমত, যেসব শিকারি জনগোষ্ঠী এখনো টিকে আছে তারা তাদের আশপাশের কৃষিভিত্তিক কিংবা শিল্পভিত্তিক সমাজের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের এখনকার বাস্তবতার সঙ্গে হাজার হাজার বছর আগের বাস্তবতার মিল খুঁজতে যাওয়াটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

দ্বিতীয়ত, এখনকার শিকারি জনগোষ্ঠীগুলো টিকে আছে মূলত বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশে, যেখানে কৃষিকাজ বেশ কঠিন বা অসম্ভব। যেসব গোষ্ঠী দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমির মতো এরকম প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে, তারা আসলে অপেক্ষাকৃত অনেক উর্বর ইয়েংজি নদীর তীরের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারবে না। বিশেষ করে বলতে গেলে, কালাহারি মরুভূমির তুলনায় প্রাচীন ইয়েংজি নদীর আশপাশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল অনেক বেশি। আর সেই সময়ের গোষ্ঠীগুলোর আকার এবং তাদের

ভেতরকার সম্পর্কগুলোকে বোঝার জন্য এই ধরনের তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, প্রাচীন শিকারি গোষ্ঠীগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, একেকটা গোষ্ঠী অন্য একটা গোষ্ঠী থেকে অনেকটাই আলাদা। তারা যে শুধু পৃথিবীর একেক এলাকায় একেক রকম তা-ই নয় বরং একই এলাকাতেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কথা। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা যখন প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছান, সেখানকার আদিবাসীদের মধ্যে তারা ব্যাপক বৈচিত্র্যের সন্ধান পান। ব্রিটিশদের দখলের কিছু আগেও এ অঞ্চলে ২০০ থেকে ৬০০ উপজাতিতে প্রায় ৩ লাখ থেকে ৭ লাখের মাঝামাঝি সংখ্যক শিকারি বসবাস করত, যাদের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার একাধিক গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে।[২] প্রত্যেকটা উপজাতিরই নিজেদের মতো ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতি ছিল। এখনকার দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া বা অ্যাডিলেডের কাছাকাছি তখন বসবাস করত কিছু পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী। এসব গোষ্ঠী মিলে ছিল একটা উপজাতি যেটা কিনা ভৌগোলিক সীমারেখার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। উলটো দিকে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার দিকের উপজাতিগুলো আবার মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাসী ছিল। সেখানে একজন ব্যক্তির পরিচয় তার টোটেম দিয়ে হতো, ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে নয়। টোটেম হলো একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র প্রতীক। মূলত অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর আমেরিকার উপজাতিদের মধ্যে পশুপাখির আদলে এই প্রতীক নির্বাচনের প্রচলন ছিল।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীন শিকারি মানুষদের মধ্যে ব্যাপক নৃতাত্ত্বিক কিংবা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ছিল। কৃষিবিপ্লবের সময়ে যে ৫০ থেকে ৮০ লাখ শিকারি মানুষেরা বসবাস করত তারা হাজারটা আলাদা আলাদা ভাষা আর সংস্কৃতি নিয়ে হাজারটা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত ছিল।৩ এটা আসলে বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের অন্যতম বড়ো অর্জন। এজন্য মানুষের কল্পনাশক্তিকে ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় নেই। এই কল্পনাশক্তির কারণেই একই রকম পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে একই রকম শারীরবৃত্তীয় গঠনের মানুষগুলোও সম্পূর্ণ আলাদা কাল্পনিক বাস্তবতায় বসবাস করতে

পারত। আর তার ফলেই আসলে তাদের মধ্যে আলাদা আলাদা সামাজিক আচার কিংবা রীতিনীতি তৈরি হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, আজকের অক্সফোর্ড আর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যে জায়গায় অবস্থিত, ৩০ হাজার বছর আগে সেই দুই জায়গার মানুষ হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা ভাষায় কথা বলত। একটা গোষ্ঠী হয়তো ছিল খুব যদ্ধংদেহী, অন্যটা হয়তো-বা বেশ শান্তিপ্রিয়। এমনও হতে পারে, ক্যামব্রিজ গোষ্ঠী হয়তো ছিল গোষ্ঠীগত সমাজে বিশ্বাসী আর অক্সফোর্ড গোষ্ঠী হয়তো ছোটো ছোটো পরিবারে বিভক্ত। ক্যামব্রিজের লোকেরা হয়তো তাদের দেবতাদের মূর্তি তৈরি করত কাঠে খোদাই করে আর অক্সফোর্ডের লোকেরা হয়তো পূজা করত নৃত্যের মাধ্যমে। প্রথম দলটা হয়তো পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত আর অন্যরা হয়তো ভাবত এইসব গাঁজাখুরি গল্প। কোনো একটা সমাজে হয়তো সমকামিতাকে মেনে নেওয়া হতো যেখানে অন্যটায় তা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ।

অন্য কথায়, যদিও আধুনিক শিকারিদের ওপর নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ আমাদের প্রাচীন শিকারিদের সম্ভাব্য জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বাস্তবতার সম্ভাব্য জগৎটা আরো বিস্তৃত যার বেশিরভাগই আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়ে গেছে। হোমো সেপিয়েন্সের প্রাকৃতিক জীবনধারণ-পদ্ধতি নিয়ে যত জমজমাট বিতর্ক সেগুলোর সবগুলোতেই এই সত্যটা অনুপস্থিত। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকে সেপিয়েন্সের কোনো একটিমাত্র প্রাকৃতিক জীবন ধারণ পদ্ধতি ছিল না। ছিল অসংখ্য বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সম্ভার থেকে কোনো একটিকে আপন করে নেওয়ার সুযোগ।

প্রকৃত প্রাচুর্যময় সমাজ

কৃষিপূর্ব সমাজ সম্পর্কে তাহলে আমরা কী রকম সর্বজনীন ধারণা পেলাম? তখনকার সমাজের বেশিরভাগ সদস্যই হয়তো কয়েক ডজন থেকে কয়েক শ সদস্যের ছোটো ছোটো উপজাতিতে বসবাস করত। বলা বাহুল্য, এইসব উপজাতির সব সদস্যই ছিল মানুষ। এই শেষ

কথাটা খেয়াল করাটা জরুরি। সাধারণভাবে এটা মনে হতে পারে যে, সমাজ তৈরি হবে মানুষ নিয়ে– এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যায়, কৃষি কিংবা শিল্পভিত্তিক সমাজ কেবল মানুষ নিয়ে গঠিত নয় বরং এইসব সমাজ গড়ে উঠেছে মূলত মানুষ ও কিছু গৃহপালিত জীবজন্তুর সমন্বয়ে। অবশ্যই তারা তাদের প্রভুদের সমকক্ষ বা তাদের সমান মর্যাদার নয়, কিন্তু তার পরও তারা এখনকার সমাজের অনিবার্য সদস্য। উদাহরণস্বরূপ, আজকের 'নিউজিল্যান্ড' নামের সমাজটা প্রায় ৪৫ লাখ সেপিয়েন্স আর প্রায় ৫ কোটি ভেড়ার সমন্বয়ে গঠিত!

'কৃষিপূর্ব সমাজের গোষ্ঠীগুলো কেবল মানুষের সমন্বয়ে গঠিত'– এই সাধারণ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল কুকুর। কুকুরই আসলে হোমো সেপিয়েন্সের পোষ মানানো প্রথম গৃহপালিত পশু। ঘটনাটা ঘটেছিল কৃষিবিপ্লবেরও আগে। বিশেষজ্ঞরা নির্দিষ্ট দিন-তারিখের ব্যাপারে যদিও একমত হতে পারেন না, কিন্তু ১৫ হাজার বছর আগেও যে গৃহপালিত কুকুরের অস্তিত্ব ছিল সে কথা নিশ্চিতভাবেই জানা যায়। এমনও হতে পারে, তারা হয়তো আরো হাজারখানেক বছর আগে থেকেই মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেছে।

কুকুরকে সেই সময়ে অনেকভাবে কাজে লাগানো হতো। যেমন, তারা শিকারের কাজে সাহায্য করতে পারত। আবার তাদেরকে বন্য পশু কিংবা অন্য মানুষের আক্রমণ সম্পর্কে আগেভাগে জানার জন্য সতর্ক সংকেতের মতোও কাজে লাগানো যেত। প্রজন্মান্তরে, মানুষ ও কুকুর এই দুটি প্রজাতি সহ-বিবর্তনের* মাধ্যমে নিজেদের বোঝাপড়ার অনেক উন্নতি করে ফেলল। যেসব কুকুর তাদের প্রভুর প্রয়োজন কিংবা অনুভূতির ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল তারা একটু বাড়তি খাবার ও আদর-যত্ন পেতে লাগল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের

---

* জীববিজ্ঞানে সহ-বিবর্তন বলতে বোঝায়– 'কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত অন্য কোনো একটা জীবের কারণে কোনো একটা জীবের যে রূপান্তর সংঘটিত হয়'। অন্য কথায় বলতে গেলে, যখন অন্তত দুটো আলাদা প্রজাতির জিনগত পরিবর্তন একে অপরকে পারস্পরিকভাবে প্রভাবিত করে তখন আমরা বলি যে তাদের মধ্যে সহ-বিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে।

বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও বেড়ে গেল। একইসঙ্গে, কুকুরগুলোও তাদের নিজেদের প্রয়োজনে মানুষদেরকে ব্যবহার করা শিখে ফেলল। কুকুরের সঙ্গে মানুষের ১৫ হাজার বছরের এই মজবুত বন্ধন, অন্য যে-কোনো প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি আবেগের ও গভীর বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি করে ফেলল।[৪] সে কারণে এখন তো বটেই, আরো আগেও কখনো কখনো পোষা কুকুরের মৃতদেহ দাফন করা হতো ঠিক মানুষের মতোই।

যেহেতু সে সময়কার গোষ্ঠীগুলো আকারে বেশ ছোটো ছিল, তার ফলে প্রত্যেক সদস্য অন্য প্রায় সব সদস্যকেই খুব কাছ থেকে চিনত। বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন নিয়ে মিলেমিশে কাটত তাদের জীবন। একাকিত্ব কিংবা গোপনীয়তা ছিল খুবই দুর্লভ। পাশাপাশি বসবাস করা গোষ্ঠীদের মধ্যে হয়তো সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ছিল। তারা হয়তো নিজেদের মধ্যে সদস্য অদল-বদল করত, হয়তো একসঙ্গে শিকার করত, হয়তো দুর্লভ শৌখিন জিনিসপত্র নিয়ে বাণিজ্য করত, রাজনৈতিক মৈত্রী তৈরি করত কিংবা একইসঙ্গে ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করত। এরকম সহযোগিতা আসলে হোমো সেপিয়েন্সের অন্যতম মৌলিক গুণ, যেটা তাদের টিকে থাকার জন্য অন্যান্য মানব-প্রজাতির তুলনায় একটু বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। কখনো কখনো প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে তারা একসঙ্গে মিলে একটি নতুন গোষ্ঠী গঠন করেছিল। সেই নতুন গোষ্ঠীতে ছিল একইরকম ভাষা, একই পৌরাণিক কাহিনি আর একই সামাজিক আচার।

তাই বলে অবশ্য এই প্রতিবেশীর সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্কটাকে নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করারও কিছু নেই। যদিও সময়ে সময়ে প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলো কাছাকাছি থেকেছে কিংবা একসঙ্গে শিকার করেছে, তার পরও তারা আসলে তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে, নিজেদের মতো করে। বাণিজ্যের ব্যাপারটাও ঝিনুক, রঙিন পাথর কিংবা কাঁচা রঙের মতো কিছু শৌখিন সামগ্রীর মধ্যেই সীমিত ছিল। ফলমূল কিংবা মাংসের মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বাণিজ্য করার তেমন কোনো

প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোনো একটা গোষ্ঠী যে অন্য কোনো একটা গোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর জন্য পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কগুলোও কদাচিৎই দেখা যেত। একটি উপজাতি আসলে একটি পুরোপুরি স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে কখনো গড়ে উঠতে পারেনি। যদিও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে আলোচনার জন্য কিছু জায়গা ছিল কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট স্থায়ী শহর কিংবা প্রতিষ্ঠান ছিল না। একজন সাধারণ সদস্য হয়তো বহু মাস ধরে নিজের গোষ্ঠীর বাইরে অন্য কাউকে না দেখেই কাটিয়ে দিয়েছে। সে হয়তো তার সারা জীবনে মাত্র কয়েক শ মানুষকে নিজ চোখে দেখেছে। আসলে সেপিয়েন্স জনগোষ্ঠী খুব ছাড়া-ছাড়াভাবে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। তবে সত্যি কথা হলো, কৃষিবিপ্লবের আগ পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল এখনকার মিশরের কায়রোর জনসংখ্যার চেয়েও কম!

৭. প্রথম পোষা প্রাণী? উত্তর ইসরায়েলে প্রায় ১২ হাজার বছরের পুরোনো একটা কবর পাওয়া গেছে। সেখানে ৫০ বছর বয়স্ক একজন নারীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, আর তার পাশেই ছিল একটি কুকুরছানার কঙ্কাল (ছবিতে নিচে বাঁ দিকে)। কুকুরছানাটাকে ওই নারীর মাথার কাছাকাছিই কবর দেওয়া হয়েছিল। তার বাঁ হাতটা কুকুরটার ওপরে এমনভাবে রাখা যেটা একরকম আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। অবশ্যই অন্যরকম ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে কুকুরছানাটা হয়তো পরকালের দরজার প্রহরীর জন্য একটা ছোট্ট উপহার।

বেশিরভাগ সেপিয়েন্স গোষ্ঠীই ছিল যাযাবর। তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াত খাবারের সন্ধানে। তারা কখন কোথায় যাবে সেটা ঠিক তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত না। বরং নির্ভর করত ঋতু পরিবর্তনের ওপর, বিভিন্ন প্রাণীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বসতি স্থানান্তরের ওপর কিংবা বিভিন্ন গাছপালার জীবনচক্রের ওপর। তারা সাধারণত বাড়ির আশপাশের কয়েক ডজন কিংবা বড়োজোর কয়েক শ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যেই ঘুরে বেড়াত।

মাঝেমধ্যে গোষ্ঠীগুলো হয়তো সম্পূর্ণ নতুন একটা এলাকায় এসে পড়ত। সেটা বিভিন্ন কারণেই হতে পারে। যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভয়ংকর দাঙ্গা, জনসংখ্যার চাপ কিংবা কোনো এক নতুন নেতার দুর্দান্ত কোনো সিদ্ধান্ত। এরকম হঠাৎ হঠাৎ প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে উদ্দেশ্যহীনভাবে নতুন কোনো এক জায়গায় চলে যাওয়াটাই আসলে মানুষের এই দুনিয়াব্যাপী সম্প্রসারণের পেছনে অনেক বড়ো ভূমিকা রেখেছে। যদি একটা শিকারি গোষ্ঠী প্রতি ৪০ বছরে একবার করে ভেঙে যায় এবং এর ভাঙা অংশগুলো যদি পূর্ব দিকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে সম্পূর্ণ নতুন কোনো এলাকায় যায়, তাহলে পূর্ব আফ্রিকা থেকে চীন পর্যন্ত দূরত্ব পাড়ি দিতে প্রায় ১০ হাজার বছর সময় লাগার কথা।

কিছু দুর্লভ সময়ে, যখন কোনো এলাকায় খাবারের যথেষ্ট জোগান থাকত, তখন হয়তো গোষ্ঠীগুলো একটা ঋতুর জন্য কিংবা স্থায়ীভাবেই বসতি গাড়ত কোনো এলাকায়। খাবার শুকানো ও ঠান্ডা রাখার নানা পদ্ধতিও তখন মানুষ আবিষ্কার করেছিল। যার ফলে একটু বেশি সময়ের জন্য খাবার জমিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যেত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীতে ভরপুর নদী কিংবা সাগরের আশপাশে মানুষ স্থায়ী জেলে গ্রাম তৈরি করে ফেলেছিল। এইসব জেলে গ্রামই ছিল ইতিহাসের প্রথম স্থায়ী বসতি। এই ঘটনা কিন্তু কৃষিবিপ্লবেরও অনেক আগেকার কথা। এরকম জেলে গ্রাম হয়তো ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে প্রায় ৪৫ হাজার বছর আগে দেখা গিয়েছিল। এরকম কোনো গ্রামই হয়তো পরবর্তীতে

হোমো সেপিয়েন্সকে সমুদ্রযাত্রার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল– যার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো তাদের প্রথম অস্ট্রেলিয়া যাত্রা।

বেশিরভাগ এলাকাতেই সেপিয়েন্সরা তখন থেকেই নানা ধরনের খাবারে অভ্যস্ত ছিল। তারা সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী যখন যে খাবার পাওয়া যেত, সেটাই সংগ্রহ করত। তারা পোকামাকড় হাতিয়ে নিত, গাছ থেকে ফলমূল পাড়ত, গর্ত করে শেকড় জোগাড় করত, খরগোশ ধরত আর বাইসন কিংবা বিশাল ম্যামথ শিকার করত। যদিও প্রাচীন পূর্বপুরুষ বলতে আমাদের চোখের সামনে একজন বীর শিকারি পুরুষের ছবিটাই প্রথমে ভেসে ওঠে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সেপিয়েন্সের প্রধান কাজ ছিল আসলে খাবার সংগ্রহ করা, শিকার করা নয়। আর সংগ্রহ করা খাবার দিয়েই তাদের বেশিরভাগ ক্যালরির জোগান হতো। এই খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েই তারা চকমকি পাথর, কাঠ আর বাঁশের মতো বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সন্ধান পেত।

সেপিয়েন্স যে শুধু খাবার আর জিনিসপত্রের জন্যই ঘুরে ঘুরে খোঁজ করে বেড়াত, তা নয়। তথ্য সংগ্রহ করাও তাদের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য ছিল। বেঁচে থাকার জন্য বসতির চারপাশটা সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা তাদের খুব দরকার ছিল। প্রতিদিনের খাবারের সন্ধানটা আরো দক্ষতার সঙ্গে করার জন্য তাদের ওই এলাকার গাছপালা ও প্রাণীদের জীবনচক্র ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান দরকার ছিল। তাদের জানতে হতো কোন খাবারগুলো পুষ্টিকর, কী খেলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা অন্যান্য কোন খাবার ওষুধ হিসেবে কাজ করে। তাদের আরো জানা দরকার ছিল ঋতুচক্র সম্বন্ধে, ঝড়বৃষ্টি কিংবা খরার আগের বিপৎসংকেত সম্বন্ধে। তারা সব নদী কিংবা জলপ্রবাহ, সব আখরোট গাছ, সব ভালুকের গুহা আর সব চোখা পাথরের সংগ্রহই ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করত। তাদের প্রায় প্রত্যেক সদস্যকেই জানতে হতো কীভাবে পাথর দিয়ে চাকু বানাতে হয়, কীভাবে পুরোনো ছেঁড়া আলখাল্লা মেরামত করতে হয়, কীভাবে খরগোশ ধরার ফাঁদ পাততে হয় কিংবা তুষারঝড় বা ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে পড়লে কী করতে হয় অথবা সাপের কামড় খেলেই-বা কী করতে হয়। এগুলোর যে-কোনোটাতেই দক্ষতা অর্জন করতে

হলে একজনকে অনেক দিন ধরে শিখতে ও চর্চা করতে হয়। একজন সাধারণ প্রাচীন শিকারি কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা পাথর দিয়ে বর্শার মাথা বানিয়ে ফেলতে পারত। আমরা যদি এখন এই একই কাজ করার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে খুব বাজেভাবে ব্যর্থ হব। কারণ, আমাদের বেশিরভাগেরই চোখা এবং শিকারের উপযোগী পাথর সম্পর্কে কিংবা ওগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে তেমন কোনো জ্ঞান নেই।

অন্য কথায় বলতে গেলে, সেই সময়কার সাধারণ একজন শিকারি তার আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখত। সেই তুলনায় তাদের এখনকার উত্তরাধিকারীরা বরং একেবারেই আনাড়ি। আজকের শিল্পভিত্তিক সমাজে বেশিরভাগ মানুষেরই টিকে থাকার জন্য তার আশপাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে আসলে তেমন কিছু জানার প্রয়োজন হয় না। এখনকার সময়ে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, বিমা কর্মকর্তা, ইতিহাসের শিক্ষক কিংবা কারখানার শ্রমিক হিসেবে টিকে থাকার জন্য আসলে আপনার কী জানা দরকার? আপনাকে আপনার নিজের কাজের ছোটো জগতের অনেক খুঁটিনাটি সম্পর্কে অনেক বেশি কিছু জানা দরকার, কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ প্রয়োজন মেটাতেই আপনাকে অন্য সব মানুষের ওপর নির্ভর করতে হবে, যারা নিজেরা আবার তাদের কাজের ছোট্ট জগতের বাইরে তেমন কিছু জানে না। যদিও সামগ্রিকভাবে মানুষ এখন তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেকে বেশি জানে কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিন্তা করলে আসলে প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক মানুষেরাই ইতিহাসে সবচেয়ে জ্ঞানী ও দক্ষ মানুষ ছিল।

এমন কিছু তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়, যেটা ইঙ্গিত করে যে, এখনকার গড়পড়তা সেপিয়েন্সের মস্তিষ্কের আকার সেই শিকারি সময়ের তুলনায় একটু কমে এসেছে।[৫] সেই সময়ে টিকে থাকার জন্য প্রত্যেকেরই প্রচণ্ড মানসিক দক্ষতার দরকার ছিল। যখন থেকে কৃষি কিংবা শিল্পের আবির্ভাব হলো, মানুষ বেশি বেশি করে টিকে থাকার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে থাকল। আর এভাবেই বোধবুদ্ধি কম হয়েও টিকে থাকার সুযোগ তৈরি হলো। স্রেফ পানি বয়ে কিংবা কারখানার সাধারণ একজন শ্রমিক হওয়ার পরও আপনি

দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন আর আপনার একেবারেই সাধারণ জিনগুলো আপনার বংশধরদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

শিকারি পূর্বপুরুষেরা যে শুধু তাদের চারপাশের প্রাণী, গাছপালা আর ব্যবহার্য জিনিসপত্র সম্পর্কেই জ্ঞান লাভ করেছিল, তা-ই নয়, বরং তারা তাদের শরীর ও অনুভূতি সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। তারা ঘাসের ওপর সামান্য নড়াচড়া থেকেই টের পেয়ে যেত কোনো সাপ ওত পেতে আছে কি না। তারা গাছের পাতাগুলো খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করত, যার ফলে সহজেই ফলমূল, মৌমাছির চাক কিংবা পাখির বাসা খুঁজে পেত। তারা একেবারেই কম কষ্টে ও নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারত। তারা দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে বসতে, হাঁটতে কিংবা দৌড়াতে পারত। সারাটা সময় নানা ধরনের ব্যবহারের ফলে তাদের শরীর একজন ম্যারাথন দৌড়বিদের মতোই একদম সুস্থ-সবল থাকত। তাদের শরীর এত নিপুণ ছিল যে এখনকার মানুষেরা বছরের পর বছর ধরে যোগব্যায়াম কিংবা তাইচি চর্চা করেও সেটা অর্জন করতে পারবে না।

এইসব শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবন জায়গাভেদে কিংবা ঋতুভেদে যদিও একেক রকম ছিল কিন্তু তারা সবাই আসলে অনেক সুস্থ ও আরামদায়ক জীবন যাপন করত। বরং তাদের উত্তরাধিকারী কৃষক, রাখাল, দিনমজুর কিংবা অফিস কর্মচারীদের জীবনই অনেক বেশি কষ্টের।

যেখানে আজকের প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজেও মানুষজন সপ্তাহে গড়পড়তা প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ ঘণ্টা কাজ করে, উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৬০ এমনকি ৮০ ঘণ্টা কাজ করে, সেখানে কালাহারি মরুভূমির মতো প্রতিকূল পরিবেশেও আজকের দিনের শিকারি-সংগ্রাহকরা সপ্তাহে মাত্র ৩৫ কি ২৫ ঘণ্টা কাজ করে। তারা প্রতি তিন দিনে এক দিন শিকার করে। অন্যান্য খাবার সংগ্রহের কাজটা করতে তিন থেকে ছয় ঘণ্টা নেয় বড়োজোর। সাধারণত একটা গোষ্ঠীর জন্য এটাই যথেষ্ট হয়। এমনও হতে পারে যে, এখনকার কালাহারি মরুভূমির চেয়েও বেশি উর্বর জায়গায় প্রাচীন শিকারি মানুষেরা খাবার বা বিভিন্ন কাঁচামাল জোগাড় করার জন্য অনেক কম সময় ব্যয় করত। তার ওপর, শিকারি-সংগ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের

জন্য অনেক কম কাজ করতে হতো। তাদের থালা-বাটি ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করা, বাচ্চার কাঁথা বদলানো বা বিল পরিশোধ করার মতো বিরক্তিকর কাজগুলো করতে হতো না।

আসলে কৃষি কিংবা শিল্পভিত্তিক সমাজের চেয়ে শিকারি-সংগ্রাহক মানুষেরা অনেক বেশি মজার জীবন যাপন করত। আজকের একজন চীনা শ্রমিক ঘর থেকে বের হয় সকাল ৭টার সময়, তারপর নানা রকম দূষণে ভরপুর রাস্তা দিয়ে গিয়ে পৌঁছায় তার অস্বাস্থ্যকর কাজের জায়গায়, তারপর একইভাবে একই যন্ত্র চালায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তাও দিনে প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে। তারপর সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঘরে ফিরে থালাবাসন ধোয়া কিংবা কাপড়চোপড় পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়। এদিকে, ৩০ হাজার বছর আগে একজন চীনা শিকারি হয়তো তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সকাল ৮টার দিকে ঘর থেকে বের হতো। তারা হয়তো আশপাশের বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত। ব্যাঙের ছাতা, খাওয়ার মতো শিকড় কিংবা ব্যাং ধরত। মাঝে মাঝে হয়তো বাঘের তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাত। বিকেলের বেশ আগেই তারা খাবারের জন্য ঘরে ফিরত। এর ফলে তাদের হাতে অনেক সময় থাকত গল্প করার, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করার কিংবা নেহাতই উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় কাটানোর। মাঝেমধ্যে নিশ্চয়ই তাদের বাঘে ধরে খেয়ে ফেলত কিংবা সাপে কামড় দিত কিন্তু অন্যদিকে ভাবলে, তাদেরকে তো অন্তত গাড়িঘোড়ার দুর্ঘটনা কিংবা শিল্পকারখানার দূষণের কারণে মরতে হতো না।

বেশিরভাগ জায়গায় এবং বেশিরভাগ সময়ে, ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করাই মানুষকে আদর্শ পুষ্টির জোগান দিয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু তো নেই-ই বরং হাজার হাজার বছর ধরে এটাই মানুষের সাধারণ খাদ্যাভ্যাস ছিল। তার ফলে মানুষের শরীর এই খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গেই খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন ফসিল থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত এটারই ইঙ্গিত দেয় যে, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের অপুষ্টি কিংবা দুর্ভিক্ষে মরার সম্ভাবনা বেশ কম ছিল বরং সাধারণত তাদের কৃষক বংশধরদের চেয়ে তারা বেশি লম্বা ও স্বাস্থ্যবান ছিল। গড় আয়ু তখন ছিল মাত্র ৩৫ কি ৪০ বছর, কিন্তু

এর জন্য মূলত দায়ী অতিরিক্ত শিশু মৃত্যুহার। যেসব শিশু বিপদসংকুল প্রথম বছরগুলো পার করে ফেলতে পারত তাদের বেশ ভালো সম্ভাবনা ছিল ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার। কেউ কেউ তো হয়তো ৮০ বছর পর্যন্তও বাঁচত। আর এখনকার শিকারি-সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীতে ৪৫ বছর বয়সি একজন মহিলা আরো ২০ বছর বাঁচার আশা করতে পারেন যেখানে পুরো জনগোষ্ঠীর ৫ থেকে ৮ শতাংশ হলো ষাটোর্ধ্ব।[৬]

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসই শিকারি-সংগ্রাহকদের দুর্ভিক্ষ কিংবা অপুষ্টি থেকে রক্ষা করেছিল। অন্যদিকে কৃষকরা খুব সীমিত আর ভারসাম্যহীন খাবার খেত। বিশেষ কওে, পূর্বাধুনিক যুগে বেশিরভাগ ক্যালরির জোগানই হতো একটিমাত্র উৎস থেকে– গম, আলু কিংবা ধান। এই উৎসগুলোর একটা সমস্যা হলো এগুলোতে বেশ কিছু মৌলিক উপাদান, যেমন– ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদানের যথেষ্ট ঘাটতি আছে, যেগুলো আবার মানুষের শরীরের জন্য দরকার। প্রাচীন চীনের একজন সাধারণ কৃষক সকাল, দুপুর কিংবা রাত সব সময় শুধু ভাতই খেত। তার কপাল ভালো থাকলে সে পরদিনও একই খাবার খাওয়ার কথাই ভাবত। অন্যদিকে, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকরা নিয়মিতভাবে ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন রকম খাবার খেত। কোনো এক প্রাচীন কৃষকের কোনো এক পূর্বপুরুষ হয়তো সকালের খাবার হিসেবে খেত লিচু আর ব্যাঙের ছাতা, তারপর দুপুরের খাবার হিসেবে ফলমূল, শামুক আর কচ্ছপের মাংস আর তারপর রাতের বেলা হয়তো খেতো বুনো পেঁয়াজের সঙ্গে খরগোশের মাংস। পরদিনের খাবার হয়তো হতো একেবারেই অন্যকিছু। আর এই বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসই প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের সব রকম প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করেছিল।

এ ছাড়াও কোনো একটা নির্দিষ্ট খাবারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হওয়ার ফলে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তাদের অনেক কম ভুগতে হতো। অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক সমাজগুলো দুর্ভিক্ষে প্রায় ধ্বংস হয়ে যেত। খরা, দাবদাহ বা ভূমিকম্পের মতো বড়ো বড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের ধান কিংবা আলুর খেত লন্ডভন্ড

করে দিত। অবশ্য শিকারি-সংগ্রাহকদের যে এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনো সমস্যাই হতো না– এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই। তাদেরও সমস্যা হতো, তারাও অনেক সময় না খেয়ে থাকত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তাদের জন্য এই ধরনের দুর্যোগ থেকে উত্তরণটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাদের কোনো একটা নিয়মিত খাবারের উৎস যদি ধ্বংসও হয়ে যেত, তারা তখন অন্য কোনো কিছু দিয়ে কাজ চালিয়ে নিত অথবা অন্য কোথাও চলে যেত।

আরো মজার ব্যাপার হলো, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকরা সংক্রামক রোগে অনেক কম আক্রান্ত হতো। কৃষি কিংবা শিল্পভিত্তিক সমাজে যে সমস্ত রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল (যেমন গুটিবসন্ত, হাম, যক্ষ্মা) সেগুলোর বেশিরভাগেরই উৎপত্তি আসলে গৃহপালিত পশুপাখি থেকে। এইসব রোগজীবাণু পরবর্তী সময়ে মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত হয় মূলত কৃষিবিপ্লবের পরে, আগে নয়। যেসব প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকরা শুধু কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল তারাও কিন্তু এইসব পরিণতি থেকে মুক্ত ছিল। তা ছাড়া কৃষি বা শিল্পভিত্তিক সমাজের বেশিরভাগ মানুষই বসবাস করত খুব অস্বাস্থ্যকর, ঘনবসতিপূর্ণ চিরস্থায়ী বসতিতে– যেগুলো ছিল রোগজীবাণুর আদর্শ বাসস্থান। অন্যদিকে শিকারি-সংগ্রাহকরা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে আলাদা আলাদাভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তার ফলে কোনো রোগই মহামারির আকার ধারণ করতে পারত না।

একটি সম্পূর্ণ ও বৈচিত্র্যে ভরপুর খাদ্যাভ্যাস, অপেক্ষাকৃত কম কাজের সময় আর সংক্রামক রোগের অনুপস্থিতিই অনেক বিশেষজ্ঞকে অনুপ্রাণিত করেছে কৃষিপূর্ব সমাজকেই প্রকৃত ‘প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজ’ হিসেবে আখ্যায়িত করতে। অবশ্য এই প্রাচীন গোষ্ঠীকেই আদর্শ মনে করাটা আমাদের ভুল হবে। যদিও তারা কৃষি কিংবা শিল্পভিত্তিক সমাজের মানুষের তুলনায় অনেক ভালো জীবন যাপন করত, তার পরও তাদের জীবনে অনেক রুক্ষতা ও নির্দয়তা ছিল। অভাব ও কাঠিন্য মোটেই দুর্লভ ছিল না তাদের জীবনে, শিশুর মৃত্যুহারও ছিল বেশি। সে সময় হয়তো সংখ্যালঘুর অস্তিত্বই রাখা হতো না। বেশিরভাগ লোক হয়তো নিজেদের কাছাকাছি সম্পর্কটা উপভোগ করত কিন্তু যেসব দুর্ভাগারা অন্য সদস্যদের বিরাগভাজন

হয়ে যেত তাদের কপালে ভালো দুঃখ ছিল। এমনকি আধুনিক শিকারি-সংগ্রাহকেরাও মাঝেমধ্যেই তাদের দুর্বল বা অক্ষম সদস্যদের ত্যাগ করত কিংবা মেরেই ফেলত। কারণ সেইসব সদস্য তাদের গোষ্ঠীর সঙ্গে একই তালে চলতে পারত না। অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুদেরও হয়তো নিঃশেষ করে ফেলা হতো। এমনকি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার জন্য মানুষ উৎসর্গ করার কথাও শোনা যায়।

১৯৬০ সালের আগ পর্যন্ত যে অ্যাচে (অপযল্ক) গোষ্ঠী প্যারাগুয়ের জঙ্গলে বসবাস করত, তারাও ছিল শিকারি-সংগ্রাহক। তাদেরকে দেখে আমরা শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের কিছু ভয়ংকর দিক সম্পর্কে জানতে পারি। যখনই অ্যাচেদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মারা যেত তখন তারা একটা ছোটো কন্যাশিশুকে বলি দিত আর তারপর তাদের দুজনকে একসঙ্গে কবর দিত। কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ অ্যাচে গোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভয়ংকর কিছু ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন। একবার একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষকে তার গোষ্ঠী ত্যাগ করাল। কারণ হলো সেই লোকটা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় অন্যদের সঙ্গে চলতে পারছিল না। তাকে তারা একটা গাছের তলায় রেখে চলে যায়। শকুনেরা তার মাথার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল ভরপেট খাবারের আশায়। কিন্তু সেই মানুষটা আশ্চর্যজনকভাবে অসুস্থতা কাটিয়ে উঠে দ্রুত হেঁটে তার গোষ্ঠীতে ফিরে যেতে পেরেছিল। তার শরীর ঢাকা ছিল শকুনের বিষ্ঠায়, তাই তার নাম রাখা হলো শকুনের উচ্ছিষ্ট।

যখনই কোনো একজন অ্যাচে নারী দলের জন্য বোঝা হয়ে যেত তখন একজন জোয়ান পুরুষ চুপিচুপি তার পেছনে এসে কুড়ালের এক আঘাতে তার মাথাটা আলাদা করে ফেলত। একজন অ্যাচে পুরুষ তার জঙ্গল-জীবনের প্রথম দিককার কথা নৃতত্ত্ববিদদের শুনিয়েছিল– 'আমি প্রথা অনুসারে বয়স্ক মহিলাদের হত্যা করতাম...আমি সাধারণত চাচি-খালাদের মারতাম...এইজন্য মহিলারা আমাকে বেশ ভয় পেত...এখন, এইখানে এই সাদা চামড়াদের সঙ্গে থেকে আমি দুর্বল হয়ে গেছি।' যেসব শিশু চুল ছাড়া জন্মগ্রহণ করত তাদের অপুষ্ট মনে করা হতো এবং সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলা হতো। একজন নারী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন তার

প্রথম কন্যাসন্তানকে মেরে ফেলা হয়েছিল কারণ গোষ্ঠীর পুরুষেরা আরো একটি কন্যাসন্তান চায়নি তখন। অন্য একসময় একজন পুরুষ একটি ছোট্ট শিশুকে মেরে ফেলেছিল কারণ তার তখন বেজায় মেজাজ গরম ছিল আর শিশুটা শুধু কাঁদছিল। আবার অন্য একটি শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল, কারণ সে নাকি খুব অদ্ভুত দেখতে ছিল আর অন্য শিশুরা তাকে দেখে হাসত![৭]

তাই বলে এইসব গল্প শুনে তাড়াতাড়ি করে অ্যাচেদের সম্পর্কে ভয়ংকর একটা ধারণা করে ফেলা কিন্তু একদম ঠিক হবে না। যেসব নৃতত্ত্ববিদেরা তাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন তাঁরা বলেছেন প্রাপ্তবয়স্ক অ্যাচেদের মধ্যে গন্ডগোল মারামারি আসলে খুবই কম হতো। আবার নারী-পুরুষ উভয়েই নিজের ইচ্ছামতো সঙ্গী বদলাতে পারত। তারা একই সঙ্গে হেসেখেলে থাকত, তাদের নেতৃত্ব নিয়ে খুব বেশি মাথাব্যথা তো ছিলই না বরং তারা মাতব্বর ধরনের লোকজনকে একদম পাত্তা দিত না। তারা তাদের অল্প সহায়সম্পত্তি নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিল আর মোটেই সাফল্য কিংবা সম্পদের জন্য হা-হুতাশ করত না। যে জিনিসগুলোকে তারা জীবনে সবচেয়ে গুরুত্ব দিত, তা হলো সুন্দর সামাজিক সম্পর্ক আর খুবই ভালো বন্ধুত্ব।[৮] তারা শিশু, অসুস্থ লোকজন আর বয়স্কদের হত্যা করাটা অনেকটা এখনকার গর্ভপাত কিংবা স্বেচ্ছামৃত্যুর মতো করে দেখত। আরেকটা কথা এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, এই অ্যাচেদেরকে কিন্তু প্যারাগুয়ের সাধারণ কৃষকরা খুব নির্মমভাবে হত্যা করত। শত্রুদের থাবা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাই অ্যাচে গোষ্ঠী দলের দুর্বল সদস্যদের প্রতি বেশ রুক্ষ আচরণ করতে বাধ্যই হতো বলা যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, অন্য সব মানবসমাজের মতোই অ্যাচে সমাজও আসলেই খুব জটিল ছিল। সুতরাং তাদের সম্পর্কে এই সামান্য ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে তাদের সমাজব্যবস্থাকে আদর্শ মনে করার কোনো কারণই নেই। অ্যাচেরা ফেরেশতাও ছিল না আবার শয়তানও ছিল না– তারাও মানুষই ছিল। আর বলাই বাহুল্য, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকেরাও সেই মানুষই ছিল।

জিন-পরিদের গল্প

আচ্ছা, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক মানুষদের আধ্যাত্মিক বা মানসিক জীবন যাপন সম্পর্কে আমরা কী বলতে পারি? সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটা খুব একটা সহজ নয়। আমরা যদি শিকারি-সংগ্রাহকদের অর্থনৈতিক অবস্থানটা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে তার জন্য আমাদের সেই সময়কার কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে। খুবই ভালো হয় যদি সেগুলো পরিমাপ করা যায়। যেমন, আমরা হিসাব কষতে পারি একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন ঠিক কত ক্যালরির দরকার হয়, এক কেজি আখরোট থেকে কত ক্যালরি পাওয়া যায় আর জঙ্গলের এক বর্গকিলোমিটার থেকে কতগুলো আখরোটই-বা জোগাড় করা যায়। এসব তথ্য আমাদের হাতে থাকলে সেই সমাজের খাদ্যাভ্যাসে আখরোটের গুরুত্ব কতখানি সেটা মোটামুটি বুঝতে পারব।

কিন্তু তারা কি আসলে আখরোটকে উপাদেয় মনে করত নাকি পানসে বিরক্তিকর কিছু মনে করত? নাকি তারা মনে করত আখরোট গাছগুলোতে আত্মারা ভর করে থাকে? তাদের কাছে কি আখরোট গাছের পাতাগুলোকে সুন্দর লাগত? তাদের সমাজের কোনো তরুণ তার প্রেমিকাকে একটা রোমান্টিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় কি আখরোট গাছতলার ছায়াঘেরা পরিবেশটার কথা ভাবত? তাদের এইসব চিন্তার বা অনুভূতির জগৎ সম্পর্কে জানাটা আসলে নেহাতই কিছু সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না।

বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই একমত হন যে, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক সমাজে সর্বপ্রাণবাদ বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস খুব সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল। সর্বপ্রাণবাদ মানে হলো এমন এক বিশ্বাস, যাতে মনে করা হয়, সব জায়গা, প্রাণী, গাছপালা আর সব প্রাকৃতিক ঘটনারই আসলে সচেতন সত্তা আছে, অনুভূতি আছে এবং তারা মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। সুতরাং একজন সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী লোক মনে করতেই পারে যে, পাহাড়ের ওপরের যে বড়ো পাথরটা আছে ওটারও চাওয়া-পাওয়া কিংবা প্রয়োজন থাকতে পারে। পাথরটা হয়তো মানুষের কোনো কাজের জন্য রেগে যেতে পারে

কিংবা আনন্দিতও হতে পারে। পাথরটা মানুষদের খুব তিরস্কারও করতে পারে আবার মানুষের কাছে সাহায্যও চাইতে পারে। এদিকে মানুষেরাও হয়তো পাথরটার কোনো নাম দিত পাথরটার স্তুতি কিংবা ভর্ৎসনা করার জন্য। শুধু পাথরই নয়, পাহাড়ের গোড়ার দিকের ওক গাছগুলোও এমন জীবন্ত হতে পারে, এমনকি পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা জলপ্রবাহটা কিংবা জঙ্গলের পথের পাশের ঝরনাটা, তার চারপাশে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড়, মাঠের ইঁদুর, শেয়াল আর গোরু যারা সেই ঝরনায় পানি পান করে– এই সবকিছুই হতে পারে একেকটা জীবন্ত সত্তা। সর্বপ্রাণবাদের জগতে শুধু যে জীব কিংবা বস্তুকেই জীবন্ত মনে করা হতো তা-ই নয়, সেখানে অবস্তুগত সত্তাও ছিল। যেমন, মৃত মানুষের আত্মা কিংবা ভালো বা খারাপ কিছু সত্তা– ঠিক আমাদের শয়তান, পরি কিংবা ফেরেশতার মতন।

সর্বপ্রাণবাদীরা মনে করে, মানুষ আর অন্যান্য সত্তার মধ্যে কোনো বিভেদের দেওয়াল নেই। তারা চাইলেই কথা কিংবা নাচগান আর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। একজন শিকারি হয়তো একদল হরিণকে ডেকে বলল, যেন তাদের একজন নিজেকে উৎসর্গ করে। শিকার সফল হলে শিকারি হয়তো মৃত প্রাণীর কাছে ক্ষমা চাইবে। কেউ যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে হয়তো একজন পুরোহিত অসুখের জন্য দায়ী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করত। আর তারপর সে সেই আত্মাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কিংবা সংশোধন করার চেষ্টা করত। প্রয়োজন পড়লে পুরোহিত হয়তো অন্য কোনো আত্মারও সাহায্য নিত। এসব যোগাযোগের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, যেসব সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে তারা সবই কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানের বা অঞ্চলের। তারা কোনো বৈশ্বিক ঈশ্বর নয়, বরং কোনো একটা নির্দিষ্ট হরিণ বা একটা নির্দিষ্ট গাছ, একটা নির্দিষ্ট ঝরনা কিংবা একটা নির্দিষ্ট আত্মা।

মানুষ আর সেইসব সত্তার মধ্যে যেমন কোনো বিভেদ ছিল না, তাদের মধ্যে সম্পর্কের ঠিক নির্দিষ্ট কোনো নিয়মকানুনও ছিল না। মানুষ ছাড়া অন্য সব সত্তাগুলো শুধু যে মানুষের চাওয়া পূরণের জন্য ছিল এমন নয়, আবার তারা যে ইচ্ছামতো দুনিয়া চালানোর মতো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছিল, তাও নয়। তাদের পুরো দুনিয়াটা মোটেই

শুধু মানুষকে কেন্দ্র করে বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট সত্তাকে কেন্দ্র করেও আবর্তিত হতো না।

সর্বপ্রাণবাদ কোনো একটা নির্দিষ্ট ধর্ম নয়। এটা আসলে হাজারটা বিভিন্ন রকমের ধর্ম বা বিশ্বাসের একটা সাধারণ নাম মাত্র। তাবৎ দুনিয়া কোথা থেকে এলো আর তাতে মানুষের স্থানই-বা কোথায়– এরকম সব ব্যাপারে সেই সব ধর্ম কিংবা বিশ্বাসের একটা মোটামুটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা তাদেরকে এক করে সর্বপ্রাণবাদ নামে ডাকতে পারি। কিন্তু প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের যদি আমরা হুট করে সর্বপ্রাণবাদী বলে বসি, সেটা খুব একটা ভালো কাজ হবে না। কেন, সেটা বোঝানোর জন্য একটা তুলনা করা যেতে পারে। ধরুন, আমরা বললাম যে একটু সেকেলে গোছের কৃষকরা সবাই মূলত আস্তিক ছিল। কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। আস্তিকতা (যার ইংরেজি ‘Theist’ শব্দটা এসেছে গ্রিক ‘theos’ বা ‘মড়ফ’ থেকে) হলো এমন একটা ধারণা যেটা বলে, সমগ্র মহাবিশ্ব চলছে আসলে মানুষ ও অল্প কিছু উচ্চমার্গীয় সত্তার দ্বারা, যাদেরকে ঈশ্বর বা দেবতা নামে ডাকা হয়। এটা অবশ্যই সত্য যে, সেকেলে কৃষকরা বেশিরভাগই আস্তিক ছিল। কিন্তু এর থেকে আমরা নির্দিষ্ট করে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারি না। আঠারো শতকের পোল্যান্ডের ইহুদি র‍্যাবাইরা, ম্যাসাচুসেটসের সপ্তাদশ শতকের ডাইনি পোড়ানো পিউরিটানরা, পঞ্চদশ শতকের মেক্সিকোর অ্যাজটেক পুরোহিতরা, দ্বাদশ শতকের ইরানের সুফি সাধকরা, দশম শতকের ভাইকিং যোদ্ধারা, দ্বিতীয় শতকের রোমান বাহিনী কিংবা প্রথম শতকের চীনা আমলারা– এঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে আড়াল করে সবগুলোকে এক নামে ‘আস্তিকতা’ বললে আসলে অনেক কিছুই চাপা পড়ে যায়। এদের প্রত্যেকেই অন্যদের আচার ও বিশ্বাসকে একদম উদ্ভট ও লৌকিকতাবিবর্জিত মনে করত। একইভাবে প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক সেই সর্বপ্রাণবাদীদের মধ্যকার আচার ও বিশ্বাসের পার্থক্যও হয়তো এতটাই বিশাল মাপের ছিল। তাদের ধর্মীয় জীবন হয়তো সব সময় উদ্বেল ছিল নানা রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে, আমাদের সীমার মধ্যে আমরা যতদূর অবধি জানতে পারি তা দিয়ে ওই সাধারণীকরণে গিয়েই থামতে হয়। প্রাচীন, অপ্রচলিত আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যে-কোনো রকমের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করাটা নেহাতই অনুমাননির্ভর হবে। কারণ আমাদের হাতে তেমন কোনো তথ্য-প্রমাণই নেই। আর সামান্য যা-কিছু বা আছে, যেমন হাতে তৈরি জিনিসপত্র কিংবা গুহাচিত্র– এসব থেকে আসলে হাজার রকম ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব। যেসব বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে তারা জানতে পেরেছেন সেই শিকারি-সংগ্রাহকরা ঠিক কেমন অনুভব করত, তাঁদের নানা রকম তত্ত্ব আসলে যতটা না প্রস্তরযুগের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারটা খোলাসা করে, তার চেয়ে ঢের বেশি তাঁদের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে।

অল্প কিছু সমাধির ধ্বংসাবশেষ, গুহাচিত্র আর হাড়ের তৈরি মূর্তি থেকে পাহাড়সম নানান তত্ত্ব খাড়া করবার চেয়ে বরং একটু অকপট হয়ে এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের যে ধারণা আছে তা খুবই অস্পষ্ট। আমরা অনুমান করতে পারি সেই সময় হয়তো সর্বপ্রাণবাদীরা ছিল, কিন্তু সেটা খুব একটা তথ্যপূর্ণ হলো না। আমরা জানি না তারা ঠিক কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা করত, কী কী উৎসব উদ্‌যাপন করত কিংবা কী কী বিষয় নিষিদ্ধ ছিল তাদের সমাজে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমরা আসলে জানি না তারা ঠিক কীরকম গল্প বলত। এটাই আসলে আমাদের মানব-ইতিহাস সম্পর্কে জানাশোনার সবচেয়ে বড়ো সংকীর্ণতা।

শিকারি-সংগ্রাহকদের সামাজিক-রাজনৈতিক জগৎ সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপস্থিতি, একক পরিবার কিংবা একটিমাত্র সঙ্গীর মতো খুব মৌলিক কিছু ব্যাপারেও একমত হতে পারেননি। এটা হতেই পারে যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন রকম নিয়ম মেনে চলত। কোনো একটা গোষ্ঠী হয়তো তাদের প্রতিবেশী শিম্পাঞ্জিদের মতোই সুগঠিত, উত্তেজিত ও হিংস্র ছিল। অন্যদিকে

হয়তো অন্য কোনো গোষ্ঠী ছিল পার্শ্ববর্তী বোনোবোদের মতো অলস, শান্তিপ্রিয় আর কামুক।

৮. ল্যাসকাউ গুহার (Lascaux Cave) প্রায় ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার বছর পুরোনো একটা গুহাচিত্র। আমরা এখানে ঠিক কী দেখতে পাচ্ছি আর এই চিত্রটির মানেই-বা আসলে কী? কেউ কেউ বলে আমরা এখানে দেখতে পারি, একটা বুনো মোষ একজন মানুষকে মারছে যার মাথাটা একটা পাখির মতন আর লিঙ্গ উত্থিত। মানুষটার নিচে আমরা আরেকটা পাখি দেখতে পাচ্ছি, যেটা হয়তো মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়া আত্মার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে ছবিটা নেহাতই একটা গতানুগতিক শিকারসংক্রান্ত দুর্ঘটনার ছবি নয় বরং এই জগৎ থেকে অন্য জগতে যাওয়ার কথাও আমরা এখানে দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের জানার কোনো উপায় নেই যে আসলে এসব ধারণা আদৌ সত্য কি না। এটা অনেকটা রোর্সাক পরীক্ষার (Rorschach Test) মতো কাজ কওে, যেটা আধুনিক বিশেষজ্ঞদের পূর্বসংস্কারকেই বেশি উন্মোচিত করে, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের বিশ্বাসকে নয়।

১৯৯৫ সালে রাশিয়ার সুঙ্গির অঞ্চলে, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা প্রায় ৩০ হাজার বছর পুরোনো একটা কবরস্থান আবিষ্কার করেন, যেটা ছিল কিছু ম্যামথ-শিকারি গোষ্ঠীর। এখানকার একটি কবরে তারা খুঁজে পান ৫০ বছর বয়স্ক একজন পুরুষের কঙ্কাল। কঙ্কালটা ম্যামথের দাঁতের ৩ হাজারটা পুঁতি দিয়ে গাঁথা একটা মালা দিয়ে ঢাকা ছিল।

মৃত মানুষটির মাথায় শেয়ালের দাঁত দিয়ে সাজানো একটা টুপি ছিল আর তার কবজি জুড়ে ছিল ম্যামথের দাঁতের তৈরি ২৫টা চুড়ি। একই এলাকার অন্যান্য কবর খুঁড়ে কিন্তু এত কিছু পাওয়া যায়নি। এখান থেকে বিশেষজ্ঞরা এই যুক্তি দাঁড় করালেন যে সুঙ্গির এলাকার ম্যামথ-শিকারিরা নিশ্চয় একটা সুগঠিত সমাজব্যবস্থায় বসবাস করত। সম্ভবত ওই মৃত মানুষটি ছিল তাদের গোষ্ঠীর প্রধান। অথবা এমনও হতে পারে যে, সে আসলে ছিল অনেকগুলো গোষ্ঠী মিলে গঠিত পুরো একটি উপজাতিরই প্রধান। কারণ একটামাত্র গোষ্ঠীর অল্প কয়েক ডজন সদস্য মিলে কবরের ভেতরের এত এত সরঞ্জাম বানিয়েছে, এটাও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৯. শিকারি-সংগ্রাহকেরা এই হস্তচিত্র তৈরি করেছিল প্রায় ৯ হাজার বছর আগে আর্জেন্টিনায় 'হাতের গুহা' (Hands Cave) নামে খ্যাত একটি গুহায়। দেখে কেন যেন মনে হয়, এই মৃত লম্বা হাতগুলো ওই পাথরের ভেতর থেকে বের হয়ে আমাদের দিকে এগোচ্ছে। প্রাচীন শিকারিসমাজের ধ্বংসাবশেষ বা নিদর্শন যা-কিছু পেয়েছি আমরা, তার মধ্যে এটা অন্যতম নাড়া দেওয়ার মতো একটা ছবি– কিন্তু কেউ জানে না এর মানে কী।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এরপর আরো মজার একটা কবর খুঁজে পেলেন। এর মধ্যে ছিল মাথায় মাথায় লাগানো দুটো কঙ্কাল। একটা ছিল ১২-১৩ বছরের একটা ছেলের আর আরেকটা ছিল ৯ বা ১০ বছরের কোনো একটা মেয়ের। ছেলেটা ঢাকা ছিল প্রায় ৫ হাজার হাতির দাঁতের পুঁতি দিয়ে। তার মাথায় একটা শেয়ালের দাঁতওয়ালা টুপি ছিল আর একটা বেল্ট ছিল, যাতে প্রায় ২৫০টা শেয়ালের দাঁত ছিল (অন্তত ৬০টা শেয়ালের সব দাঁত উপড়ে ফেলতে হয়েছে অতগুলো দাঁত জোগাড় করার জন্য)। আর মেয়েটাকে সাজানো হয়েছিল ৫ হাজার ২৫০টা পুঁতি দিয়ে। দুজনেরই চারপাশে অনেক ভাস্কর্য ও হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্র ছিল। একজন খুব দক্ষ শিল্পীরও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে ওরকম একটা পুঁতি তৈরি করতে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাকি সব জিনিসের কথা বাদ দিয়েও ওই দুজন ছেলেমেয়েকে শুধু ১০ হাজার পুঁতি দিয়ে সুসজ্জিত করতে প্রায় ৭ হাজার ৫০০ ঘণ্টার নিরলস পরিশ্রমের দরকার হয়েছিল। তার মানে একজন অভিজ্ঞ শিল্পীর প্রায় তিন বছরের কঠোর পরিশ্রম! ভাবা যায়?

এই যে ছেলেমেয়ে দুটো, তারা নিশ্চয় অত ছোটো বয়সেই নেতা হয়ে যায়নি কিংবা পাকা ম্যামথ-শিকারিও হয়নি। তাহলে কেন তাদের ওরকম বাড়াবাড়ি রকমের সাজসজ্জা করে কবর দেওয়া হয়েছে, সেটা আসলে শুধু তাদের সাংস্কৃতিক আচার-বিচার থেকেই জানা যাবে। একটা তত্ত্বমতে, তারা হয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের বাবা-মায়ের পদমর্যাদার ভাগীদার ছিল। সম্ভবত, তারা গোষ্ঠীর দলপ্রধানের ছেলেমেয়ে ছিল এবং সেটা এমন একটা সমাজে, যেখানে পারিবারিক কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের চল ছিল। অন্য আরেকটা তত্ত্ব অনুসারে, ওই ছেলেমেয়ে দুটোকে হয়তো জন্মের সময়ই কোনো মৃত আত্মার পুনরুত্থান হিসেবে দেখা হয়েছে। তৃতীয় একটা তত্ত্ব বলে, তাদের কবরের এত এত কারুকাজ আসলে সমাজে তাদের অবস্থান নয় বরং তাদের মৃত্যুর ধরনটাই জানান দেয়। তাদেরকে হয়তো রীতি অনুযায়ী বলি দেওয়া হয়েছিল, হয়তো-বা তাদের দলপ্রধানের দাফনের আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবেই। তারপর দাফন করা হয়েছিল মহা ধুমধামের সঙ্গে।[৭]

একদম সঠিক উত্তর যা-ই হোক না কেন, ৩০ হাজার বছর আগেও যে সেপিয়েন্স এমন সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে সমর্থ ছিল তার একটা দুর্দান্ত প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে এই সুঙ্গির ছেলেমেয়ে দুটোর কবর। সেপিয়েন্সের এই বৈশিষ্ট্যটা পরবর্তী সময়ে বহু দূর অব্দি গড়িয়ে একটা আচরণগত বৈশিষ্ট্যে রূপ নিয়ে আমাদের ডিএনএর মধ্যে পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছে! শুধু আমাদেরই নয়, আমাদের মতো অন্যান্য কিছু প্রাণীর ডিএনএতেও এই বৈশিষ্ট্যটা জায়গা করে নিয়েছে।

যুদ্ধ নাকি শান্তি?

এতক্ষণ আমরা আমাদের পূর্বসূরি শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় আচার-আচরণ, সমাজকাঠামো এইসব ব্যাপারে জানলাম। এরপর যে কঠিন প্রশ্নটা আমাদের সামনে চলে আসে তা হলো– শিকারি-সংগ্রাহকদের সমাজে যুদ্ধের ভূমিকা ঠিক কেমন ছিল? কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের সমাজ ছিল একদম স্বর্গসুখে ভরপুর। তারা দাবি করেন, যুদ্ধ আর হিংস্রতার উদ্ভবই হয়েছিল কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে, যখন মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি জমা করতে শুরু করেছিল। আবার, অন্যকিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের জগৎটা ছিল খুব নির্দয় আর ভয়ংকর রকমের হিংস্র। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই দুই দলের চিন্তাভাবনাই আসলে শূন্যের ওপর তৈরি প্রাসাদের মতো, যেটা মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খুবই সরু এক সুতো দিয়ে। আর সেই সরু সুতো হলো কিছু দুর্বল প্রত্নতত্ত্বীয় ধ্বংসাবশেষ আর আধুনিক শিকারি-সংগ্রাহকদের ওপর নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ।

নৃতাত্ত্বিক প্রমাণগুলো খুব আগ্রহোদ্দীপক কিন্তু খুবই ঝামেলাপূর্ণও বটে। এখনকার শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠীগুলো মূলত পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবেই বসবাস করে। তার ওপর, তাদের বসবাসের জায়গাগুলোও খুবই প্রতিকূল– যেমন, উত্তর মেরু অথবা কালাহারি মরুভূমি যেখানে মানুষের বসতি প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং অন্য মানুষের সঙ্গে মারামারি করার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। এ ছাড়া ইদানীংকালের শিকারি-সংগ্রাহকেরাও রাষ্ট্রের সীমারেখার বাইরে নয়,

ফলে বড়োসড়ো দাঙ্গা লাগার সম্ভাবনাও থাকে না। ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা মাত্র দুটো সুযোগ পেয়েছেন বড়ো কিংবা অপেক্ষাকৃত ঘনবসতিপূর্ণ স্বাধীন শিকারি-সংগ্রাহক সমাজকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার। সে দুটোর একটা হলো উনিশ শতকে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আর অন্যটি উনিশ শতকের শেষ বা বিশ শতকের গোড়ার দিকে উত্তর অস্ট্রেলিয়ায়। অ্যামেরিন্ডিয়ান (Amerindian) আর অ্যাবোরোজিনাল অস্ট্রেলিয়ান (Aboriginal Australian) সংস্কৃতি দুটোই খুব ঘন ঘন সশস্ত্র যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। এটা অবশ্য তর্কসাপেক্ষ যে এখান থেকে কি আমরা কোনো সাধারণ সময়ের চিত্র পেলাম, নাকি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব দেখতে পেলাম।

প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারগুলো নেহাতই অপ্রতুল ও অস্পষ্ট। ১০ হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া কোনো এক যুদ্ধের কীই-বা তথ্য-প্রমাণ থাকবে? সেই সময়ে তো দুর্গ কিংবা দেওয়ালের চল ছিল না। এমনকি সৈন্যদের ব্যারাক বা ঢাল-তলোয়ারও ছিল না। প্রাচীন কোনো একটা বর্শা পেলে আমরা মনে করতে পারি, সেটা হয়তো-বা যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু ওটা আবার শিকারের কাজের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। এদিকে আবার ফসিলে পরিণত হয়ে যাওয়া মানুষের হাড় থেকে তথ্য উদ্‌ঘাটন করাও কম দুরূহ কাজ নয়। সেই হাড়ে যুদ্ধের কারণেও চিড় ধরতে পারে, আবার কোনো দুর্ঘটনার কারণেও হতে পারে। আমরা যদি প্রাচীন কোনো কঙ্কাল পাই আর আবিষ্কার করি সেটার কোনো হাড় ভাঙা বা ফাটা নয় আর তাতে কোনো কাটার দাগও নেই, তার পরও আসলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না যে মানুষটা কোনো নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়নি। মানুষটা চূড়ান্ত আতঙ্কেও মারা যেতে পারে, যেটা হাড়ে কোনো প্রমাণ রাখবে না। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, শিল্পবিপ্লবের আগের যেসব যুদ্ধ হতো, তাতে যারা মারা যেত তাদের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই মারা যেত আসলে দুর্ভিক্ষে, শীতে আর নানা রকম রোগে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যখন এইসব মৃত মানুষের কঙ্কালের সন্ধান পাবে তারা হয়তো খুব সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে এই সব মানুষগুলো হয়তো কোনো এক বিরাট প্রাকৃতিক

দুর্যোগে মারা গিয়েছিল। কীভাবে আমরা বুঝতে পারব যে ওরা আসলেই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল?

সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে সমস্ত সতর্কতার বিষয়টা পরিষ্কার করার পর এখন আমরা কিছু প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারের দিকে তাকাতে পারি। পর্তুগালে কৃষিবিপ্লব শুরুর ঠিক আগেকার প্রায় ৪০০ কঙ্কাল নিয়ে একসময় একটা জরিপ করা হয়। সেখানে মাত্র দুটো কঙ্কালে স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। একইরকমভাবে একই সময়ে ইসরায়েলের দিকে আরো ৪০০ কঙ্কালের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, মাত্র একটা কঙ্কালে একটা মাত্র গর্ত যেটাকে আসলে মানুষের প্রতিহিংসার চিহ্ন বলা যায়। তৃতীয় আরেকটা জরিপ চালানো হয় কৃষিপূর্ব দানিয়ুব উপত্যকায় আরো ৪০০ কঙ্কালের ওপর। সেখানে ১৮টা কঙ্কালে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। ৪০০টার মধ্যে ১৮ সংখ্যায় খুব কম শোনালেও এটা আসলে বেশ বড়ো একটা শতকরা অংশ। যদি সত্যিই ১৮ জন প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মারা গিয়ে থাকে, তার মানে শতকরা প্রায় ৪.৫ ভাগ মৃত্যু হয়েছিল মানুষের প্রতিহিংসার কারণে। আজকের দিনে সারা পৃথিবীতে প্রতিহিংসায় মৃত্যুহার শতকরা মাত্র ১.৫ ভাগ, তাও যুদ্ধ আর অন্যান্য নৃশংসতা সব ধরে। বিংশ শতাব্দীতে সকল মানবমৃত্যুর মধ্যে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ হলো মানুষে মানুষে প্রতিহিংসার কারণে– সেটাও আবার এমন এক শতাব্দীতেই যেটাতে ভয়ংকর সব যুদ্ধ আর গণহত্যা দেখেছে বিশ্ব। সুতরাং বলা যায় সেই প্রাচীন দানিয়ুব উপত্যকার মানুষেরা আমাদের এখনকার বিংশ শতাব্দীর মানুষের মতই হিংস্র ছিল।*

এরকম হতাশাজনক আবিষ্কার যে শুধু দানিয়ুব উপত্যকাতেই পাওয়া গেছে তা নয়, আরো নানান জায়গাতেই এই একই অবস্থা। সুদানের জাবেল সাহাবাতে (Jabl Sahaba), ১২ হাজার বছরের পুরোনো একটা কবরস্থানে ৫৯টা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। শতকরা

---

* দানিয়ুবের ওই পুরো ১৮টা কংকালই যে প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মারা গেছে সেটাও কিন্তু তর্কসাপেক্ষ। কেউ কেউ শুধু আঘাতপ্রাপ্ত ছিল। অবশ্য আমরা যদি নানান রকমের অজ্ঞাত আতঙ্কের কারণে মৃত্যুর কথা বিবেচনা করি, তাহলে ব্যাপারাটা কাটাকাটি হয়ে যায়।

হিসাবে এর প্রায় ৪০ শতাংশ, মানে ২৪টা কঙ্কালের গায়ে তির বা বর্শার মাথার অংশটুকু গেঁথে থাকতে দেখা গেছে। একজন নারীর দেহাবশেষে তো ১২টা আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গেছে। বাভারিয়ার ওফনেট গুহায় (Ofnet Cave in Bavaria) প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ৩৮ জন শিকারি-সংগ্রাহকের দেহাবশেষ উদ্ধার করেন, যাদের বেশিরভাগই ছিল নারী ও শিশু। তাদের সবাইকে দুটো আলাদা গর্তে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। সেসবের প্রায় অর্ধেক দেহাবশেষেই মানুষের তৈরি অস্ত্রের দ্বারা আঘাতের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল একেবারে ছোটো শিশু। কিছু কিছু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জঘন্য রকমের নৃশংসতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সব রকমের সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনা করেই, এসব আলামত থেকে এটা স্পষ্ট যে, একটা পুরো শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠী এই জায়গায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে কোনটা আসলে প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের জগৎ সম্পর্কে ভালো ধারণা দেয়– ইসরায়েল আর পর্তুগালে আবিষ্কার করা শান্তিময় কঙ্কালগুলো, নাকি জাবেল সাহাবা আর ওফনেটের ঐসব কসাইখানা? আসলে কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না! প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকেরা যেমন হাজারটা ভিন্ন রকম ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা করত, তাদের মধ্যে নৃশংসতার মাত্রাটাও ছিল তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কিছু কিছু জায়গা যেমন ছিল শান্ত-স্নিগ্ধ, আবার এমন কিছু জায়গাও ছিল যেখানে হরহামেশাই লেগে থাকত ভয়ংকর সব দাঙ্গা।[১০]

কবি যেখানে নীরব

প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র বের করা যদি কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে, সেই সময়কার কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়াটাও প্রায় অসম্ভব। যখন একটা সেপিয়েন্স গোষ্ঠী প্রথম কোনো একটা নিয়ান্ডার্থাল অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করেছিল, তার পরের কয়েক বছর নিশ্চয় সেখানে খুব শ্বাসরুদ্ধকর এক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই বিশাল ঘটনার তেমন কিছুই আজ আর অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। বড়োজোর

কিছু ফসিলে রূপান্তরিত হাড় আর কিছু পাথরের তৈরি জিনিসপত্র পাওয়া যেতে পারে। যেগুলোর গভীর সব অনুসন্ধানও আমাদের বিশেষ কিছু জানান দিতে পারবে না। আমরা বড়োজোর মানুষের শারীরিক গঠন, মানুষের তৈরি প্রযুক্তি, খাদ্যাভ্যাস আর সামাজিক গঠন সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারি। কিন্তু সেসব থেকে আমরা পাশাপাশি অবস্থান করা সেপিয়েন্স গোষ্ঠীর মধ্যকার রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না। সেই জোটকে আশীর্বাদ করা আত্মা আর সেই আশীর্বাদ রক্ষার জন্য দলের পুরোহিতকে গোপনে দেওয়া হাতির দাঁতের তৈরি পুঁতিগুলো সম্পর্কেও তেমন কিছু জানতে পারি না।

এই নীরবতার পর্দা প্রায় ১০ হাজার বছরের ইতিহাসকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। এই বিশাল সময়ে হয়তো অনেক যুদ্ধ আর বিপ্লব হয়েছে, দারুণ সব ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছে, গভীর সব দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে কিংবা অতুলনীয় সব শৈল্পিক নিদর্শন তৈরি হয়েছে। শিকারি-সংগ্রাহকেরা হয়তো তাদের মধ্যে বিশ্বজয়ী নেপোলিয়নকে খুঁজে পেয়েছে, যে হয়তো লুক্সেমবার্গের অর্ধেক আকারের কোনো সাম্রাজ্য শাসন করেছে। হয়তো মহা প্রতিভাধর বেথোভেনকে খুঁজে পেয়েছে তারা, যে হয়তো অর্কেস্ট্রা নয় বরং বাঁশের বাঁশির সুরমূর্ছনায় মানুষের চোখে জল এনে দিতে পারত। তারপর হয়তো মহিমান্বিত নবি কিংবা পথপ্রদর্শকের দেখা পেয়েছে যারা সারা বিশ্বের একক স্রষ্টার বদলে হয়তো এলাকার কোনো একটা ওকগাছের কাছ থেকে পাওয়া পবিত্র বাণী প্রচার করত। কিন্তু এসব আসলে শুধুই অনুমান। নীরবতার পর্দাটা এতই মোটা যে, আমরা নিশ্চিতও হতে পারি না এরকম কিছু ঘটেছিল কি না, বিশদ ব্যাখ্যা তো অনেক দূরের কথা।

বিশেষজ্ঞরা সাধারণত সেসব প্রশ্নই করেন যেগুলোর একটা মোটামুটি উত্তর তারা দিতে পারেন। উপযুক্ত গবেষণা উপকরণ বা পদ্ধতি না পেলে আমরা সম্ভবত কখনোই জানতে পারব না প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকেরা ঠিক কী বিশ্বাস করত অথবা কীরকম রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ হতো তাদের সমাজে। এর পরও আমাদের সেইসব প্রশ্ন করতে হবে যেগুলোর কোনো উত্তর আমাদের জানা নেই। তা না হলে, আমরা হয়তো প্রায় ৬০ হাজার থেকে ৭০ হাজার

বছরের ইতিহাস আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে অনুপ্রাণিত হব এই অজুহাত দিয়ে যে 'সেই সময়কার মানুষজন তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছুই করেনি'।

সত্যিটা হলো তারা আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই করেছে। বিশেষ করে বলতে গেলে, যতটা না বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে পারে, তার চেয়েও ঢের বেশি মাত্রায় বদলে ফেলেছিল তারা আমাদের চারপাশের জগৎটাকে। সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল, মধ্য অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এলাকা আর আমাজনের জঙ্গলের অভিযাত্রীদের বিশ্বাস, তাঁরা এমন কিছু আদিম জায়গায় প্রবেশ করতে পেরেছেন, যেখানে কোনো মানুষের স্পর্শ পড়ার সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু এটা আসলে একটা ভ্রম মাত্র। শিকারি-সংগ্রাহকেরা আমাদের বহু আগে এই পৃথিবীতে বসবাস করে গেছে। এটা হতেই পারে যে তারা পৃথিবীর গভীরতম জঙ্গল কিংবা সবচেয়ে জনমানবশূন্য এলাকাতেও নিজেদের বসতি গেড়ে নিজেদের মতো করে পরিবর্তন এনেছে। এর পরের অধ্যায়ে আমরা জানতে পারব, কীভাবে প্রথম কৃষিনির্ভর গ্রাম প্রতিষ্ঠার বহু আগেই সেইসব শিকারি-সংগ্রাহকেরা পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র বদলে দিয়েছিল। কল্পকাহিনি তৈরি করতে পারা আর ঘুরে ঘুরে বেড়ানো সেইসব সেপিয়েন্স গোষ্ঠীগুলোকেই আসলে বলা যায়, প্রাণিজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ধ্বংসাত্মক শক্তি।

অধ্যায় ৪

অগণন মানুষের স্রোত

বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের আগে মানুষের সবগুলো প্রজাতিরই বসবাস আফ্রো-এশিয়ান ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ কথা সত্যি, তখন সাঁতরে কিংবা ভেলায় চড়ে যাওয়া যায়, এমন কিছু ভূখণ্ডেও মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন বলা যায়, ফ্লোরেস দ্বীপে মানব-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় সাড়ে ৮ লাখ বছর আগে। তবে মানুষ তখনো আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মতো ভূখণ্ড বা মাদাগাস্কার, নিউজিল্যান্ড আর হাওয়াইয়ের মতো দ্বীপগুলোতে পৌঁছাতে পারেনি।

শুধু যে মানুষই আফ্রো-এশিয়ান এলাকায় আটকে ছিল তা নয়, অন্যান্য সব প্রাণীও আটকে পড়েছিল সেখানে। আর তার একটা বড়ো কারণ ছিল সমুদ্র পার হওয়ার বাধা। এ কারণেই অস্ট্রেলিয়া বা মাদাগাস্কারের মতো জায়গাগুলোতে লাখ লাখ বছর ধরে বিবর্তনের ধারা ছিল আলাদা, সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলোও ছিল আকৃতি-প্রকৃতিতে আফ্রো-এশিয়ান প্রজাতির চেয়ে অন্যরকম। এইভাবেই পুরো পৃথিবীটা নিজস্ব উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমারোহে গড়ে ওঠা কয়েকটা পৃথক বাস্তুতন্ত্রে বিভক্ত ছিল। এরপর মানুষ এই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর মানুষের হাতে যে শুধু প্রযুক্তি আর সাংগঠনিক দক্ষতা এলো তা-ই নয়, সেই সঙ্গে আফ্রো-এশিয়ান ভূখণ্ড ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে যাত্রা করার জন্য প্রয়োজনীয় দূরদর্শিতাও পেল তারা। তাদের অর্জন শুরু হলো ৪৫ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। বিশেষজ্ঞদের জন্য এটা ব্যাখ্যা করাটা একটু কঠিন, কারণ কাজটা মানুষের জন্য মোটেই

সহজ ছিল না। অস্ট্রেলিয়াতে পৌঁছাতে মানুষকে পার হতে হয়েছে ছোটো-বড়ো অনেক সামুদ্রিক প্রণালি, আর তারপর খুব দ্রুত নিজেদের খাপ খাওয়াতে হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশে।

এ বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারণাটা অনেকটা এমন– প্রায় ৪৫ হাজার বছর আগে যেসব মানুষ ইন্দোনেশিয়ান আর্কিপেলাগোতে (এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে সরু প্রণালি দিয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জ) বসবাস করত, তারাই প্রথম সমুদ্রপথে যাতায়াত শুরু করে। তারা সমুদ্রে চলার উপযোগী নৌকা তৈরি করতে শেখে। তারপর মাছ ধরতে, ব্যবসায় করতে কিংবা আবিষ্কারের জন্য আরো দূরে যেতে শুরু করে। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রায় কিছু অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। সিল, সামুদ্রিক গোরু বা ডলফিনের মতো সব সমুদ্রচারী স্তন্যপায়ী প্রাণীই বহু যুগের বিবর্তনে পেয়েছে জলজ জীবনের উপযুক্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার মানুষেরা সম্পূর্ণ নতুন এক উপায় আবিষ্কার করল। তারা ছিল আফ্রিকান তৃণভূমির নরবানরের (Ape) বংশধর। সমুদ্র পাড়ি দিতে তাদের মাছের মতো পাখনা কিংবা তিমির মতো মাথার প্রয়োজন হলো না। বরং তারা শিখে ফেলল কীভাবে নৌকা বানাতে হয়, আর কীভাবে সেটা চালাতে হয়। এই নতুন অর্জিত দক্ষতাই একদিন তাদের পৌঁছে দিল অস্ট্রেলিয়ায়।

এটা ঠিক যে পুরাতত্ত্ববিদেরা এখনো ৪৫ হাজার বছর আগের কোনো নৌকা, দাঁড় কিংবা কোনো জেলে গ্রামের নিদর্শন এখনো খুঁজে পাননি। অবশ্য পাওয়া খুব সহজও নয়, কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধির কারণে সেই প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ার তটরেখা আজ কয়েকশ মিটার পানির নিচে। তবু এই ধারণার পক্ষে জোরালো প্রামাণ্য যুক্তি আছে। অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপনের কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানুষ উত্তরের অনেক ছোটো ছোটো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে উপনিবেশ তৈরি করে। এর মধ্যে বুকা (Buka) আর মানুস (Manus)-এর মতো কিছু দ্বীপ ছিল নিকটতম ভূখণ্ড থেকেও প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে। উন্নত ধরনের নৌকা ও তা চালানোর দক্ষতা ছাড়া সেখানে যাওয়াটা অবিশ্বাস্য। একই ধরনের সামুদ্রিক যাতায়াতের প্রমাণ পাওয়া যায় নিউ আয়ারল্যান্ড আর নিউ ব্রিটেন দ্বীপের মধ্যেও।[১]

মানুষের অস্ট্রেলিয়া যাত্রা ইতিহাসের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কলম্বাসের আমেরিকা যাওয়া বা অ্যাপোলো এগারোর চাঁদে যাওয়ার চেয়ে সেটা কোনো অংশে কম নয়। ওটাই প্রথমবারের মতো কোনো মানুষের তথা কোনো স্থলচারী স্তন্যপায়ী প্রাণীর আফ্রো-এশিয়ান ভূখণ্ডের বাইরে কোথাও যাওয়া। তবে ঘটনাটা তার চেয়েও বেশি গুরুত্ববহ অন্য একটা কারণে। এই অভিযানের মধ্য দিয়েই শিকারি মানুষ খাদ্যশৃঙ্খলের সবচেয়ে ওপরে উঠে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করল পৃথিবীর নৃশংসতম প্রাণীরূপে।

এতদিন পর্যন্ত মানুষ নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলেছে, পরিবেশকে নিজের মতো করে পালটে দেওয়ার তেমন কোনো চেষ্টা করেনি। পরিবেশের বড়ো কোনো পরিবর্তন না করেই বিভিন্ন রকম স্থান ও পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে দারুণ সাফল্য দেখিয়েছে মানুষ। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া 'জয়' করা এই মানুষেরা শুধু নিজেরাই বদলাল না, সঙ্গে সঙ্গে আমূল পালটে দিল অস্ট্রেলিয়ার আদিম পরিবেশও।

অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতীরের বালিতে মানুষের আঁকা প্রথম পদচিহ্নটি সঙ্গে সঙ্গেই মুছে দিয়েছিল সমুদ্রের স্রোত, কিন্তু পরবর্তীকালে এই মানুষেরাই সেখানে রেখে এসেছে এমন এক চিহ্ন, যা সময়ের স্রোত মুছতে পারবে না আর কখনোই। অস্ট্রেলিয়া তখন এক অদ্ভুত অকল্পনীয় জগৎ। সেখানে তখন ঘুরে বেড়াত ২০০ কেজি ওজনের দুই মিটার লম্বা ক্যাঙ্গারু, আর এখনকার বাঘের মতোই বড়ো আকারের মার্সুপিয়াল সিংহ ছিল সেখানকার সবচেয়ে বড়ো শিকারি প্রাণী। বিশাল আকারের কোয়ালার দেখা মিলত গাছে, তবে এখনকার মতো তারা ছোটোখাটো আদুরে চেহারার ছিল না মোটেই। উটপাখির দ্বিগুণ আকারের উড়তে-না-পারা পাখিরা ছুটে বেড়াত খোলা প্রান্তরে, ড্রাগনের মতো গিরগিটি আর মিটার-পাঁচেক লম্বা সাপেরা কিলবিলিয়ে চলত গহিন বনের তলে। জঙ্গল দাপিয়ে বেড়াত প্রকাণ্ড ডিপ্রোটোডন আর আড়াই টন ওজনের উমব্যাট। পাখি আর সরীসৃপ ছাড়া বাকি সব প্রাণীই ছিল মার্সুপিয়াল। মার্সুপিয়াল বলা হয় সেইসব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের, যারা ক্ষুদ্র অপরিণত শিশুর জন্ম দিয়ে তাদের পরিপুষ্ট করে

তুলত পেটের সামনের থলিতে রেখে। আফ্রিকা আর এশিয়াতে এমন কোনো প্রাণী ছিলই না, অথচ অস্ট্রেলিয়াতে তারাই ছিল সর্বেসর্বা।

পরের কয়েক হাজার বছরে এই দানবাকৃতি প্রাণীদের সবাই একরকম হারিয়েই গেল। ৫০ কিলোগ্রামের বেশি ওজন হয় এমন ২৪টি প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে ২৩টিই বিলুপ্ত হয়ে গেল।[২] ভেঙে পড়ল অস্ট্রেলিয়ার খাদ্যশৃঙ্খল, আবার তা গড়েও উঠল নতুন করে। অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশে লাখ লাখ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল এটাই। এর দায় কি সবটুকুই মানুষের?

মানুষের দায়

অনেক বিশেষজ্ঞই এই বিলুপ্তির দায় বরাবরের মতো জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনের ওপরে চাপিয়ে মানুষকে নির্দোষ দেখাতে চান। তবে মানুষ যে সম্পূর্ণ নির্দোষ, এই কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনটি প্রমাণের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর দোষ চাপানো যুক্তিগুলো ধোপে টেকে না, বরং সেটা এসে পড়ে আমাদেরই পূর্বপুরুষদের ওপর।

প্রথমত, ৪৫ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুতে যে পরিবর্তন হয় তা এমন কোনো আকাশ-পাতাল পরিবর্তন ছিল না। আর শুধুই জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য এই বিপুল বিলুপ্তি– এটা কষ্টকল্পনা। ইদানীং সবকিছুর জন্যই জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা হলেও, এটা সত্য যে পৃথিবীর জলবায়ু কখনোই স্থির ছিল না। পরিবর্তনের ধারা এখানে চিরন্তন। ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাই কোনো না কোনো জলবায়ু পরিবর্তনের সাক্ষী।

আমাদের এই গ্রহটিকে অসংখ্য তাপ-শৈত্যের চক্রের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। গত ১০ লাখ বছরের মধ্যে প্রতি ১ লাখ বছরে গড়ে একবার করে বরফ যুগ পার করে এসেছে পৃথিবী। এর মধ্যে সর্বশেষটি শুরু হয় প্রায় ৭৫ হাজার বছর আগে, আর সেটা চলেছিল ১৫ হাজার বছর আগ পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে পৃথিবী শীতলতম অবস্থায় পৌঁছেছিল দুবার– একবার প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে, আরেকবার প্রায় ২০ হাজার বছর আগে। অস্ট্রেলিয়ায়

ডিপ্রোটোডনের আবির্ভাব হয় ১৫ লাখ বছর আগে, অন্তত ১০টি বরফ যুগ পার করেও টিকে ছিল তারা। এমনকি ৭০ হাজার বছর আগের সর্বশেষ বরফ যুগের শীতলাবস্থার সময়ও ডিপ্রোটোডনের অস্তিত্ব ছিল। তাহলে ৪৫ হাজার বছর আগে তাদের আর দেখা গেল না কেন? শুধু ডিপ্রোটোডনই যদি বিলুপ্তির শিকার হতো, তাহলেও হয়তো সেটাকে কাকতাল বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু শুধু তো ডিপ্রোটোডন নয়, একই সঙ্গে হারিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার প্রাণিকুলের ৯০ শতাংশেরও বেশি। মানুষও অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাল, আর ঠিক সেই সময়টাতেই সেখানকার এতগুলো প্রাণী মারা যাচ্ছিল ঠান্ডায়– এও কি কাকতালীয়? নিশ্চয়ই নয়।[৩]

দ্বিতীয় যুক্তি হলো, জলবায়ু পরিবর্তনেই যদি এই সর্বগ্রাসী বিলুপ্তি এসে থাকে, তাহলে তা জলে-স্থলে একসঙ্গেই আসার কথা। কিন্তু ৪৫ হাজার বছর আগে কোনো সামুদ্রিক প্রাণীর বিলুপ্তির চিহ্ন মেলে না। কাজেই মানুষের আগমন এর একটা কারণ হতে পারে বইকি। কারণ সমুদ্র-বিচরণে তখনো পটু হয়ে না উঠলেও তখনকার মানুষ ডাঙায় ছিল এক প্রবল হুমকি।

তৃতীয়ত, অস্ট্রেলিয়ার মতো একই রকম ঘটনা পরের সহস্রাব্দগুলোতেও ঘটেছে; আর সেগুলো ঘটেছে সেসব জায়গাতেই যেখানে মানুষ গেছে। কাজেই সেক্ষেত্রেও মানুষ দায়মুক্ত হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নিউজিল্যান্ডের প্রাণিকুলের কথা। ৪৫ হাজার বছর আগের তথাকথিত 'জলবায়ু পরিবর্তন' যাদের কিছুই করতে পারেনি, তারাই একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল মানুষ ওই দ্বীপে পা রাখতেই। নিউজিল্যান্ডের প্রথম জনগোষ্ঠী মাওরিরা ওখানে পৌঁছায় প্রায় ৮০০ বছর আগে। এর পরের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ওখানকার প্রাণীদের বেশিরভাগ বিলুপ্ত হয়, যার মধ্যে ছিল সব পাখি প্রজাতির ৬০ শতাংশ।

একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল উত্তর মহাসাগরে সাইবেরিয়ার উপকূল থেকে ২০০ কিলোমিটার উত্তরের র‍্যাঙ্গেল (Wrangel) দ্বীপের ম্যামথগুলোকেও। লাখ লাখ বছর ধরে উত্তর গোলার্ধের অনেকটা জুড়ে ছিল এই ম্যামথরা। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তেই তারা আস্তে আস্তে সরে পড়ল– প্রথমে ইউরেশিয়ায়,

পরে উত্তর আমেরিকায়। ১০ হাজার বছর আগেও র‍্যাঙ্গেল ও উত্তর মেরুর কাছের কয়েকটা দ্বীপ ছাড়া আর কোথাও ম্যামথ ছিল না। র‍্যাঙ্গেল দ্বীপের ম্যামথরা আরো কয়েক হাজার বছর টিকে ছিল। তারপর, ৪ হাজার বছর আগে মানুষ সেখানে যেতেই তারাও হারিয়ে গেল।

এই ঘটনাগুলো শুধু অস্ট্রেলিয়ায় ঘটলেও সেটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে নিয়ে মানুষকে হয়তো ছাড় দেওয়া যেত। কিন্তু সামগ্রিক ইতিহাস বিবেচনা করে হোমো সেপিয়েন্সকে একটি খুনি প্রজাতি বলেই মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, সেই প্রস্তরযুগের হাতিয়ারকে সম্বল করে মানুষ কীভাবে অস্ট্রেলিয়াতে এত বড়ো একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাল? এর তিনটা মানানসই উত্তর পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ায় বিলুপ্ত হওয়া প্রাণীদের বেশিরভাগ ছিল বড়ো বড়ো প্রাণী। এসব বড়ো প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ঘটে ধীরগতিতে। এদের গর্ভধারণকাল হয় দীর্ঘ, আর প্রতিবার গর্ভধারণে এরা জন্ম দেয় স্বল্পসংখ্যক শিশুর। কাজেই মানুষ যদি কয়েক মাসে একটা করেও ডিপ্রোটোডন হত্যা করে, তাতেও এদের মৃত্যুহার জন্মহারের চেয়ে বেড়ে যাওয়ার কথা। এভাবেই পরের কয়েক হাজার বছরে সংখ্যায় কমতে কমতে একসময় পৃথিবীর সর্বশেষ ডিপ্রোটোডনটিও মারা গেল।[৪]

আকারে প্রকাণ্ড হলেও অস্ট্রেলিয়ার ডিপ্রোটোডন ও অন্য বড়ো প্রাণীগুলোকে হত্যা করা মানুষের জন্য খুব কঠিন হয়নি। এই দোপেয়ে আততায়ীর আচমকা আক্রমণে তারা বরাবরই ধরাশায়ী হতো। আফ্রো-এশিয়ান ভূখণ্ডে ২০ লাখ বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে মানুষ, অর্জন করেছে শিকারের সর্বোচ্চ দক্ষতা। সেই শানিত দক্ষতা কাজে লাগিয়েই প্রায় ৪ লাখ বছর আগে থেকে মানুষ বড়ো প্রাণী শিকার করতে শুরু করে। সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে আফ্রিকা আর এশিয়ার বড়ো প্রাণীগুলো মানুষের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে শিখেছিল। এজন্যই তারা মানুষ কিংবা মানুষের মতো দেখতে সব প্রাণীদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখত। অস্ট্রেলিয়ার প্রাণীগুলো এই পালিয়ে বাঁচার ব্যাপারটা শিখে নেওয়ার সময়ই পায়নি। মানুষকে দেখে ক্ষতিকর প্রাণী মনে হওয়ার

কোনো কারণই ছিল না। লম্বা ধারালো দাঁত কিংবা পেশিবহুল ক্ষিপ্র শরীর– এমন কোনো শারীরিক বৈশিষ্ট্য মানুষের ছিল না যে তাকে দেখে ভয় পেতে হবে। কাজেই পৃথিবীর বৃহত্তম মার্সুপিয়াল প্রাণী ডিপ্রোটোডন প্রথমবার ক্ষুদ্র মানুষকে দেখেও হয়তো পাতা চিবানোতেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। মানুষকে দেখে ভয় পেতে হবে– এই বোধটা বিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি হওয়ার কথা, কিন্তু বিবর্তিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায়নি অস্ট্রেলিয়ার প্রাণীগুলো।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা হলো, অস্ট্রেলিয়ায় আসার আগেই মানুষ আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল। নতুন এক প্রতিকূল পরিবেশে ঝোপঝাড় আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে পথ বের করে নিতে তারা সেটাই ব্যবহার করল। আবার আগুন দেখে আকৃষ্ট হওয়া প্রাণীগুলোও পরিণত হলো মানুষের সহজ শিকারে। সবকিছু মিলে পরের কয়েক হাজার বছরে অস্ট্রেলিয়ার বাস্তুতন্ত্র আমূল বদলে গেল।

এই কারণটার পক্ষে একটা জোরালো প্রমাণ হলো অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভিজ্জ জীবাশ্ম। ৪৫ হাজার বছর আগের অস্ট্রেলিয়ায় ইউক্যালিপটাস গাছ ছিল বিরল। কিন্তু মানুষের আগমনের পর থেকে শুরু হলো ইউক্যালিপটাসের স্বর্ণযুগ। ইউক্যালিপটাস গাছ আগুন প্রতিরোধী, তাই মানুষের সাহায্যে অস্ট্রেলিয়ার বনাঞ্চলে শুরু হলো ইউক্যালিপটাসের একচ্ছত্র রাজত্ব।

উদ্ভিদ জগতের এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ল প্রাণিজগতে– তৃণভোজী ও মাংসাশী উভয়ের ওপর। কোয়ালাদের প্রধান খাদ্য ছিল ইউক্যালিপটাসের পাতা, তাই তাদের আর খাবারের কোনো অভাবই রইল না, কিন্তু বেশিরভাগ প্রাণীই পড়ল মহাবিপদে। খাদ্য-খাদকের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক ভেঙে পড়ল, ফলে দুর্বল প্রজাতিগুলো আরো এগিয়ে গেল বিলুপ্তির পথে।[৫]

তৃতীয় ব্যাখ্যাটা বলে, অস্ট্রেলিয়ার প্রাণী-বিলুপ্তিতে মানুষের শিকার ও আগুনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য কারণ হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারটাকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। ৪৫ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুতে চলমান পরিবর্তন সেখানকার পরিবেশের ভারসাম্যকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল, যা প্রাণীদেরও ঠেলে দিয়েছিল একটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়। সাধারণ

অবস্থায় তারা হয়তো ওখান থেকেও অন্যান্যবারের মতো ঘুরে দাঁড়াতে পারত, কিন্তু এবারে মানুষের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরো সংকটময় করে তোলে। প্রতিকূল আবহাওয়া আর শিকারি মানুষের দ্বিমুখী আক্রমণে তাদের আর শেষরক্ষা হয়নি। টিকে থাকার কোনো কৌশল আয়ত্তে আনার আগেই শেষ হয়ে গেল তারা।

এই তিনটি কারণের মধ্যে কোনটা যে সত্যিই দায়ী, সেটা আরো বেশি তথ্য-প্রমাণ হাতে না পেলে নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু তার পরও এটুকু বলা যায় যে, যদি মানুষ অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃতিতে এতখানি হস্তক্ষেপ না করত, তাহলে হয়তো আজও সেখানে মার্সুপিয়াল সিংহ, ডিপ্রোটোডন কিংবা বিরাট আকারের ক্যাঙ্গারুর দেখা পাওয়া যেত।

শ্লথদের বিলুপ্তির পথে যাত্রা

অস্ট্রেলিয়ার প্রাণী-বিলুপ্তি সম্ভবত পৃথিবীতে মানুষের প্রথম বড়ো 'কীর্তি'। পরবর্তী সময়ে আমেরিকাতেও একই রকম বিপর্যয় ঘটেছে, আরো বড়ো আকারে। মানব-প্রজাতিগুলোর মধ্যে হোমো সেপিয়েন্সই প্রথম পশ্চিমে পৌঁছায় প্রায় ১৬ হাজার বছর আগে, অর্থাৎ ১৪ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে। তারা পৌঁছেছিল পায়ে হেঁটে, কারণ তখন সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচু ছিল বলে উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়া ও উত্তর-পশ্চিম আলাস্কাকে জুড়ে দেওয়া পথটুকু তখনো পানিতে ডুবে যায়নি। তাই বলে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার চেয়ে একটুও সহজ ছিল না এই যাত্রা। মানুষকে তখন টিকে থাকতে হয়েছে মেরুবলয়ের চরম আবহাওয়ায়, যেখানে শীতে সূর্যের দেখাই পাওয়া যায় না আর তাপমাত্রা মাঝে মাঝে শূন্যের নিচে ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায়।

এর আগে মানুষের কোনো প্রজাতিই উত্তর সাইবেরিয়ার মতো শীতল জায়গায় যেতে পারেনি, এমনকি শীতসহিষ্ণু নিয়ান্ডার্থালরাও নয়। অথচ আফ্রিকার তৃণভূমির গরমে অভিযোজিত হোমো সেপিয়েন্সরাই তাদের উদ্ভাবনী কৌশলে সেই বরফের দেশে টিকে গেল। শীতল আবহাওয়ায় যেতে যেতেই তখনকার যাযাবর মানুষ পশম আর চামড়া সেলাই করে বরফের ওপর চলার জুতা আর

পোশাক তৈরি করতে শিখল। তাদের শিকারের অস্ত্র ও কৌশল দুইই উন্নত হলো, আর সেটা কাজে লাগল ম্যামথের মতো বড় প্রাণী শিকার করতে। গরম কাপড় আর উন্নত শিকার কৌশল– এই দুইয়ের ওপর ভরসা করেই মানুষ আরো শীতল স্থানে যেতে সাহস করল, আর তারা যতই উত্তরে গেল, তাদের দক্ষতাগুলোও বাড়তে লাগল তাল মিলিয়ে।

কিন্তু কেন? কেন সাইবেরিয়ার শীতে মানুষের এই স্বেচ্ছানির্বাসন? তাদের কেউ হয়তো গিয়েছিল যুদ্ধ থেকে পালিয়ে, কেউ জনসংখ্যার চাপে, কেউ আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচতে। আবার অনেকে ঠিক পালিয়ে নয়, বরং উত্তরে গিয়েছিল প্রাণিজ আমিষের প্রাচুর্য দেখে। তখনকার মেরুবলয় জুড়ে ছিল প্রচুর হৃষ্টপুষ্ট ম্যামথ আর বল্গাহরিণ। একটা ম্যামথ মানেই প্রচুর পরিমাণে মাংস। আর সেটা দীর্ঘকাল সংরক্ষণের জন্য বরফও ছিল অঢেল। তার সঙ্গে পাওয়া যেত চর্বি, পশম আর মূল্যবান দাঁত। সাঙ্গিরের (Sungir, মস্কো থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পূর্বে প্রাচীন মানুষের বসতি) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, ওখানকার ম্যামথ-শিকারি মানবসমাজ কষ্টেসৃষ্টে নয়, রীতিমতো প্রাণপ্রাচুর্যে বিকশিত হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে মানুষের দল ছড়িয়ে পড়ল নানাদিকে। তার ফলে ম্যামথ, ম্যাস্টোডন, গন্ডার আর বল্গাহরিণ পরিণত হতে লাগল তাদের খাদ্যে। ১৪ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে এই প্রাণীদের ধাওয়া করতে করতেই মানুষ উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে পৌঁছে গেল আলাস্কায়। আর এভাবেই যে নতুন একটা মহাদেশ আবিষ্কৃত হলো, মানুষ বা ম্যামথ কেউই সেটা বুঝতে পারেনি।

শুরুর দিকে এই পথটা বন্ধ করে রেখেছিল বিরাট হিমবাহ, তাই খুব বেশি মানুষ তার ওপারে যেতে পারেনি। তবে ১২ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রকোপে সেই বরফ গলে গিয়ে আলাস্কা যাওয়ার পথ খুলে যায়। সেই নতুন পথে মানুষ দলে দলে পাড়ি জমায় নতুন মহাদেশে। মেরু অঞ্চলের শীতে অভ্যস্ত মানুষ দ্রুতই নতুন পরিবেশ আর আবহাওয়াতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। সাইবেরিয়ার মানুষের বংশধরেরা বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব

দিকের ঘন জঙ্গল, মিসিসিপির বদ্বীপের জলাভূমি, মেক্সিকোর মরুভূমি আর মধ্য আমেরিকার বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করল। আবার কেউ কেউ চলে গেল আমাজন নদীবিধৌত এলাকায়, আন্দেজ পর্বতমালার উপত্যকায় কিংবা আর্জেন্টিনার পাম্পাস সমভূমিতে। পুরো মহাদেশে ছড়িয়ে পড়তে মানুষের সময় লেগেছিল বড়োজোর দুই হাজার বছর। ১০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই মানুষ দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণের তিয়েরা দেল ফুয়েগো (Tierra del Fuego) দ্বীপে পৌঁছায়। মানুষ এত দ্রুত আমেরিকার আদ্যোপান্ত দখল করতে পারার মূল কারণ তাদের অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা ও অভিযোজন ক্ষমতা। কার্যত বড়ো ধরনের কোনো জিনগত পরিবর্তন ছাড়াই আর কোনো প্রাণী এতরকম বৈচিত্র্যময় পরিবেশে এত দ্রুত নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি।[৬]

তবে মানুষের আমেরিকা দখলের প্রক্রিয়াটি মোটেই রক্তপাতহীন ছিল না। ১৪ হাজার বছর আগে আমেরিকার প্রাণিজগৎ এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল। আলাস্কা থেকে দক্ষিণে, কানাডা ও পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের সমভূমিতে এগিয়ে যাওয়ার পথে মানুষ সামনে পেল ম্যামথ ও ম্যাস্টোডন, ভালুকের মতো বড়ো আকারের ইঁদুর, ঘোড়া ও উটের পাল আর বিশালাকায় সিংহ। আরো ছিল এমন কিছু বিশাল প্রাণী যা আজ আর দেখা যায় না। এদের মধ্যে ছিল লম্বা দাঁতওয়ালা ভয়ংকরদর্শন বিড়াল আর প্রায় ছয় মিটার লম্বা, আট টন পর্যন্ত ওজনের স্থলচর শ্লথ। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণিকুল ছিল আরো বেশি বৈচিত্র্যময়। সেখানেও ছিল নানা রকম স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ আর পাখি। দুই আমেরিকাই ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে বিকশিত বিবর্তনের আদর্শ লীলাভূমি, যার প্রাণী ও উদ্ভিদগুলো ছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার জীবসম্ভার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কিন্তু এ সবই মানুষ ওখানে যাওয়ার আগের কথা। মানুষ যাওয়ার দুই হাজার বছরের মধ্যেই এদের বেশিরভাগ প্রজাতিই হারিয়ে গেল। এখনকার হিসাব বলে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর আমেরিকার ৪৭টি প্রজাতির মধ্যে বিলুপ্ত হয় ৩৪টি, আর দক্ষিণ

আমেরিকায় ৬০-এর মধ্যে ৫০টি। ৩ কোটি বছর ধরে টিকে থাকা লম্বা দাঁতের বিড়াল বিলুপ্ত হলো, একই পরিণতি হলো বিশাল শ্লথ আর সিংহের, আমেরিকান প্রজাতির ঘোড়া আর উটের, বিশাল ইঁদুর আর ম্যামথের। তার সঙ্গে বিলুপ্ত হলো হাজার হাজার প্রজাতির ছোটো ছোটো স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি, এমনকি পোকামাকড় আর পরজীবীও (ম্যামথ বিলুপ্ত হওয়ার পর ম্যামথের সব রকম উকুনও বিলুপ্ত হয়)।

দশকের পর দশক ধরে এসব প্রাণীর জীবাশ্ম আর দেহাবশেষের খোঁজে দুই আমেরিকার পাহাড় ও সমতলে চষে বেড়াচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। যখনই তাঁরা কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন পরম যত্নে সেগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছেন গবেষণাগারে। সেটা হতে পারে প্রাচীন আমেরিকান উটের হাড় কিংবা সেই বিরাট শ্লথের বিষ্ঠা। সেখানে প্রতিটি নমুনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে তাদের বয়স নির্ণয় করা হয়। সব গবেষণার ফল পাওয়া গেছে একই রকম– সাম্প্রতিকতম নমুনাগুলোও সেই সময়ের, যখন মানুষ প্রথম আমেরিকায় আসে, অর্থাৎ ১২ হাজার থেকে ৯ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এর পরবর্তী সময়ের নমুনা পাওয়া গেছে কেবল কয়েকটি ক্যারিবিয়ান দ্বীপে, নির্দিষ্ট করে বললে কিউবা ও হিসপানিওলায়। সেখানে পাওয়া শ্লথের বিষ্ঠা মোটামুটি ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের– ঠিক যে সময়ে মানুষ ক্যারিবিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে ওখানে পৌঁছায়।

এর পরেও কিছু বিশেষজ্ঞ এইসবের জন্য মানুষের বদলে জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করতে চান (সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় যে, ৭ হাজার বছর ধরে পশ্চিমের সব জায়গার আবহাওয়া বদলে গেলেও কোনো 'রহস্যময় কারণে' ক্যারিবিয়ান দ্বীপে বদলায়নি)। কিন্তু আমেরিকায় পাওয়া প্রমাণকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। আমরাই যে এই বিলুপ্তির জন্য দায়ী– এ সত্যকে কোনোভাবেই এড়ানো যায় না। যদি জলবায়ুর পরিবর্তন এখানে কোনো ভূমিকা রেখেও থাকে, তবু মানুষের ভূমিকা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি।[৭]

নূহের নায়ে ঠাঁই হবে কাদের?

অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার মতো মহাদেশ আর কিউবার মতো দ্বীপে প্রাণীদের যে গণবিলুপ্তি ঘটেছিল, তার চেয়ে একটু কমই ঘটেছিল আফ্রো-এশিয়ান এলাকায়। সেখানে বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোর মধ্যে হোমো সেপিয়েন্স বাদে মানুষের অন্য প্রজাতিগুলোও ছিল। এই ছোটো-বড়ো বিলুপ্তির ঘটনাগুলোকে এক সুতোয় গাঁথলে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো একটা পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কাটা এসেছিল মানুষের কাছ থেকেই। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বড়ো বড়ো লোমশ প্রাণী। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের সময়ে এই পৃথিবী প্রায় ২০০ রকমের বড়ো (৫০ কিলোগ্রামের বেশি ওজনের) স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবাস ছিল, আর কৃষিবিপ্লব আসার পর ছিল শখানেকের মতো। লেখালেখি করতে শেখা, চাকা আবিষ্কার কিংবা লোহার জিনিস বানাতে শেখার অনেক আগেই মানুষ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাণীদের অর্ধেকটা।

কৃষিবিপ্লবের পরও সেই একই নাটক বারবার মঞ্চস্থ হয়েছে পৃথিবীর অসংখ্য দ্বীপে, আরেকটু ছোটো আকারে। বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় সে গল্পই বারবার উঠে আসে আমাদের সামনে। সে নাটকের প্রথম দৃশ্যের কুশীলব নানা রকমের প্রাণী– মানুষের কোনো ভূমিকা সেখানে নেই। দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘটে মানুষের আগমন (যার প্রমাণ মেলে মানুষের হাড়, বর্শার ফলা কিংবা মাটির পাত্রের টুকরোয়), আর তৃতীয় দৃশ্যে মঞ্চ জুড়ে কেবলই মানুষ, আর ছোটো-বড়ো অনেক প্রাণী তখন উধাও।

একটা ভালো উদাহরণ পাওয়া যায় আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ৪০০ কিলোমিটার পূর্বের দ্বীপ মাদাগাস্কারে। লাখো বছরের বিবর্তনে এই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছিল সেখানকার স্বতন্ত্র প্রাণিজগৎ। সেখানে ছিল ‘এলিফ্যান্ট বার্ড’ নামের উড়তে না পারা পাখি, তিন মিটার উচ্চতা আর আধা টন ওজন নিয়ে এরাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পাখি। সঙ্গে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মেরুদণ্ডী

প্রাণী প্রকাণ্ড লেমুর। দেড় হাজার বছর আগে এরকম অনেকগুলো বড়ো প্রাণী একেবারে হঠাৎ করেই যেন হারিয়ে গেল– ঠিক মানুষ ওখানে পা রাখার পরপরই।
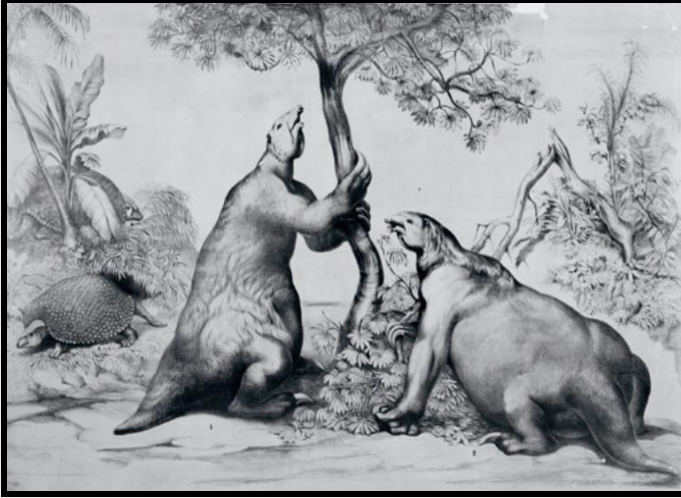
১০. দুটি প্রকাণ্ড শ্লথ (মেগাথেরিয়াম) আর তাদের পেছনে দুটি প্রকাণ্ড আর্মাডিলো। অধুনালুপ্ত এই আর্মাডিলো লম্বায় প্রায় তিন মিটার আর ওজনে দুই টন পর্যন্ত হতো। শ্লথগুলোর উচ্চতা ছয় মিটার পর্যন্তও হতো, আর ওজন হতো প্রায় আট টন।

প্রশান্ত মহাসাগরে গণবিলুপ্তির প্রথম আঘাতটা আসে প্রায় ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে। এ সময়েই পলিনেশিয়ার কৃষকেরা সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি আর নিউ ক্যালিডোনিয়ায় বসতি স্থাপন করে। তারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শত শত প্রজাতির পাখি, পোকামাকড়, শামুকসহ স্থানীয় নানা প্রাণীকে শেষ করে ফেলে। এই বিলুপ্তির ঢেউ এগিয়ে যায় উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে – আর মুছে দিয়ে যেতে থাকে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর প্রাণীদের। ক্রমশ এর ফলাফল দেখা যায় ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সামোয়া ও টোঙ্গায়, প্রথম খ্রিষ্টাব্দে মার্কুইস দ্বীপপুঞ্জে, ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ইস্টার দ্বীপ, কুক দ্বীপপুঞ্জ ও হাওয়াইয়ে, আর সবশেষে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে নিউজিল্যান্ডে।

ঠিক একই রকমের ঘটনা ঘটেছে আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আরো হাজার হাজার দ্বীপে। পুরাতত্ত্ববিদেরা একেবারে ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোতেও এর প্রমাণ পেয়েছেন। সেসব দ্বীপেও এমন সব পাখি, পোকা আর শামুকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থেকেও মানুষের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু হাতে-গোনা কয়েকটা অত্যন্ত দুর্গম দ্বীপ আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের নজর এড়িয়ে ছিল। এমনই একটা বিখ্যাত দ্বীপ গালাপাগোস, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত মানুষ সেটাকে দেখেনি। সেখানকার প্রাণিজগৎ তখনো মানুষের হাতে পড়েনি, তাই সেখানে পাওয়া গেল বিশাল আকারের কচ্ছপ, যারা প্রাচীন ডিপ্রোটোডনের মতোই মানুষ দেখে ভয় পায় না।

যে বিলুপ্তির প্রথম ধাক্কাটা এসেছিল শিকারি মানুষের হাত ধরে, তারই দ্বিতীয় ধাক্কাটা আসে কৃষক মানুষের কাছ থেকে। সেটা দেখে তৃতীয় ধাক্কাটার আভাস পাওয়া যায়, সেটা এখন চলমান আছে, এই শিল্পযুগে। পরিবেশবাদীরা যতই বলুক আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতির প্রতি বৈরী ছিল না, কথাটা মোটেই ঠিক নয়। আজকের এই শিল্পযুগ আসার অনেক আগেই মানুষ বহু প্রাণী ও উদ্ভিদকে বিলুপ্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে। নৃশংসতার বিচারে পৃথিবীর আর একটি প্রাণীও মানুষের সমকক্ষ নয়।

বিলুপ্তির প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে মানুষ যদি আরো একটু সচেতন হতো, তাহলে হয়তো তৃতীয় পর্যায়টা নিয়ে তারা এত নির্বিকার থাকতে পারত না। মানুষ যদি জানত কতগুলো প্রজাতির প্রাণীকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, তাহলে এখনো যেগুলো টিকে আছে তাদের বাঁচাতে তারা আরো একটু সচেষ্ট হতো। মহাসাগরের বড়ো প্রাণীগুলোর জন্য এই কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বুদ্ধিভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক বিপ্লবের সময়ে ডাঙার প্রাণীদের তুলনায় জলের প্রাণীদের ক্ষতি হয়েছে সামান্যই। কিন্তু এই শিল্পযুগের দূষণ আর সামুদ্রিক সম্পদে লোভী মানুষের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের কারণে

তাদের অনেকেই আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। এভাবে চলতে থাকলে সাগরের তিমি, হাঙর, টুনা আর ডলফিন হয়তো একদিন সেই প্রাচীন ডিপ্রোটোডন, শ্লথ আর ম্যামথের পরিণতিই বরণ করবে। তারপর উত্তাল স্রোতের মতো অসংখ্য মানুষই কেবল পৃথিবীতে রাজত্ব করবে, আর সেই অগণিত মানুষের মহাপ্লাবনে নূহের নৌকার প্রাণীদের মতোই টিকে থাকবে মানুষেরই পোষ মানা কিছু প্রাণী।

দ্বিতীয় পর্ব

কৃষিবিপ্লব

১১. প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার কোনো এক মিশরীয় সমাধির মধ্যে পাওয়া একটি দেওয়ালচিত্র, যেখানে দৈনন্দিন কৃষিকাজের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

অধ্যায় ৫

ইতিহাসের বৃহত্তম ফাঁকি

প্রথম পর্বে আমরা বিভিন্ন মানব প্রজাতির বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব থেকে শুরু করে কৃষিবিপ্লব পর্যন্ত আমাদের সেপিয়েন্স পূর্বপুরুষদের জীবনযাপন কেমন ছিল সেটাও কিছুটা জানার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি আমরা সেপিয়েন্সের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে আমরা খতিয়ে দেখেছি কেমন ছিল প্রায় ১০ হাজার বছর আগেকার প্রাচীন শিকারি মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাপন। পুরো পৃথিবীর বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্যের ওপর মানুষের বিপুল প্রভাব নিয়েও আমরা খানিকটা আলোচনা করেছি।

প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা সেপিয়েন্সরা দেখতে ঠিক আমাদের মতোই ছিল, আমাদের মতো করেই ভাবতে আর অনুভবও করতে পারত। ওরা সম্ভবত আমাদের মতোই বুদ্ধিমান, কৌতূহলী ও সংবেদনশীল ছিল। তারাও হয়তো তাদের মতো করে ধর্মীয় বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব আর রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এ কথা সত্য যে, আমাদের কাছে ওই সময়ের যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওসব ঘটনা একেবারেই ঘটেনি। আমরা জানি যে, কৃষিবিপ্লবের ফলে একদল প্রান্তিক কৃষক ও মজুর আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আমাদের পূর্বপুরুষ শিকারি মানুষদের জীবন অনেক দিক থেকেই তাদের উত্তরসূরি সেইসব কৃষক ও মজুরদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। এ থেকে একটি প্রশ্নের উদয় হয়– যদি শিকারি

মানুষদের সময়ে জীবন এত ভালোই ছিল, তাহলে কৃষিবিপ্লবটা হলো কেন? এই অধ্যায়ে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজব। তারপর আমরা শিকারি জীবন থেকে কৃষিভিত্তিক জীবনের এই পট পরিবর্তন, মানবসমাজ ও তার পরিপার্শ্বের ওপর কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে তা নিয়ে আলোচনা করব।

মানব-প্রজাতি প্রথম ২৫ লাখ বছর পর্যন্ত কৃষিকাজ ছাড়াই বেশ ভালো মানিয়ে নিয়েছিল। জীবনধারণের জন্য তাদেরকে কোনোরকম চাষবাস বা পশুপালন করতে হয়নি। হোমো ইরেক্টাস, হোমো ইরগেস্টার আর নিয়ান্ডার্থালরা গাছ থেকে বুনো ফলমূল পেড়ে খেত এবং বুনো ভেড়া শিকার করত। সেটা করতে গিয়ে তারা সেই সব ফলগাছ কিংবা ভেড়াদের স্বাভাবিক জীবনধারণে কোনো ধরনের ব্যাঘাত ঘটায়নি। বুনো ফলগাছগুলো কোথায় জন্মাবে অথবা ভেড়ার পালেরা কোথায় চরে বেড়াবে কিংবা কোন ছাগলটা কোন ছাগীর সঙ্গে মিলিত হবে তা নিয়ে তাদেরকে মাথা ঘামাতে হয়নি। এদিকে হোমো সেপিয়েন্সও বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের প্রায় ১০ হাজার বছর পর পর্যন্ত অন্য কোনো প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করেনি। আজকের অবস্থানে আসার জন্য হোমো সেপিয়েন্সকে অনেকগুলো সাহসী পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তারা পূর্ব আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যে, সেখান থেকে ইউরোপে, তারপরে এশিয়ায় আর সবশেষে অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকায়। কিন্তু সে সময়ে যত জায়গাতেই হোমো সেপিয়েন্স বসতি স্থাপন করেছে, সবখানেই তারা লাখ লাখ বছর ধরে টিকে থাকা মানুষের অন্যান্য প্রজাতিগুলোর মতোই জীবন যাপন করেছে। তারা জঙ্গলের উদ্ভিদ সংগ্রহ করেছে আর বুনো পশু শিকার করেছে, কিন্তু তাদেরকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেনি। আর সেটা খুব স্বাভাবিকও। যখন আপনার দৈনন্দিন জীবন আনন্দে কাটছে প্রয়োজনীয় সুষম খাবারে, বৈচিত্র্যময় সামাজিক কাঠামোয়, ধর্মীয় বিশ্বাসে আর রাজনৈতিক গতিশীলতায়, তখন কোন দুঃখে আপনি অন্য কিছু করতে যাবেন?

কিন্তু, সেপিয়েন্সের এই শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন চিরস্থায়ী হয়নি। প্রায় ১০ হাজার বছর আগে সেপিয়েন্সের জীবনে কিছু পরিবর্তন আসায় এই দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই ব্যয় করতে শুরু করে অল্প কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে। ফলে, গম, আলু, মুরগি কিংবা গোরু– মোটামুটি এই কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে সেপিয়েন্সের জীবন। এ সময়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানুষ বীজ বুনত, সেচ দিত আর আগাছা বাছত। ভেড়া, ছাগল কিংবা গোরু চরাত। মানুষ ভেবেছিল এই কাজগুলো তাদেরকে বেশি বেশি ফলমূল, শস্য ও মাংস দেবে। আর এজন্যই তারা এসবের পেছনে এতটা সময় ব্যয় করত। শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন ছেড়ে কৃষিকাজ ও পশুপালনে মনোনিবেশ করার এই পুরো ব্যাপারটি মানুষের জীবনযাপনের ধরনকে আমূল পালটে দিয়েছিল। আর এই আমূল পরিবর্তনকেই আমরা 'কৃষিবিপ্লব' বলে জানি।

শিকারি-সংগ্রাহক জীবন থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদের লালনপালন ও চাষাবাদের এই পরিবর্তনের সূচনা হয় সাড়ে ৯ হাজার থেকে সাড়ে ৮ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে। উৎপত্তিস্থল উত্তর-পূর্ব তুরস্ক, পশ্চিম ইরান আর লেভান্তের (The Levant) পাহাড়ি এলাকা। কৃষিবিপ্লব প্রথমে খুব ধীরে ধীরে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা থেকে শুরু হয়েছিল। গম আর ছাগলের চাষাবাদ শুরু হয় প্রায় ৯ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে; মটরশুঁটি আর মসুরের ডালের আবাদ শুরু হয় ৮ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে; ৫ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শুরু হয় জলপাইয়ের চাষ; ৪ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ঘোড়া প্রতিপালন করা শুরু হয় এবং আঙুরের চাষাবাদ শুরু হয় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী আরো অনেক পরে মানুষের আয়ত্তে আসে, যেমন– উট আর কাজু বাদাম। কিন্তু মোটামুটি সাড়ে ৩ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই বন্য পশুর গৃহপালিতকরণ এবং চাষাবাদের মূল জোয়ারটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আজও, এত এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকার পরও, আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরির

প্রায় ৯০ শতাংশই আসে গম, ধান, ভুট্টা, আলু, বার্লির মতো অল্প কিছু উদ্ভিদ থেকে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এইসবই কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা চাষ করা শিখে ফেলেছিল প্রায় সাড়ে ৯ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়! গত প্রায় ২ হাজার বছরে আমরা তেমন কোনো নতুন উদ্ভিদ বা প্রাণীর চাষাবাদ শুরু করিনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের মস্তিষ্ক যেমন সেই প্রাচীনকালের শিকারি-সংগ্রাহকদের মতো, তেমনি আমাদের খাদ্যাভ্যাসও সেই প্রাচীন কৃষকদের খাদ্যাভ্যাস থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। অথচ আমরা নিজেরা নিজেদের কতটাই না আধুনিক মনে করি!

বিশেষজ্ঞরা একসময় মনে করতেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলেই প্রথমে কৃষিকাজ শুরু হয় এবং সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে যায় ইউরোপ, এশিয়াসহ সারা পৃথিবীতে। কিন্তু এই মতবাদটি এখন আর তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। এখন বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কৃষিকাজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তার যাত্রা শুরু করে। মধ্য আমেরিকার মানুষেরা যখন ভুট্টা কিংবা শিমের চাষ শুরু করেছে, তারা তখন জানতই না যে তখনই বা তার আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে মটরশুঁটি কিংবা গমের চাষ চলছে। দক্ষিণ আমেরিকানরা যখন আলুর চাষ শুরু করেছিল বা লামা পোষ মানিয়েছিল তখন তারা জানতও না মেক্সিকো কিংবা লেভান্তে কী হচ্ছিল। চীনই প্রথম ধান আর ভুট্টা চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু করেছিল, একইসঙ্গে তারা শূকর পুষতেও শুরু করেছিল। যেসব গোষ্ঠী খাবার উপযোগী লাউ (Gourd) উৎপাদনের জন্য জমি নিড়াতে নিড়াতে ক্লান্ত হয়ে ওইসব বাদ দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো চাষ করা শুরু করেছিল তারাই আসলে উত্তর আমেরিকার প্রথম দিককার কৃষক। নিউ গিনির লোকেরা আখ আর কলার চাষ আয়ত্তে এনে ফেলেছিল, আর ওদিকে পশ্চিম আফ্রিকার কৃষকেরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আফ্রিকান ভুট্টা, আফ্রিকান ধান, ভুট্টা আর গমের চাষ শুরু করেছিল। এইরকম কয়েকটা জায়গা থেকে একসঙ্গে শুরু হয়ে আস্তে

আস্তে কৃষিকাজ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। এরই ফলে খ্রিষ্টের জন্মের মোটামুটি প্রথম শতকের মধ্যেই সারা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই কৃষিনির্ভর হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন কৃষিবিপ্লব মধ্যপ্রাচ্য, চীন, মধ্য আমেরিকা আর নিউ গিনির মতো নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়ই ঘটল? অস্ট্রেলিয়া বা আলাস্কার মতো অন্য কোনো জায়গায় সেটার সূচনা হলো না কেন? এই প্রশ্নের খুব সোজা উত্তর হলো, সেই সময়ে প্রাণী বা উদ্ভিদের বেশিরভাগ প্রজাতিই পোষ মানানো কিংবা চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত ছিল না। সেপিয়েন্স মাটির তলা থেকে সুস্বাদু ছত্রাক সংগ্রহ করতে পারত কিংবা পারত বিশাল পশমি ম্যামথ শিকার করতে, কিন্তু এসবের কোনোটাকেই পোষ মানানো বা চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। একদিকে ছত্রাকগুলো যেমন ছিল রহস্যময়, অন্যদিকে বড়ো বড়ো প্রাণীগুলো ছিল বেশ হিংস্র। আমাদের পূর্বসূরিরা হাজারখানেক প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে খাবার সংগ্রহ করত বা প্রাণী শিকার করত। তাদের মধ্যে মাত্র অল্প কিছু প্রজাতিই পোষ মানানো কিংবা চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত ছিল। সেই অল্প কিছু প্রজাতি মধ্যপ্রাচ্য আর মধ্য আমেরিকার মতো কিছু নির্দিষ্ট জায়গায়ই পাওয়া যেত। আর এই কারণেই কৃষিবিপ্লব অন্য কোনো জায়গায় না হয়ে ওই জায়গাগুলোতেই প্রথম ঘটে।

'কৃষির উত্থান একটি মাত্র উৎস থেকে শুরু হয়েছিল'– একসময় বিশেষজ্ঞরা শুধু এটা দাবি করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তাঁদের অন্যতম দাবি ছিল যে, কৃষিবিপ্লব ছিল মানবজাতির অগ্রসরতার পথে এক বিশাল পদক্ষেপ। অনেকের যুক্তি ছিল এই যে, বিবর্তন শত-সহস্র বছর ধরে ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি বুদ্ধিমান মানুষ তৈরি করেছে। আর মানুষ যত বেশি বুদ্ধিমান হয়েছে তারা তত ভালোভাবে প্রাণী এবং উদ্ভিদের প্রজননপদ্ধতি বুঝতে পেরেছে। এর ফলে ভেড়া, ছাগল, মুরগি, গম, আলু এবং এরকম আরো কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্র নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে মানুষ। এবং এ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যখনই তাদের রপ্ত হলো, তখনই তারা খুব আনন্দের সঙ্গে তাদের কঠিন ও ভয়ংকর

শিকারি-সংগ্রাহক জীবন ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সহজ ও শান্তির কৃষিজীবন বেছে নিল।
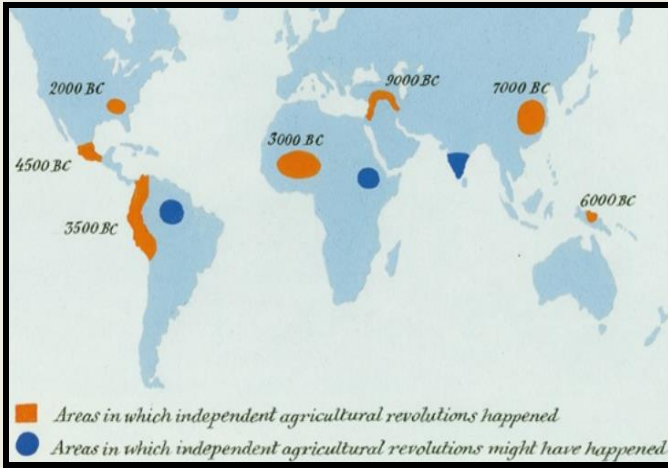
ম্যাপ ২ : কৃষিবিপ্লবের সময় ও স্থানগুলো চিহ্নিত করা আছে। তথ্যগুলো তর্কসাপেক্ষ আর মানচিত্রটা নিত্যদিনই বদলাচ্ছে নতুন নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কারণে।[১]

কয়েক যুগ আগ পর্যন্ত বেশিরভাগ মানুষই এটাই মনে করত। এমনকি আজও যারা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রসরতা সম্পর্কে খুব বেশি খবর রাখেন না তারা এই গল্পই বিশ্বাস করে বসেন। কিন্তু এই গল্পের পুরোটাই আসলে একটা কল্পকাহিনি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এখনো এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ খুঁজে পাইনি, যেটা দেখে বলা যাবে, কৃষিবিপ্লবের সময় মানুষ আরো বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছিল। বরং সত্যি হলো, শিকারি-সংগ্রাহকেরা কৃষিবিপ্লবের আরো অনেক আগে থেকেই উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রজনন পদ্ধতি সম্বন্ধে জানত। টিকে থাকার স্বার্থেই তাদের এগুলো জানতে হতো। কারণ, সে সময়ে শিকার ও ফলমূল সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে নিবিড় জ্ঞানের ওপরই তাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হতো। কোন জায়গায় কোন উদ্ভিদ জন্মায়, কোন প্রাণী কোন সময়ে বংশবৃদ্ধি করে– এগুলো না জানলে তাদের খাবার সংগ্রহ নিয়েই সমস্যায় পড়তে হতো। সুতরাং আমরা যদি এটা মনে করি যে, মানুষের

বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধি এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান কৃষিবিপ্লবের সূচনা করেছিল তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা হবে। একইভাবে, শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তর মানুষের জীবনযাত্রার মানের বিরাট উন্নতি সাধন করে– এমনটা ভাবা হবে আরো বড়ো ভুল। মোদ্দা কথা হলো, কৃষকেরা যে তাদের পূর্বসূরি শিকারিদের চেয়ে উন্নত জীবন যাপন করত, এটা ভাবা নেহাতই বোকামি। কারণ, বেশিরভাগ কৃষকের তুলনায় তাদের পূর্বসূরি শিকারি-সংগ্রাহকেরা অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন যাপন করত। তারা সুষম খাবার খেত, অপেক্ষাকৃত কম সময় কাজ করত এবং তারা কৃষকদের তুলনায় অনেক বেশি সময় মজার মজার কাজ করে কাটাত। তা ছাড়া তাদের সম্ভবত দুর্ভিক্ষ, রোগ-জীবাণু এবং মানুষের প্রতিহিংসার মতো বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হয়নি। কৃষিবিপ্লব অবধারিতভাবেই মানবজাতির পুরো খাদ্যের মজুত অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত খাবার কোনোভাবেই মানুষকে উন্নত খাদ্যাভ্যাস বা অধিক অবসর দিতে পারেনি। এই অতিরিক্ত খাবার বরং সাহায্য করেছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটাতে আর তার ফলে তৈরি হয়েছে কিছু অসৎ ও ধনী রাজা, কিছু পুরোহিত ও শোষকশ্রেণি। উৎপাদিত সকল অতিরিক্ত খাবার এই শ্রেণিই সাবাড় করে ফেলে। ফলে, একজন সাধারণ কৃষককে হাজার বছর আগের একজন সাধারণ শিকারির চেয়ে ঢের বেশি কাজ করতে হলো। অথচ তার বদলে সে পেল অপেক্ষাকৃত বাজে খাবার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলতেই হয় যে, কৃষিবিপ্লব হলো ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ধোঁকা।[২]

প্রশ্ন হলো, এই ধোঁকার জন্য দায়ী কে? রাজা, পুরোহিত, এমনকি ব্যবসায়ীদেরও এই ধোঁকার জন্য দায়ী করা যায় না। তাহলে এতসব হলো কী করে, কার চক্রান্তে? আসলে এই সবকিছুর মূল হোতা হলো গম, ধান আর আলুর মতো অল্প কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি। অবিশ্বাস্য শোনালেও এই উদ্ভিদগুলোই আসলে হোমো সেপিয়েন্সকে পোষ মানিয়েছিল, উলটোটা নয়!

কথাটা উদ্ভট শোনাতে পারে, কিন্তু মাথা ঠান্ডা করে পুরো ব্যাপারটাকে মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে গম, আলু কিংবা ধানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করুন। গমের কথাই ধরা যাক, ১০ হাজার বছর আগেও গম ছিল একটা বুনো আগাছা, মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য বুনো আগাছার মধ্যে একটি। হঠাৎ করে কয়েক সহস্রাব্দের মধ্যেই দেখা গেল, মধ্যপ্রাচ্যের অল্প কিছু নির্দিষ্ট এলাকা থেকে গম খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে– আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আরো অনেক জায়গায়। টিকে থাকা এবং প্রজননকে যদি সফল বিবর্তনের প্রাথমিক মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, গত ১০ হাজার বছরে গম একটি অত্যন্ত তুচ্ছ আগাছা থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম সফল উদ্ভিদে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ১০ হাজার বছর আগের উত্তর আমেরিকা বা কানাডার বিস্তীর্ণ ভূমিতে যান কিংবা কানসাস, আইওয়া অথবা কানাডার ম্যানিটোবাতে যান, সেখানে কোনো গমের গাছ দেখতে পাবেন না। কিন্তু আপনি যদি আজকে এই একুশ শতকের উত্তর আমেরিকা কিংবা কানাডাতে যান, আপনি কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটে যেতে পারবেন যেখানে গম ছাড়া আর কোনো কিছু আপনার চোখেই পড়বে না। অন্য কোনো গাছ নেই, কোনো প্রাণী নেই এমনকি নেই কোনো ঘরবাড়িও, মাঠের পর মাঠ জুড়ে শুধু গম আর গম। এই ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটল? কীভাবে গম এখন ভূপৃষ্ঠের প্রায় সোয়া ২ লাখ বর্গকিলোমিটার দখল করে ফেলল, যা কিনা আকারে পুরো ব্রিটেনের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ? যেখানে ১০ হাজার বছর আগে এটা মধ্যপ্রাচ্যের অল্প কিছু জায়গায় শুধু জন্মাত, কীভাবে গম সেই একটা তুচ্ছ আগাছা থেকে যত্রতত্র, সর্বত্র জন্মানো একটা উদ্ভিদে পরিণত হলো?

গম এই কাজটা করেছিল আসলে হোমো সেপিয়েন্সকে ব্যবহার করে! এই নরবানর গোত্রীয় মানুষেরা ১০ হাজার বছর আগ পর্যন্ত বেশ আরামের জীবন যাপন করছিল। কিন্তু তারপর তারা হঠাৎ করেই গম চাষে বেশি বেশি সময় ব্যয় করা শুরু করল। মাত্র ২০০

কিংবা বড়োজোর ১ হাজার বছরের মধ্যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরোটা সময় গমের দেখাশোনা আর বিস্তারের জন্যই পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করল! একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা জানি, গমের গাছ পাথর বা নুড়িপাথর একদম পছন্দ করে না, কারণ এগুলো তার বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। তাই মানুষ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সেইসব নুড়িপাথর মাঠ থেকে সরাতে লাগল যাতে গম নির্বিঘ্নে বাড়তে পারে। একইভাবে, গম অন্য উদ্ভিদের সঙ্গে জমিতে তার পানি, খাবার বা খনিজ পদার্থ ভাগাভাগি করাও পছন্দ করে না। তাই সব পুরুষ ও মহিলা মিলে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করে সেইসব আগাছা বা উদ্ভিদ জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে লাগল যাতে গম একাই জমির সব পানি, পুষ্টি উপাদান এবং সেইসঙ্গে সূর্যালোক ভোগ করতে পারে। বিভিন্ন ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ বা প্রাণী যেমন কেঁচো, ঘাসফড়িং, খরগোশ কিংবা হরিণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার তেমন কোনো ক্ষমতা গমের ছিল না। সুতরাং মানুষ গম থেকে এদেরকে দূরে রাখার জন্য নানা কসরত করতে লাগল। তারা বেড়া দিল জমিতে, খরগোশগুলো মারতে শুরু করল। তারা কেঁচো আর ঘাসফড়িংগুলো ছুড়ে ফেলতে লাগল গমকে রক্ষা করার জন্য। এত কিছুর পরও পানি এবং পুষ্টির জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল গম। তাই মানুষ প্রতিদিন আরো অনেক অনেক ঘণ্টা কাজ করতে লাগল শুধু কিছু ঝরনা ও প্রবাহ থেকে জমিতে পানি বয়ে আনার জন্য। কিংবা হয়তো কুয়া খোঁড়ার জন্য যেটা থেকে পানি এনে সেচ দেওয়া যাবে গমের খেতে। এমনকি তারা বিভিন্ন প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ পর্যন্ত জমিতে ছড়িয়ে দিতে লাগল জমিকে উর্বর করার জন্য।

কিন্তু এতকাল ধরে হোমো সেপিয়েন্সের শরীর এসব কাজের জন্য বিবর্তিত হয়নি। হোমো সেপিয়েন্স এবং সমগোত্রীয় অন্যান্য মানুষের শরীর লাখ লাখ বছর ধরে গাছে চড়া, ফল পাড়া কিংবা জঙ্গলে হরিণ বা খরগোশকে তাড়া করার জন্যই অভিযোজিত হয়ে এসেছে। এই শরীর পাথর কুড়ানো, আগাছা পরিষ্কার করা, নদী থেকে পানি বয়ে জমিতে নিয়ে যাওয়ার মতো কোমরভাঙা খাটুনির জন্য মোটেই প্রস্তুত

ছিল না। এর খেসারত দিতে হয়েছে মানুষের মেরুদণ্ড, হাঁটু ও ঘাড়কে। অনেক প্রাচীন কঙ্কাল আমাদের নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন থেকে কৃষিজীবনের এই পরিবর্তন মানুষের জন্য অনেক নতুন নতুন সমস্যা হাজির করে, যেমন– কশেরুকার স্থানচ্যুতি, পিঠ বা কোমরব্যথা, আরথ্রাইটিস, হার্নিয়া এরকম আরো অনেক কিছু। সব মিলিয়ে এসব কৃষিনির্ভর কাজকর্ম, যেমন– জমিতে পানি দেওয়া, জমি পরিষ্কার করা বা রক্ষা করা– এসব মানুষের এত এত সময় নিয়ে নিল যে মানুষ বাধ্য হলো গমের জমির কাছাকাছি বসতি গড়তে। স্বাভাবিকভাবেই এটা তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলল। যাযাবর শিকারি থেকে তারা এক সাধারণ কৃষকে পরিণত হলো, যারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করে। আমরা প্রায়ই বলি যে, আমরা মানুষেরা গমকে পোষ মানিয়েছি। এখন একটু খেয়াল করে দেখুন– ইংরেজি 'Domesticate' শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Domus' থেকে, যার মানে হলো ঘর। সুতরাং কাউকে Domesticate করা মানে হলো তাকে ঘরে থাকতে বাধ্য করা। এখন, কে ঘরে বসবাস করছে? অবশ্যই গম নয়; কারণ, গম তো এখনো জমিতে জন্মাচ্ছে। সেপিয়েন্সই বরং এখন ঘরে থাকে, সুতরাং সেপিয়েন্সই আসলে গৃহপালিত হয়েছে!

গম কীভাবে এই কাজটা করতে পারল? কীভাবে গম মানুষকে অপেক্ষাকৃত শান্তির শিকারি-সংগ্রাহক জীবন থেকে কৃষকের কঠিন জীবনে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করল? এর প্রতিদান হিসেবে গম মানুষকে কী দিল? অপেক্ষাকৃত উন্নত খাদ্যাভ্যাস তো দেয়নি। মনে রাখতে হবে, মানুষ সর্বভুক প্রাণী– যারা নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। কৃষিবিপ্লবের আগে ধান-গমজাতীয় খাদ্যশস্য মানুষের খাদ্যতালিকার একটা ছোটো অংশ ছিল মাত্র। এদিকে, ধান-গমজাতীয় খাদ্যশস্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল একটা খাদ্যাভ্যাসে খনিজ ও ভিটামিনের ঘাটতি থেকে যায়, ওগুলো হজম করাও কষ্ট এবং ওগুলো আমাদের দাঁত আর মাড়ির জন্যও বেশ ক্ষতিকর।

গম কিন্তু মানুষকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও দেয়নি। একজন গ্রাম্য কৃষকের জীবন কিন্তু একজন শিকারি-সংগ্রাহকের জীবনের থেকে কম

নিরাপদ। এর কারণ হলো, অন্তত শখানেক বা হাজারখানেক বছর আগেও কৃষকেরা এক, দুই কিংবা তিন ধরনের শস্য চাষাবাদ করত এবং সেগুলো খেয়েই জীবন ধারণ করত। যেমন, চীনে তারা শুধু ভাতই খেত। মধ্যপ্রাচ্যে তারা শুধু বার্লি আর গম খেত। মধ্য আমেরিকায় বেশিরভাগ মানুষই শুধু ভুট্টা খেত। এই দু-একটা শস্যের ওপর নির্ভরশীলতা কিন্তু ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, হঠাৎ যদি খরা কিংবা বন্যার মতো কোনো দুর্যোগ আসে অথবা যদি কোনো পরজীবী জীবাণুর আক্রমণে সব গমখেত ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কৃষকদের খাওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। যার ফলে হাজারে হাজারে কৃষক মারা যেত। অন্যদিকে, শিকারি-সংগ্রাহকেরা উন্নত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা উপভোগ করত। কারণ, তারা বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ সংগ্রহ করত আর নানান রকম প্রাণী শিকার করে খেত। কোনো একটা নির্দিষ্ট খাবারের উৎসের ওপর তাদের অতটা নির্ভরশীলতা ছিল না। সে কারণে, কোনো বছর কোনো দুর্যোগের কারণে যদি নির্দিষ্ট কোনো খাবার নাও পাওয়া যেত, তাহলে তারা অন্য ধরনের খাবারগুলো বেশি বেশি করে সংগ্রহ করতে পারত। সুতরাং এটুকু নিশ্চিত যে, গম মানুষকে অপেক্ষাকৃত ভালো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

এরপর আসি প্রতিহিংসার ব্যাপারে। গম মানুষে-মানুষে প্রতিহিংসা কমানোর চেয়ে বরং বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি অবদান রেখেছে। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রথম দিককার গ্রাম্য কৃষকরা সম্ভবত তাদের শিকারি পূর্বপুরুষদের সমান অথবা তার চেয়ে বেশি হিংস্র ছিল। কৃষকদের কাছে তুলনামূলক অনেক বেশি মজুত করা জিনিসপত্র থাকত। চাষাবাদের জন্য জমিও আগলে রাখতে হতো। প্রতিবেশী কোনো দলের হামলায় পশু চরানোর মাঠ হারানোটা তাদের জন্য ছিল জীবন-মরণের ব্যাপার। সুতরাং মীমাংসা বা সমঝোতা করার তেমন কোনো সুযোগই ছিল না। অন্যদিকে শিকারি-সংগ্রাহক কোনো গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর হামলার শিকার হলে ওই এলাকা থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারত। সেটা কঠিন আর বিপজ্জনক ছিল বটে, কিন্তু একইসঙ্গে যুক্তিসংগতও ছিল।

এদিকে, কোনো কৃষিভিত্তিক গ্রামে কোনো শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণ হলেও, পিছু হটার তেমন কোনো উপায় ছিল না। কারণ, পিছু হটার মানে দাঁড়াত ফসলের জমি, ঘরবাড়ি, মজুত শস্য সবই হারানো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম হলে না খেতে পেয়ে মরা ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না তাদের। সেইজন্যই কৃষকেরা বাধ্য হয়েই একজোট হয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেত।
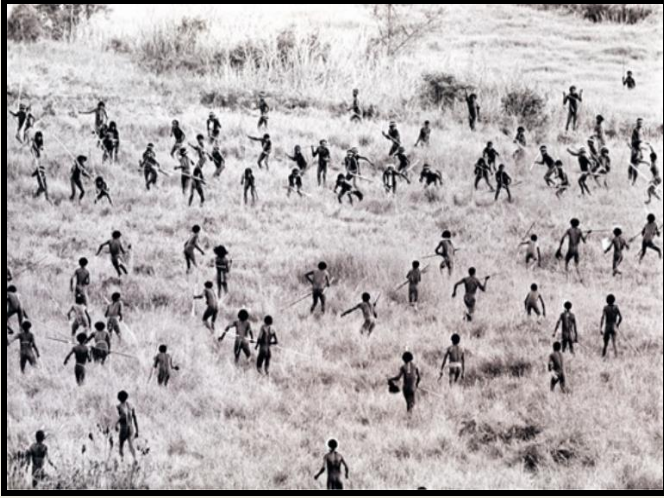
১২। নিউ গিনিতে দুটো কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াইয়ের দৃশ্য (১৯৬০)। সম্ভবত, কৃষিবিপ্লবের পর হাজার বছর ধরে এরকম দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, খুব সাধারণ কৃষিভিত্তিক সমাজেও মানবমৃত্যুর প্রায় ১৫ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল মানুষে মানুষে প্রতিহিংসা। যার মধ্যে আবার ২৫ শতাংশই শুধু পুরুষের মৃত্যু। এখনকার নিউ গিনিতে, 'দানি' (Dani) নামক একটি কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায়ের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পুরুষের মৃত্যু হয় প্রতিহিংসাবশত। আবার অন্য একটি সম্প্রদায়, 'এঙ্গা'তে (Enga) এই হার ৩৫ শতাংশ। এদিকে ইকুয়েডরে, ওয়েরানি (Waorani) সম্প্রদায়ের প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই

নৃশংসভাবে অন্য কোনো মানুষের হাতে মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং এসব পরিসংখ্যান থেকে বলা যায়, গম মানুষকে অন্য মানুষের প্রতিহিংসা থেকে কোনো নিরাপত্তা তো দেয়ইনি বরং উলটো আরো প্রতিহিংসা ছড়িয়েছে। প্রতিহিংসা জিনিসটা পরবর্তী সময়ে অনেকটা কমে এসেছে শহর কিংবা সাম্রাজ্যের মতো আরো বড়ো সামাজিক কাঠামো তৈরির পর। কিন্তু এত বড়ো এবং কার্যকর রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে মানুষের হাজার হাজার বছর সময় লেগে গেছে।

গ্রাম্য জীবনযাপন কৃষকদেরকে প্রথমদিকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। বন্য জন্তু, বৃষ্টি আর ঠান্ডা থেকে একটু ভালোভাবে রক্ষা পেত তারা। তার পরও একজন সাধারণ কৃষকের জন্য সুবিধার চেয়ে অসুবিধাটাই বেশি ছিল। কিন্তু এই তথ্যটা আধুনিক সমাজের মানুষেরা খুব সহজে হজম করতে পারে না। যেহেতু আমরা এখন খাবারের প্রাচুর্য আর নিরাপত্তা উপভোগ করছি আর এগুলো কৃষিবিপ্লবের ফলেই সম্ভব হয়েছে, তাই আমরা ধরেই নিই কৃষিবিপ্লব অবশ্যই মানবসভ্যতার অগ্রগতির একটি প্রধান ধাপ। কিন্তু শুধু এই আজকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা করে হাজার বছরের ইতিহাসকে পুরোপুরি অস্বীকার করা আমাদের একেবারেই উচিত হবে না। এর চেয়ে পুরো ব্যাপারটাকে বরং প্রথম শতকের চীন দেশের তিন বছর বয়সি অপুষ্টিতে ভোগা, মৃতপ্রায়, ক্ষুধার্ত একটি শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা উচিত। তার বাবার চাষাবাদের ভরাডুবির কারণেই হয়তো তার এই অবস্থা। এর পরও কি সে এভাবে বলবে যে, ‘আমি অপুষ্টিতে মরতে বসেছি, কিন্তু তাতে কী, আগামী দুই হাজার বছরের মধ্যে মানুষের খাবারের আর কোনো অভাব তো হবেই না, বরং তারা বড়ো বড়ো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে অনেক আরামে থাকতে পারবে। সুতরাং আমার আজকের কষ্ট ভবিষ্যতের মানুষের জন্য এক মহান আত্মত্যাগ হয়ে থাকবে!’

তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে গম সেইসব কৃষক, দিনমজুর কিংবা সেই অপুষ্টিতে ভোগা চীনা শিশুটিকে কী এমন দিয়েছিল যে মানুষ কৃষিকাজের ওই কঠিন জীবন বেছে নিল? উত্তরটা হলো, গম কোনো একজন নির্দিষ্ট মানুষকে তেমন কিছুই দেয়নি।

কিন্তু হোমো সেপিয়েন্সের পুরো প্রজাতিকে সামগ্রিকভাবে একটা জিনিস দিয়েছিল। গম চাষের ফলে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় আগের চেয়ে অনেক বেশি খাবার উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল। হোমো সেপিয়েন্স অনেক বেশি পরিমাণে খাবার পেয়েছিল কৃষির মাধ্যমে, যেটা তারা শিকারি-সংগ্রাহক জীবনে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে পায়নি। আর এই অতিরিক্ত খাবার খুব দ্রুতগতিতে হোমো সেপিয়েন্সের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করল। এর ফলে একই এলাকায় আরো অনেক বেশি মানুষের বসবাস করা সম্ভব হলো। উদাহরণস্বরূপ, জেরিকোর মরূদ্যানের কথাই ধরা যাক, হালে যার নাম প্যালেস্টাইন। জেনে রাখা ভালো, ইতিহাসের প্রথম গ্রামটি গড়ে উঠেছিল প্রায় ৯ হাজার বছর আগে। সুতরাং আমরা যদি ১৩ হাজার বছর আগের জেরিকোর মরূদ্যানে ফিরে যাই, যখন মানুষ বুনো লতাপাতা সংগ্রহ করে আর পশু শিকার করে বেঁচে থাকত, তাহলে দেখতে পাব যে, জেরিকোর মরূদ্যান ও তার আশপাশের এলাকায় সাকুল্যে হয়তো ১০০ জন স্বাস্থ্যবান মানুষের একটা ভবঘুরে গোষ্ঠীর ঠিকমতো খাওয়াপরার সুযোগ ছিল। এখন, আমরা যদি আরো সামনে এগিয়ে ৮ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে যাই, তাহলে দেখতে পাব যে জেরিকোর উদ্যানের বুনো লতাপাতাগুলো সরে গিয়ে গমের জন্য জায়গা করে দিয়েছে। জেরিকো এখন আরো অনেক বেশি মানুষের খাবারের জোগান দিতে পারছে। এমনকি এখন প্রায় ১ হাজার লোকের একটি গ্রাম টিকে আছে। অবশ্য, সেই গ্রামের মানুষেরা বেশিরভাগ সময়ই রোগশোক আর অপুষ্টিতে ভুগছে!

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো একটা প্রজাতির সাফল্যের মূল্যায়ন ক্ষুধা, যন্ত্রণা, সুখ কিংবা দুর্দশা দিয়ে হয় না, হয় শুধু ডিএনএর অনুলিপির সংখ্যার বিচারে। ঠিক যেমন একটি কোম্পানির অর্থনৈতিক সাফল্য শুধু তার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে সেটা দিয়ে মাপা হয়, তার কর্মচারীরা সুখী কি না সেটা দিয়ে নয়, একইভাবে একটি প্রজাতির বিবর্তনীয় সাফল্য মাপা হয় তার কতগুলো ডিএনএ অনুলিপি টিকে আছে সেটা দিয়ে। যদি কোনো একটি প্রজাতির কোনো ডিএনএ অনুলিপিই টিকে না থাকে, তার মানে সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সেটাকে একটি বিবর্তনীয়

যাত্রাপথের সমাপ্তি বা ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হয়। আর যদি কোনো একটি প্রজাতির অসংখ্য ডিএনএ অনুলিপি পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করে, তাহলে এটাকে বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি সাফল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ১ হাজারটা অনুলিপি সব সময়ই ১০০টা অনুলিপি থেকে ভালো। আর এটাই হলো কৃষিবিপ্লবের মূল সার্থকতা– যে-কোনো উপায়ে আরো বেশি বেশি লোককে বাঁচিয়ে রাখা!

তার পরও, কোনো একজন ব্যক্তিমানুষের কথা যদি ভাবি, সে কেন এইসব বিবর্তনের হিসাবনিকাশ চিন্তা করতে যাবে? কেন একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তার নিজের জীবন যাপনের মান কমিয়ে দেবে শুধু যাতে বেশি বেশি মানুষ টিকে থাকতে পারে? উত্তরটা অনাকাঙ্ক্ষিত– কেউ আসলে এই চুক্তি মেনে নেয়নি। কৃষিবিপ্লব ছিল আসলে একটা ফাঁদ!

বিলাসিতার ফাঁদ

শিকারিজীবন থেকে কৃষিজীবনে পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটা কোনো সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ছিল না। অনেক ছোটো ছোটো পদক্ষেপের সমষ্টি ছিল এটা। ব্যাঙের ছাতা বা বাদাম সংগ্রহ কিংবা হরিণ শিকার করে বেড়ানো হোমো সেপিয়েন্সের কোনো একটা গোষ্ঠী হঠাৎ করেই একদিন স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস শুরু করেনি। চাষের জমি প্রস্তুত করা, গমের চারা বোনা কিংবা নদী থেকে সেচের পানি বয়ে আনা– কোনো কিছুই হঠাৎ করে শুরু হয়নি। প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আসলে ছোটো ছোটো একেকটা ধাপে হয়েছে, আর সেই প্রত্যেকটা ধাপে দৈনন্দিন জীবনের ছোট্ট কোনো একটা পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

হোমো সেপিয়েন্স মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছায় প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে। এর পরের ৫০ হাজার বছর যাবৎ আমাদের পূর্বপুরুষেরা কৃষির সাহায্য ছাড়া শুধু টিকেই ছিল না, চারদিকে ছড়িয়েও পড়েছিল। ওই এলাকায় সেই জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদও ছিল। যখন ঢের খাবারের জোগান হতো, তখন তারা হয়তো একটু বেশি সন্তান নিত, আবার যখন খাবারের সংকট

হতো তখন কম নিত। অন্য অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতোই মানুষের বংশবৃদ্ধির ওপরেও জিন ও হরমোনের নিয়ন্ত্রণ আছে। অনুকূল সময়ে মেয়েরা দ্রুত প্রাপ্তবয়স্ক হয় আর তাদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রতিকূল সময়ে আবার প্রাপ্তবয়স্ক হতে যেমন দেরি হয় তেমনি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

এইসব প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সাংস্কৃতিক ব্যাপারস্যাপারও জড়িত ছিল। যারা নবজাতক কিংবা একদম ছোটো তারা হাঁটত খুব আস্তে, আবার আলাদা করে তাদের খেয়ালও রাখতে হতো। সেইসব যাযাবর গোষ্ঠীর জন্য তাই এই শিশুগুলো ছিল একটা বোঝা। এই কারণেই তখনকার মানুষ পরপর দুটো সন্তানের মধ্যে অন্তত তিন-চার বছর বিরতি চাইত। এটার একটা প্রাকৃতিক উপায় তাদের জানা ছিল। সেটা হলো, মায়েরা তাদের শিশুদের সারা দিন ধরেই এবং তুলনামূলক বেশি বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াত (সারা দিন ধরে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের গর্ভধারণের ঝুঁকি খুব কম থাকে)। এ ছাড়াও, অন্য উপায়গুলোর মধ্যে ছিল যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা, গর্ভপাত আর শিশু হত্যা।[৪]

এইভাবে চলে আসা হাজার হাজার বছর সময়ে মানুষ মাঝে মাঝেই গমের দানা খেত, কিন্তু এটা ছিল তাদের খাবারের তালিকার নগণ্য একটা অংশ। প্রায় ১৮ হাজার বছর আগে, শেষ বরফযুগ সরে গিয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে (Global Warming)। তাপমাত্রা যত বাড়ল, বৃষ্টিপাতও বাড়তে থাকল। এই আবহাওয়াটা মধ্যপ্রাচ্যের গম আর অন্যান্য শস্যের জন্য খুব অনুকূল ছিল। ফলে তারা খুব দ্রুত ছড়াতে লাগল চারদিকে। মানুষ আরো বেশি বেশি গম খেতে থাকল আর তার ফলে তারা গমের বংশবৃদ্ধির আরো সুযোগ করে দিল। এইসব বুনো শস্যগুলো মাড়াই-বাছাইয়ের পর রান্না করে খেতে হতো। সেই জন্যই যারা ওগুলো সংগ্রহ করত, তারাই আবার সেগুলো তাদের অস্থায়ী ঘরে বয়ে নিয়ে যেত। গমের দানাগুলো ছোটো হওয়ায় কিছু কিছু দানা নিশ্চয়ই ফেরার পথে পড়ে হারিয়ে যেত। আর সেইসব পড়ে যাওয়া দানা থেকে আবার গমের গাছ জন্মাত। এর ফলে কী হলো? মানুষের বসবাসের জায়গার আশপাশে আরো বেশি বেশি গম জন্মাতে থাকল!

মানুষ বনজঙ্গল সাফ করে ফেলতে শুরু করলে সেটা গমের বিস্তারের জন্য বেশ সহায়ক হলো। আগুনে যখন বড়ো বড়ো গাছ, গুল্ম সব মরে গেল, তখন গম একাই পুরোটা সূর্যালোক, ভূগর্ভস্থ পানি ও পুষ্টি পেতে থাকল। এর ফলে গমের জোগান বাড়ল, সঙ্গে অন্যান্য খাবারের উৎসও ছিল কিছু। আর এইবার মানুষ তাদের যাযাবর জীবন ছেড়ে মৌসুমি কিংবা স্থায়ী আবাসন তৈরি করে বসবাস শুরু করে দিল।

প্রথমদিকে হয়তো তারা ফসল কাটার সময় মাসখানেকের জন্য আবাস গাড়ত। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তখন গমের উৎপাদন বাড়তে থাকল, আস্তে আস্তে এক মাসের জায়গায় দেড় কি দুমাসের বসতি হতে থাকল। তারপর একসময় সেটা একটা স্থায়ী গ্রামে পরিণত হলো। এইরকম বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়েই। এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় লেভান্তের (Levant) নাম। সাড়ে ১২ হাজার থেকে সাড়ে ৯ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে নাতুফিয়ান (Natufian) সংস্কৃতি বিকশিত হয়। নাতুফিয়ানরা মূলত শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবেই জীবন যাপন করত। তারা ডজনখানেক বিভিন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণী শিকার করে খেতো। কিন্তু তারাই আবার স্থায়ী গ্রামে বসবাস করত আর বেশিরভাগ সময় ব্যয় করত বুনো খাদ্যশস্য জোগাড় করা এবং সেগুলো খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করার কাজে। তারা পাথরের ঘর বানিয়েছিল, এমনকি ফসলের গোলাও বানিয়েছিল। সেইসব গোলায় তারা প্রয়োজনের সময়ের জন্য খাদ্যশস্য জমা করে রাখত। তারা নতুন নতুন হাতিয়ারও বানিয়েছিল, যেমন– পাথরের কাস্তে ও জাঁতাকল। এগুলো ফসল কাটা আর মাড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত হতো।

সাড়ে ৯ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরবর্তী বছরগুলোতে নাতুফিয়ানদের বংশধরেরা নানা রকম খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা অব্যাহত রাখল, কিন্তু একই সঙ্গে তারা সেগুলোকে নানান রকম নতুন উপায়ে চাষ করাও শিখে ফেলল। বুনো শস্যদানা সংগ্রহ করার সময় তারা ইচ্ছে করেই কিছু অংশ সংগ্রহ না করে রেখে দিত পরের বার বপনের জন্য। তারা আবিষ্কার করে ফেলেছিল যে শস্যের বীজ

এলোমেলোভাবে মাটির ওপরে ফেলে রাখার চেয়ে গভীরে গর্ত করে পুঁতে রাখলে বেশি ফসল পাওয়া যায়। এরপরই তারা জমিতে নিড়ানি দেওয়া আর হালচাষ করা শুরু করে দিল। আস্তে আস্তে তারা আগাছা পরিষ্কার করা, সেচ দেওয়া আর জৈব সারের ব্যবহারও শিখে ফেলল। এর ফলে যেটা হলো, শস্য চাষে বেশি সময় দেওয়ার ফলে বুনো জন্তু শিকার করা বা খাবার সংগ্রহ করার আর সময় থাকল না। এইভাবেই শিকারি-সংগ্রাহক থেকে কৃষকের জন্ম হলো।

কোনো একটা নির্দিষ্ট পদক্ষেপের কারণেই যে তখনকার মানুষ হঠাৎ করে বুনো গম সংগ্রহ করার জায়গায় গমের চাষাবাদ শুরু করেছিল এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আর সেই কারণেই ঠিক কোন সময় কৃষির দিকে এই পরিবর্তনটা হলো সেটা বলাও খুব মুশকিল। তবে সাড়ে ৮ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে গড়ে উঠেছিল জেরিকোর মতো অনেক ছোটো ছোটো স্থায়ী গ্রাম। সেসব গ্রামের অধিবাসীদের প্রধান কাজ ছিল পশুপালন।

এদিকে স্থায়ী গ্রামে বসবাস করা ও যথেষ্ট খাবারের মজুতের কারণে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। যাযাবর জীবন ত্যাগ করার ফলে একজন নারী এখন প্রায় প্রতিবছরই একটি সন্তান জন্ম দিতে পারত। খুব অল্প বয়স থেকেই শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়াও জাউয়ের মতো অন্যান্য খাবার খাওয়ানো হতো। নতুন শিশুদের এই নতুন হাতজোড়া বড়ো দরকার ছিল ফসলের জমিতে। কিন্তু ওদিকে নতুন মুখগুলো মজুত খাবার দ্রুত খেয়ে ফেলতে লাগল। তাই আরো বেশি বেশি জমি চাষ করা দরকার হয়ে পড়ল। এদিকে আরো একটা ঘটনা ঘটল, মানুষ তখন স্থায়ী ঘরবসতিতে বসবাস শুরু করায় রোগজীবাণুও ছড়াতে থাকল, আবার শিশুরা মায়ের দুধ বাদ দিয়ে বেশি বেশি খাদ্যশস্য খেতে লাগল। সেইসব খাদ্যশস্যও কাড়াকাড়ি করেই খেতে হতো তাদের। এইসব কারণে শিশুমৃত্যুহার অনেক বেড়ে গেল। সেই সময়ে বেশিরভাগ কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রায় প্রতি তিন জন শিশুর মধ্যে একজন মারা যেত ২০ বছরে পৌঁছানোর আগেই।[৫] কিন্তু এত কিছুর পরও জন্মহার মৃত্যুহারকেও ছাপিয়ে গেল! আর মানুষ বেশি বেশি শিশু জন্ম দিতে লাগল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গমের ওপর এই আস্থা আস্তে আস্তে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে লাগল। একনাগাড়ে শিশু মরতে থাকল আর প্রাপ্তবয়স্কদেরও ঘাম ঝরে যেত শুধু দুটো রুটি জোগাড় করার জন্য। সাড়ে ৮ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের জেরিকোর একজন সাধারণ মানুষ, সাড়ে ৯ হাজার কিংবা ১৩ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় ঢের বেশি কঠিন জীবন যাপন করত। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি আসলে কী হচ্ছিল। কারণ এটা এক দিনে হচ্ছিল না বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হচ্ছিল। প্রতিটি প্রজন্মই তাদের পূর্বপুরুষদের মতোই জীবন যাপন করত, শুধু একটু বেশি দক্ষতার সঙ্গে এই যা। তারা শুধু অল্প কিছু বেশি জিনিস আবিষ্কার করেছিল তাদের কৃষিকাজে সুবিধার জন্য। স্ববিরোধী শোনালেও সেইসব একেকটা ছোটো ছোটো উন্নতি, যেগুলোর জীবনকে আরো সহজ করার কথা ছিল, সেগুলোই গলার কাঁটা হয়ে বিঁধতে লাগল কৃষকদের জীবনে।

তাহলে কী কারণে মানুষ এরকম দুর্ভাগ্যজনক ভুল করল? যে কারণে মানুষ গোটা ইতিহাস জুড়েই ভুল করে এসেছে, ঠিক সেই একই কারণে। মানুষ মোটেই বুঝতে পারেনি তাদের সিদ্ধান্তগুলোর ফলাফল কী হতে যাচ্ছে। যখনই তারা একটা বাড়তি কাজ করতে উদ্যত হতো, যেমন বীজগুলো এলোমেলোভাবে না ফেলে নিড়ানি দিয়ে তারপর ফেলা– তখনই তারা মনে করত– 'হ্যাঁ, আমাদের হয়তো একটু বেশি পরিশ্রম হবে, কিন্তু এর ফলে ফসলও হবে অনেক বেশি! আমাদের আর অপয়া বছরগুলোর জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমাদের সন্তানদের আর কখনো ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যেতে হবে না।' কথায় যুক্তি ছিল। বেশি পরিশ্রম করলে সুন্দর জীবন পাওয়া যাবে– এটাই ছিল মূল পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনার প্রথম ভাগটা বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছিল। মানুষ আসলেই আগের চেয়ে অনেক বেশি খাটাখাটনি করছিল। কিন্তু তারা একেবারেই খেয়াল করেনি যে, অতিরিক্ত খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। তার ফলে, চাষাবাদ আরো ভালো হলেও, অনেক বেশি গম মজুত থাকলেও, এই বেশি গম কিন্তু বেশি বেশি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করতে হবে। সুতরাং মাথাপিছু

খাবারের পরিমাণ এমন আহামরি কিছু বাড়বে না। সেই সময়কার কৃষকেরা আগে ভেবে দেখেনি যে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মায়ের দুধের বদলে বেশি বেশি করে জাউ খাওয়ানোর ফলে তাদের রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা কমে যাবে। তা ছাড়া একই জায়গায় বসবাস করার ফলে সেইসব কৃষিভিত্তিক সমাজে শিশুদের বিভিন্ন রোগ-জীবাণুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে গিয়েছিল। এসবের ফলে অনেক বেশি বেশি শিশু মারা যাচ্ছিল। আরো যে ব্যাপারটা তাদের ভাবনায় আসেনি সেটা হলো, কেবল গমের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে থাকার কারণে খরার মতো দুর্যোগের সময়ে তাদের টিকে থাকা আগের চেয়েও কঠিন হয়ে যাবে। আরো আছে, গোলাভরা ফসল শুধু নিজেদের জন্যই ভালো তা নয়, চোরের জন্যও সেটা অত্যন্ত লোভনীয়। সুতরাং ফসল বাঁচাতে ভালো মৌসুমেও তাদের বেড়া দিতে হতো, পাহারা দিতে হতো আর নানা রকম যুদ্ধ করতে হতো, যেগুলো তাদের আগে কখনো করতে হয়নি। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এইসমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারগুলো তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনাটাকে ভেস্তে দিল। একটা সুন্দর জীবন পাওয়ার জন্য কষ্টটা একটু বেশিই হয়ে গেল।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আসে যে, যখন তারা দেখলই যে পরিকল্পনাটা কাজ করছে না তখন কেন তারা আবার তাদের পুরোনো জীবনে ফিরে গেল না? একটা কারণ হলো, পরিকল্পনাটা যে ঠিকমতো কাজ করছে না সেটা বুঝতে বুঝতেই তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেটে গেছে। সুতরাং সেটা বাতিল করে পুরোনো জীবনে ফেরার জন্য তাদের অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল আসলে। ততদিনে তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কীভাবে তারা আগে অন্যভাবে জীবন ধারণ করত। বড়োজোর তারা তাদের সন্তানদের হয়তো গল্প শোনাত যে তারা যখন ছোটো ছিল বা তাদের বাবা কিংবা দাদা যখন ছোটো ছিল তখন খেতে কত কম গম হতো। হয়তো বলতো যে তাদের ভাবতে অবাক লাগে কীভাবে অত অল্প গম দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষরা খেয়ে পরে বেঁচে থাকত। এইটাই আসলে তখনকার মানুষ মনে রেখেছিল যে কয়েক প্রজন্ম আগে তাদের অনেক কম খাবার ছিল। আগের জীবনে ফিরে না যাওয়ার

আরেকটা কারণ হলো, জনসংখ্যা দুর্দান্ত গতিতে বেড়েই চলছিল আর তার ফলে আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য সেটা একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে যেখানে একটা গ্রামে হয়তো মোট ১০০ জন মানুষ থাকত, এখন সেখানে হয়তো ১৫০ জন থাকে। এখন যদি তারা আগের সেই জীবনে ফিরে যেতে চায় যেখানে ১০০ জন ঠিকমতো খেয়েপরে বাঁচতে পারবে, তাহলে কোন ৫০ জন এখন না খেয়ে মরতে চাইবে? কেউই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটা করতে রাজি ছিল না। আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার আসলে আর কোনো উপায় ছিল না। ফাঁদে পড়ে সেই পথ বন্ধ হয়ে গেছে আগেই।

এভাবেই একটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং উন্নত জীবনের আশা মানুষকে আরো কঠিন জীবন বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিল। অদ্ভুত শোনালেও এমন ঘটনা কিন্তু ওটাই শেষ নয়, বরং মানুষের পুরো ইতিহাস জুড়ে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এমনকি আজও সেই একই ঘটনা ঘটে চলেছে! অনেক মানুষ আছে, যারা ছোটো পরিসরে হলেও নিজের জীবন থেকেই বুঝতে পারবে কৃষিবিপ্লবের সময় কী হয়েছিল। যেমন ধরুন, একজন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের কথা। এমন সাধারণত শোনা যায় না যে একজন কলেজছাত্র বড়ো হয়ে একজন সংগীতশিল্পী হতে চায়। বরং এটাই বেশি শোনা যায় যে সংগীতশিল্পী হয়ে এত টাকা কামানো যায় না, যেটা দিয়ে নিজের খরচ চালানো যাবে। সুতরাং একজন সাধারণ কলেজছাত্র হয়তো অর্থনীতি কিংবা কম্পিউটার-বিজ্ঞান অথবা অন্য এমন একটা কিছু পড়বে, যেটা হয়তো আসলে তার ভালো লাগে না। তার পরও সে অনেক পরিশ্রম করবে। হয়তো একটা কম্পিউটার-সংক্রান্ত কোম্পানি দাঁড় করাবে, প্রথম কয়েক বছর খুব পরিশ্রম করবে আর অনেক পয়সা কামাবে। আর তারপর যখন তার বয়স ৩০ বা ৩৫-এর কাছাকাছি পৌঁছাবে তখন সেই সব টাকাপয়সা নিয়ে সে অবসরে যাবে। আর তখন সে সত্যিকার অর্থে নিজের ইচ্ছেমতো জীবন যাপন করবে, ইচ্ছে হলে সংগীতশিল্পী হবে। যদিও কেউ হয়তো তাকে এর জন্য টাকাপয়সা দেবে না, কিন্তু তার তখন সেটা দরকারও হবে না। এখানেও এই কলেজছাত্রের সঙ্গে সেই একই ঘটনা ঘটছে,

যা ঘটেছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কৃষিবিপ্লবের সময়ে। অনেক কলেজছাত্রই আসলে ওরকম কল্পনা করে। তারা আসলে ভুলে যায় যে অনেক রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তার জীবনে আসবে, যার ফলে শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রেই তার পরিকল্পনাটা ভেস্তে যাবে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে তার কাছে হয়তো যথেষ্ট পরিমাণ টাকাপয়সা থাকবে ৩০ বছর বয়সে, কিন্তু একই সঙ্গে তাদের অনেক দায়িত্ব কিংবা অভ্যাসও থাকবে, যেটা সে এখন ভাবতেই পারছে না। হয়তো তখন তার স্ত্রী-সন্তান থাকবে যাদের দেখাশোনা করতে হবে। সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হয়তো একটা বাড়ি বানানোর জন্য তাকে কোনো কিছু বন্ধক রাখতে হবে বা ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিতে হবে। তার হয়তো একাধিক গাড়ি থাকবে বা ছুটিতে দেশবিদেশ ঘুরতে যাওয়ার মতো বিলাসিতা থাকবে। সুতরাং ৩০ বছর বয়সে তার কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশি টাকা থাকবে কিন্তু তার অনেক বাধ্যবাধকতাও থাকবে। ৩০ বছরে এসে বেশিরভাগ মানুষই এটা ভাববে না যে অনেক হয়েছে, এখন আমি এইসব বউ ছেলেমেয়ে ঘরসংসার ছেড়ে ছুড়ে চলে যাব আর সংগীতশিল্পী হব। এমন করে তো কেউ ভাবেই না, বরং তারা সেই দাসত্বের জীবনেই চলতে থাকে, কারণ তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আর ফিরে যেতে পারে না। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে দাসত্বে নিমগ্ন থাকে। আর ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটেছিল আমাদের পূর্বপুরুষ কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে।

এটা আসলে ইতিহাসের চিরন্তন বিধানগুলোর (Iron Law) একটি। ইতিহাসের কিছু রীতি আছে, যেগুলো সব সময়ই সত্যি। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশি সত্যি তা হলো– বিলাসিতা আস্তে আস্তে প্রয়োজনে পরিণত হয়! যখনই মানুষ কোনো একটা নির্দিষ্ট অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা সেটাকেই স্বাভাবিক মনে করতে থাকে। তারপর একসময় তারা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যায় যে তারা আর ওগুলো ছাড়া চলতে পারে না। আমাদের সময়েরই একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি। গত কয়েক যুগ ধরে আমরা মানুষেরা অজস্র রকমের যন্ত্রপাতি বানিয়েছি সময় বাঁচানো এবং আরো কার্যকর জীবন যাপনের জন্য। এই যন্ত্রগুলোর

আমাদের জীবনকে আরো সহজ করার কথা, কারণ এগুলো আমাদের অনেক সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে। এই যন্ত্রগুলো, যেমন ধরুন– ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ডিশ ওয়াশার, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার আর ইমেইল– আমরা বেশিরভাগ সময়ই মনে করি, এগুলো আমাদের জীবন সহজ করে দিচ্ছে কারণ এগুলো আমাদের অনেক সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে। যেমন ধরুন ইমেইল। আগে আমরা যখন অন্য কোনো শহরে কিংবা দেশে কাউকে একটা চিঠি লিখতাম, চিঠিটা লেখা থেকে শুরু করে তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত অনেক কাজ করতে হতো। চিঠিটা লিখতে হতো, একটা খাম কিনতে হতো, একটা ডাকটিকিটও। তারপর চিঠিটা খামে ভরে ডাকটিকিটটা খামের ওপর লাগাতে হতো। তারপর খামের ওপর ঠিকানা লিখতে হতো এবং ডাকবাক্সে কিংবা পোস্ট অফিসে নিয়ে যেতে হতো আর টাকা দিতে হতো। তারপর চিঠিটা পৌঁছাতে আর তার উত্তর পেতে কয়েক দিন বা সপ্তাহ এমনকি মাসও লেগে যেত। আমরা এখন এই সমস্ত কিছু করতে পারি মাত্র কয়েক সেকেন্ড কিংবা মিনিটের মধ্যে। আমরা একটা চিঠি লিখতে পারি, পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে কারো কাছে পাঠাতে পারি আর মাত্র কয়েক মিনিট, ঘণ্টা কিংবা দিনের মধ্যেই উত্তর পেয়ে যেতে পারি। এখন, যদিও ইমেইল আমাদের অনেক সময় এবং পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে কিন্তু একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, ইমেইল কি আমাদের অপেক্ষাকৃত সহজ জীবন দিয়েছে?

একটু চিন্তা শুরু করেই যে উত্তরটা বেশিরভাগ মানুষ দেয় তা হলো, না, তা কখনই নয়। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে ইসরায়েল থেকে আমেরিকায় একটা ইমেইল পাঠানো, একটা চিঠি পাঠানোর চেয়ে অনেক সোজা এখন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই আজ আমরা দিনে কয়েক ডজন ইমেইল পড়ি আর উত্তর দিই। আর প্রত্যেকেই আশা করে আমি তার ইমেইলের উত্তর দিয়ে দেব দু-এক দিনের মধ্যেই। আমি যদি এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর না দিই তারা মন খারাপ করবে কিংবা রেগে যাবে। তো দেখা যাচ্ছে, ৫০ বছর আগে আমার যেখানে সপ্তাহে একটি কি বড়োজোর দুটা চিঠি সামলাতে হতো, সেখানে আজ আমাকে প্রতিদিন অনেক বেশি সময় দিতে হচ্ছে একগাদা ইমেইলের পেছনে। সুতরাং যদিও ইমেইল চিঠির চেয়ে অনেক সহজ

কিন্তু যেসব মানুষ ইমেইল ব্যবহার করে তাদের জীবন সেইসব চিঠি ব্যবহারকারীদের চেয়ে মোটেই সহজ নয়। বরং অনেক বেশি উৎকণ্ঠা আর বিরক্তিতে ভরপুর।

আমরা আমাদের আশপাশে এমন মানুষও পাব যারা ইমেইল অ্যাকাউন্ট খুলতে মোটেই আগ্রহী নয়, কারণ তারা এই ইমেইলের ইঁদুর-দৌড়ে অংশ নিতে চায় না। এটা মোটেই নতুন কিছু নয়। আমরা যদি হাজার হাজার বছর আগে ফিরে যাই, ঠিক কৃষিবিপ্লবের সময়ে, তাহলেও আমরা দেখতে পেতাম যে, সব মানবগোষ্ঠীই কিন্তু শিকারিজীবন থেকে কৃষিজীবনে পা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা সে পথে পা বাড়ায়ওনি। এমন অনেক গোষ্ঠীই ছিল যারা তাদের আগের জীবন ছেড়ে গম আলু কিংবা ধানের চাষ করতে চায়নি। কিন্তু আসল ঘটনা হলো, কৃষিবিপ্লবটা সফল হওয়ার জন্য সব গোষ্ঠীরই গম চাষ শুরু করার কোনো দরকার ছিল না। একটা এলাকায় মাত্র একটা গোষ্ঠী শুরু করলেই চলত। যখনই একটা মানুষ আটঘাট বেঁধে গম চাষের জন্য খেত তৈরিতে নেমে পড়ল, সেটা মধ্যপ্রাচ্যেই হোক বা মধ্য আমেরিকা, ওই এলাকায় কৃষির অগ্রগতি আর ঠেকানো সম্ভব ছিল না। কারণ হলো, কৃষিকাজের ফলে খুব দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হতে থাকল আর তার ফলে কৃষকের সংখ্যা, শিকারিদের চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়তে থাকল। আর যখনই এই দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল কোনো দ্বন্দ্বে, স্বাভাবিকভাবেই কৃষকেরা শুধু সংখ্যাগত কারণেই জিতে গেল। সুতরাং শিকারিরা হয় অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারত, নয়তো শত্রুদের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নেওয়ার জন্য নিজেরাও কৃষিকাজ শুরু করতে পারত। যে-কোনো দিক থেকে চিন্তা করলেই দেখা যায়, আগেকার সেই শিকারি-সংগ্রাহকজীবন টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিলাসিতার ফাঁদের এই গল্পটা– 'জীবনকে উন্নত করার একটা চেষ্টা যে শেষমেশ জীবনকে কঠিন করে ফেলে'– এটা মানবজাতিকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। আরেকটু সহজ জীবনের জন্য মানবজাতির নিয়ত অনুসন্ধান চারপাশের প্রকৃতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটায়, যেটা সমস্ত পৃথিবীকে এমনভাবে বদলে দেয়, যা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি।

কৃষিবিপ্লবটাও কেউ আসলে কল্পনা করেনি। এটা ঘটেছিল আসলে মানুষের একে একে নেওয়া বেশ কিছু নিতান্ত সাধারণ সিদ্ধান্তের ফলে, যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল সামান্য কটা মানুষের পেট ভরানো আর একটুখানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো সামগ্রিকভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। তাদেরকে শিকারি থেকে কৃষক বানিয়েছিল, যারা দুপুরের কড়া রোদে নদী থেকে বালতিতে করে পানি বয়ে নিয়ে যেত গমের খেতে।

বেহেশতি ইশারা

এতক্ষণ যে বর্ণনাটা আমরা দেখলাম সেটা থেকে মনে হয় যে, কৃষিবিপ্লব আসলে নেহাতই একটা ভুল হিসাব নিকাশের ফলাফল ছিল। ব্যাখ্যাটা একেবারে মন্দ নয়। ইতিহাস জুড়ে এর চেয়ে অদ্ভুত সব হিসাবের গরমিলের নমুনা আমরা দেখতে পাব। কিন্তু তার পরও, কৃষিবিপ্লবকে শুধুই একটা হিসাবের গরমিল হিসেবে না দেখে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখারও সুযোগ আছে। কেবল আরেকটু সহজ জীবনের আশাই হয়তো মানুষের জীবনের ঐরকম রূপান্তর ঘটায়নি। হয়তো সেপিয়েন্সের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল, যার জন্য তারা সচেতনভাবেই কঠোর পরিশ্রমের জীবন বেছে নিয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা সাধারণত আমাদের ইতিহাসের অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করতে অর্থনৈতিক ও জনমিতিক কারণগুলোকেই সামনে নিয়ে আসতে চান। কারণ, এটা তাদের হিসাব নিকাশের পদ্ধতির সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে, আধুনিক ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞদের কাছে দর্শন বা সংস্কৃতির মতো অবস্তুগত উপাদানগুলোকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ থাকে না। লিখিত প্রমাণগুলো বরং তাদের আরো সাহায্য করে। যেমন ধরুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে নেহাতই খাদ্যের অভাবে কিংবা জনসংখ্যার চাপে হয়নি এটা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট দলিলপত্র, চিঠি, স্মৃতিকথা আমাদের সংগ্রহে আছে। কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন নাতুফিয়ান সংস্কৃতির কথা ভাবি, তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় বস্তুগত উপাদানের ওপর। কারণ আমাদের হাতে সেই সময়কার কোনো দলিল-দস্তাবেজ নেই।

সুতরাং সেই সময়ের মানুষজন অর্থনৈতিক কারণ নাকি বিশ্বাস কোনটা দ্বারা বেশি পরিচালিত হতো সেটা নির্দিষ্ট করে বলা খুব মুশকিল।

সৌভাগ্যবশত, কিছু কিছু বিরল ক্ষেত্রে আমরা জলজ্যান্ত কিছু প্রমাণ পেয়েছি। ১৯৯৫ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দক্ষিণপূর্ব তুরস্কের গোবেকলি তেপে (Gobekli Tepe) নামের একটা জায়গায় খননকাজ শুরু করেন। ওখানকার একদম নিচের পুরোনো স্তরগুলোতে তাঁরা কোনো বাড়িঘর কিংবা কোনো প্রাত্যহিক কাজের জিনিসপত্রের নিদর্শন পাননি। তাঁরা বরং কারুকার্যখচিত বিশাল বিশাল স্তম্ভ ও কিছু ভাস্কর্যের নিদর্শন পেয়েছেন। এরকম প্রতিটা স্তম্ভের ওজন প্রায় সাত টন পর্যন্ত আর এর উচ্চতা পাঁচ মিটার পর্যন্ত। কাছাকাছি একটা কুয়োতে তাঁরা আধাখোদাই একটা স্তম্ভ পেয়েছেন, যেটার ওজন প্রায় ৫০ টন। সব মিলিয়ে তারা প্রায় ১০টা ভাস্কর্য আবিষ্কার করেছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা প্রায় ৩০ মিটার চওড়া।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অবশ্য এরকম ভাস্কযের্র সঙ্গে বেশ পরিচিত। সারা পৃথিবীতেই তাঁরা এগুলো দেখেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ব্রিটেনের স্টোনহেঞ্জের (Stone Henge) কথা। তার পরও, গোবেকলি তেপে নিয়ে পড়াশোনার সময় তারা দারুণ কিছু ব্যাপার আবিষ্কার করেন। স্টোনহেঞ্জ আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সময়কার এবং এটা বানিয়েছিল মোটামুটি উন্নত কৃষিনির্ভর সমাজ। কিন্তু গোবেকলি তেপের নিদর্শনগুলো প্রায় সাড়ে ৯ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের। এ ছাড়াও আর যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় এই ভাস্কর্যগুলো বানিয়েছিল শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠী। প্রথম প্রথম প্রত্নতত্ত্ব সম্প্রদায় এই আবিষ্কারকে তেমন একটা পাত্তা দিতে চায়নি, কিন্তু যতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকল, ততই এর পুরোনো সময় আর কৃষিপূর্ব সমাজের কারিগরের ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া গেল। আর এখান থেকেই বোঝা গেল, শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের মানুষদের দক্ষতা, ক্ষমতা আর তাদের সংস্কৃতির জটিলতা সম্পর্কে আমরা যা ভাবি ব্যাপারগুলো মোটেই অতটা সহজ নয়।

১৩. বাঁয়ে: গোবেকলি তেপের একটি ভাস্কযের্র কিছু অংশ। ডানে: একটি কারুকার্যখচিত পাথরের স্তম্ভ (প্রায় পাঁচ মিটার লম্বা)

এসব দেখে প্রশ্ন জাগতেই পারে, একটা শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ কেন ওই রকম একটা জিনিস তৈরি করতে যাবে? নিশ্চয়ই তাদের দৈনন্দিন কাজে ওসবের তেমন কোনো দরকার ছিল না। ওই কাঠামোগুলো বিশাল জীবজন্তু ধরার কোনো ফাঁদও ছিল না কিংবা বৃষ্টি বা সিংহের হাত থেকে বাঁচার আশ্রয়ও ছিল না। সব রকম সম্ভাব্য দিক থেকেই মনে হয়, এই কাঠামো বা ভাস্কর্যগুলোর সঙ্গে কোনো না কোনো ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য জড়িত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সেটার অর্থ এখনো পুরোপুরি উদ্ধার করতে পারেননি। এর অর্থ উদ্ধার করার পেছনে তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কারণ তাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত ছিল না। সেইসব ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যগুলো যা-ই হোক না কেন, শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের মানুষেরা সেগুলোতে এতটাই বিশ্বাস করত যে তারা একটা বিশাল সময় এবং পরিশ্রম দিয়ে গোবেকলি তেপের মতো কাঠামো নির্মাণ করেছিল। গোবেকলি তেপে নির্মাণ করার একমাত্র উপায় ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী বা গোত্রের হাজার হাজার শিকারি-সংগ্রাহকের দীর্ঘ সময় ধরে একত্রে কাজ করা। শুধু খুব সূক্ষ্ম ধর্মীয় বা আদর্শগত চর্চার মাধ্যমেই এরকম একটা প্রচেষ্টাকে টিকিয়ে রাখা এবং এর পেছনে প্রেরণা জোগানো সম্ভব।

এসব বাদ দিলেও, গোবেকলি তেপের ভেতরে আরো একটা দুর্দান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য লুকানো আছে, যার সঙ্গে কৃষি বা কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। যেসব জিনতত্ত্ববিদেরা চাষযোগ্য গমের ডিএনএ নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা বহু বছর ধরে জানার চেষ্টা করছেন কোথায় এবং কবে প্রথম গম চাষ শুরু হয়। সব ধরনের গমের সঙ্গে চাষযোগ্য গমের তুলনা করে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে চাষযোগ্য গমের প্রজাতিগুলোর মধ্যে অন্তত একটার (Einkorn Wheat) আবির্ভাব হয়েছিল পূর্ব-দক্ষিণ তুরস্কের একটা পাহাড়ি এলাকায়, যেটা কি না গোবেকলি তেপে থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে।[৬]

এই যে মানুষ গমের চাষ শুরু করল, কিংবা গমই মানুষকে 'গৃহপালিত' করে ফেলল– এই ঘটনার সঙ্গে গোবেকলি তেপের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নিশ্চয়ই কোনো একটা সম্পর্ক আছে। কারণ এ দুটো ঘটনার একসঙ্গে ঘটাকে স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার বলা যায় না। যেই মানুষগুলো গোবেকলি তেপে তৈরি করেছিল এবং পরে ব্যবহার করত তাদের খাওয়াদাওয়ার জন্য অনেক বেশি খাবারের প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা এরকম একটা ধারণা পাচ্ছি যে, দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের শিকারি-সংগ্রাহকেরা সাড়ে ৯ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে প্রথমবারের মতো বুনো গম সংগ্রহ করা ছেড়ে বড়ো পরিসরে গমের চাষ করা শুরু করল। আর সেটা মোটেই তাদের জীবনকে সহজতর করার লক্ষ্যে নয় কিংবা খাবারের জোগান বাড়ানোর জন্যও নয় বরং তাদের সেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা মন্দির তৈরি এবং তার দেখাশোনার জন্য। সাধারণভাবে আমরা ভাবি অনেকটা এরকম– পৃষ্ঠপোষকেরা প্রথমে একটা গ্রাম তৈরি করে আর তারপর যখন গ্রামটা বেশ ভালোমতো চলতে থাকে তখন তারা একটা মন্দির স্থাপন করে। গ্রামবাসীরা মন্দিরে আসে প্রার্থনার জন্য। কিন্তু গোবেকলি তেপে আমাদের জানায় যে অন্তত কিছু ক্ষেত্রে গ্রাম তৈরি হওয়ার আগেই মন্দির তৈরি হয়েছিল আর এর পরেই গ্রাম কিংবা গ্রামবাসীরা এটাকে ঘিরে জড়ো হয়েছিল। সুতরাং কৃষির আবির্ভাব হয়েছিল কোনো ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক কারণে, কোনো অর্থনৈতিক কারণে নয়। অবশ্য এটা আমরা একদম নিশ্চিত করে

বলতে পারি না, কারণ আমাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এখনো গোবেকলি তেপেতে খননকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা আশা করি, আগামী কিছু বছরের মধ্যেই আমরা এ ব্যাপারে আরো পরিষ্কার একটা ধারণা পাব।

বিপ্লবের বলি

মানুষ ও শস্যের মধ্যকার যে ভয়ংকর চুক্তি, সেটাই আমাদের পূর্বপুরুষদের করা একমাত্র চুক্তি নয়। আরো একটা চুক্তি হয়েছিল, যেটা অন্যান্য প্রাণী, যেমন– ভেড়া, ছাগল, শুয়োর আর মুরগির ভাগ্য বদলে দিয়েছিল। যে যাযাবর গোষ্ঠী বুনো ভেড়া শিকার করে বেড়াত, তারাই কিন্তু প্রজন্মান্তরে সেইসব ভেড়ার শারীরিক গঠনের পরিবর্তনে প্রভাব ফেলেছিল। এটা সম্ভবত শুরু হয়েছিল বেছে বেছে শিকার করার মাধ্যমে। তারা বাচ্চা দেওয়ার মতো বড়ো স্ত্রী ভেড়াগুলো আর একদম বাচ্চা ভেড়াগুলোকে শিকার করত না, যাতে তাদের ভবিষ্যতের জন্য খাবার নিশ্চিত থাকে। এর পরের ধাপটা সম্ভবত সেইসব ভেড়ার পালকে অন্যান্য হিংস্র পশু, যেমন– সিংহ, নেকড়ে কিংবা অন্য শিকারি-সংগ্রাহক সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করা। এরপর তারা হয়তো ভেড়ার পালগুলোকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে চরিয়ে বেড়ানো শুরু করল, যাতে তাদের ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর শেষমেশ, মানুষ আরো ভালো করে খেয়াল করে ভেড়ার পাল বাছাই করতে লাগল, যাতে সেটা মানুষের চাহিদা ভালোমতো পূরণ করতে পারে। যেসব ভেড়া বেশি বন্য স্বভাবের ছিল আর কিছুতেই মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাইত না তাদেরকে সবার প্রথমে হত্যা করা হতো (রাখালেরা সাধারণত একটু বেশি কৌতূহলী পশু পছন্দ করে না, কারণ তারা সহজেই পাল থেকে দূরে চলে যায়)। একইভাবে সবচেয়ে চিকন আর ভগ্নস্বাস্থ্যের স্ত্রী ভেড়াগুলোকেও বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে ছিল না। এভাবে অনেকগুলো প্রজন্ম পার হওয়ার পর আরো মোটাতাজা, আরো নরমসরম আর কম কৌতূহলী ভেড়ার পাল তৈরি হলো। এই তো চাই! এতদিনে রাখাল

এমন ভেড়ার পাল পেল, যারা তার বাঁশির পেছন পেছন তাকে অনুসরণ করে চলবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, শিকারিরা হয়তো ভেড়া ধরত আর তাকে বড়ো করত। যখন খাবারের অভাব হতো না তখন তাকে খাইয়ে মোটাতাজা বানিয়ে ফেলত, আবার যখন খাবারের সংকট তখন ধরে খেয়ে ফেলত। এরকম করতে করতে কোনো এক সময় তারা আরো বেশি সংখ্যায় ভেড়া ধরে রাখতে শুরু করল। এদের মধ্যেই কেউ কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হলো আর বাচ্চা উৎপাদন শুরু করল। ওদিকে, যেসব ভেড়া খুব বেয়াড়া ছিল তাদেরকে প্রথমেই সাবাড় করে ফেলা হতো। আর যারা সবচেয়ে শান্তশিষ্ট আর হৃষ্টপুষ্ট তাদেরকেই বাঁচিয়ে রাখা হলো, যাতে তারা আরো বাচ্চা উৎপাদন করে। আর এভাবে একপাল গৃহপালিত ও অনুগত ভেড়া তৈরি হলো।

এইসব গৃহপালিত প্রাণী (ভেড়া, মুরগি, গাধা ও অন্যান্য) থেকে মানুষ অনেক খাবার (মাংস, দুধ, ডিম) ও কাঁচামাল (চামড়া, উল) পেতে শুরু করল। পাশাপাশি এদেরকে নানাভাবে খাটিয়েও নেওয়া যেত। জিনিসপত্র আনা নেওয়া, জমি চাষ, শস্য মাড়াইয়ের মতো যে কাজগুলো এর আগ পর্যন্ত মানুষকেই করতে হতো, সেগুলো তখন তারা ওইসব প্রাণীকে দিয়ে করাতে লাগল। কৃষিভিত্তিক সমাজগুলোতে মানুষ মূলত চাষাবাদ নিয়েই ব্যস্ত থাকত, পশুপালন ছিল বাড়তি একটা ব্যাপার। কিন্তু এই সময়েই একটা নতুন ধরনের সমাজব্যবস্থা আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগল, যেটা প্রধানত নির্ভর করত নানান রকম গৃহপালিত প্রাণীর ওপর। এই নতুন ধরনের সমাজের নাম দেওয়া যেতে পারে ‘পশুপালন সমাজ’।

মানুষ যতই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, সঙ্গে তাদের গৃহপালিত পশুগুলোও যেতে থাকল। ১০ হাজার বছর আগেও, সব মিলিয়ে মাত্র অল্প কয়েক লাখ ভেড়া, গোরু, ছাগল, বুনো শুয়োর আর মুরগি শুধু আফ্রো-এশিয়ান এলাকায় দেখা যেত। আজকের দুনিয়ায়, ১০০ কোটি ভেড়া, ১০০ কোটি শুয়োর, ১০০ কোটিরও বেশি গোরু আর প্রায় ২৫০ কোটি মুরগি আছে! আর এরা পৃথিবী জুড়েই আছে। গৃহপালিত মুরগিই হলো সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে

থাকা পাখি যেটা মানুষ মাংস আর ডিমের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এখন এই পৃথিবীতে জনসংখ্যার দিক থেকে মানুষের পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বহুল বিস্তৃত বড়ো আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো হলো যথাক্রমে গৃহপালিত গোরু, শুয়োর আর ভেড়া! খুব সূক্ষ্ম বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে (যেটা সাফল্য বলতে শুধু ডিএনএ প্রতিলিপির সংখ্যাকেই বোঝে) কৃষিবিপ্লব আসলে মুরগি, গোরু, শুয়োর আর ভেড়ার জন্য বিশাল এক আশীর্বাদ হিসেবেই এসেছিল!

দুর্ভাগ্যবশত, এই বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি আসলে সাফল্যের সংজ্ঞাটা সম্পূর্ণভাবে দিতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছু বিচার করে শুধু টিকে থাকা আর বংশবিস্তার দিয়ে, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা বা সুখের কোনো মূল্যই নেই এখানে। মুরগি কিংবা গোরুর গৃহপালিত হওয়াটা হয়তো একটা সাফল্যের গল্প, কিন্তু তারাই আবার এ যাবৎকালের সব প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা। গৃহপালনের প্রথাটা শুরু হয়েছিল খুব নৃশংস কিছু চর্চার মধ্য দিয়ে, যেটা প্রজন্মান্তরে আরো নিষ্ঠুরই হয়েছে।

বুনো মুরগির সাধারণ জীবনকাল মোটামুটি সাত থেকে ১২ বছর, আর বুনো গোরুর ২০-২৫ বছর। কিন্তু সত্যিকার বন্য পরিবেশে বেশিরভাগ মুরগি কিংবা গোরু আসলে এর চেয়ে বেশ কম বয়সেই মারা যেত। তার পরও অন্তত বেশ কটা বছর বেঁচে থাকার তাদের ভালোই সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে, বেশিরভাগ গৃহপালিত মুরগি আর গোরুই আসলে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে মানুষের খাবারে পরিণত হয়। কারণ অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় এই বয়সটাই তাদের হত্যা করার জন্য উপযুক্ত। (তিন মাসেই যদি একটা মোরগ তার সর্বোচ্চ ওজনে পৌঁছে যায়, তাহলে কোন দুঃখে মানুষ তাকে তিন বছর ধরে খাওয়াতে যাবে?)

ডিম দেওয়া মুরগি, দুধেল গাভি আর ভারবাহী পশুদের মাঝে মাঝে অনেক বছর বাঁচতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই বর্ধিত জীবনের জন্য তাদের মূল্যও দিতে হয়। তারা এমন এক জীবন পায়, যেটা তাদের আশা কিংবা প্রয়োজনের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। যৌক্তিকভাবেই এটা ধরে নেওয়া যায় যে, একটা ষাঁড় নিশ্চয় সারা দিন ঘাসভরা মাঠে অন্য ষাঁড়দের সঙ্গে চরে বেড়াতেই পছন্দ করবে,

সে কখনোই একটা নরবানরের চাবুকের বাড়ি খেতে খেতে তার বোঝা বইতে কিংবা হাল চাষ করতে চাইবে না।

ষাঁড়, ঘোড়া, গাধা আর উটকে অনুগত ভারবাহী পশুতে পরিণত করার জন্য তাদের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি আর সামাজিক বন্ধন ভেঙে দিতে হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে তাদের হিংস্রতা আর যৌনতাকে, এমনকি রহিত করা হয়েছে তাদের ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমতাও। এ কাজের জন্য কৃষকরা নানান রকম উপায় বের করেছিল; যেমন– খোঁয়াড় বা খাঁচায় পশুদের আটকে রাখা, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা, চাবুক দিয়ে পিটিয়ে বা ছ্যাঁকা দিয়ে কাজ করানোতে অভ্যস্ত করা। আর পুরুষ প্রাণীদের নপুংসকরণ তো খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এসবের ফলে পুরুষ প্রাণীদের আগ্রাসন কমে গেল আর মানুষ আরো ভালোমতো যাচাই-বাছাই করে নিজের ইচ্ছামতো সেইসব প্রাণীর পুনরুৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকল।

নিউ গিনির অনেক সমাজে একজন মানুষের সম্পদ বলতে তার কতগুলো শুয়োর আছে সেটা বোঝানো হয়। শুয়োর যেন পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তারা শুয়োরের নাকটা কেটে দিত। এর ফলে যেটা হতো, শুয়োর যখনই গন্ধ শুঁকতে যেত তার প্রচণ্ড ব্যথা করত। এখন যেহেতু গন্ধ না শুঁকতে পারলে শুয়োর খাবার কিংবা পথ কিছুই খুঁজে পাবে না সুতরাং তারা পুরোপুরি তাদের মানুষ প্রভুদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেল। নিউ গিনির অন্য এক এলাকায় আবার শুয়োরের চোখ উপড়ে ফেলা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এর ফলে শুয়োর কোন দিকে যাচ্ছে তাও দেখতে পায় না।[৭]
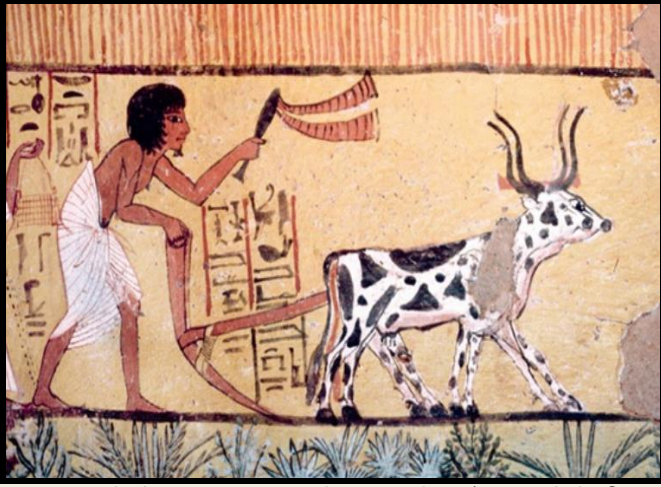
১৪. এই চিত্রটি পাওয়া গেছে আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের একটি মিশরীয় সমাধিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে, এক জোড়া ষাঁড়কে দিয়ে হাল চাষ করানো হচ্ছে। এমনিতে বন্য পরিবেশে বেঁচে থাকা একটি গোরু তার পালের সঙ্গে ইচ্ছামতো বিচরণ করে বেড়াত। তাদের নিজেদের মধ্যে একটা জটিল সামাজিক সম্পর্কও ছিল। অন্যদিকে নপুংসকৃত আর গৃহপালিত একটি ষাঁড় তার জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই নষ্ট করে চাবুকের বাড়ি খেয়ে, একা কিংবা আরেকজনের সঙ্গে হাল চষে আর একটা ছোট্ট কুঠুরির ভেতর বসবাস করে। এই জীবন তার শারীরিক কিংবা মানসিক কোনো প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। তারপর, যখনই কোনো একটা ষাঁড় আর জমি চষতে পারে না তখনই তাকে হত্যা করা হয়। (ছবির ওই মিশরীয় কৃষকের দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও ভালো করে খেয়াল করুন, সে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, যেটা তার শরীরের জন্য মোটেই ভালো নয়। সত্যি বলতে কি, এই মানুষটাও ষাঁড়টার মতোই নিজের শরীর, মন আর সামাজিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে এক যন্ত্রণাময় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।)

দুগ্ধখামারগুলোতে একটু অন্যরকম উপায়ে পশুদেরকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা হয়। সাধারণত গাভি, ছাগী কিংবা ভেড়ি শুধু বাছুর বা বাচ্চা জন্মের পরই দুধ উৎপাদন করে, তাও ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ তাদের সন্তানদের সেটা দরকার হয়। এখন, খামারে দুধের জোগান অব্যাহত রাখার জন্য যেটা করা হয় সেটা হলো সেসব বাছুর, ছাগলের বাচ্চা কিংবা ভেড়ার বাচ্চাদের জন্মের পরপরই হত্যা করা হয়। আর তারপর যতদিন সম্ভব ততদিন ধরে তাদের মায়েদের দুধ দোয়ানো হয়। তারপর আবার তাদের

অন্তঃসত্ত্বা বানানো হয়। এটা এখনো খুবই প্রচলিত একটা পন্থা। এখনকার অনেক আধুনিক দুগ্ধখামারে একটা দুধ দেওয়া গাভিকে হত্যা করার আগে সেটা মোটামুটি বছর পাঁচেক বাঁচে। এই পাঁচ বছর সময়ের প্রায় পুরোটা জুড়েই সে অন্তঃসত্ত্বা থাকে। তাকে প্রতি ৬০ কি ১২০ দিন পরপর নিষিক্ত করা হয় যাতে সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। তার সন্তানকে জন্মের পরপরই তার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। গাভিগুলোকে লালনপালন করা হয় পরের প্রজন্মের দুধ উৎপাদনকারী হিসেবে আর ষাঁড়গুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাংসের খামারে।[৮]

অন্য আরেকটা পন্থা হলো, বাছুর কিংবা বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়েদের কাছাকাছি রাখা কিন্তু এমন কিছু ব্যবস্থা করা, যাতে তারা খুব বেশি মায়ের দুধ খেতে না পারে। এটার একটা খুব সহজ উপায় হলো বাছুরটাকে প্রথমে তার মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হবে, তারপর যখনই দুধ পুরো মাত্রায় পাওয়া যাবে, তখনি বাছুরটাকে সরিয়ে নেওয়া হবে। এই পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে সাধারণত বাছুর আর গাভি দুজনের কাছ থেকেই বেশ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়। তাই কিছু কিছু রাখাল যেটা করত তা হলো, বাছুরটাকে মেরে তার মাংস খেয়ে ফেলত কিন্তু তার চামড়াটা দিয়ে একটা বাছুরের মতো দেখতে পুতুল তৈরি করত। তারপর সেটা গাভিটার সামনে রাখত, যাতে গাভির দুধ উৎপাদন বেড়ে যায়। সুদানের নয়ার (Nuer) উপজাতির লোকজন তো আরেক ধাপ এগিয়ে সেই নকল বাছুরের গায়ে তার মায়ের মূত্র ঢেলে দিত যাতে মা সেই পুতুলটাকে আরো বেশি আপন ভাবতে পারে! নয়ারদের আরেকটা পদ্ধতি ছিল, বাছুরের মুখে কাঁটাওয়ালা একটা আংটা পরিয়ে দেওয়া। এর ফলে বাছুর দুধ খেতে গেলে গাভির গায়ে কাঁটা ফুটত আর গাভি তখন নিজেই বাছুরকে দুধ খেতে দিত না।[৯] ওদিকে, সাহারার তুয়ারেগ (Tuareg) উট প্রজননকারীরা উটশাবকদের নাকের বাইরের অংশ আর ঠোঁটের ওপরের অংশটা কেটে দিত, যাতে তাদের চুষতে কষ্ট হয়। এভাবেই তারা শাবকদের বেশি দুধ খাওয়া থেকে বিরত রাখত।[১০]

সব কৃষিভিত্তিক সমাজই যে তাদের পোষ্য প্রাণীগুলোর প্রতি এমন আচরণ করত, তা নয়। কিছু কিছু গৃহপালিত প্রাণীর জীবন

হয়তো বেশ ভালোই ছিল। উলের জন্য পোষা ভেড়াটা, পোষা কুকুরটা আর বেড়ালটা বেশ আরামেই থাকত। যুদ্ধে কিংবা প্রতিযোগিতায় লড়াই করার ঘোড়াগুলোও আরামে থাকত। রোমান সম্রাট ক্যালিগুলা (Caligula) সচেতনভাবেই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া ইনকিতাতুসকে (Incitatus) তাঁর উজির হিসেবে নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন! রাখাল আর কৃষকেরা পুরো ইতিহাস জুড়েই তাদের পালিত প্রাণীদের বেশ খেয়াল রেখেছে, ঠিক যেমন দাসপ্রভুরা তাদের দাসদের প্রতি দয়া দেখিয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে অনেক রাজা ও ধর্মপ্রচারক নিজেদের রাখালের বেশে উপস্থাপন করেছেন। আর তারা তাদের প্রজাদের সেভাবেই খেয়াল রেখেছেন, যেভাবে রাখালেরা খেয়াল রাখত তাদের পশুপালের ওপর। এখন নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে এটা কোনো কাকতাল ছিল না!

১৫. আধুনিক মাংস কারখানার একটি সাধারণ বাছুর। জন্মের পরপরই বাছুরটিকে তার মায়ের থেকে আলাদা করে একটা ছোটো খোপের ভেতর আটকে রাখা হয় যেটার আকার তার শরীরের আকারের থেকে খুব একটা বড়ো নয়। সেখানেই বাছুরটি তার

> পুরো জীবন কাটায়, গড়ে মাস চারেক হবে। তাকে ওই খোপ থেকে বের হতে দেওয়া হয় না, সে অন্য বাছুরদের সঙ্গে খেলতেও পারে না। এমনকি তাকে হাঁটতেও দেওয়া হয় না। আর এইসবই করা হয় যাতে তার পেশিগুলো শক্ত না হয়ে যায়। নরম নরম পেশির মানেই হলো খুব নরম আর সুস্বাদু মাংস (Steak)। প্রথম যখন বাছুরটা হাঁটতে পারে, তার পেশিগুলো একটু প্রসারিত করতে পারে কিংবা অন্য বাছুরদের ছুঁতে পারে, সেটা হলো তার কসাইখানায় যাওয়ার পথে। বিবর্তনের ভাষায় বলতে গেলে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সব প্রাণীর মধ্যে গোরু হলো অন্যতম সফল প্রাণী। আবার একইসঙ্গে সেই একই গোরু পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগা প্রাণীও।

রাখাল বা পশুপালকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখে পশুদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এ কথা মানতেই হয় যে, বেশিরভাগ গৃহপালিত পশুর জন্যই কৃষিবিপ্লব একটা ভয়ানক বিপর্যয় হিসেবেই এসেছিল। তাদের ওই বিবর্তনীয় 'সাফল্য' আসলে অর্থহীন। একটা বিরল বুনো গন্ডার যার সম্পূর্ণ প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার শঙ্কার মধ্যে আছে, সেও ওই বাছুরের চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে, যে কিনা তার ছোট্ট জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে একটা ছোট্ট বাক্সের ভেতরে, মোটাতাজা হচ্ছে কিছু সুস্বাদু মাংসের টুকরোয় পরিণত হওয়ার জন্য। বিরল সেই গন্ডারটি তার প্রজাতির শেষ কজন সদস্য হওয়ার কারণে এমন কিছু কম সুখী নয়। আবার সংখ্যার বিরাট সাফল্যও কিন্তু সেইসব বাছুরদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার জন্য কোনো সান্ত্বনা হতে পারে না।

বিবর্তনীয় সাফল্য আর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার মধ্যের এই দ্বন্দ্বটাই কৃষিবিপ্লব থেকে আমাদের পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যখন আমরা গম কিংবা ভুট্টার মতো বিভিন্ন উদ্ভিদের ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তন বিবেচনা করি, তখন হয়তো-বা বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গিটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু গোরু, ভেড়া কিংবা মানুষের মতো বড়ো প্রাণী–যাদের অনুভূতি ও সংবেদনের এক জটিল জগৎ রয়েছে–তাদের ক্ষেত্রে বিবর্তনীয় সাফল্য কীভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়, সেটা আমাদের আগে বুঝতে হবে। সামনের অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয়ভাবে আমাদের প্রজাতির সম্মিলিত ক্ষমতা বাড়তে থাকে, আর কীভাবে সেটা আমাদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যায় ৬

কল্পনার কারাগার

মানব-ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত বিষয় হলো কৃষিবিপ্লব। কেউ কেউ মনে করে, এই কৃষিবিপ্লব মানবজাতির প্রগতি ও সমৃদ্ধির দুয়ার খুলে দিয়েছিল, আবার কারো মতে মানুষের সব দুর্গতির শুরু সেখানেই। এই দ্বিতীয় দলের মতে, ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সেই সময়টাতেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের সুতোটা ছিঁড়তে শুরু করে, শুরু হয় বিচ্ছিন্নতা আর লোভের আধিপত্য। সেখান থেকে আগের জীবনে ফিরে যাওয়ারও আর কোনো পথ ছিল না, কারণ কৃষিকাজের ফলে মানুষের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে গেল যে, আগের মতো খাদ্য সংগ্রহ কিংবা শিকার করে অন্নসংস্থান করাটা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল। ১০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে এই পৃথিবীতে প্রায় ৫০ থেকে ৮০ লাখ যাযাবর শিকারি মানুষের বসবাস ছিল। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক পার হতে না হতেই তাদের সংখ্যা কমে হয়ে গেল ১০ থেকে ২০ লাখের মতো (যাদের অধিকাংশই ছিল অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায়)। শতকরা হিসেবে সেটা খুবই সামান্য, কারণ তখন পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল ২৫ কোটি।

এরপর বেশিরভাগ কৃষকই স্থায়ী বসতি গেড়ে বসবাস করা শুরু করে দিল; অল্প কিছু পশুপালকই কেবল যাযাবর থেকে গেল। স্থায়ী বসতি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে মানবগোষ্ঠীগুলোর আকার অনেকটা ছোটো হয়ে এলো। প্রাচীন শিকারি মানুষেরা বিশাল এলাকা জুড়ে থাকত, ক্ষেত্রবিশেষে যার আকার হতো কয়েক শ বর্গকিলোমিটার। 'বাসা' বলতে তারা বুঝত সেই পুরো এলাকাটাকেই– সেখানকার পাহাড়, নদী, বন, আকাশ– সবকিছুই। অন্যদিকে কৃষকদের দিনের বেশিরভাগই কাটত এক টুকরো জমিতে কাজ করে, আর বাকি সময়টা

কাটত কাঠ, পাথর আর মাটির তৈরি ছোট্ট ঘরে। নিজের ঘরের প্রতি কৃষক মানুষের সেই যে প্রবল আকর্ষণ জন্মাল তারই সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে মানুষের স্থাপত্য ও মনস্তত্ত্বে। 'নিজের বাসা'র প্রতি আকর্ষণ আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব সেই প্রাগৈতিহাসিক আত্মকেন্দ্রিকতারই ছাপ।

কৃষক মানুষের বসতিগুলো প্রাচীন শিকারি মানুষদের এলাকা থেকে যেমন ছিল অনেক ছোটো, তেমনি ছিল নানা রকম কৃত্রিমতায় পূর্ণ। শিকারি মানুষেরা তাদের থাকার জায়গাতে তেমন কোনো পরিবর্তন করেনি– এক আগুন জ্বালানো ছাড়া। কিন্তু কৃষক মানুষ বিপুল শ্রম ব্যয় করে সেই বুনো পরিবেশের মধ্যে দ্বীপের মতো করে তৈরি করে নিলো নিজেদের আবাস। তারা বনের গাছ কেটে, খাল কেটে, মাঠ পরিষ্কার করে বানাল নিজেদের ঘর, চাষের জমি আর ফলের বাগান। এই জায়গার ভেতরে বসবাসের অধিকার ছিল কেবল মানুষের, আর মানুষের 'অনুমোদিত' প্রাণী ও উদ্ভিদের। সেটা নিশ্চিত করতে মানুষকে তাদের এলাকার চারদিকে বেড়াও দিতে হলো। কৃষক মানুষের অনেকটা সময় লেগে যেত বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত আগাছা আর বুনো প্রাণী দূর করতে। এদের কেউ ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচত, আর কেউ গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে মারা পড়ত মানুষের হাতে। সেই কৃষিযুগের আরম্ভে যার শুরু, তারই রেশ ধরে আজকের দিনেও পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ লাঠি, চপ্পল কিংবা কীটনাশক নিয়ে পিঁপড়া, তেলাপোকা আর মাকড়সার বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে সেই একই যুদ্ধ।

অনেকদিন পর্যন্ত মানুষের বসবাসের এলাকাগুলো ছিল খুব ছোটো ছোটো। পৃথিবীতে মোট জায়গা আছে ৫১ কোটি বর্গকিলোমিটার, যার মধ্যে ডাঙা প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি বর্গকিলোমিটার। ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দেও পৃথিবীর কৃষকেরা তাদের যাবতীয় গাছপালা আর পশুপাখি নিয়ে মাত্র ১.১ কোটি বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছিল, যা কিনা পুরো পৃথিবীর মাত্র ২ শতাংশ।[২] বাকি জায়গাগুলো ছিল খুব গরম, খুব ঠান্ডা বা অন্য কোনো কারণে কৃষিকাজের অনুপযোগী। আর সেই ২ শতাংশ জায়গা থেকেই ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়।

নিজের তৈরি বসতি ছেড়ে চলে যাওয়াটা ক্রমেই মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। নিজেদের ঘরবাড়ি, ফসলের খেত আর খাবারের গোলা ত্যাগ করার ঝুঁকি মানুষ নেয়নি। আর একই জায়গায় অনেকদিন বাস করতে করতে মানুষের স্থাবর সম্পদের পরিমাণও বাড়তে লাগল। সেই সম্পদের মধ্যে বাঁধা পড়ল যাযাবর মানুষ। কৃষক সমাজ সম্পদে খুব সমৃদ্ধ মনে না হলেও একটা কৃষক পরিবারের মোট সম্পদ ছিল পুরো একটা শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের মোট সম্পদের চেয়েও বেশি।

ভবিষ্যতের হাতছানি

কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষের বিচরণক্ষেত্র কমে গেল, কিন্তু কৃষিকাজের জন্য আগের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হলো তাদের। সামনের মাসে, এমনকি সামনের সপ্তাহে কী খাব– এমন চিন্তা শিকারি মানুষের মাথায় কখনো আসেইনি। কিন্তু কৃষক মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তার সীমারেখা দিন, সপ্তাহ, মাস ছাড়িয়ে বছরের কোঠাও পেরিয়ে গেল।

শিকারি মানুষ ছিল দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ, পরবর্তী সময়ের জন্য কিছু বাঁচিয়ে রাখাটা তাদের জন্য কঠিন ছিল। ভবিষ্যতের চিন্তা তাই তাদের খুব একটা ছিল না। তবে ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা যে একেবারেই চিন্তা করত না, এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। শভে (Chauvet), লাস্কো (Lascaux) আর আলতামিরার (Altamira) গুহার দেওয়ালের ছবিগুলো যারা এঁকেছিল, তারাও নিশ্চয়ই চেয়েছিল ছবিগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে যাক। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধ আর সন্ধিগুলোও ছিল দীর্ঘমেয়াদি। কোনো কোনো ঋণ শোধরাতে কিংবা কোনো অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেও অনেক সময় কয়েক বছর লেগে যেত। তার পরেও, শিকার কিংবা সংগ্রহ করে খাবার জোটানো এই মানুষগুলোর পক্ষে ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশিদূর চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। মজার ব্যাপার হলো, এই অপারগতা তাদের ভবিষ্যৎসংক্রান্ত মানসিক দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল। যে ভবিষ্যতের ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তাকে নিয়ে চিন্তা করে আমার কী লাভ?

কৃষিবিপ্লব মানুষের কাছে ভবিষ্যতের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিল। কৃষকদের সব সময় ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রেখে কাজ করতে হতো। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ছিল ঋতুচক্রের পালাবদলের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল– দীর্ঘ সময় উৎপাদন আর স্বল্প সময় ফসল সংগ্রহের চক্রে বছর কেটে যেত। মাঠভরা ফসল ঘরে তুলে যে কৃষক আজ রাতে মত্ত হচ্ছে উৎসবে, কাল ভোরেই তাকে আবার ছুটতে হবে মাঠে– কারণ তার ঘরে আগামী দিন, আগামী সপ্তাহ, এমনকি আগামী মাসের খাবার থাকলেও তাকে এখন পরের বছরের কথাও ভাবতে হয়।

এই ভবিষ্যৎ চিন্তার মূল কারণ ছিল ঋতুচক্রের ওপর নির্ভরশীলতা, আর ফসল ফলার চিরন্তন অনিশ্চয়তা। যেসব গ্রামে অল্প কিছু ফসল চাষ আর পশুপালন করা হতো, খরা, বন্যা আর মহামারির ভয় তাদের পিছু ছাড়ত না। কাজেই কৃষকদের সব সময় নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার মজুত করে রাখতে হতো। আগে হোক বা পরে, কোনো না কোনো বছর খারাপ সময় আসবেই– আর সেই খারাপ সময়টাতে পর্যাপ্ত খাবারের মজুত না থাকলে না খেয়ে থাকতে হবে। এই দূরদর্শিতার অভাবে অনেক কৃষককেই অকালে মরতে হয়েছে।

সেই কৃষিযুগের শুরু থেকেই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা হয়ে গেল মানুষের চিরসঙ্গী। যেসব কৃষক ফসলের খেতে পানির জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করত, তাদের প্রতি বর্ষাকাল শুরু হতো নতুন দুশ্চিন্তা নিয়ে। তাদের অনেকটা সময় যেত আকাশের দিকে তাকিয়ে আর বাতাসের গন্ধ শুঁকে। সময়মতো বৃষ্টি হবে কি না, হলেও পরিমাণমত হবে কি না, ঝড় এসে ফসল উড়িয়ে নিয়ে যাবে কি না– এসবই ছিল তাদের নিত্যদিনের চিন্তা। আবার ইউফ্রেটিস, সিন্ধু আর হোয়াংহো নদীর অববাহিকার কৃষকদের চিন্তার বিষয় ছিল নদীর পানির উচ্চতা। এসব নদীর পানি বেড়ে দুকূল ভাসিয়ে দিত বন্যায়; তাতে সব ফসলের খেতে পৌঁছত পানি, আর ওপরে জমত উর্বর পলিমাটির স্তর। কিন্তু কখনো বন্যাটা সময়মতো না হলে, কিংবা খুব বেশি হলেই হতো সর্বনাশ।

শুধু এটুকুই নয়, কোনো দুর্যোগ এলে কীভাবে সেটা সামাল দেওয়া যাবে, সেই দুশ্চিন্তাও কৃষকদের দিশেহারা করে ফেলত। সেজন্যই তারা আরো বেশি জমি চাষ করত, খাল কাটত আর বেশি

বেশি বীজ বুনত। গ্রীষ্মকালের কর্মী পিঁপড়ের মতোই উদয়াস্ত পরিশ্রম করত একজন কৃষক। ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে সে জলপাইগাছ লাগাত মাঠে, আর সেই জলপাই পিষে তেল বের করত তার ছেলেপুলে আর নাতি-নাতনিরা। সেই জমিয়ে রাখা জলপাইয়ের তেল কাজে লাগত শীতকালে কিংবা পরের বছরে।

মানুষের এই কৃষিকাজের প্রভাব ছিল ব্যাপক। এখান থেকেই বড়ো আকারের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন হয়। তবে দুঃখের বিষয় হলো, এই পরিশ্রমী কৃষকেরা কখনোই তাদের আকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দেখা পায়নি। সব জায়গাতেই দেখা গেছে কৃষকের উদ্বৃত্ত ফসল ভোগ করতে আবির্ভূত হয়েছে নানান শোষক ও অভিজাতগোষ্ঠী, আর কৃষক আটকা পড়েছে তার চিরন্তন দুশ্চিন্তার আবর্তে।

এই উদ্বৃত্ত ফসলই পরবর্তীকালে রাজনীতি, যুদ্ধ, শিল্পকলা ও দর্শনের বিকাশে ইন্ধন জোগায়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে প্রাসাদ, দুর্গ, সৌধ আর মন্দির। এই আধুনিক যুগের শুরুর দিকেও মানুষের ৯০ শতাংশই ছিল কৃষক, যাদের সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির ফল ভোগ করেছে বাকি ১০ শতাংশ– রাজা, রাজকর্মচারী, সৈন্য, যাজক, শিল্পী ও দার্শনিকের মতো অভিজাত শ্রেণি। এরাই ভরেছে ইতিহাসের পাতা, আর বাকিদের জীবন কেটে গেছে ফসলের মাঠে।

কাল্পনিক কাঠামো

কৃষকের ফলানো অতিরিক্ত খাবার আর আবিষ্কৃত নতুন পরিবহণব্যবস্থা– এ দুইয়ের ফলে অনেক মানুষ একসঙ্গে বড়ো আকারের গ্রাম তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করল। কালক্রমে বড়ো গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে নগর, আর এ সবকিছু মিলে তৈরি হলো বিশাল সব রাজ্য আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র।

এসব বড়ো নগর ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর যেসব নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হলো, তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার মানুষ করতে পারেনি। কারণ শুধু উদ্বৃত্ত খাদ্য ও পরিবহণব্যবস্থাই এর জন্য যথেষ্ট ছিল না। একটা রাজ্যের লাখ লাখ মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবার থাকলেও তাতে জমি ও পানির বণ্টন, নানা রকম বিরোধ নিষ্পত্তি

কিংবা যুদ্ধকালীন কর্তব্যের মতো বিষয়গুলোতে মানুষ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। খাদ্যের অভাবে নয়, বরং এই ঐক্যের অভাবেই মানুষের মধ্যে নানা রকম দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফরাসি বিপ্লবের শুরু করেছিল ধনাঢ্য উকিলেরা, ক্ষুধার্ত কৃষক নয়। ভূমধ্যসাগরের চারদিক থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রোমান সাম্রাজ্য কল্পনাতীত অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়, অথচ ঠিক সেই সময়েই সেখানকার রাজনৈতিক কাঠামোতে ভাঙন ধরছিল নানা রকম অন্তর্ঘাতে। ১৯৯১ সালের যুগোস্লাভিয়াতেও খাদ্যাভাব ছিল না, তবু এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দেশটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এসব অনর্থের মূলে ছিল মানুষের যথাযথ বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অভাব। মানুষের লাখ লাখ বছরের বিবর্তন হয়েছে ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে। কৃষিকাজ শুরু করার পর থেকে রাজ্য গঠন পর্যন্ত বিবর্তনের জন্য যে কয়েক হাজার বছরের সময় মানুষ পেয়েছে সেটা এত বড়ো গোষ্ঠী গঠন করার মানসিকতা তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল না।

সেই খাবার সংগ্রহ করার যুগে কয়েক শ অপরিচিত মানুষ কোনো রকম জৈবিক তাড়না ছাড়াই দল বাঁধতে পারত। আর এটা সম্ভব হতো কিছু মিথে (প্রচলিত গল্পে) তাদের বিশ্বাসের ফলে। অবশ্য এই ধরনের গোষ্ঠীতে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ খুব বেশি ছিল না। এই ছোটো আকারের মানবগোষ্ঠীগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজেদের প্রায় সব প্রয়োজন তারা নিজেরাই মেটাত। কৃষিবিপ্লব পরবর্তী সময়টাকে না জানা ২০ হাজার বছর আগের কোনো সমাজতাত্ত্বিক হয়তো বলতেন মিথের ক্ষমতা খুব বেশি নয়– এই বড়োজোর শ-পাঁচেক মানুষ মিথের প্রভাবে কড়ি বিনিময় করতে, অদ্ভুত কিছু উৎসবে অংশ নিতে কিংবা নিয়ান্ডার্থালদের একটা দলকে ধরে পেটাতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। তাই বলে লাখ লাখ মানুষকে দিয়ে একই রকম চিন্তা বা কাজ করিয়ে নেওয়াটা মিথের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু ইতিহাস তেমনটা বলে না। মানুষের মধ্যে একবার ভালোমতো ছড়িয়ে পড়তে পারলে মিথের ক্ষমতা হয়ে যায় অকল্পনীয়। কৃষিবিপ্লবের পর যখন নগর আর রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপক্রম হচ্ছিলো, সে

সময়েই মানুষের মধ্যে ক্ষমতাধর দেবদেবী কিংবা মাতৃভূমির মতো বিষয়গুলো নিয়ে নানা রকম গল্প-কাহিনি তৈরি হয়। এই গল্পগুলোই মানুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করে। বিবর্তন এগোচ্ছিলো আগের মতোই খুব ধীরে, কিন্তু মানুষের কল্পনার দৌড় এবারে তাকে হারিয়ে দিল। এই কল্পনাশক্তির জোরেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এত এত মানুষ সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ হলো।

৮৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মানববসতি ছিল জেরিকো গ্রাম, যার লোকসংখ্যা ছিল কয়েক শ। ৭০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আনাতোলিয়ার চাতালিয়ুক শহরের জনসংখ্যা ছিল ৫ থেকে ১০ হাজারের মধ্যে। সেটাও ছিল তখনকার পৃথিবীর বৃহত্তম বসতি। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ সহস্রাব্দে নীল নদের অববাহিকা ও বদ্বীপের উর্বরভূমিতে যে শহর গড়ে উঠেছিল তার লোকসংখ্যা ছিল আরো বেশি, আর সে শহরের আওতায় ছিল আশপাশের অনেক গ্রাম। ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই সম্পূর্ণ নীল নদ অববাহিকা প্রথম মিশরীয় সাম্রাজ্যের অধীন হয়। তখনকার ফারাওরা শাসন করতেন হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার লাখ লাখ মানুষকে। ২২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে মহান সার্গন পত্তন করেন পৃথিবীর প্রথম সাম্রাজ্যের– আক্কাদীয় সাম্রাজ্য। সে সাম্রাজ্যে প্রজার সংখ্যা ছিল নিযুতের ঘরে, আর সেনাবাহিনীতে স্থায়ী সদস্য ছিল ৫ হাজার ৪০০ জন। আর ১০০০ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়, যার মধ্যে ছিল আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় ও পারস্য সাম্রাজ্য। এসব সাম্রাজ্যে প্রজার সংখ্যা ছিল কোটির কাছাকাছি, আর সৈন্য ছিল ১০ হাজারের মতো।
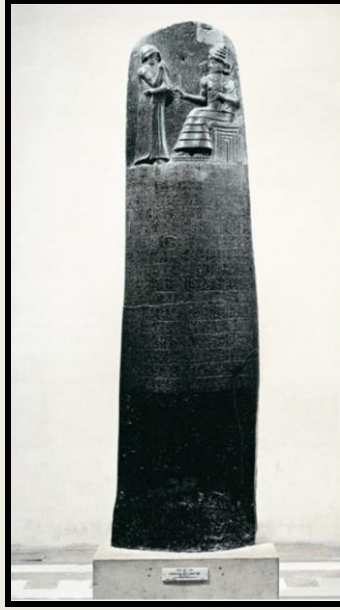
১৬। ১৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শিলালিপিতে খোদাই করা হামুরাবির আইন

২২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সমগ্র চীন জুড়ে গঠিত হয় চীন (Qin) সাম্রাজ্য, আর তার কিছুকাল পরেই রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে আসে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। চীন সাম্রাজ্যের হাজার হাজার স্থায়ী সৈন্য আর লক্ষাধিক রাজকর্মচারীর বেতন আসত প্রায় ৪ কোটি প্রজার দেওয়া কর থেকে। ওদিকে রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে প্রায় ১০ কোটি প্রজার কাছ থেকে কর আদায় করা হতো। সেই করের অর্থই একদিকে আড়াই থেকে ৫ লাখ সৈন্যের খোরাক জোগাত, অন্যদিকে সেই অর্থেই তৈরি হয় প্রায় ১ হাজার ৫০০ বছর ধরে ব্যবহৃত রাস্তা। আজ আমরা ওখানে যেসব থিয়েটার আর অ্যাম্ফিথিয়েটার দেখতে পাই, সেগুলোও তৈরি হয়েছে তখনই।

প্রাচীন মিশরীয় আর রোমান সাম্রাজ্যের লাখ লাখ মানুষের সহযোগিতায় গড়া সমাজের গল্পটা যতটা দারুণ মনে হয়, আসলে ব্যাপারটা তেমন নয়। ‘সহযোগিতা’ শব্দটা অনেকটা নিঃস্বার্থ শোনালেও

সেটা সব সময় স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলে না। মানুষের বড়ো বড়ো সংগঠনের বেশিরভাগই এক সময় অত্যাচার আর শোষণের পথে এগিয়ে গেছে। এমন সংগঠন গড়ার মূল্য কৃষকেরা চুকিয়েছেন তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যটুকু দিয়ে। কর সংগ্রাহকের কলমের একটি খোঁচায় কৃষককে তার সারা বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফসলটুকু হারাতে হতো। রোমান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত অ্যাম্ফিথিয়েটার গড়েছিল যে ক্রীতদাসের দল, সমাজের অলস ধনীদের আনন্দ দিতে সেই ক্রীতদাসেরাই সেখানে লড়াই করে মরত গ্ল্যাডিয়েটর রূপে। জেলখানা আর বন্দিশিবিরগুলোকেও এক ধরনের সহযোগিতার সমাজ বলা যায়, কারণ সেখানেও অনেকগুলো অজানা-অচেনা মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতায় একসঙ্গে একই রকম জীবন যাপন করে।

IN CONGRESS, JULY 4, 1776.

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America,
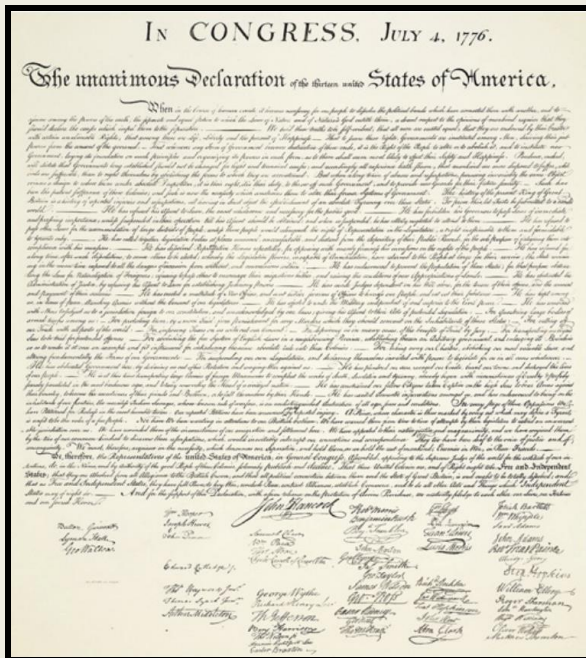
১৭। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ৪ জুলাই ১৭৭৬

সেই প্রাচীন মেসোপটেমীয় শহর থেকে চীন বা রোমান সাম্রাজ্য– এই সবগুলোই দাঁড়িয়ে ছিল এক কাল্পনিক কাঠামোর ওপর। যেসব

সামাজিক রীতিনীতি সেসব জায়গায় চালু ছিল তা মানুষের ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসেনি, এসেছে সেখানে প্রচলিত মিথগুলোর ওপর মানুষের সম্মিলিত বিশ্বাস থেকে।

মিথ কীভাবে পুরো একটা সাম্রাজ্যকে ধরে রাখে? এমন একটা উদাহরণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি– পিউজো। ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পরিচিত দুটো মিথ থেকে এর উত্তর খোঁজা যাক। একটা হলো হামুরাবির আইন, যেটা প্রাচীন ব্যাবিলনে সেই ১৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে লাখো মানুষের সমাজ গড়েছিল, আর অন্যটা হলো ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা, যা আজও লাখ লাখ আমেরিকানের পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তি হিসেবে টিকে আছে।

১৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনই ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম নগর। আর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সাম্রাজ্য, যার লোকসংখ্যা ছিল ১০ লাখেরও ওপরে। এলাকাটা ছিল মেসোপটেমিয়া, যার মধ্যে ছিল আজকের সিরিয়া আর ইরানের কিছু অংশ আর ইরাকের প্রায় পুরোটাই। ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যার নাম শোনা যায়, তিনি হামুরাবি। তাঁর এই খ্যাতির মূল কারণ হলো তাঁর প্রণীত আইন। এই আইনগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল হামুরাবিকে একজন আদর্শ রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যে আইনগত সমতা আনা আর ভবিষ্যতের রাজাদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া।

উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত সমাজ এটাকে গ্রহণ করেছিল প্রায় দৈববাণীর মতোই, আর তাদের অনুসারীরা হামুরাবির মৃত্যুর পরও যতদিন সাম্রাজ্য টিকে ছিল ততদিন এই আইনের অনুলিপি তৈরি করে গেছে। তাই মেসোপটেমিয়ার মানুষের সামাজিক রীতিনীতি বোঝার জন্য হামুরাবির আইন একটা চমৎকার উপকরণ।[৩]

হামুরাবির আইনের ভাষ্য শুরু হয়েছে মেসোপটেমিয়ার মন্দিরের প্রধান দেবতা আনু, এনলিল ও মারডুকের (Anu, Enlil and Marduk) নামে, যাঁরা হামুরাবিকে নিযুক্ত করেছেন 'বিচার প্রতিষ্ঠা, দুষ্টের দমন ও দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারকে প্রতিহত করতে'।[৪] এর পরেই আছে প্রায় ৩০০টি আইনের তালিকা, যার

প্রত্যেকটিতে কোন কাজের জন্য কেমন বিচার হবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এমন কয়েকটা আইন দেখা যাক :

১৯৬। যদি কোনো উঁচু শ্রেণির মানুষ আরেক উঁচু শ্রেণির মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তবে তাকেও অন্ধ করে দেওয়া হবে।

১৯৭। সে যদি কোনো উঁচু শ্রেণির মানুষের হাড় ভেঙে দেয়, তবে তারও হাড় ভেঙে দেওয়া হবে।

১৯৮। সে যদি কোনো সাধারণ মানুষের চোখ অন্ধ করে দেয় বা হাড় ভেঙে দেয়, তবে তাকে ৬০ শেকেল রুপা জরিমানা দিতে হবে।

১৯৯। সে যদি আরেকজন উঁচু শ্রেণির মানুষের কোনো দাসের চোখ অন্ধ করে দেয় বা হাড় ভেঙে দেয়, তবে তাকে ওই দাসের মূল্যের অর্ধেকের সমান রুপা দিতে হবে।[৫]

২০৯। যদি কোনো উঁচু শ্রেণির মানুষ উঁচু শ্রেণির কোনো নারীকে আঘাত করে এবং এতে ওই নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু হয়, তবে তাকে ১০ শেকেল রুপা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২১০। এতে যদি ওই নারীর মৃত্যু হয়, তাহলে তার কন্যাকে হত্যা করা হবে।

২১১। সে যদি সাধারণ শ্রেণির কোনো নারীকে আঘাত করে এবং এতে ওই নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু হয়, তাহলে তাকে পাঁচ শেকেল রুপা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২১২। এতে ওই নারীর মৃত্যু হলে তাকে ৩০ শেকেল রুপা জরিমানা দিতে হবে।

২১৩। সে যদি কোনো উঁচু শ্রেণির মানুষের দাসীকে আঘাত করে এবং এতে ওই দাসীর গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু হয়, তবে তাকে ২ শেকেল রুপা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২১৪। এতে ওই দাসীর মৃত্যু হলে তাকে ২০ শেকেল রুপা জরিমানা দিতে হবে।[৬]

এই তালিকার পরে হামুরাবি বলেছেন,

‘এগুলোই হলো জীবনে সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য রাজা হামুরাবির প্রতিষ্ঠিত ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত আমি, মহান রাজা হামুরাবি, সেসব মানুষের প্রতি উদাসীন নই, যাদেরকে আমার দায়িত্বে সোপর্দ করেছেন দেবতা এনলিল, আর যাদের পথ দেখাবার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন দেবতা মারডুক।’[৭]

হামুরাবির আইন অনুযায়ী ব্যাবিলনের সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে সর্বজনীন ও চিরন্তন ঈশ্বরনির্দেশিত ন্যায়বিচারের ওপর। সামাজিক স্তরবিন্যাস এ আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আইন অনুযায়ী মানুষ দুই লিঙ্গ ও তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। শ্রেণি তিনটি হলো উঁচু শ্রেণির মানুষ, সাধারণ মানুষ আর দাস। ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ ও শ্রেণির মানুষের মূল্যও ভিন্ন। একজন সাধারণ নারীর জীবনের মূল্য যেখানে ৩০ শেকেল রূপা, সেখানে একজন দাসীর জীবনের মূল্য ২০ শেকেল রুপা। আবার একজন সাধারণ পুরুষের চোখের মূল্যই ৬০ শেকেল রুপা।

এই আইন পরিবারের ভেতরেও মানুষের অধিকারক্রম নির্দিষ্ট করে দেয়। এখানে সন্তানদের আলাদা মানুষ হিসেবে নয়, বরং তাদের মা-বাবার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ কারণেই, কোনো উচ্চতর মানুষ আরেকজন উচ্চতর মানুষের মেয়েকে হত্যা করলে শাস্তিস্বরূপ তার মেয়েকেও হত্যা করা হতো। হত্যাকারীকে শাস্তি না দিয়ে তার নিরপরাধ কন্যাকে হত্যা করাটা আমাদের কাছে খাপছাড়া মনে হলেও হামুরাবি ও ব্যাবিলনের বাসিন্দাদের কাছে এটাই ছিল ন্যায়সংগত। হামুরাবির আইন প্রণয়নের আগে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রজারা সবাই যদি যার যার সামাজিক অবস্থান মেনে নেয়, তাহলেই সাম্রাজ্যের লাখ লাখ অধিবাসীদের মধ্যে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হবে। তখন সমাজে খাদ্যের উৎপাদন ও বণ্টন সুষ্ঠু হবে, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে এবং সাম্রাজ্যকে আরো বিস্তৃত করে আরো বেশি সম্পদ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

হামুরাবির মৃত্যুর প্রায় ৩ হাজার ৫০০ বছর পরে, উত্তর আমেরিকায় ব্রিটিশদের তেরোটি উপনিবেশের মানুষদের মনে হতে লাগল যে, ব্রিটিশ রাজা তাদের প্রতি সুবিচার করছেন না। এইসব মানুষের কয়েকজন মুখপাত্র ফিলাডেলফিয়ায় একত্র হলেন, আর ১৭৭৬ এর জুলাইয়ের ৪ তারিখে ঘোষণা করলেন যে এই ১৩টি উপনিবেশের মানুষ আর ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজা নয়। তাদের স্বাধীনতার এই ঘোষণাতেও ছিল সর্বজনীন ও চিরন্তন ন্যায়বিচারের কথা, আর ঠিক হামুরাবির আইনের মতোই সেগুলোও ছিল

ঈশ্বরনির্দেশিত। তবে আমেরিকার ঈশ্বরের প্রদত্ত নীতিগুলো ব্যাবিলনের ঈশ্বরের নীতি থেকে ছিল ভিন্ন। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা বলে :

'এ কথা আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিচ্ছি যে, সব মানুষকেই সৃষ্টি করা হয়েছে সমানভাবে এবং প্রত্যেকেই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে লাভ করেছে কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার, যার মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা আর সুখের সাধনা।'

হামুরাবির আইনের মতো আমেরিকার স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্রও বলে যে, এই পবিত্র নীতিমালা মেনে চললে লাখো মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে সহযোগিতার সম্পর্ক, একটি ন্যায়সংগত ও প্রগতিশীল সমাজে তারা পাবে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন। হামুরাবির আইনের মতো আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাও স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করেছে– পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কাছেও তা সমান গ্রহণযোগ্য। ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকার স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীরা এটা শিখছে।

পাশাপাশি তুলনা করে দেখলে এই দুটো নিয়মনীতি আমাদের দ্বিধায় ফেলে দেয়। হামুরাবির আইন ও আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা– দুটোই নিজেকে সর্বজনীন ও চিরন্তন ন্যায়ের পথ বলে দাবি করে। অথচ যেখানে আমেরিকার মানুষেরা বলে সব মানুষই সমান, সেখানে ব্যাবিলনের মানুষেরা আগেই স্বীকার করে নিচ্ছে যে সব মানুষ সমান নয়। এক্ষেত্রে আমেরিকানরা অবশ্যই বলবে তারাই ঠিক, হামুরাবির আইন ঠিক নয়। একইভাবে হামুরাবিও বলবেন তিনিই ঠিক, আমেরিকানরা নয়। আসলে উভয়েই ভুল। হামুরাবি ও আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতারা ন্যায়ের সর্বজনীন ও অপরিবর্তনীয় ভিত্তি হিসেবে দুটো কাল্পনিক বাস্তবতার কথা কল্পনা করেছিলেন, যার একটির ভিত্তি ছিল আধিপত্য আর অন্যটির ভিত্তি ছিল সমতা। কিন্তু বাস্তবে এই দুই রকম সর্বজনীন নীতি মানুষেরই মস্তিষ্কপ্রসূত, এর সূচনা হয় তাদের কল্পনায়, আর এসব বেঁচে থাকে তাদের বানিয়ে তোলা নানা কাল্পনিক গল্পগাথার মাধ্যমে। এসব রীতিনীতির আসলে কোনো বস্তুগত ভিত্তি নেই।

মানুষকে উচ্চতর ও সাধারণ শ্রেণিতে ভাগ করার ধারণাটা যে কল্পনাপ্রসূত, সেটা না-হয় সহজেই মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু 'সব মানুষই সমান'– এই কথাটা? আসলেই কি সব মানুষ সমান? মানুষের কল্পনার বাইরে এসে কোনো নিরপেক্ষ বাস্তব ভিত্তির ওপর সব মানুষকে সমান বলে দাবি করা যায়? শারীরিকভাবেও কি সব মানুষ সমান হয়? আসুন, আমরা আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার সবচেয়ে বিখ্যাত লাইনটিকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করি :

'এ কথা আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিচ্ছি যে, সব মানুষকেই সৃষ্টি করা হয়েছে সমানভাবে এবং প্রত্যেকেই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে লাভ করেছে কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার, যার মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা আর সুখী হওয়ার প্রচেষ্টা।'

জীববিজ্ঞান বলে মানুষের 'সৃষ্টি' হয়নি, 'বিবর্তন' হয়েছে। আর বিবর্তন মোটেই সবার জন্য সমান হয় না। সমতার ধারণা সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। আমেরিকানরা এই ধারণা পেয়েছে খ্রিষ্টধর্ম থেকে– যেখানে বলা হয় প্রত্যেক মানুষ পবিত্র আত্মার অধিকারী এবং ঈশ্বরের চোখে সব আত্মাই সমান। এখন, আমরা যদি ঈশ্বর, সৃষ্টি, আত্মা– এই খ্রিষ্টধর্মীয় শব্দগুলোকে বাদ দিয়ে চিন্তা করি, তাহলে 'সব মানুষ সমান'– এ কথার অর্থ কী দাঁড়ায়? বিবর্তন পার্থক্য তৈরি করে, সমতা নয়। প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জিন সংকেত আছে, যা জন্মের পর থেকেই পরিবেশের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। এভাবেই মানুষের মধ্যে নানা রকম বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে আর তার ফলে টিকে থাকার সম্ভাবনাও হয় একেকজনের এক একেরকম। কাজেই 'সব মানুষকেই সৃষ্টি করা হয়েছে সমানভাবে' না বলে বলা উচিত 'মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়েছে'।

জীববিজ্ঞানে যেমন মানুষের 'সৃষ্টি হওয়ার' কথা কোথাও বলা হয়নি, তেমনি বলা হয়নি কোনো 'ঈশ্বর' এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো কিছু 'লাভ করার' কথাও। সেখানে মানবজন্মের পেছনে শুধু একটা প্রক্রিয়াই চলমান আছে, তা হলো অন্ধ-উদ্দেশ্যহীন বিবর্তন।

তাই ‘সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে লাভ করেছে’ না বলে বলা উচিত মানুষ ‘জন্মেছে’।

একইভাবে বলা যায়, জীববিজ্ঞানে ‘অধিকার’ বলেও কিছু নেই। আছে শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য। পাখির ওড়ার অধিকার আছে বলে সে ওড়ে না, পাখি ওড়ে তার ডানা আছে তাই। আর এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্যও ‘অবিচ্ছেদ্য’ নয়, কারণ এগুলোরও পরিব্যক্তি ঘটে, ফলে এদের পরিবর্তন হয়, আবার কখনো হারিয়েও যায়, যেমন উটপাখি হারিয়েছে তার ওড়ার ক্ষমতা। কাজেই ‘অবিচ্ছেদ্য অধিকার’ এর জায়গায় বলা উচিত ‘পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য’।

এখন, বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে নজর দেওয়া যাক। ‘জীবন’ ব্যাপারটা ঠিক আছে, কিন্তু ‘স্বাধীনতা’? জীববিজ্ঞানে স্বাধীনতা বলেও কিছু নেই। সমতা ও অধিকারের মতো স্বাধীনতাও মানুষের কল্পনাপ্রসূত একটা ধারণা। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে গণতান্ত্রিক সমাজের মানুষেরা স্বাধীন আর স্বৈরশাসনে থাকা মানুষেরা পরাধীন– এরকম কিছু বলা যায় না। আর ‘সুখ?’ আজ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুখের একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা দিতে পারেনি, কিংবা সুখের কমবেশি নির্ধারণের কোনো উপায়ও খুঁজে পায়নি। গবেষণায় যা পাওয়া গেছে তা হলো আনন্দ, যাকে আরো সহজে সংজ্ঞায়িত বা পরিমাপ করা যায়। কাজেই ‘জীবন, স্বাধীনতা আর সুখী হওয়ার প্রচেষ্টা’-এর বদলে আমরা বলতে পারি ‘জীবন ও আনন্দলাভ’।

তাহলে জীববিজ্ঞানের চোখে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার আলোচ্য লাইনটি দাঁড়াচ্ছে এমন :

‘এ কথা আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিচ্ছি যে, সব মানুষই ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই জন্মেছে কিছু পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যার মধ্যে আছে জীবন ও আনন্দলাভের চেষ্টা।’

বিষয়টিকে এভাবে দেখলে সমতা ও সমানাধিকারের পক্ষের লোকেরা হয়তো খেপে যাবেন। বলবেন, ‘সব মানুষ যে শারীরিকভাবে সমান নয় তা তো আমাদের জানাই আছে, কিন্তু

আমরা যদি মেনে নিই যে ভেতরে ভেতরে সবাই সমান, তাহলে সবাই মিলে একটা স্থিতিশীল সমাজ গড়ে তোলা যায়।' সেক্ষেত্রে আসলে আর কিছু বলার নেই। এটাই হলো একটু আগে বলা সেই 'কাল্পনিক ভিত্তি'। 'সবাই সমান'– এটা ধরে নেওয়ার কারণ এই নয় যে তা সত্য, বরং কারণটা হলো এই যে এটা মেনে নিলে মানুষের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্কটা আরো দৃঢ় হয়, যা দিয়ে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা যায়। এই কাল্পনিক ভিত্তি কোনো ষড়যন্ত্র কিংবা মিথ্যে মোহ নয়, এটা হলো অনেক মানুষকে সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ করার একটা কার্যকর উপায়। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এই একই রকম যুক্তি কিন্তু হামুরাবিও তাঁর শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থাকে সঠিক প্রমাণ করতে ব্যবহার করতে পারতেন।

প্রকৃত বিশ্বাসী

এ পর্যন্ত পড়ে কিছু পাঠক নিশ্চয়ই একটু নড়েচড়ে বসেছেন। এটাই স্বাভাবিক, কারণ আমাদের শিক্ষাই আমাদের এভাবে তৈরি করেছে। হামুরাবির আইনকে মিথ বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সব মানুষের সমানাধিকারকে মিথ হিসেবে মেনে নিতে পারি না আমরা। আসলেই, মানুষ যদি বুঝতে পারে যে মানুষের সমানাধিকারের ব্যাপারটা এমন কৃত্রিম আর কাল্পনিক, তাহলে সেটা কি আমাদের এই সমাজকাঠামোর প্রতি একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না? ঈশ্বর সম্পর্কে ভলতেয়ার বলেছেন, 'ঈশ্বর বলে কেউ নেই, কিন্তু আমার চাকরকে আবার কথাটা বলতে যেয়ো না, রাতের বেলায় ও ব্যাটা যদি আমাকে খুন করে ফেলে।' ঠিক একই রকম কথা হয়তো হামুরাবিও বলতেন তাঁর শ্রেণিবিভক্ত সমাজ নিয়ে, আর আমেরিকার সংবিধানের লেখক থমাস জেফারসন বলতেন মানবাধিকার নিয়ে। মাকড়সা, হায়েনা কিংবা শিম্পাঞ্জির মতো হোমো সেপিয়েন্স প্রাণীটিরও প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত বিশেষ কোনো অধিকার নেই। কিন্তু এ কথা তো অন্ধবিশ্বাসীদের বলা যাবে না, পাছে রাতে খুন হয়ে যাই।

এরকম আশঙ্কা অমূলক নয়। প্রাকৃতিক সম্পর্ক হলো একটা স্থিতিশীল সম্পর্ক। মানুষ যদি মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্বে আর বিশ্বাস না করে, তাহলে কাল সকাল থেকে মাধ্যাকর্ষণ উধাও হয়ে যাবে না। অন্যদিকে, একটা কৃত্রিম শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পর্ক সব সময় ভেঙে পড়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে। কারণ, এরকম সম্পর্কগুলো দাঁড়িয়ে থাকে কিছু মিথের ওপর, আর মিথগুলো টিকে থাকে মানুষের বিশ্বাসে। এ ধরনের শৃঙ্খলা টিকিয়ে রাখা রীতিমতো শ্রমসাধ্য কাজ। এই শৃঙ্খলা টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ অনেক সময় সহিংসতার পথও বেছে নেয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ, আদালত আর জেলখানাগুলো মানুষকে এই শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখতে কাজ করে যায় নিরন্তর। প্রাচীন ব্যাবিলনে কেউ কাউকে অন্ধ করে দিলে 'চোখের বদলা চোখ' নীতিতে তার শাস্তিবিধান হতো। আবার ১৮৬০ সালে যখন আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে পারল তাদের আফ্রিকান দাসেরাও মানুষ এবং মানুষের সব স্বাধীনতা তাদের জন্যও প্রযোজ্য, তখন বাকিদেরকে সেটা বোঝাতে তো রীতিমতো গৃহযুদ্ধই বেধে গেল।

তবে এমন কাল্পনিক শৃঙ্খলা টিকিয়ে রাখতে শুধু সহিংসতাই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় এই শৃঙ্খলার ধারণায় বিশ্বাসী কিছু আন্তরিক অনুসারী। প্রিন্স ট্যালির‍্যান্ডের কথা ধরা যাক। তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে কাজ করেছেন রাজা ষোড়শ লুইয়ের অধীনে, অংশ ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের, কাজ করেছেন নেপোলিয়নের অধীনেও। শেষ জীবনে তাঁর আনুগত্যটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের দিকেই ছিল। কয়েক দশক ধরে সরকারের সঙ্গে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরই একটি উক্তি থেকে, 'বেয়োনেট দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়, তবে ওটার ওপর বসে পড়াটা খুব সুখকর নয়।' অনেক সময় ১০০ সৈনিকের কাজ একজন যাজক করে ফেলতে পারেন অনেক সস্তায় আর সহজে। আর বেয়োনেট যতই কার্যকর হোক না কেন, ওটা ব্যবহারের জন্য মানুষও তো চাই। সৈনিক, কারারক্ষী, বিচারক আর পুলিশেরা কি একটা কাল্পনিক শৃঙ্খলা ধরে রাখতে চেষ্টা করবে, যদি তারা নিজেরাই সেটা বিশ্বাস না করে? মানুষের যত রকম যৌথ কর্মকাণ্ড আছে তার মধ্যে

সবচেয়ে কঠিন হলো সন্ত্রাস। যদি বলি সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে সেনাবাহিনী, তবে সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে কে? শুধু ভয়ভীতি দেখিয়ে পুরো একটা সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা আনতে হলে বাহিনীর সবাই না হোক, অন্তত উচ্চপদস্থ সৈনিকদের একটা কিছুর ওপরে বিশ্বাস রাখতে হয়– সেই একটা কিছু হতে পারে ঈশ্বর, হতে পারে মর্যাদা, হতে পারে মাতৃভূমি, পৌরুষ কিংবা অর্থ।

এই সামাজিক পিরামিডের ওপরতলায় থাকা লোকদের নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন চলে আসে। তারা কি এমন একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চাইত, যদি তারা নিজেরাই সেটা বিশ্বাস না করত? সবার প্রথমে যে উত্তরটা মাথায় আসে সেটা হলো, তারা তাদের উদাসীন মনের নিতান্ত ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বা খেয়াল থেকেই এমন কাজ করে। যদিও একজন অবিশ্বাসী, যার কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই, কোনো কিছুর জন্যই তার ব্যক্তিগত কোনো আকাঙ্ক্ষা বা লোভ থাকার কথা নয়। জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য একজন মানুষের খুব বেশি কষ্ট করার দরকার পড়ে না। সেসব চাহিদা পূরণ হলে মানুষ টাকা খরচ করে পিরামিড বানায়, ছুটিতে বিশ্বভ্রমণে বের হয়, নির্বাচনী প্রচারণায় টাকা ঢালে, প্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠনকে টাকা পাঠায়, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে এবং আরো আরো টাকা কামায়– এ সবকিছুই একজন প্রকৃত খেয়ালি বা নৈরাশ্যবাদী মানুষের কাছে পুরোপুরি অর্থহীন কাজ। নৈরাশ্যবাদী দর্শনের জনক বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ডায়োজিনিস একটি কাঠের তৈরি পিপের ভেতর বসবাস করতেন। একদিন ডায়োজিনিস যখন সূর্যের আলোয় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, বিখ্যাত সম্রাট আলেকজান্ডার তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কোনোভাবে ডায়োজিনিসের উপকারে আসতে পারেন কি না। উত্তরে নৈরাশ্যবাদী ডায়োজিনিস মহান সম্রাট আলেকজান্ডারকে বললেন, ‘অবশ্যই পারেন। একটু পাশে সরে দাঁড়ান। আপনি সামনে এসে দাঁড়ানোর কারণে সকালের রোদটা ঠিকমতো গায়ে লাগছে না।’

এই কারণেই অনেকগুলো নৈরাশ্যবাদী লোক কখনো একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে না। সামাজিক কাঠামো বা সামাজিক

স্তরবিন্যাস কেবল তখনই গড়ে ওঠে যখন সমাজের অধিকাংশ লোক, বিশেষ করে অভিজাত সম্প্রদায় এবং নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের অধিকাংশ মানুষ সেই স্তরবিন্যাসের কাল্পনিক বাস্তবতায় বিশ্বাস করে। খ্রিষ্টধর্ম ২ হাজার বছর টিকে থাকত না যদি অধিকাংশ বিশপ ও ধর্মযাজক যিশুখ্রিষ্টকে বিশ্বাস না করতেন, আমেরিকার গণতন্ত্র ২৫০ বছর ধরে টিকে থাকত না যদি অধিকাংশ প্রেসিডেন্ট ও সাংসদ মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস না করতেন। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা এক দিনও টিকত না, যদি বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী এবং ব্যাংকাররা ক্যাপিটালিজম বা ধনতন্ত্রে বিশ্বাস না করতেন।

এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে

মানুষকে এমন একটা কাল্পনিক শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেলার উপায় কী? কীভাবে খ্রিষ্টধর্ম, গণতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ সফল হলো এ কাজে? প্রথম শর্ত হলো কোনোভাবেই স্বীকার করা যাবে না যে ব্যাপারটা কাল্পনিক বা আরোপিত। মানুষকে বোঝাতে হবে যে, সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য এ নিয়মগুলো মানুষের তৈরি নয় বরং ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম। সব মানুষ যে সমান নয়, তার কারণ এই নয় যে, হামুরাবি তা বলেছেন, বরং এর কারণ হলো এটা দেবতা এনলিল ও মারডুকের কথা। আবার সব মানুষই যে সমান, সেটা থমাস জেফারসনের কথা নয়, এর কারণ ঈশ্বর তাদের সমান করেই সৃষ্টি করেছেন। অ্যাডাম স্মিথের কথায় মুক্তবাজার সেরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়নি, হয়েছে প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়মে।

শৃঙ্খলা তৈরি করা এবং বজায় রাখার জন্য এসব শৃঙ্খলার সঙ্গে ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তিকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি এসব নিয়মের ব্যাপারে মানুষকে শিক্ষা দেওয়াও প্রয়োজন। জন্মের পরমুহূর্ত থেকে প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ঘটনার মধ্যে একজন মানুষকে এইসব নিয়মের কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক রূপকথায়, নাটকে, ছবিতে, গানে, সামাজিক আচরণে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, স্থাপত্যে, রন্ধনপদ্ধতিতে, পোশাকের নকশায় মিশে থাকে এই কাল্পনিক

সামাজিক শৃঙ্খলার উপাদান। যেমন– আজকের দিনে মানুষ সমতায় বিশ্বাস করে, তাই শ্রমিকদের পোশাক জিনস আজ ধনীদের জন্যও কেতাদুরস্ত। মধ্যযুগের মানবসমাজ ছিল শ্রেণিবিভক্ত, তাই অভিজাত পরিবারের সদস্যদের গায়ে কৃষকের আলখাল্লা উঠত না কখনোই। সে সময় 'স্যার' কিংবা 'ম্যাডাম' সম্বোধন উচ্চবংশীয় মানুষদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। আজ যে-কোনো আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ শুরু হয় সেই একই সম্বোধনে।

এই কাল্পনিক শৃঙ্খলা কীভাবে সমাজের সর্বত্র মিশে আছে, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে তারই ব্যাখ্যা। খুব অল্প কথায় বলতে গেলে, মানুষ কেন ব্যাপারটাকে কাল্পনিক বলে ধরতে পারে না তার তিনটা কারণ পাওয়া যায়।

ক। কাল্পনিক শৃঙ্খলা আমাদের চারপাশের বস্তুগত পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকে। জিনিসটা কাল্পনিক আর তার অস্তিত্ব কেবল আমাদের কল্পনায়, কিন্তু তার পরেও সেটা সব বস্তুর মধ্যে খুব ভালোভাবে মিশে যেতে পারে। বর্তমান পশ্চিমা দেশগুলোর মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। তাদের কাছে প্রত্যেক মানুষ কেবলই একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যার সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করে সে নিজেই। অন্যরা তার বিষয়ে কী ভাবছে তার কোনো ভূমিকা সেখানে নেই। প্রতিটি মানুষের কাছে জীবনের অর্থ তার নিজের মতো করে সংজ্ঞায়িত। পশ্চিমা দেশের স্কুলগুলোও একটা শিশুকে শেখায় তাকে নিয়ে সহপাঠীদের হাসি-তামাশায় কান না দিতে।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মিথটা আমাদের কল্পনা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব রূপ নিয়েছে আমাদের ঘরের নকশায়। আজকের দিনে একটা বাড়িতে অনেক ছোটো ছোটো ঘর থাকে। পরিবারের প্রত্যেক শিশুসদস্য নিজের একটা করে ঘর পায় যেখানে তার একচ্ছত্র রাজত্ব। অনেক বাড়িতে এমন একটা শিশুর পক্ষে তার ঘরের দরজাটা আটকে দেওয়া, এমনকি ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে তার বাবা-মাকেও দরজায় টোকা দিয়ে অনুমতি নিয়ে তার ঘরে ঢুকতে হয়। ঘর সাজানোও হয় ওই শিশুটির পছন্দমতো। এরকম বাড়িতে এমন

পরিবেশে বেড়ে ওঠা যে-কোনো মানুষই ব্যক্তিসত্তা-সচেতন হবে, এটাই স্বাভাবিক। তার সামাজিক মূল্যও নিরূপণ করবে সে নিজেই।

মধ্যযুগের অভিজাত সমাজে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণাটা ছিল না। মানুষের সামাজিক মূল্য নির্ধারিত হতো সমাজে তার অবস্থান আর তার সম্পর্কে অন্যদের ধারণা থেকে। মানুষের হাসির পাত্র হওয়াটা ছিল চরম অপমানজনক ব্যাপার। যে-কোনো মূল্যে পরিবারের মান রাখতে হবে– এটাই ছিল তাদের পারিবারিক শিক্ষা। এখনকার মতো তখনো এই মূল্যবোধের নিদর্শন দেখা যেত তাদের বাসস্থান দুর্গগুলোতে। সেখানে কোনো শিশুর একার একটা ঘর থাকাটা ছিল বিরল ঘটনা। মধ্যযুগের কোনো ব্যারনের কিশোর ছেলে বাবা-মায়ের প্রবেশাধিকারবিহীন নিজের মতো করে সাজানো নিজের ঘরের কথা কল্পনাও করতে পারত না। তাকে থাকতে হতো তার সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে কোনো একটা বড়ো হলঘরে। একান্ত ব্যক্তিগত স্থান বা সময় কোনোটাই তার ছিল না, সারা দিন তার ওঠাবসা ছিল আর দশজনের সঙ্গেই। তাই শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলত না, অন্যরা কী দেখছে কী ভাবছে সেটাও তাকে মাথায় রাখতে হতো। এভাবে বেড়ে ওঠার কারণেই মানুষের সামাজিক মূল্য নির্ধারিত হতো তার সামাজিক অবস্থান ও অন্যদের কাছে তার ভাবমূর্তি থেকে।[৮]

খ। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোও তৈরি হয় এই কাল্পনিক সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। বেশিরভাগ মানুষই তার আঁকড়ে ধরা বিশ্বাসগুলোকে কাল্পনিক বলে মানতে চায় না, কিন্তু তাদের জন্মই হয় একটা প্রতিষ্ঠিত কল্পনার উপস্থিতিতে। তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে এই মিথগুলোকে ঘিরে। তারপর একসময় মানুষের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাগুলোই সমাজের কাল্পনিক ভিত্তির রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়।

আজকের পশ্চিমা দেশগুলোর মানুষের মনের ইচ্ছাগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছে তার পেছনে আছে তাদের কয়েক শতাব্দী আগে থেকে তৈরি হওয়া বৈচিত্র্যপিয়াসী, জাতীয়তাবাদী, পুঁজিবাদী ও মানবিক কিছু মিথ। যেমন, অনেকেই তার বন্ধুকে পরামর্শ দেয়, 'মন যা চায় তা-ই করো'। কিন্তু কী চাইতে হবে, আমাদের মন সেই নির্দেশনা

পায় প্রচলিত শক্তিশালী মিথগুলোর কাছ থেকেই। 'মন যা চায় তা-ই করো'– এরকম একটা চিন্তা আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছে ঊনবিংশ শতকের কিছু বৈচিত্র্যপিপাসু আর বিংশ শতকের কিছু ভোগবাদী মিথ। 'ডায়েট কোক খাও। যা মন চায় করো'– এই স্লোগান সঙ্গে নিয়ে কোকাকোলা কোম্পানি সারা পৃথিবীতে বাজারজাত করেছে তাদের পণ্য।

মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত চাওয়াগুলোও ঠিক করে দেয় আমাদের সমাজের অন্তর্নিহিত এই কাল্পনিক ভিত্তি। ইদানীং ছুটি কাটানোর একটা জনপ্রিয় উপায় হলো দেশের বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া। এটাকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ড বলার কোনো সুযোগ নেই। একটা শিম্পাঞ্জি গোষ্ঠীর প্রধান কখনোই আরেকটি গোষ্ঠীতে গিয়ে তার অবসর সময় কাটাতে চাইবে না। প্রাচীন মিশরের অভিজাত সমাজের মানুষ পিরামিড বানিয়ে কিংবা মমি করে মৃতদেহ সংরক্ষণে প্রচুর অর্থব্যয় করেছে, কিন্তু কেনাকাটা করতে ব্যাবিলনে বা স্কি করতে ফিনিশিয়ায় যায়নি। আজকের দিনে মানুষ যে ছুটিতে প্রচুর টাকা খরচ করে বিদেশ যাচ্ছে, তার পেছনে আছে বৈচিত্র্যপিয়াসী, ভোগবাদী মিথ।

বৈচিত্র্যপ্রবণ এই মিথ মানুষকে বোঝায় যে জীবনকে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে চাইলে তাকে যত বেশি সম্ভব বৈচিত্র্যের স্বাদ নিতে হবে। খোলা মনে তাকে গ্রহণ করতে হবে সব রকম মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, বৈচিত্র্যময় সব সম্পর্ক, নানা স্বাদের খাবার, বিভিন্ন সুরের গান। সেটা করার একটা ভালো উপায় হলো দূরে এমন কোথাও চলে যাওয়া– যেখানকার সংস্কৃতি, রং-রূপ-স্বাদ-গন্ধ আর সামাজিক রীতিনীতি বাঁধাধরা জীবন ও পরিচিত পরিবেশ থেকে পুরোপুরি আলাদা। ভ্রমণ শেষে 'কীভাবে এই ভ্রমণ জীবনকে বদলে দিল'– এই শিরোনামের গল্পটাও যুক্ত হবে বৈচিত্র্যপ্রবণতার এই মিথের সঙ্গে।

এদিকে ভোগবাদী চিন্তাধারা আমাদের শেখায় সুখী হতে হলে আমাদের যথাসম্ভব বেশি পণ্য ও সেবা ভোগ করতে হবে। যখনই কোনো কিছুর অভাব বোধ হবে, বা মনে হবে কিছু একটা ঠিকমতো

চলছে না, সেটা পূরণ করতে হবে কোনো পণ্য বা সেবা কিনে। ভোগ্যপণ্যগুলো কীভাবে আমাদের জীবনকে আরো উন্নত করে তার বর্ণনা তো টেলিভিশনের পর্দায় প্রত্যেক বিজ্ঞাপনেই আমরা দেখতে পাই।

বিচিত্র জিনিসের স্বাদ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার এই ধারণার সঙ্গে খুব চমৎকারভাবে মিশে যায় ভোগবাদী দর্শন। বৈচিত্র্যপ্রবণতা ও ভোগবাদিতা মিলে সৃষ্টি করেছে এক 'অভিজ্ঞতার বাজার', আর তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান পৃথিবীর পর্যটনশিল্প। পর্যটনশিল্প টিকিট বিক্রি করে না, হোটেলের ঘরও ভাড়া দেয় না, বিক্রি করে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা। এ শিল্পে প্যারিস কোনো শহর নয়, ভারতও কোনো দেশ নয়, কেবলই অভিজ্ঞতার ভান্ডার। অভিজ্ঞতা এমন এক পণ্য, যা ভোগ করে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হয়, মানুষ সুখী হয়। একজন কোটিপতি যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে তাকে নিয়ে প্যারিসে যায়, সে আসলে তার ব্যক্তিগত স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় না, যায় এই বৈচিত্র্যপ্রবণতা ও ভোগবাদিতার মিথের ওপর বিশ্বাস রেখে। এমন পরিস্থিতিতে প্রাচীন মিশরের কোনো ধনী ব্যক্তি বেড়াতে যাওয়ার কথা চিন্তাও করত না, বরং হয়তো তার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে তার জন্য তৈরি করত এক বিরাট সমাধিস্তম্ভ।

১৮। গিজার বিশাল পিরামিড। প্রাচীন মিশরের ধনীদের অর্থব্যয়ের একটি খাত

মিশরীয়রা যেমন পিরামিড বানিয়েছে, তেমনি অন্যান্য অনেক সভ্যতার মানুষও তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে পিরামিডের মতো কিছু একটা গড়তে। সংস্কৃতিভেদে শুধু তাদের নাম, আকার আর চেহারাই বদলায়। কারো জন্য সেটা হয় বিরাট পিরামিড, কারো জন্য সুইমিংপুল আর উঠানসহ শহরে একটা ছোট্ট বাড়ি। কিন্তু সভ্যতার গভীরে প্রোথিত কোন মিথের প্রভাবে সেটা করছে মানুষ, তার কথা কজন জানতে চায়?

গ। সমাজের এই কাল্পনিক ভিত্তি টিকে আছে বহু মানুষের সামষ্টিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। হুট করে একজন পণ্ডিত মানুষ যদি খুব চেষ্টা করে ব্যক্তিগতভাবে এইসব কাল্পনিক ধারণা থেকে বের হয়ে আসতেও পারে, তাতে সমাজের কিছুই আসবে-যাবে না। বড়ো কোনো পরিবর্তন আনতে হলে আরো লাখ লাখ মানুষকে সেটা বোঝাতে হবে। এ কারণেই এই কাল্পনিক ভিত্তি কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং একটি আন্তর্ব্যক্তিক বিষয়।

ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে হলে আগে আমাদের ‘নৈর্ব্যক্তিক’ (Objective), ‘ব্যক্তিক’ (Subjective) ও ‘আন্তর্ব্যক্তিক’ (Inter-subjective)− এই তিনটি শব্দ ও তাদের পার্থক্য জানতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক ঘটনাগুলো মানুষের চিন্তা বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল নয়। উদাহরণ হিসেবে তেজস্ক্রিয়তার কথা বলা যায়। তেজস্ক্রিয়তা কোনো মিথ নয়। মানুষ তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের আগেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছিল। এই বিকিরণ মানুষের জন্য বেশ বিপজ্জনক, মানুষ সেটা জানুক বা না-ই জানুক। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক মেরি কুরি সুদীর্ঘ সময় তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করলেও তিনি জানতেন না এটা তাঁর শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তা মৃত্যু ঘটাতে পারে− এ কথায় তিনি বিশ্বাস না করলেও তাঁর মৃত্যু হয় অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগে, যার কারণ ছিল অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ।

ব্যক্তিক বিষয়গুলো ব্যক্তিনির্ভর। এগুলো নির্ভর করে একজন ব্যক্তির চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের ওপর। বিশ্বাস পরিবর্তন হলে এই ব্যক্তিক ধারণাগুলোও বিলুপ্ত হয়। অনেক শিশুর মুখেই কাল্পনিক বন্ধুর কথা শোনা যায় যে বন্ধু তার সঙ্গে খেলে কিংবা কথা বলে। বাকি সব মানুষের কাছে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ সেই বন্ধুর অস্তিত্ব আছে কেবল ওই শিশুটির কল্পনার জগতে, যে জগৎ তার একান্তই ব্যক্তিগত। শিশুটি বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এই বিশ্বাসও হারিয়ে যায়, সঙ্গে হারিয়ে যায় সেই কাল্পনিক বন্ধুও।

আন্তর্ব্যক্তিক বিষয়গুলোও বিশ্বাসনির্ভর, কিন্তু একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। এগুলো টিকে থাকে একই সঙ্গে অনেক মানুষের বিশ্বাসে ও তাদের সম্পর্কে। এক্ষেত্রে যদি সেই অনেক মানুষের একজনের বিশ্বাস পরিবর্তন হয়, কিংবা একজন যদি মারাও যায়, তবু তাতে ওই সম্মিলিত বিশ্বাসের কিছু যায়-আসে না, সেটা টিকে থাকে আগের মতোই। কিন্তু যদি ওই বিশ্বাসের অনুসারী বেশিরভাগ লোক মারা যায় বা বিশ্বাস পরিবর্তন করে, তবে ওই ধারণায় পরিবর্তন আসতে পারে, এমনকি সেটা বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। এগুলো কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য বলা মিথ্যে বা রূপকথার মতো কিছু নয়। এগুলোর অস্তিত্ব ঠিক নৈর্ব্যক্তিক ধারণাগুলোর মতো

স্পষ্ট না হলেও মানবসমাজে এগুলোর প্রভাব ব্যাপক। মানবসমাজকে এগিয়ে নেওয়ার পথে যা-কিছু চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে, তার মধ্যে অনেকগুলোই আন্তর্ব্যক্তিক। আইন, অর্থ, ঈশ্বর ও জাতির মতো ধারণাগুলো এর মধ্যেই পড়ে।

আবারও পিউজোর উদাহরণে ফিরে যাই। পিউজো শুধু তার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কল্পনার ফসল নয়। পিউজোর অস্তিত্ব টিকে আছে অসংখ্য মানুষের কল্পনায়। এই প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি বিশ্বাস করেন কারণ তাঁর সঙ্গে এই ধারণায় বিশ্বাস করে এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, প্রতিষ্ঠানের উকিল, ব্যাংকের কর্মচারীরা, শেয়ারবাজারের লোকেরা আর ফ্রান্স থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত নানান দেশের গাড়ি ব্যবসায়ীরা। একদিন হঠাৎ করেই যদি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলে বসেন যে পিউজোর অস্তিত্বে তিনি আর বিশ্বাস করেন না, সম্ভবত পরদিনই তিনি নিজেকে দেখবেন নিকটস্থ পাগলাগারদে, আর তাঁর অফিসের চেয়ারে দেখবেন অন্য কাউকে।

একইভাবে বলা যায়, ডলার, মানবাধিকার এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসে। সে কারণে কোনো একজন মানুষের অবিশ্বাসে এসবের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এগুলো আন্তর্ব্যক্তিক বিষয়, তাই এগুলোকে পালটে দিতে হলে অসংখ্য মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়, আর একজন ব্যক্তির পক্ষে তা অসম্ভব। এ ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে বড়ো এবং জটিল কোনো প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে। সেটা হতে পারে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দল কিংবা কোনো বিপুল আদর্শিক আন্দোলন। আবার এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়তে হলে অনেকজন মানুষকে এই পরিবর্তনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন তারা নতুন কোনো মিথের ওপর তাদের সম্মিলিত বিশ্বাস স্থাপন করবে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এমন, সমাজের একটা কাল্পনিক ভিত্তি পালটে দিতে হলে সেখানে আরেকটা কাল্পনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পিউজোকে নির্মূল করতে হলে তার চেয়ে শক্তিশালী কিছু প্রয়োজন, সেটা হতে পারে ফ্রান্সের আইনব্যবস্থা। ফ্রান্সের আইনকে অকার্যকর করতে পারে আরো বড়ো কিছু, যেমন ফ্রান্স রাষ্ট্রটি স্বয়ং। আর ফ্রান্স নামক রাষ্ট্রটিকেই আমরা যদি অস্বীকার করতে চাই? তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে আরো বড়ো, আরো শক্তিশালী কোনো ধারণায়।

এই সম্মিলিত কল্পনা ও বিশ্বাসের হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। এই বিশ্বাসের খাঁচার গরাদ কেটে যতবারই আমরা ছুটে যাব মুক্তির আশায়, ততবারই আমাদের পথরোধ করবে আরো বড়ো কোনো খাঁচার অদৃশ্য দেওয়াল।

অধ্যায় ৭

স্মৃতি উপচানো তথ্য

প্রাকৃতিক বিবর্তন একজন মানুষকে জন্ম থেকে ফুটবলার করে গড়ে তোলে না। এটা ঠিক, যে পা দিয়ে আপনি ফুটবলে লাথি দেন সেটা তৈরি করে বিবর্তন। যে কনুই দিয়ে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে গুঁতো মেরে আপনি হলুদ কার্ড পান সে শক্ত কনুইয়ের পেছনে অবদান বিবর্তনের। যে মুখ দিয়ে অন্য খেলোয়াড়কে গালি দেন বিবর্তনই তা ধীরে ধীরে তৈরি করেছে। কিন্তু বিবর্তনের এতসব উপহার বড়োজোর আমাদের একা একা ফাঁকা একটা গোলবারে পেনাল্টি কিক করার সুযোগটুকুই করে দিতে পারে। একটা সত্যিকারের ফুটবল ম্যাচ খেলতে হলে আপনাকে বিকেলবেলা স্কুলের মাঠে অচেনা কিছু মানুষকে খেলার সঙ্গী করে নিতে হবে। পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে দুই পক্ষের সব খেলোয়াড়েই যেন একই নিয়ম মেনে চলে। যেসব হিংস্র প্রাণী অচেনা কিছু দেখলেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তেড়ে আসে, তারা তাদের জন্মগত স্বভাব থেকেই সেটা করে। কুকুরের ছানা সব দেশেই সব জায়গাতেই একই কায়দায় নিজেদের মধ্যে মারামারি, খুনসুটি করতে থাকে– কারণ সেটা তাদের জিনগত সংকেতে লিপিবদ্ধ করা থাকে। কিন্তু কিশোর একটা ছেলের জিনে ফুটবল খেলার নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে না। তার পরও তারা অচেনা ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে পারে, কারণ তারা সবাই ফুটবল খেলার একই নিয়মকানুন শিখেছে। নিয়মকানুনের পুরোটাই মানুষের কল্পনা থেকে বানানো, কিন্তু সেটা সবাই জানে এবং মানে বলেই সকলে মিলে একসঙ্গে খেলাধুলা করা সম্ভব হয়।

শুধু একটা গুরুত্বপূর্ণ তফাত বাদ দিলে ফুটবল দলের মতো খেলার নিয়মের এই ধারণা রাষ্ট্র, চার্চ কিংবা ব্যবসায়কেন্দ্রের মতো বড়ো বড়ো মানবসংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের শিকারি পূর্বপুরুষদের যেমন একটি গোষ্ঠীতে বা ছোটো একটি গ্রামে বাস করতে অল্প কিছু সরল এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানতে হতো, ফুটবল খেলার নিয়মগুলোও অনেকটা তার সমতুল্য। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই খেলার সবগুলো নিয়ম মনে রাখার পাশাপাশি গান, ছবি বা বাজারের ফর্দও মনে রাখতে পারে। কিন্তু বড়ো বড়ো মানব-প্রতিষ্ঠানগুলোকে হাজার হাজার এমনকি লাখ লাখ মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হয়। তাদেরকে অনেক অনেক তথ্য এবং নিয়মকানুন জমা রাখতে হয়। এত তথ্য এবং নিয়মকানুন মনে রাখা এবং সেসব প্রয়োগ করার মতো ক্ষমতা একজন মানুষের মস্তিষ্কে থাকে না।

মানুষ ছাড়া অন্য যেসব প্রাণী বড়ো বড়ো দল বেঁধে থাকে (যেমন, পিঁপড়া ও মৌমাছি), তাদের দলগুলো অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও নমনীয়। এর কারণ হলো দলবদ্ধ হয়ে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় সব নিয়মকানুন সরাসরি তাদের জিনোমে লিপিবদ্ধ করা আছে। উদাহরণস্বরূপ, একটা নারী মৌমাছির লার্ভা পরিণত হয়ে রানি মৌমাছি না কর্মী মৌমাছি হবে, তা নির্ভর করে তাকে কীরকম খাবার দেওয়া হচ্ছে, তার ওপর। বড়ো হওয়ার পর সমাজে দায়িত্ব অনুযায়ী তার আচার-আচরণ কেমন হবে সেসবও তার ডিএনএতেই সরাসরি লেখা থাকে। মৌমাছিদের সামাজিক কাঠামোও মানুষের মতোই বেশ জটিল হতে পারে। সেখানে নানা ধরনের কর্মী মৌমাছি থাকতে পারে– খাদ্য সংগ্রাহক কর্মী, সেবিকা কর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি। কিন্তু, গবেষকরা মৌমাছি সমাজে এখন পর্যন্ত কোনো 'আইনজীবী' মৌমাছির সন্ধান পাননি। যেহেতু তাদের আচার-আচরণ, সামাজিক দায়িত্ব সব ডিএনএতে লেখা থাকে, মৌমাছিদের সমাজে উকিলের দরকার নেই। তাদের সমাজে কারো 'মৌমাছি সংবিধান' ভুলে যাওয়ার বা অমান্য করার সম্ভাবনাও নেই। রানি মৌমাছিরা কখনো পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত মৌমাছির কাছ থেকে ষড়যন্ত্র করে খাবার কেড়ে নেয় না এবং কর্মী মৌমাছিরাও কখনো বেতন বাড়ানোর জন্য হরতাল অবরোধ করে না।

মজার ব্যাপার হলো, মানুষের সমাজে কিন্তু এরকম অনিয়ম অহরহই ঘটে থাকে। কারণ হিসেবে বলা যায়, মানুষ তাদের কল্পনাপ্রসূত এসব সামাজিক কাঠামোর ধারণা চাইলেই তাদের ডিএনএতে লিপিবদ্ধ করে পাকাপাকিভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর করতে পারে না। মানুষের সমাজের আইনকানুন, সামাজিক আচরণ, বিধিবিধানের সবটুকুই প্রত্যেক মানবশিশুকে জন্মের পর থেকেই একটি সচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিখতে হয়। এ শেখার ব্যাপারটা না থাকলে মানুষের যে-কোনো সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়তে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির (শাসনকাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৯২ সাল থেকে ১৭৫০) কথা ধরা যাক। তার জারি করা বিধান অনুযায়ী, সমাজের মানুষ তিনটি স্তরে বিভক্ত– অভিজাত মানুষ, সাধারণ মানুষ ও দাস। মৌমাছির সমাজের স্তরবিন্যাসের মতো এই স্তরবিন্যাস প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নয় অর্থাৎ মানুষের জিনে এরকম কোনো স্তরবিন্যাসের কথা লেখা নেই। যদি ব্যাবিলনের লোকজন নিজে থেকে এই স্তরবিন্যাসের নিয়ম মনে না রাখত, তাহলে তাদের তৎকালীন সামাজিক কাঠামো টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে যেত। যখন রাজা হামুরাবির ডিএনএ তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গেল, তাতেও কিন্তু রাজা হামুরাবির রাজ্যের বিধিবিধান লিপিবদ্ধ ছিল না। ‘যদি একজন অভিজাত শ্রেণির মানুষ একজন সাধারণ শ্রেণির নারীকে হত্যা করেন, তাহলে হত্যাকারীকে ৩০টি রুপার মুদ্রা জরিমানা হিসেবে দিতে হবে’– এরকম আইন ডিএনএতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। হামুরাবিকে কষ্ট করে এসব আইনকানুন তার ছেলেমেয়েদের শেখাতে হয়েছে, তারা আবার শিখিয়েছে তাদের সন্তানদের। আইনকানুনগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য তার বংশধরদেরকেও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই শেখানোর প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হয়েছে।

একটা সাম্রাজ্যকে টিকে থাকতে হলে, তার অনেক রকম তথ্যের দরকার হয়। আইনকানুন ছাড়াও, সাম্রাজ্যগুলোকে সবার টাকাপয়সার লেনদেন, খাজনা, প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুত, বণিকদের জাহাজ, উৎসব-পার্বণ ও যুদ্ধ জয়ের দিনক্ষণের হিসাব রাখতে হয়। লাখ লাখ বছর ধরে মানুষ তার

মস্তিষ্কে এসব তথ্য জমা রাখত। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, প্রধানত তিনটি কারণে মানুষের মস্তিষ্ক একটি সাম্রাজ্যের এই বিশাল পরিমাণ তথ্য জমা রাখার জন্য উপযুক্ত নয়।

প্রথমত, মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এ কথা সত্যি, কিছু কিছু লোকের স্মৃতিশক্তি সত্যিই অসাধারণ। প্রাচীনকালে এরকম অসাধারণ স্মৃতিশক্তির মানুষজনকে কেবল রাজ্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক খুঁটিনাটি এবং রাজ্যের সমস্ত রকম আইনকানুন নিখুঁতভাবে মনে রাখবার জন্যই চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হতো। কিন্তু, অসাধারণ স্মৃতিশক্তিধারী মানুষদেরও মনে রাখার একটা সর্বোচ্চ সীমা আছে। একজন আইনজীবীর পক্ষে হয়তো ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের বর্তমান সব আইনকানুন মুখস্থ রাখা সম্ভব, কিন্তু ১৬৯২-১৬৯৩ সালে ঘটা সালেমের ডাকিনীদের বিচারের (Salem Witch Trial) পর থেকে সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে ম্যাসাচুসেটস রাষ্ট্রে কোন আইন কী অবস্থায় প্রণীত হয়েছে বা কোন আইন প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত কী ছিল সেসবের সমস্ত খুঁটিনাটি মনে রাখা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, মানুষ মরণশীল। মানুষ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কেরও মৃত্যু ঘটে। একটা মানুষের গড় আয়ু যেহেতু ১০০ বছরেরও কম, সুতরাং একটা মস্তিষ্কে জমা রাখা সব তথ্য ১০০ বছরের আগেই মুছে যাবে, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। এ কথা ঠিক, মানুষ তার মস্তিষ্কে জমানো তথ্য কথাবার্তা, আকার-ইঙ্গিত বা অভিনয়ের মাধ্যমে সরাসরি অন্য মস্তিষ্কে স্থানান্তর করতে পারে। কিন্তু, এভাবে কেবল আংশিক তথ্যেরই স্থানান্তর সম্ভব এবং সেই স্থানান্তরের সময় প্রতিবারই কিছু ভুলত্রুটি থেকে যায় (উদাহরণ বলার ত্রুটি, শোনার ত্রুটি, অভিনয়ের ত্রুটি, অভিনয়ের অর্থ বোঝার ত্রুটি)। এইসব কারণে, মাত্র কয়েকবার এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে তথ্য পাঠালে তার অর্থ অনেকটাই পালটে যায় এবং অনেক সময়ই মূল অর্থ পুরোপুরি হারিয়ে যায়।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো, মানুষের মস্তিষ্ক কেবল কিছু বিশেষ ধরনের তথ্য জমা করা এবং সেসব নিয়ে কাজ করার জন্যই যুগ যুগ ধরে বিবর্তিত হয়েছে। মানুষের পূর্বপুরুষদেরকে

তাদের অস্তিত্বের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়েছে শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে। এই পুরো সময়টাতে টিকে থাকার জন্য তাদেরকে হাজার হাজার গাছপালা এবং প্রাণীর আকার-আকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণবিষয়ক তথ্য মনে রাখতে হয়েছে। তাদের মনে রাখতে হয়েছে, হেমন্তকালে এলম (Elm) গাছের নিচে জন্মানো কোঁকড়ানো হলুদ রঙের মাশরুম বিষাক্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি এবং শীতকালে ওক (Oak) গাছের নিচে জন্মানো ওই একই ধরনের মাশরুম পেটব্যথার মহৌষধ। শিকারি-সংগ্রাহকদেরকে তাদের গোত্রের অন্যান্য মানুষগুলোর চিন্তাভাবনা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটাও সব সময় মাথায় রাখতে হতো। রাজ্জাক যদি শাবানাকে খুব উত্ত্যক্ত করত এবং রাজ্জাকের বিরক্তিকর আচরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শাবানার যদি তৃতীয় কারো সাহায্যের দরকার পড়ত, তাহলে শাবানার জন্য এই কথাটা জানা জরুরি ছিল যে, রাজ্জাকের সঙ্গে গত সপ্তাহ থেকে ববিতার ঝামেলা চলছে। কারণ, সেক্ষেত্রে ববিতাকে বললেই সে রাজ্জাককে লাইনে আনার ব্যাপারে শাবানাকে সাহায্য করতে সানন্দে এবং উৎসাহের সঙ্গে রাজি হতো। এক কথায় বলা যায়, বিবর্তনীয় চাপই মানুষকে উদ্ভিদ, প্রাণী, চারপাশের প্রকৃতি এবং সামাজিক সম্পর্ক এসব সম্বন্ধে বিপুল পরিমাণ তথ্য তার মস্তিষ্কে জমা রাখতে বাধ্য করেছিল।

কৃষিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকে মানুষ অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং জটিল ধরনের সমাজ গঠন করতে শুরু করল এবং এই নতুন ধরনের সমাজে সম্পূর্ণ নতুন একধরনের তথ্য জমা রাখা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। সেটা হলো 'সংখ্যা'। শিকারি-সংগ্রাহকদের কখনোই গাণিতিক তথ্য জমা রাখার তেমন দরকার পড়েনি। উদাহরণস্বরূপ, কোন গাছে কয়টা আম ধরল তার হিসাবনিকাশ কোনো শিকারি-সংগ্রাহকই রাখত না। এইসব কারণে এতকাল ধরে মানুষের মস্তিষ্ক কখনোই গাণিতিক তথ্য মনে রাখা বা সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশ করার জন্য বিবর্তিত হয়নি। অথচ, একটি বড়ো রাজ্য পরিচালনার জন্য গাণিতিক তথ্য ছিল অপরিহার্য। শুধু আইনকানুন প্রণয়ন এবং দেবদেবীদের গল্পে মানুষের বিশ্বাস তৈরি করাই একটি রাজ্য শাসনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। রাজ্য চালাতে

গেলে কর আদায় করতে হতো। রাজ্যের হাজার হাজার মানুষের ওপর কর আরোপ করা এবং করের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য সবার বেতন এবং সম্পত্তির পরিমাণ, রাজ্যের খরচাপাতি, জরিমানা, মেয়াদোত্তীর্ণ ধারকর্জের হিসাব, কর মওকুফ বা ছাড়-সম্পর্কিত তথ্যাদি জমা রাখার দরকার হতো। একটা রাজ্যের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় এইসব তথ্যের পরিমাণ ছিল বিশাল। এই বিশাল পরিমাণ তথ্য জমা রাখতে না পারলে এবং সেসব নিয়ে কাজ করতে না পারলে একটা রাজ্যের পক্ষে কোনোভাবেই জানা সম্ভব ছিল না যে তার কী কী সম্পদ আছে এবং ভবিষ্যতে তার পক্ষে আরো কী কী সম্পদ আহরণ করা সম্ভব। মানুষের মস্তিষ্ক এতসব সংখ্যাসূচক তথ্য মনে রাখার উপযোগী ছিল না। কিন্তু একসময় হঠাৎ করেই এসব তথ্য মুখস্থ করা, মনে রাখা এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ল। তখন অধিকাংশ মানুষই হয় তথ্যে তাদের মস্তিষ্ক টইটম্বুর করে ফেলল নতুবা হাল ছেড়ে দিল। এই বিশাল পরিমাণ সংখ্যানির্ভর তথ্য যেন প্রবাদের সেই কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আর মানুষের মস্তিষ্ক যেন বারো হাত কাঁকুড়।

সংখ্যাসূচক তথ্য মনে রাখার ব্যাপারে মানুষের মস্তিষ্কের এই সীমাবদ্ধতা দীর্ঘকাল মানুষকে অনেক বড়ো এবং জটিল ধরনের কোনো মানবসংগঠন গঠন করতে দেয়নি। মানুষের কোনো একটি বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলেই, তাদের একসঙ্গে থাকার জন্য বিপুল পরিমাণ গাণিতিক তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করার দরকার পড়ত। যেহেতু মানুষের মস্তিষ্ক এই কাজটা করতে পারত না, সুতরাং সেই বিশেষ দল বা গোষ্ঠী একসময় ভেঙে পড়ত। সেই কারণেই, কৃষিবিপ্লবের হাজার হাজার বছর পরেও মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আকার ছিল অপেক্ষাকৃত ছোটো এবং সরল।

এই সমস্যার প্রথম সমাধান বের করেছিল দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী প্রাচীন সুমেরীয়রা। সেখানে উর্বর কাদামাটিকে চিরে ফেলা তপ্ত সূর্যের আলো বয়ে আনত পর্যাপ্ত ফসলের সমারোহ। আর এই ফসলের সমারোহ সেখানে তৈরি করল সমৃদ্ধ নগর। নগরবাসীর সংখ্যা যতই বাড়তে থাকল, তাদের

দৈনন্দিন কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক তথ্যের পরিমাণও বাড়তে থাকল। এই সমস্যার সমাধান করতে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে ৩০০০ অব্দের মধ্যে কিছু নাম-না-জানা সুমেরীয় পণ্ডিত গাণিতিক তথ্য জমা রাখার একটা উপায় বের করলেন। তাঁদের নিজেদের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল অনেক বেশি পরিমাণ গাণিতিক তথ্য সংরক্ষণ করতে পারা। এর মাধ্যমে সুমেরীয়রা প্রথম বড়ো বড়ো সমাজকাঠামো তৈরির ব্যাপারে মানবমস্তিষ্কের তথ্য জমা রাখার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হলো। তৈরি হতে লাগল শহর, রাজ্য ও সাম্রাজ্য। মানবমস্তিষ্কের বাইরে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনার জন্য সুমেরীয়রা যে পদ্ধতির উদ্ভব ঘটায়, তার নাম ছিল– 'লেখনী'।

সত্যায়িত, 'কুশিম'

লেখনী হলো বস্তুজগতের কিছু প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে তথ্য জমা রাখার একটি পদ্ধতি। সুমেরীয়রা কাদামাটির ফলকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখত। তাদের বর্ণমালা তৈরি হয়েছিল দুই ধরনের প্রতীক বা চিহ্নের সমন্বয়ে। একধরনের চিহ্ন সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। ১, ১০, ৬০, ৬০০, ৩৬০০ এই সংখ্যাগুলোর জন্য তাদের বর্ণমালায় আলাদা আলাদা প্রতীক বা চিহ্ন ছিল (এখানে জানিয়ে রাখা দরকার, সুমেরীয়রা ৬ভিত্তিক এবং ১০ভিত্তিক সংখ্যার সমন্বিত একটা সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করত। সম্ভবত তাদের ৬ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালের মানুষজন একটি দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করার বা একটি বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করার ধারণা পায়)। অন্য আরেক ধরনের প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে তারা মানুষ, পশুপাখি, কেনাবেচার পণ্য, রাজ্যের সীমানা, দিন-তারিখ এসব তথ্য জমা রাখত। এই দুই ধরনের চিহ্ন দিয়ে তৈরি করা লিখন পদ্ধতির সাহায্যে সুমেরীয়রা যে-কোনো মানবমস্তিষ্ক বা যে-কোনো মানুষের ডিএনএর থেকে অনেক বেশি পরিমাণ তথ্য জমা করতে সক্ষম হয়েছিল।

লেখনী আবিষ্কারের আদিপর্বে তা শুধু সংখ্যাবিষয়ক তথ্য বা দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করার কাজেই ব্যবহৃত হতো। মাটির ফলকে লেখা 'মহান সুমেরীয় উপন্যাস' বা এজাতীয় কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব থেকে থাকলেও তার কোনো নমুনা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মাটির ফলকে লেখালেখির ব্যাপারটি ছিল সময়সাপেক্ষ এবং পাঠকও ছিল হাতে-গোনা। সেজন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার কাজেই মূলত লেখনীর ব্যবহার হতো। প্রায় ৫ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের জন্য কোনো মহান বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন কি না, তা খুঁজতে গেলে আমাদের একরকম হতাশই হতে হবে। কারণ, আমাদের উদ্দেশে রেখে যাওয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথম লিখিত বাক্যটি ছিল অনেকটা এরকম– 'সাইত্রিশ মাসে উনত্রিশ হাজার ছিয়াশি একক বার্লি –কুশিম'।

এ কথার সম্ভাব্য মানে হতে পারে এরকম– 'সাইত্রিশ মাসে মোট উনত্রিশ হাজার ছিয়াশি বস্তা বার্লি রাজার সংগ্রহশালায় জমা হয়েছে। স্বাক্ষর –কুশিম'। হায়, ইতিহাসে পাওয়া মানুষের লিখনপদ্ধতির প্রথম নিদর্শন আমাদের দিল না কোনো প্রাচীন দার্শনিক প্রজ্ঞার খবর, কোনো মহৎ কাব্য কিংবা বীরগাথা, শেখাল না কোনো আইনকানুন, এমনকি শোনাল না কোনো মহারাজার দিগ্‌বিজয়ের চমকপ্রদ কাহিনি! সেগুলোর পুরোটা জুড়ে থাকল কেবল গৎবাঁধা-একঘেয়ে ব্যাবসায়িক নথি, কর আদায় সংক্রান্ত তথ্য, মোট ঋণের হিসাব এবং জমিজমার মালিকানা বিষয়ক দলিল।
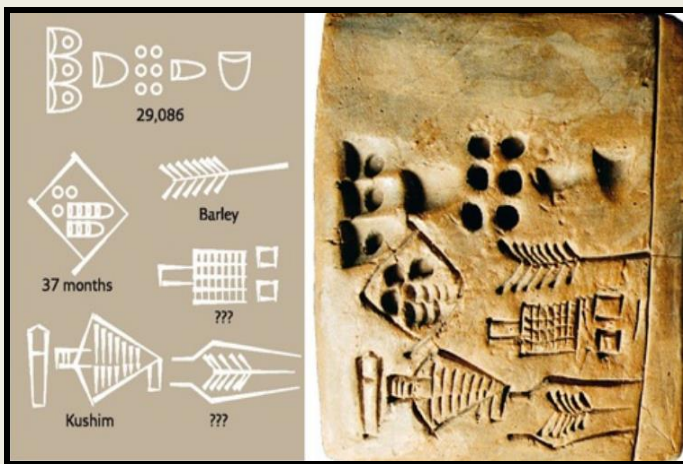
১৯। উরুক শহরের প্রশাসনিক হিসাবসংবলিত মাটির পাত্র। 'কুশিম' কোনো একক ব্যক্তির নাম বা অফিসের কোনো কর্মচারী বা কর্মকর্তার পদবিও হতে পারে। যদি 'কুশিম' নামটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির হয়, তাহলে ইতিহাসে তিনিই সম্ভবত প্রথম মানুষ ছিলেন, যার সত্যিকার নাম আমরা জানি! এর আগের সময়কার ইতিহাসে আমরা যতকিছুর নাম শুনেছি, যেমন– নিয়ান্ডার্থাল, নাটুফিয়ানস, শভে গুহা, গোবেকলি তেপে– সবগুলোই আধুনিক মানুষের নতুন করে দেওয়া নাম। আমরা কোনোভাবেই জানি না যে, গোবেকলি তেপের নির্মাতারা ওই জায়গাটিকে ঠিক কী নামে ডাকতেন। লেখনীর আবিষ্কারের পর থেকে আমরা ইতিহাসের সত্যিকার নায়কদের কান হয়ে সে সময়কার গল্প শুনতে শুরু করলাম। কুশিমকে ডাকার সময় হয়তো প্রতিবেশীরা ঠিক 'কুশিম!' এই নামটিই চিৎকার করে উচ্চারণ করত! 'কুশিম' সম্পর্কে যে কথাটা না বললে গল্পটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে সেটা হলো– ইতিহাসে প্রথম অমর হয়ে রইল 'কুশিম' নামে যে ব্যক্তিটির নাম অথবা 'কুশিম' পদবিধারী যে মানুষটি, তিনি কিন্তু কোনো কবি ছিলেন না, মহান নবি ছিলেন না, ছিলেন না কোনো দিগ্‌বিজয়ী বীর। 'কুশিম' ছিলেন একজন 'হিসাবরক্ষক'!

যদিও এ কথা ঠিক, খুঁজে পাওয়া অল্প কিছু মাটির ফলকে লিখিত তথ্য থেকে সেকালের মানুষের ভাষার আওতা সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। মুখে মুখে মানুষ কতরকম বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারত, সে ধারণা করাও সহজ নয়। কিন্তু, মাটির ফলক থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী এটুকু অন্তত অনুমান করা যায়, কোনো কোনো জিনিস তখন মানুষের ভাষার আওতাধীন ছিল না। সুমেরীয়দের এই আংশিক বর্ণমালা বা গাণিতিক সংকেতগুলো দিয়ে কবিতা লেখা বা

সাহিত্য রচনা করা মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেগুলো দিয়ে বেশ সফলতার সঙ্গেই কর আদায়সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ লিপিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব ছিল।

প্রাচীনকালের আরেক ধরনের লেখালেখির অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি, যার অবস্থা আরো হতাশাব্যঞ্জক। সেটা হলো, কতগুলো শব্দের একটা পৌনঃপুনিক তালিকা, যেগুলো কোনো শিক্ষানবিশ ছাত্র তার অনুশীলনের অংশ হিসেবে বারবার লিখেছে বলে মনে করা হয়। তখনকার দিনে যখন একজন ছাত্র হিসাব লেখার কাজে বিরক্ত হয়ে প্রেমের কবিতা লিখতেও চাইত, সেটা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। সুমেরীয়দের প্রাচীন বর্ণমালাকে বলা যেতে পারে আংশিক লিপি, এটা পূর্ণাঙ্গ কোনো লিপি ছিল না। পূর্ণাঙ্গ লিপি বলতে কী বুঝি? পূর্ণাঙ্গ লিপি হলো বস্তুগত চিহ্নের সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি বর্ণমালা, যা দিয়ে মানুষের কথ্যভাষার প্রায় সবকিছুই এমনকি কবিতাও লিখে ফেলা যায়। অন্যদিকে, আংশিক লিপি হলো এমন এক বর্ণমালা, যা দিয়ে কেবল বিশেষ ধরনের কিছু তথ্যই লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। ল্যাটিন লিপি, প্রাচীন মিশরীয় লিপি এবং একালের ব্রেইল লিপি হলো পূর্ণাঙ্গ লিপির উদাহরণ। এই সবগুলো লিপি দিয়েই আপনি কর আদায়ের হিসাবনিকাশ যেমন লিখে রাখতে পারবেন, তেমনি লিখতে পারবেন প্রেমের কবিতা, ইতিহাসের বই, খাবারের রেসিপি বা ব্যবসায়ের নিয়মকানুন। অন্যদিকে প্রাচীন সুমেরীয় লিপি, বর্তমানের গাণিতিক লিপি বা সংগীতের স্বরলিপি– এগুলো হলো আংশিক লিপির উদাহরণ। গাণিতিক লিপি দিয়ে হিসাবনিকাশের জন্য গণিতের নানা সমীকরণ লেখা সম্ভব, কিন্তু কবিতা লেখা সম্ভব নয়। অন্যান্য আংশিক লিপিগুলোর ক্ষেত্রেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।

সুমেরীয়রা কিন্তু তাদের বর্ণমালা দিয়ে যে কবিতা লেখা যায় না এটা নিয়ে মোটেও চিন্তিত ছিল না। তারা মুখের সব কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য তাদের ভাষা তৈরি করেনি, বরং মুখের ভাষা যেসব জিনিস সহজে প্রকাশ করতে পারে না সেইসব সংখ্যা বা হিসাবনিকাশ-সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্যই তাদের ভাষা তৈরি করেছিল। এরকম কিছু সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়, যারা ইতিহাসের পুরোটা সময় জুড়ে আংশিক লিপি ব্যবহার করেই কাজ চালিয়েছে

এবং কখনো পূর্ণাঙ্গ লিপি তৈরির চেষ্টাও করেনি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাক-কলম্বিয়ান যুগে আন্দেজ পর্বত অঞ্চলে গড়ে ওঠা একধরনের লিপির কথা আমরা বিবেচনা করতে পারি। এই লিপি সুমেরীয়দের লিপি থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। এটা অন্যান্য প্রচলিত লিপিগুলো থেকেও এতটাই আলাদা যে, অনেকে এটাকে আদৌ কোনো লিপি বলা যায় কি না, সেটা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই লিপি কোনো মাটির ফলকে বা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হতো না। বরং, নানা রঙের দড়িতে বিভিন্ন ধরনের গিঁট বেঁধে এই লিপি তৈরি করা হতো। এই নানা রঙের দড়িগুলোকে একসঙ্গে বলা হতো 'কিপু' (Quipu)। প্রতিটা দড়ির বিভিন্ন অবস্থানে নানা রকম গিঁট বাঁধা থাকত। একেকটা কিপুতে শত শত দড়ি এবং হাজার হাজার গিঁট থাকতে পারত। এই গিঁটগুলোর সংখ্যা, গিঁটের ধরন এবং দড়িতে গিঁটের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সেগুলো নানা সংখ্যা প্রকাশ করত। এইভাবে নানা রঙের দড়ি এবং দড়িতে নানা ধরনের গিঁট দেওয়ার মাধ্যমে তারা কর আদায় বা সম্পত্তির হিসাসংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ গাণিতিক তথ্য জমা রাখতে পারত।[২]

২০। একজন মানুষ হাতে একটি কিপু ধরে আছে। ইনকা সভ্যতার সমাপ্তির পর কিপুর কথা এভাবেই বর্ণিত হয়েছিল একটি স্প্যানিশ লিপিতে

শত শত বছর, সম্ভবত হাজার হাজার বছর ধরে এই কিপু ছিল অনেক নগর, রাজ্য এবং সাম্রাজ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি অপরিহার্য অংশ।[৩] কিপু'র সবচেয়ে সফল ব্যবহার হয়েছিল বিখ্যাত 'ইনকা' সভ্যতার আমলে। 'ইনকা' শব্দের অর্থ হলো 'সূর্যের সন্তান'। ১ কোটি বা তার চেয়ে কিছু বেশি মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই ইনকাদের রাজ্য এবং এর ভৌগোলিক বিস্তৃতি ছিল আজকের পেরু, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া আর চিলির কিছু অংশ জুড়ে। কিপুর কারণেই তারা বিশাল পরিমাণ তথ্য জমা রাখা

এবং তা দিয়ে নানা রকম হিসাব-নিকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল, একটি বড়ো আকারের রাজ্য চালানোর জন্য যা ছিল অপরিহার্য।

এমনকি কিপু দিয়ে করা হিসাবনিকাশ এতটাই কার্যকর এবং নির্ভুল ছিল যে, দক্ষিণ আমেরিকা জয়ের পরে স্প্যানিয়ার্ডরা প্রথমদিকে তাদের রাজ্য পরিচালনার জন্য কিপু ব্যবহার করা শুরু করেছিল। কিন্তু, এর ফলে দুটো সমস্যা দেখা দিল। প্রথমত, স্প্যানিয়ার্ডরা নিজেরা কিপু তৈরি করতে এবং সেটা পড়তে জানত না। কিপু তৈরির জন্য তাদেরকে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের ওপরই নির্ভর করতে হতো। দ্বিতীয়ত, স্প্যানিয়ার্ডরা এটা বুঝতে পেরেছিল যে, স্থানীয় কিপু বিশেষজ্ঞরা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কিপুতে ভুল তথ্য রাখতে পারে এবং তাদের স্প্যানিয়ার্ড প্রভুদের বিভ্রান্ত করতে পারে। এসব কারণে দক্ষিণ আমেরিকায় যখন পাকাপাকিভাবে স্পেনের আধিপত্য স্থাপিত হলো, তখন কিপু বাতিল করে তারা তাদের সব হিসাবনিকাশ ল্যাটিন লিপি ও সংখ্যার মাধ্যমে রাখতে শুরু করল। সহজভাবে বলতে গেলে স্পেনের রাজত্ব কায়েম হওয়ার পরে কিপু একরকম বিলুপ্তই হয়ে যায়। যেহেতু, কিপু পড়ার মতো বিশেষজ্ঞ লোকজনও আর অবশিষ্ট ছিল না, সে কারণে যে দু-একটা কিপু টিকে থাকল, সেগুলোর পাঠোদ্ধার করাও মোটামুটি অসম্ভব হয়ে পড়ল।

আমলাতন্ত্রের বিস্ময়

এ পর্যন্ত মানুষের লেখালেখির যেসব নিদর্শন আমরা দেখলাম সেগুলো মূলত লেনদেন, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে। কালক্রমে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা কাঠখোট্টা আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার পাশাপাশি অন্যান্য জিনিসও লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত সুমেরীয় লিপিতে একের পর এক বর্ণ ও চিহ্ন যুক্ত হতে থাকে। এর ফলে সুমেরীয়দের লিপি একসময় পূর্ণাঙ্গ লিপি হয়ে ওঠে, যে লিপির আধুনিক নাম 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform)। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের মধ্যেই কিউনিফর্ম লিপি ব্যবহার করে রাজারা সমন জারি করতে শুরু

করেন, ধর্মযাজকেরা ঈশ্বরের বিধান লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নেন আর সাধারণ মানুষজন লিখতে শুরু করেন ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। মোটামুটি একই সময়ে মিশরের অধিবাসীরা 'হায়ারোগ্লিফিকস' (Hieroglyphics) নামে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ লিপি তৈরি করে। খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের দিকে চীনে এবং খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের দিকে মধ্য আমেরিকায় আরো কিছু পূর্ণাঙ্গ লিপির উৎপত্তি হয়।

এসব এলাকা থেকে কালক্রমে এই পূর্ণাঙ্গ লিপিগুলো দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন এলাকায় লিপিগুলো নানাভাবে পরিবর্তিত হয়, নতুন আকার ধারণ করে এবং বিস্তৃত হয় এদের কার্যপরিধি। মানুষ কবিতা লিখতে শুরু করে, লেখা শুরু হয় ইতিহাস, প্রেমের আখ্যান, নাটক, ভবিষ্যদ্বাণী এবং রান্নার বই। এত কিছুর পরও লিখিত ভাষার প্রধান কাজ একগাদা গাণিতিক তথ্য জমা রাখা এবং সেগুলো দিয়ে হিসাবনিকাশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আংশিক লিপিগুলোই আগের মতো এই কাজের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। হিব্রুদের *বাইবেল*, গ্রিকদের *ইলিয়ড*, হিন্দুদের *মহাভারত* কিংবা বৌদ্ধদের *ত্রিপিটক* প্রাথমিকভাবে মৌখিক ভাষার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল। লিখিত ভাষা আবিষ্কার না হওয়ায় সম্ভবত মানুষের মুখে মুখেই এই গ্রন্থগুলো টিকে থাকত। এদিকে খাজনার হিসাব আর আমলাতান্ত্রিক সমাজের জন্মই হয়েছে আংশিক লিপিগুলোর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। এরা অনেকটা মায়ের পেটে থাকতেই জোড়া লেগে যাওয়া যমজ দুই ভাইয়ের মতো। একটিকে আরেকটির থেকে আলাদা করে ভাবা অসম্ভব। দুর্বোধ্য কিছু সংকেতমালা দিয়ে তৈরি আজকের দিনের কম্পিউটারাইজড ডেটাবেস বা দস্তাবেজগুলো দেখলেও এ কথা সহজেই বোঝা যায়। কম্পিউটারের ভাষা পূর্ণাঙ্গ ভাষা নয় এবং মানুষের পক্ষে তা পাঠ করা মুশকিল। কম্পিউটারে তথ্য জমা রাখতে না পারলে এত বিশালসংখ্যক মানুষের এত বিষয়ের তথ্য জমা রাখা মানুষের জন্য অসম্ভব হতো। সেই হিসাবে বলাই যায় যে, এত মানুষের হিসাবনিকাশ রাখার জন্যই কম্পিউটারের আংশিক লিপির উদ্ভব হয়েছে। আবার এ কথাও সত্যি যে, এই আংশিক লিপি

আবিষ্কারের ফলেই মানুষ এত তথ্য রাখতে পারছে আর তথ্যের মালিক তৈরি করতে পারছে একটি আমলাতান্ত্রিক সমাজ।

লিখিত দলিল-দস্তাবেজের পরিমাণ যখন বাড়তে থাকল, বিশেষ করে আইনকানুন-প্রশাসনসংক্রান্ত দলিলপত্র যখন অনেক বেশি হয়ে গেল, তখন নতুন একটি সমস্যা দেখা দিল। এত দলিল-দস্তাবেজ থেকে কোনো একটি বিশেষ তথ্য খুঁজে বের করার ব্যাপারটি এ পর্যায়ে বেশ কঠিন হয়ে পড়ল। মানুষের স্মৃতিতে থাকা কোনো তথ্য খুঁজে বের করা অনেক সহজ। আমার মস্তিষ্কে লাখ লাখ, কোটি কোটি নানা রকমের তথ্য আছে, তার পরও আমি বলতে গেলে এক মুহূর্তের মধ্যেই মনে করতে পারি ইতালির রাজধানীর নাম কী, তারপরই আমার মাথায় ভাসতে থাকে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমি কী করেছিলাম তার স্মৃতি এবং তারপরই আমি মনে করতে থাকি আমার বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তার কথা। এতগুলো ভিন্ন ধরনের তথ্য আমি মনে করতে পারি মুহূর্তের মধ্যেই। কীভাবে মস্তিষ্ক তথ্য খোঁজার এই কাজটি এত নিখুঁতভাবে, এত কম সময়ে করে সেটা আজও এক রহস্য। কিন্তু আমরা এটা বুঝি যে, মস্তিষ্কের তথ্য খোঁজার ক্ষমতা বিস্ময়কর। ব্যতিক্রম একটাই, প্রতিদিন অফিস যাওয়ার আগে যখন আপনি চশমা, মানিব্যাগ বা বাসার চাবি খোঁজার চেষ্টা করেন তখনই সে রীতিমতো নাকাল হয়ে যায়! কিছুতেই মনে করতে পারে না কিছুক্ষণ আগের সামান্য এই তথ্যটুকু!

আমরা জানলাম, মস্তিষ্কের তথ্য খোঁজার ক্ষমতা অসাধারণ এবং মস্তিষ্ক এ কাজটি অনেক দ্রুততার সঙ্গে করে। এবারে দড়িতে গিঁট দিয়ে বানানো কিপু থেকে বা মাটির ফলকে খোদাই করা লিপির ব্যাপারে ফিরে আসি। এসব থেকে কীভাবে আপনি কোনো তথ্য খুঁজবেন এবং তার পাঠোদ্ধার করবেন? হ্যাঁ, কিপু বা ফলকের সংখ্যা যদি অল্প হয়, তাহলে হয়তো খুঁজে বের করাটা তেমন কোনো কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু রাজা হামুরাবির সমসাময়িক মারির রাজা জিমরিলিমের (King Zimrilim of Mari) কথা ভাবুন। রাজকার্য পরিচালনার জন্য তাদের এরকম হাজার হাজার ফলক বা লিপি তৈরি

করতে হয়েছিল। সুতরাং সেখান থেকে কোনো তথ্য খুঁজে বের করা যে ভয়াবহ কষ্টসাধ্য একটি কাজ ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ধরা যাক, এটা খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৭৬ অব্দের কোনো দুপুর। মারি রাজ্যের দুই প্রজার মধ্যে একটি গমখেতের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব বেধেছে। আলালের দাবি, সে এই জমি ৩০ বছর আগে দুলালের থেকে কিনেছে। দুলাল বলছে, জমি সে মোটেই বিক্রি করেনি, টাকার প্রয়োজনে ৩০ বছরের জন্য আলালকে ভাড়া দিয়েছিল। এখন ভাড়ার সময়সীমা শেষ, তাই সে জমি আলালের কাছ থেকে ফেরত নিতে চায়। এ নিয়ে অনেকক্ষণ চিৎকার-চ্যাঁচামেচি হলো, আশপাশে মজা দেখার জন্য লোকজন জমে গেল, দুজনের প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। একসময় দুজনেরই খেয়াল হলো, তারা শাহি দপ্তরখানায় গিয়ে সহজেই এ বিবাদের মীমাংসা করতে পারে। কারণ, সেখানেই রাজ্যের জমিসংক্রান্ত কেনাবেচার সমস্ত দলিল সংরক্ষণ করা আছে। যেই ভাবা সেই কাজ। তারা দুইজন শাহি দপ্তরখানায় গিয়ে হাজির হলো। এলাহি কারবার। দেখে দুজনেরই মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম। কার কাছে গেলে তাদের দলিল পাওয়া যাবে, এটা জানতে জানতেই তাদের অনেকটা সময় চলে গেল, ঘুরতে হলো এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে। যখন তারা সঠিক লোকের কাছে পৌঁছাল, ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাজার হিসাবরক্ষক ভদ্রভাবে জানালেন, 'কাল আসুন।' কী আর করা! তারা পরের দিন সকাল সকাল হিসাবরক্ষকের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। হিসাবরক্ষক একজন সহকারীকে দলিল খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিলেন। সহকারী তাদের দুজনকে বিশাল আকারের দস্তাবেজকক্ষে নিয়ে গেল। এই কক্ষের একদম মেঝে থেকে উঁচু ছাদ পর্যন্ত মাটির ফলকে ঠাসাঠাসি। তরুণ সহকারীর মুখ শুকিয়ে কাঠ! এই ফলকের স্তূপ থেকে কীভাবে ৩০ বছর আগের একটি দলিল খুঁজে বের করবে সে? যদিও-বা একটা দলিল পায় আলাল ও দুলালের নামে, কী করে বুঝবে এটাই আলাল এবং দুলালের জমিসংক্রান্ত সর্বশেষ দলিল? এর পরে তারা জমিসংক্রান্ত কোনো দলিল পরিবর্তন বা বাতিল করেনি তার কী নিশ্চয়তা? আর আলাল-দুলালের কোনো দলিল যদি আদৌ পাওয়া না যায়, তাহলে কি এটা বোঝা যাবে যে, আলাল আর দুলালের মধ্যে

জমিসংক্রান্ত কোনো দলিলই হয়নি? দলিলের লিপির ফলকটা তো ভেঙে গিয়েও থাকতে পারে। অথবা, গত বর্ষায় দস্তাবেজক্ষের এক কোনায় যে কয়টা মাটির ফলক একদম মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ওদের দলিলটাও যে তার মধ্যে নেই, সেটাই বা কী করে বোঝা যাবে?

সুতরাং, এটা একদম স্পষ্ট যে, কোনো তথ্য মাটির ফলকে লিখে রাখতে পারলেই যে সেটা প্রয়োজনের সময় সহজে, নির্ভুলভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যাবে এমনটা নয়। সেটা করার জন্য লিখে রাখা তথ্যগুলোকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করে একটা সূচিপত্র তৈরি করা দরকার, ফটোকপি মেশিনের মতো সহজেই তথ্যের অনুলিপি তৈরি করার জন্য একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। সর্বোপরি দ্রুততার সঙ্গে তথ্য খুঁজে বের করার জন্য কম্পিউটার অ্যালগরিদমের মতো কোনো উন্নত কৌশল থাকা দরকার। পাশাপাশি ঝানু (সঙ্গে একটু হাসিখুশি হলে ভালো হয়) লাইব্রেরিয়ানের মতো কিছু মানুষ থাকা দরকার, যারা এসব কৌশল ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে পারে।

এইসব করার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ বুঝতে পারল, লিখনপদ্ধতি আবিষ্কারের থেকে তথ্য সাজানো, অনুলিপি তৈরি এবং তথ্য খোঁজার কাজগুলো বেশি কঠিন। মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীনভাবে নানা রকম লিখন পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখনো গড়ে প্রতি ১০ বছরে কয়েকটি করে হারিয়ে যাওয়া লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে কয়েকটি সুমেরীয়দের কাদামাটির ফলকে লেখা লিপির চেয়েও পুরাতন হতে পারে। কিন্তু এসব লিপির অধিকাংশই আজ কেবল মানুষের কৌতূহলের উপাদান হয়ে টিকে আছে। এর কারণ হলো, অধিকাংশ লেখ্য ভাষার ক্ষেত্রেই মানুষ সে ভাষায় লেখা তথ্যগুলোকে তালিকাবদ্ধ করা, অনুলিপি তৈরি করা এবং দ্রুত খুঁজে বের করার কৌশল আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, সুমেরীয়, মিশরীয় এবং ইনকা সভ্যতার মানুষজন এই কাজগুলো সফলতার সঙ্গে করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি তারা নকলনবিশ, কেরানি, গ্রন্থাগারিক এবং হিসাবরক্ষক তৈরি করার স্কুলের জন্য রাজ্যের কোষাগার থেকে অর্থও বরাদ্দ করত।

এরকম একটি স্কুলের একজন ছাত্রের লেখালেখি চর্চার সময়কার একটা লিপি আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই লিপিটি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ধারণা করা হয়, এটি প্রায় ৪ হাজার বছরের পুরোনো। লিপিটি অনেকটা এরকম–

> আমি ঘরের ভেতর ঢুকলাম এবং বসে পড়লাম, এবং আমার শিক্ষক আমার ফলকে খোদাই করা লেখাটি পড়লেন। তিনি বললেন, 'না, কিছু একটা গড়বড় আছে।'
> এবং তিনি তার ছড়ি দিয়ে আমাকে শাস্তি দিলেন।
> দায়িত্বরত একজন কর্মী আমাকে বললেন, 'তুমি আমার অনুমতি ছাড়া কেন মুখ খুলেছ?'
> এবং তিনি তার ছড়ি দিয়ে আমাকে শাস্তি দিলেন।
> আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা একজন বললেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া তুমি কেন উঠেছ?'
> এবং তিনি তার ছড়ি দিয়ে আমাকে শাস্তি দিলেন।
> দারোয়ান বলল, 'তুমি কেন আমার অনুমতি ছাড়া বাইরে বের হচ্ছ?'
> এবং সে তার ছড়ি দিয়ে আমাকে মারল।
> বিয়ারের জগের দায়িত্বে থাকা লোকটি বলল, 'কেন তুমি আমার অনুমতি ছাড়া বিয়ার নিলে?'
> এবং সে তার ছড়ি দিয়ে আমাকে মারল।
> সুমেরীয় শিক্ষক বললেন, 'কেন তুমি আক্কাদিয়ান ভাষায় কথা বললে?'*
> এবং তিনি তার ছড়ি দিয়ে আমাকে শাস্তি দিলেন।
> আমার শিক্ষক বললেন, 'তোমার হাতের লেখা সুন্দর নয়!'
> এবং তিনি তার ছড়ি দিয়ে আমাকে শাস্তি দিলেন।[৪]

---

* আক্কাদিয়ান মুখের ভাষা হিসেবে চালু হওয়ার পরেও ব্যবসায়, বাণিজ্য, দলিল, দস্তাবেজ তথা দাপ্তরিক কাজে সুমেরীয় ভাষাই ব্যবহার করা হতো। সে কারণে নকলনবিশের মতো দাপ্তরিক পদের জন্য নির্বাচিত একজন ছাত্রের জন্যও সুমেরীয় ভাষায় কথা বলাই ছিল দস্তুর।

প্রাচীনকালের নকলনবিশরা শুধু যে পড়তে এবং লিখতে শিখত তা নয়, বরং তাদেরকে তালিকা, অভিধান, দিনপঞ্জি, ফর্ম, টেবিল এসবের ব্যবহারও শেখানো হতো। তালিকা বা সূচি তৈরি করা, তথ্য দ্রুত খুঁজে বের করা এবং সেসব নিয়ে কাজ করার কৌশলগুলো তারা শিখত এবং আত্মস্থ করত। এই কৌশলগুলো মস্তিষ্কের স্বাভাবিক তথ্য জমা রাখা এবং খুঁজে বের করার পদ্ধতির থেকে একেবারেই আলাদা। মস্তিষ্কে নানা রকম তথ্য স্বাধীনভাবে জমা থাকে, তালিকার মতো বিষয় অনুযায়ী বা সময় অনুযায়ী সাজানো থাকে না। যখন আমি আমার সঙ্গীকে নিয়ে কিস্তিতে নতুন বাড়ি কেনার জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে ব্যাংকে যাই, হুট করে আমার মনে পড়ে যায় আমাদের সেই ছোট্ট বাড়িটার কথা, যেখানে আমরা প্রথম একসঙ্গে বসবাস শুরু করেছিলাম। সংসারের কথা ভাবতে গিয়েই আমার মনে পড়ে নিউ অরলিয়নসে কাটানো আমাদের মধুচন্দ্রিমার সুন্দর মুহূর্তগুলো, অরলিয়নসের কথা ভাবতেই মনে পড়ে মধুচন্দ্রিমায় ওখানকার সিটি পার্কে গিয়ে দেখা কুমিরের কথা, কুমিরের বড়ো বড়ো মুখ আর দাঁত আমাকে মনে করিয়ে দেয় আগুনের হলকা বের করা ভয়ংকর ড্রাগনের কথা, ড্রাগন আমাকে মনে করিয়ে দেয় ড্রাগনের জন্য করা ওয়াগনারের লেটমোটিফ (সংগীতের একটি অংশ, যা কোনো কাহিনি, গল্পের চরিত্র, স্থান বা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চরিত্রটি গল্পে যখন যখন উপস্থিত হয়, তার লেটমোটিফ বাজতে থাকে। হলিউডের বিখ্যাত চলচ্চিত্র সিরিজ 'Star Wars' এ লেটমোটিফের অনেক ব্যবহার দেখা যায়), এই লেটমোটিফ আমাকে মনে করিয়ে দেয় তার সৃষ্টি করা বিখ্যাত গীতিনাট্য 'The Ring of the Nibelungen' এর কথা যার সংগীতের স্বরলিপি তৈরি করতে ওয়াগনারের প্রায় ছাব্বিশ বছর সময় লেগেছিল! এতসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই হুট করে খেয়াল হয়, আমি ব্যাংকে বসে শিস দিয়ে ওয়াগনারের সেই বিখ্যাত গীতিনাট্যের সিগফ্রিড চরিত্রটির জন্য করা লেটমোটিফ বাজানোর চেষ্টা করছি এবং ব্যাংকের কেরানি হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন! রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো এভাবে একসঙ্গে রাখলে চলে না, রাখতে হয় আলাদা আলাদাভাবে। বাড়ি বন্ধকির কাগজপত্র থাকবে একটা

ড্রয়ারে, আরেকটা ড্রয়ারে থাকবে বিয়ের সনদপত্র, আলাদা ড্রয়ারে রাখা হবে খাজনাসংক্রান্ত কাগজপত্র, ভিন্ন আরেকটি ড্রয়ারে রাখা হবে মামলা-মোকদ্দমাসংক্রান্ত তথ্য। এভাবে বিষয় অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে না রাখলে পরে আমাদের পক্ষে তথ্য খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু যখন কোনো তথ্য একসঙ্গে একাধিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তখন সেটা কোন ড্রয়ারে রাখা হবে সেটা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দেয়। ওয়াগনারের গীতিনাট্যের কথাই ধরা যাক। আমি কি এটাকে সঙ্গীতের ড্রয়ারে রাখব, নাকি নাটকের ড্রয়ারে রাখব, নাকি ওয়াগনারের গীতিনাট্যের জন্য নতুন একটা ড্রয়ারই তৈরি করব? মানুষকে তার মস্তিষ্কে এভাবে তথ্য জমা করতে হলে তা তার মাথাব্যথার একটা কারণে পরিণত হতো। কারণ, সে ক্ষেত্রে জীবনভর তাকে তার মাথায় নতুন ড্রয়ার বানাতে হবে, আগের অনেক ড্রয়ার সরিয়ে ফেলতে হবে বা ঢেলে নতুন করে সাজাতে হবে। মস্তিষ্কের জন্য এটা কঠিন কাজ, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দরকারি তথ্য সাজিয়ে রাখার জন্য এর থেকে কার্যকরী কোনো পদ্ধতিও মানুষের জানা নেই।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিষয় অনুযায়ী আলাদা আলাদা ড্রয়ারে তথ্য রাখার কৌশলটি তখনই সফলভাবে করা সম্ভব হবে যখন কিছু লোক তাদের মস্তিষ্কের চিন্তা করার ধরন পালটে ফেলবে, তারা সাধারণ মানুষের মতো চিন্তা করার বদলে কেরানি বা হিসাবরক্ষকের মতো করে চিন্তা করতে শুরু করবে। এ কথা আমরা সবাই কমবেশি জানি যে, কেরানি বা হিসাবরক্ষকেরা ঠিক সাধারণ মানুষের মতো করে চিন্তা করে না। তাদের চিন্তার ধরন অনেকটা বিষয় অনুযায়ী ড্রয়ার নির্বাচন করে ড্রয়ার ভরার মতো। অবশ্য এভাবে চিন্তা করার জন্য তাদের দোষী করাটা উচিত হবে না। কারণ, এভাবে চিন্তা করতে না পারলে তারা রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য পদ্ধতি অনুযায়ী গুছিয়ে রাখতে পারত না, রাখত এলোমেলোভাবে। ফলে তারা রাষ্ট্র, কোম্পানি বা অন্য কোনো সংস্থাকে তাদের পদ অনুযায়ী যথাযথ সেবা দিতে ব্যর্থ হতো। মানুষের ইতিহাসে লিখনপদ্ধতি আবিষ্কারের সবচেয়ে বড়ো প্রভাব সম্ভবত এটাই যে, এটি ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তা করার এবং দুনিয়াকে দেখবার পদ্ধতিই পালটে

দিয়েছে। মুক্ত চিন্তার ভিত্তিতে, সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ঘটনাকে বিচার করার বদলে আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি ঘটনাটিকে তার সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক একটি ঘটনা হিসেবে বিচার করতে এবং এর ফলে উৎপত্তি ঘটছে আমলাতন্ত্রের।

সংখ্যার ভাষা

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের লিখিত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের এইসব আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের স্বাভাবিক পদ্ধতির তফাত বাড়তে লাগল এবং দিনকে দিন সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এসব পদ্ধতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তনটা এলো খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকের দিকে। এ সময় মানুষ একপ্রকার আংশিক লিপি আবিষ্কার করল, যা সংখ্যাভিত্তিক যে-কোনো তথ্যকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে জমা রাখতে ও প্রক্রিয়াকরণ করতে সক্ষম। এই আংশিক লিপিটি ১০টি চিহ্নের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। চিহ্নগুলো ছিল ০ থেকে ৯। মজার ব্যাপার হলো, হিন্দুরা প্রথমে এই লিপি উদ্ভাবন করলেও, বর্তমানে এটি আরবীয় লিপি নামেই অধিক পরিচিত (আরো অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পশ্চিমা দেশগুলোতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলো একালের আরবরা সংখ্যা প্রকাশের জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করে তার থেকে আলাদা হলেও সেগুলোও আরবীয় লিপি নামেই পরিচিত)। আরবরা এই লিপি উদ্ভাবন না করলেও এই লিপির প্রসার ও উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছোটো করে দেখার কোনো উপায় নেই। আরবরা ভারতীয় উপমহাদেশ অধিকার করার সময় এই লিপির সন্ধান পায় এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেরা এর ব্যবহার শুরু করে। পরবর্তীকালে তারা এই লিপির উন্নতিসাধন করে এবং তাদের কল্যাণেই এই লিপি মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তারা এই আংশিক লিপিতে আরো কিছু চিহ্ন (যেমন, '+', '-', '×') যোগ করলে তা আধুনিক গাণিতিক ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে।

যদিও সংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য উদ্ভাবিত এই লিপিটি একটি আংশিক লিপি, এটিই বর্তমানে পৃথিবীর সব থেকে বেশি ব্যবহৃত

ভাষা। যে-কোনো রাষ্ট্র, কোম্পানি, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান, সে তারা আরবি, হিন্দি, ইংরেজি, নরওয়েজিয়ান যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, তাদের প্রায় সবাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জমা রাখা ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য এই গাণিতিক লিপিই ব্যবহার করে। এর কারণ হলো, কোনো তথ্যকে গাণিতিক লিপিতে রূপান্তর করা সম্ভব হলে তা সহজেই জমা রাখা যায়, দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এবং নির্ভুলভাবে সেসব তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা যায়।

বর্তমানকালে একজন ব্যক্তি যদি সরকার, কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো কোম্পানির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে এই গাণিতিক লিপি আয়ত্ত করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা 'দারিদ্র্য', 'সুখ' এবং 'সততা'র মতো বিমূর্ত ধারণাগুলোকেও সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। 'দারিদ্র্যসীমা', 'মানুষের সুখী হওয়ার পরিমাণ', 'বাসযোগ্য নগরীর হিসেবে অবস্থান'– এই পরিমাণসূচক ধারণাগুলোর সৃষ্টি তা-ই প্রমাণ করে। একইভাবে, জ্ঞানের অন্য অনেক শাখা, যেমন পদার্থবিজ্ঞান বা প্রকৌশলবিদ্যার চর্চা মোটামুটিভাবে মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক একরকম হারিয়েই ফেলেছে। বর্তমানে এসব ব্যাপারে গবেষণা মূলত সংখ্যা, চিহ্ন কিংবা সমীকরণের মতো গাণিতিক লিপির সাহায্যেই চালিত হচ্ছে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী অভিকর্ষের প্রভাবে ভর 'i'-এর ত্বরণ হিসাব করার জন্য একটি সমীকরণ। যখন বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ এ ধরনের হিজিবিজি কোনো সমীকরণ দেখে, ভয়ে তাদের চোখমুখ শুকিয়ে আসে। রাতের রাস্তা দিয়ে হরিণের চোখে হঠাৎ করে চলন্ত জিপের হেডলাইটের আলো পড়লে ভয়ে তার অবস্থা যেরকম হয়, অনেকটা সেরকম। এরকম হওয়াই কিন্তু স্বাভাবিক। এবং এরকম হওয়ার মানে এই নয় যে, যে মানুষটি সমীকরণটি বুঝতে পারছে না তার বুদ্ধিমত্তা কম বা সে বোকা। কিছু ব্যতিক্রমী মানুষের কথা বাদ দিলে, মানুষের মস্তিষ্ক 'আপেক্ষিকতা' বা 'কোয়ান্টাম মেকানিকস'-এর মতো পদার্থবিজ্ঞানের কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে একেবারেই অপারগ। পদার্থবিজ্ঞানীরা এসব নিয়ে চিন্তা করতে পারেন, কারণ তাঁরা মানুষের মতো চিন্তা করা ভুলে গিয়ে কিছু তথ্য

প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতির (যেমন কম্পিউটার) সাহায্যে নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন। মজার ব্যাপার হলো, তাঁদের চিন্তাভাবনার গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু ঘটে তাদের মস্তিষ্কের বাইরে– কম্পিউটারের মনিটরের পর্দায় অথবা শ্রেণিকক্ষের ব্ল্যাকবোর্ডে।

সাম্প্রতিক কালে, গাণিতিক লিপি মাত্র দুটি চিহ্নের সমন্বয়ে আরেকটি বৈপ্লবিক লিপির জন্ম দিয়েছে। মূলত কম্পিউটারে রাখা তথ্যাদিকে এই লিপিতে রূপান্তর করে জমা রাখা হয়। এই লিপি দ্বিমিক বা বাইনারি লিপি নামে পরিচিত। এই দ্বিমিক লিপিতে কেবল ০ ও ১ এই দুটি চিহ্নের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই এখন আমি কম্পিউটারে যা-কিছু লিখছি, তার সবই কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে ০ এবং ১-এর মিশেলে তৈরি নানা রকম সংখ্যার সাহায্যে জমা হচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা মানুষের উদ্ভাবিত নানা রকম লিপি সম্পর্কে জানলাম। মানুষকে নানা কাজে সাহায্য করার জন্যই এই লিপিগুলোর উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু, ধীরে ধীরে এই লিখিত তথ্যাদিই মানুষের প্রভু হয়ে উঠছে। আমাদের কম্পিউটারের পক্ষে মানুষের ভাষা, অনুভূতি কিংবা স্বপ্ন বোঝা কঠিন। সে কারণে, আমরাই আমাদেরকে গণিতের ভাষায় কথা বলতে, সুখ-দুঃখ অনুভব করতে এবং স্বপ্ন বুনতে শেখাচ্ছি, যাতে আমরা কম্পিউটারের কাছে বোধগম্য হতে পারি। কে কার প্রভু?

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। জ্ঞানের 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' নামক শাখাটি এই দ্বিমিক লিপি ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাহায্যে যন্ত্রনির্ভর বুদ্ধিমত্তা নির্মাণের চেষ্টায় অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তাই বুদ্ধি কেবল আর মানুষের থাকছে না, যন্ত্ররাও হয়ে উঠছে বুদ্ধিমান। *ম্যাট্রিক্স* বা *টার্মিনেটর*-এর মতো সায়েন্স ফিকশন সিনেমাগুলোতে আমরা দেখতে পাই, বুদ্ধিমান যন্ত্রেরা মানবজাতির ক্ষমতা খর্ব করে নিজেরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। মানুষ যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যন্ত্রের ওপর তাদের প্রভুত্ব ফিরে পাওয়ার চেষ্টা শুরু করে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মানুষের চেয়ে বহুগুণ ক্ষমতাধর ও বুদ্ধিমান যন্ত্রেরা সমগ্র মানব-প্রজাতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে।

অধ্যায় ৮

ইতিহাস ন্যায়বিচারের প্রতিচ্ছবি নয়

একটা প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক জানতে পারলেই কৃষিবিপ্লবের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাস মোটামুটিভাবে বোঝা সম্ভব। সেটা হলো– জিনগতভাবে মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার জন্য উপযুক্ত না হলেও কীভাবে তারা এত বড়ো বড়ো গোষ্ঠী বা সংগঠন গঠন করে বসবাস করতে শিখল? এ প্রশ্নের সোজাসাপটা উত্তর হলো, মানুষ নানা রকম কাল্পনিক ধারণা তৈরি করতে পারে এবং সবাই মিলে তা বিশ্বাসও করতে পারে। পাশাপাশি মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে লিখিতরূপে সংরক্ষণ করতে পারে। এই দুই রকম ক্ষমতা জিনগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে মানুষকে বড়ো বড়ো গোষ্ঠী বা সংগঠন তৈরি করার ক্ষেত্রে দারুণভাবে সহায়তা করেছে।

যদিও অনেকেই এইসব বড়ো আকারের দল বা গোষ্ঠীর উপযোগিতা নিয়ে সন্দিহান। প্রথম কারণ, মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এসব গোষ্ঠী বা সংগঠন ন্যায়বিচার বা সমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, নানা মানুষের নানা রকম কাল্পনিক বাস্তবতায় বিশ্বাস মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজে তৈরি হয়েছে নানা রকম স্তরবিন্যাস। ওপরের স্তরের লোকেরা সব সময় সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে, অন্যদিকে নিচের স্তরে বসবাসকারী মানুষেরা হয়েছে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। উদাহরণ হিসেবে রাজা হামুরাবির প্রণয়ন করা আইনের কথা বলা যেতে পারে। এই আইন অনুযায়ী সমাজের মানুষদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল– অভিজাত শ্রেণি, সাধারণ নাগরিক ও দাস। অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা ইচ্ছামতো সব ধরনের সামাজিক সুযোগ-

সুবিধা ভোগ করতে পারত। তাদের ভোগবিলাসের পর যা বাকি থাকত তা বরাদ্দ হতো সাধারণ নাগরিকদের জন্য। দাসদের জন্য প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, উপরন্তু কোনো কিছু নিয়ে অভিযোগ করলে তাদের কপালে জুটত নির্যাতন।

১৭৭৬ সালে সব মানুষের সমতার অঙ্গীকার নিয়ে আমেরিকার যাত্রা শুরু হলেও, আমেরিকানদের সমাজের বাস্তবতা তাদের মধ্যেও একটা স্তরবিন্যাসের সূচনা করে। এ স্তরবিন্যাসের সুবিধা পায় পুরুষ আর বঞ্চিত হয় নারী। শ্রেণিবিভেদ তৈরি হয় সাদা, কালো আর আদিবাসী আমেরিকানদের মধ্যে। সাদারা উপভোগ করে স্বাধীনতার স্বাদ, আর কালোরা মানুষের মর্যাদাটুকুও পায় না। সমাজ তাদেরকে বিবেচনা করে নিচু স্তরের মানুষ হিসেবে। সে কারণে, 'সব মানুষের সমান অধিকার'– এই ধারণাটি কালোদের জন্য প্রযোজ্য হয়নি। যাঁরা আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন দাসমালিক। মানুষের সমতার এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার পরও তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ দাসদের মুক্তিও দেননি বা সেটার জন্য তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোনো অপরাধবোধও কাজ করেনি। কারণ, 'মানুষের সমান অধিকার'– এই ব্যাপারটির সঙ্গে কালো নিগ্রোদের জীবনের কোনো সম্পর্ক আছে বলেই তাঁরা মনে করতেন না।

আমেরিকান সমাজ তার প্রতিষ্ঠালগ্নে ধনী-গরিবের মধ্যে পার্থক্য দূর করার ঘোষণাও দিয়েছিল। সে সময় অধিকাংশ আমেরিকানই উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের ধনী বাবা-মায়ের ধনসম্পত্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের মালিক হতো। সে কারণে ধনী-গরিবের ভেদাভেদ নিয়ে তাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাদের কাছে অর্থনৈতিক সমতা মানে ছিল ধনী-গরিবের জন্য একই আইন বহাল রাখা। এর সঙ্গে বেকার ভাতা, সমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুবিধার যে-কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে তা তাদের কখনো মনে হয়নি। এমনকি, সে সময় 'স্বাধীনতা' শব্দটিও আজকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতো। ১৭৭৬ সালে কোনো নারী বা কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বা কোনো আদিবাসী আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হবে, এমনটা ভাবা ছিল কল্পনারও অতীত। সে সময় 'স্বাধীনতা' বলতে সাদামাটাভাবে

বোঝাত রাষ্ট্র খুব বেশি জরুরি দরকার না পড়লে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না কিংবা সেই সম্পত্তি রাষ্ট্রের ইচ্ছামতো কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। সে হিসেবে, আমেরিকান সমাজ জন্মলগ্ন থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে মানুষের স্তরবিন্যাসের ব্যাপারটি সমর্থন করে এসেছে। অনেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন মানুষে মানুষে সম্পত্তির এই যে তারতম্য– এটা স্রষ্টার ইচ্ছা, তার লীলা মাত্র। আবার অনেকে ভাবেন, অর্থনৈতিক এই বৈষম্য অনাদিকাল থেকে চলে আসা প্রকৃতির এক অপরিবর্তনীয় বিধান। তাঁদের মতে, প্রকৃতিই কিছু মানুষকে মেধাবী হিসেবে তৈরি করে, যাতে তারা অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হতে পারে। আর সেই প্রকৃতিই বাকি লোকদের তৈরি করে মেধাহীন, শ্রমবিমুখ, অলস হিসেবে, ফলে তারা ধনসম্পদ অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এ পর্যন্ত আলোচনা করা সবগুলো বৈষম্যেরই মূলে আছে মানুষের সামষ্টিক কল্পনা। সেটা স্বাধীন মানুষ ও দাসের মধ্যের বৈষম্য হোক, সাদা চামড়া ও কালো চামড়ার মধ্যকার বৈষম্য হোক কিংবা ধনী ও গরিবের বৈষম্যই হোক (নারী ও পুরুষের মধ্যের বৈষম্যের ব্যাপারটি আমরা পরে আলোচনা করব)। মানুষের ইতিহাসের এক অমোঘ নিয়ম হলো– একসময়ের সামষ্টিক কল্পনাকেই মানুষ পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক সত্য এবং অনিবার্য বলে দাবি করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, যারা মানুষ ও দাসদের মধ্যে বৈষম্যকে প্রাকৃতিক এবং সঠিক বলে মনে করত, তারা দাবি করত– দাসপ্রথা মানুষের তৈরি করা কোনো প্রথা নয়, এটা অনন্তকাল ধরে এভাবেই চলে আসছে। রাজা হামুরাবি তাঁর রাজ্যে প্রচলিত অভিজাত, সাধারণ ও দাসের শ্রেণিবিভাগকে স্রষ্টার বিধান বলে মানতেন। অ্যারিস্টটল দাবি করতেন, দাসদের জন্ম থেকেই একটা 'দাস মনোবৃত্তি' আছে, ঠিক একইভাবে স্বাধীন মানুষের জন্ম থেকেই আছে 'স্বাধীন মনোবৃত্তি'। সমাজে তাদের অবস্থান তাদের সহজাত মানবপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

একজন সাদা চামড়ার বর্ণবাদী মানুষকে বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারে জিগ্যেস করুন, তিনি নানা রকম বৈজ্ঞানিক শব্দের ধোঁয়াশায় ভরা বাহারি গল্প বলে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে, বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই নানা রকম শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি সম্ভবত বলবেন, ককেশিয়ানদের রক্তে বা জিনেই এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে তারা প্রাকৃতিকভাবেই বেশি বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ ও পরিশ্রমী। একজন গোঁড়া পুঁজিবাদী মানুষকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে সমাজে সৃষ্টি হওয়া শ্রেণিবিভাগের ব্যাপারে জিগ্যেস করুন, তিনি বলবেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সামর্থ্য, মেধার পরিমাণ ভিন্ন রকম, তাই তাদের উপার্জনের পরিমাণও ভিন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের মতে, ধনীদের ধনসম্পদ বেশি হওয়ার কারণ হলো অন্যদের থেকে তারা বেশি দক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ ও পরিশ্রমী। সুতরাং, ধনীরা যদি একটু বেশি স্বাস্থ্যসেবা পায়, ভালো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদীক্ষা বা অধিক পুষ্টিকর খাবার পায়, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যত রকম সুযোগ-সুবিধা তারা পায়, তারা সেসবের জন্য যোগ্য বলেই পায়।

হিন্দুদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র– এসব বর্ণ বা গোত্রভেদ মানে তারা বিশ্বাস করে যে, মহাজাগতিক কোনো শক্তি এক জাতকে অন্য জাত থেকে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে তৈরি করেছে। হিন্দুদের একটি জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে জানা যায়, ‘পুরুষ’ নামক একটি অনাদি সত্তা থেকে এই পৃথিবী এবং সব জীবের সৃষ্টি। এই ‘পুরুষ’-এর চোখ থেকে জন্ম নেয় সূর্য, তাঁর মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয় চাঁদের, মুখ থেকে জন্ম লাভ করে ব্রাহ্মণ (পূজারি বা সাধু), হাত থেকে সৃষ্টি হয় ক্ষত্রিয়ের (যোদ্ধা বা রাজপুরুষ), ঊরু থেকে জন্ম নেয় বৈশ্য (কৃষক ও ব্যবসায়ী) আর পা থেকে উৎপত্তি লাভ করে শূদ্র (চাকর, ডোম, মেথর প্রভৃতি)। এই ব্যাখ্যা যদি কেউ মেনে নেয়, তাহলে তার কাছে সমাজে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যটা চাঁদ আর সূর্যের মধ্যকার পার্থক্যের মতো প্রাকৃতিক বা চিরন্তন মনে হবে।[১] প্রাচীনকালে চীনদেশের অধিবাসীরা মনে করত, তাদের দেবী নু ওয়া মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তিনি

অভিজাতদের যত্ন করে গড়েছেন হলুদ রঙের মাটি দিয়ে আর সাধারণ মানুষদের গড়েছেন বাদামি রঙের কাদামাটি দিয়ে।[২]

২১। বর্ণবৈষম্যের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রসৈকতের ছবি, যেখান শুধু সাদা চামড়ার মানুষদের প্রবেশাধিকার ছিল। অথচ, গাঢ় রঙের চেয়ে হালকা চামড়ার মানুষেরই সূর্যালোকে চামড়া পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তার পরও দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রসৈকতগুলোতে এই বিভক্তির পেছনে কোনো জৈবিক কারণ ছিল না। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে অপেক্ষাকৃত কম অতিবেগুনি রশ্মিযুক্ত সৈকতগুলোই সাদা চামড়ার লোকেদের জন্য আলাদা করে রাখা ছিল।

মানুষে মানুষে বৈষম্যের এতসব গল্প প্রচলিত থাকলেও এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি, শ্রেণিভেদের এই বিষয়গুলোর সূচনা হয়েছিল মানুষের কল্পনা থেকে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আসলে কোনো পুরুষ বা ব্রহ্মের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি। বরং, এই দুই শ্রেণির বিভেদের সূচনা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার বছর আগে উত্তর ভারতের মানুষের তৈরি করা আইনকানুন ও সামাজিক রীতিনীতির সাহায্যে। অ্যারিস্টটলের ধারণাও ঠিক ছিল না, স্বাধীন মানুষ এবং দাসের মধ্যে আসলে কোনোরকম শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যই নেই। মানুষের তৈরি করা আইন ও সামাজিক পরিস্থিতি কাউকে বানিয়েছে দাস আর কাউকে বানিয়েছে তাদের প্রভু। সাদা ও কাল চামড়ার মানুষদের মধ্যে কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগত শারীরিক পার্থক্য আছে,

যেমন চামড়া বা চুলের রং। কিন্তু, এখন পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, যা প্রমাণ করে তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা বা মানবিক মূল্যবোধের ব্যাপারে কোনো রকম পার্থক্য আছে।

অধিকাংশ মানুষই দাবি করে, তাদের নিজেদের সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে তৈরি এবং ন্যায়সংগত, অন্যান্য সমাজে বিদ্যমান স্তরবিন্যাসগুলো গড়ে উঠেছে কিছু মিথ্যা নিয়ম এবং আজগুবি ধারণার ওপর ভিত্তি করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ইদানীং পশ্চিমা বিশ্বে বর্ণবৈষম্যকে উপহাস করা হয় এবং এটার বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। সাদা ও কালো চামড়ার মানুষরা এক জায়গায় বসবাস করতে না পারলে, কালোরা সাদাদের স্কুলে যেতে না পারলে, হাসপাতালে সাদা ও কালোদের সমান সুবিধা দেওয়া না হলে সেসব দেশের মানুষেরা প্রতিবাদ করে, ক্ষুব্ধ হয়। অথচ সেই পশ্চিমা বিশ্বেরই অধিকাংশ আমেরিকান ও ইউরোপীয়ানের কাছেই ধনী ও গরিবের বিভাজন বা বৈষম্যটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নৈতিক। অথচ, ধনী-গরিবের পার্থক্য থাকার অর্থই হলো ধনীরা অভিজাত এলাকায় আলাদাভাবে বিলাসবহুল জীবন যাপন করবে, তাদের সন্তানরা ধনীদের জন্য নির্মিত অভিজাত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে, তাদের জন্য থাকবে উন্নত চিকিৎসাসেবা-সংবলিত হাসপাতাল। গরিবরা এসবের কোনোটাই পাবে না, যেমনটা পায় না সাদা-কালো চামড়ার বৈষম্যের দেশে কালো চামড়ার মানুষেরা। অনেক পশ্চিমা জনগণ ধনী-গরিবের এই বৈষম্যকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক মনে করলেও আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, ধনী বা গরিব হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেধা বা যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে না। বেশিরভাগ ধনী মানুষ ধনী পরিবারে জন্মানোর কারণে ধনী, আর বেশিরভাগ গরিব মানুষ গরিব পরিবারে জন্ম নেওয়ার ফলে চিরকাল গরিবই থেকে যায়।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, অনেক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত জটিল একটি সমাজকাঠামোর টিকে থাকার জন্য এইসব কল্পিত স্তরবিন্যাস এবং নীতিহীন বৈষম্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক। অবশ্য সব সমাজের স্তরবিন্যাসের নীতিগত ভিত্তি এক নয়। কোনো কোনো সমাজের

মানুষ অন্য সমাজের মানুষদের থেকে বেশি সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এমন কোনো বড়োসড়ো মানবগোষ্ঠীর সন্ধান এখনো পাননি যেখানে মানুষদের মধ্যে কোনো স্তরবিন্যাস ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মানুষ নিজেদের মধ্যে নানা শ্রেণিবিভাজন তৈরি করে তাদের সমাজকাঠামো গড়ে তুলেছে। সেই শ্রেণিবিভেদ কখনো অভিজাত, সাধারণ আর দাসের, কখনো সাদা আর কালোর, কখনো রাজা আর প্রজার, কখনো ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের আর কখনো ধনী আর গরিবের। এই সব ধরনের শ্রেণিবিভেদ অসংখ্য মানুষের সম্পর্ক ও কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিছু লোককে আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অন্যদের থেকে বড়ো করে তুলেছে।

সমাজে এইসব শ্রেণিবিভেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এর ফলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষ সম্পর্কে এতটুকু না জেনেও তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তার সঙ্গে কীরকম আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, জর্জ বার্নার্ড শ'-এর বিখ্যাত *পিগম্যালিওন* নাটকে (পরবর্তী সময়ে এই নাটকের গল্প খানিকটা অদল-বদল করে নির্মিত হয় বিখ্যাত সিনেমা– *My Fair Lady*) হেনরি হিগিনস কোনো রকম পরিচয় ছাড়াই বুঝে গিয়েছিলেন নাটকের নায়িকা এলিজা ডুলিটলের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে। এলিজা ফুলের দোকানে কাজ করত। এলিজার কথা শুনেই হিগিনস বুঝতে পারলেন, সে সমাজের নিচু শ্রেণির একজন মেয়ে। সুতরাং, তিনি চাইলেই তাকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারবেন। ধ্বনিতাত্ত্বিক হিগিনসের বিশ্বাস ছিল, একজন সম্ভ্রান্ত নারী ও একজন সাধারণ নারীর প্রধান তফাত মুখের কথায়। এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি বাজি ধরলেন। আর বাজির গুটি হিসেবে কাজে লাগালেন এলিজাকে। তিনি এলিজাকে এত নিখুঁতভাবে ভাষা শেখানো শুরু করলেন যাতে তার কথা শুনে তাকে একজন সম্ভ্রান্ত বংশের নারী বলে মনে হয়। ফুলের দোকানে আসা এত এত মানুষের কার সঙ্গে কীভাবে কোন কথা বললে দোকানের গোলাপ বা গ্ল্যাডিওলাসগুলো বিক্রি করা যাবে, সেটা জানা এলিজার জন্য জরুরি ছিল। এত লোকজনের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে

প্রশ্ন করে তাদের পরিচয় জানা বা ফুল কেনার জন্য তারা কীরকম খরচ করতে পাওে, সে সম্পর্কে জিগ্যেস করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইজন্য সেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের লক্ষণগুলোকে কাজে লাগিয়ে ফুলের খদ্দেরদের চেনার চেষ্টা করত। দোকানে কেউ এলেই এলিজা তার পোশাক খেয়াল করত, অনুমান করার চেষ্টা করত তার বয়স এবং লক্ষ করত তার চামড়ার রং এবং প্রসাধন। এইভাবে সে আন্দাজ করতে পারত, কে অ্যাকাউন্টিং ফার্মের পার্টনার আর কে চিঠি বয়ে বেড়ানো ছোকরা। এটা তার জানা ছিল যে, প্রথমজনের দামি গোলাপ বা বেশি দামি কোনো কিছু কেনার সম্ভাবনা বেশি আর দ্বিতীয়জনের পক্ষে সস্তা ডেইজি ফুল ছাড়া অন্য কিছু কেনা সম্ভব নয়।

এতক্ষণ আমরা সমাজের মানুষের মধ্যের নানা রকম স্তরবিন্যাস সম্পর্কে জানলাম। এটাও জানলাম, মানুষের সামষ্টিক কল্পনা ও টিকে থাকার প্রয়োজনীয়তাই এসব স্তরবিন্যাস সৃষ্টির জন্য দায়ী। অবশ্যই মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্যও অনেক সময় একজন মানুষের সঙ্গে অন্যজনের পার্থক্য তৈরির ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, জন্মগত এই বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমাজে শেষমেশ কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে তা নির্ভর করে মূলত মানুষের কল্পিত সেই স্তরবিন্যাসের ওপরেই। এটা দুভাবে ঘটে থাকে। প্রথমত, মানুষের জন্মগত যে-কোনো প্রতিভার যত্ন নেওয়া, চর্চা করা এবং সেগুলোর বিকাশ সাধন প্রয়োজন। সব মানুষ সমানভাবে তার মেধার চর্চা করা ও বিকাশ সাধনের সুযোগ পায় না। একজন মানুষ তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে কি না, বা পেলে কতটুকু পাবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে কল্পিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন স্তরে তার অবস্থান, সেটার ওপর। এ প্রসঙ্গে জে কে রাউলিং এর সৃষ্ট চরিত্র হ্যারি পটারের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। হ্যারি পটারের জন্ম জাদুকর পরিবারে কিন্তু তাকে বড়ো হতে হয় জাদুর সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ না থাকা সাধারণ একটি পরিবারে। যখন সে প্রথমবার জাদুর স্কুল হগওয়ার্টে আসে, তখন তার জাদু-সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান বা যোগ্যতাই ছিল না। জাদুর ব্যাপারে তার জন্মগত

ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও তার ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ আনতে তাকে যা যা করতে হয়েছিল তারই বর্ণনা আছে সাতটা বই জুড়ে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক স্তরবিন্যাসের দুটো ভিন্ন স্তরে বসবাসকারী মানুষ একইরকম যোগ্যতা বা গুণাবলির অধিকারী হলেও তারা দুজনেই সমান সফলতার অধিকারী হবে– এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, সে ক্ষেত্রে দুজন সমান যোগ্যতার খেলোয়াড়কে মাঠে আলাদা আলাদা নিয়মে খেলতে হবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শাসনকালে একজন কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, একজন ক্যাথলিক আইরিশ এবং প্রটেস্ট্যান্ট ইংরেজ যদি একইরকম ব্যাবসায়িক দক্ষতার অধিকারী হতো, তার পরেও তাদের সমান ধনী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কারণ, টাকাপয়সার এই খেলায় কারচুপি হতো প্রচুর, আর তার সুযোগ করে দিত আইনগত বাধ্যবাধকতা আর বিধিনিষেধের অদৃশ্য দেওয়াল।

দুষ্ট চক্র

এখন আমরা জানি, একই রকম না হলেও সব সমাজেই স্তরবিন্যাস বিদ্যমান। কিন্তু বিভিন্ন সমাজের স্তরবিন্যাসের মধ্যে এই যে পার্থক্য, তার কারণ কী? কেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজ শ্রেণি বা বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে মানুষের স্তরবিন্যাস তৈরি করল, অটোমানরা তৈরি করল ধর্মের ভিত্তিতে আর আমেরিকানরা চামড়ার রঙের ভিত্তিতে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসব স্তরবিন্যাসের সূচনা হয়েছিল কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের ফলাফল হিসেবে। তারপর, বছরের পর বছর ধরে সংশোধন আর পরিমার্জনের মাধ্যমে একসময় সেইসব স্তরবিন্যাসগুলো চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অনেক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, প্রায় ৩ হাজার বছর আগে যখন ইন্দো-আর্য সম্প্রদায় ভারতীয় উপমহাদেশ অধিকার করে স্থানীয় লোকজনের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে, সে সময়েই প্রথম হিন্দুদের বর্ণ বা শ্রেণিপ্রথা বিকাশ লাভ করে। বিজয়ী ইন্দো-আর্যরা তাদের প্রয়োজনেই বৈষম্যনির্ভর একটি সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি করে। স্বাভাবিকভাবেই এই স্তরবিন্যাসের সবচেয়ে ওপরে স্থান ছিল তাদের নিজেদের (যোদ্ধা ও

পুরোহিতদের)। অন্যদিকে স্থানীয় জনগণকে কৃষক বা দাস হিসেবে বসবাস করতে হতো। রাজ্যবিজেতারা সংখ্যায় ছিল অল্প, তাই তারা সব সময়ই সমাজে তাদের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক অবস্থান হারানোর ভয়ে থাকত। এই ভয় থেকে বাঁচার জন্য তারা সমস্ত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করে ফেলল। প্রত্যেক বর্ণের মানুষের জন্য নির্ধারিত করা হলো নির্দিষ্ট কিছু পেশা এবং প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করা হলো নানা রকম সামাজিক অবস্থান। এর ফলে প্রত্যেক বর্ণের মানুষের একটি আইনানুগ পরিচিতি তৈরি হলো, তৈরি হলো বর্ণ অনুযায়ী তার সামাজিক অবস্থান এবং নির্ধারিত হলো সমাজের জন্য তার দায়িত্ব-কর্তব্য। দুটি ভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা, বিয়ে, এমনকি একপাতে খাওয়াদাওয়া করাও নিষিদ্ধ করা হলো। সবাইকে একটি সামাজিক অবস্থান দেওয়ার ফলে দূর হলো স্থানীয় জনগণের দ্বারা বিদ্রোহের সম্ভাবনা। এই স্তরবিন্যাস শুধু যে আইন দ্বারা সিদ্ধ হলো তা-ই নয়, একসময় এসব ধর্মীয় পুরাণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হলো।

পরবর্তীকালে শাসকেরা এই শ্রেণি বা বর্ণপ্রথাকে ইতিহাসের একটি অধ্যায় হিসেবে ব্যাখ্যা না করে অনন্তকাল ধরে চলে আসা এক মহাজাগতিক সত্য বলে দাবি করতে থাকলেন। শুদ্ধ ও অশুদ্ধের ধারণাটি প্রথম থেকেই হিন্দু ধর্মের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল এবং দিনের পর দিন এই শুদ্ধ-অশুদ্ধ, শৌচ-অশৌচের ধারণাগুলোকে যত্ন করে লালন করা হয়েছে। সামাজিক নানা আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে যাতে শ্রেণি বা বর্ণপ্রথা নামক সামাজিক বৈষম্যের এই কাঠামোটা আরো শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। যাতে আরো সার্থকভাবে একে অনন্তকাল ধরে চলে আসা কোনো ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যরূপে মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়। ধার্মিক হিন্দুদের শেখানো হতে থাকে, ভিন্ন বর্ণ বা গোত্রের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলে তা যে কেবল একজন ব্যক্তির শুদ্ধতা বা শুচিতা নষ্ট করে তাই নয়, তা সমাজের পবিত্রতাও নষ্ট করে। আর সেই কারণেই ভিন্ন বর্ণের মানুষের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে যত দূরে থাকা যায়, সমাজের জন্য ততই মঙ্গল। তবে শুদ্ধ-অশুদ্ধ, বিশুদ্ধ-

দূষিত– এসব ধারণা যে কেবল হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত, এমনটা নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে, প্রায় সব সমাজেই, সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণিবিভেদ তৈরি করার কাজে বিশুদ্ধতা, দূষণের এই ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের শাসকশ্রেণি তাদের নিজেদের কর্তৃত্ব ও আভিজাত্য বজায় রাখায় জন্য নানাভাবে এই ধারণাগুলো ব্যবহার করেছেন। তবে মানুষের মধ্যে এই দূষিত হওয়ার ভয়ের ধারণা তৈরির জন্য কেবল শাসক ও ধর্মযাজকরাই দায়ী নয়। সম্ভবত, এর শেকড় ছড়ানো আছে আরো গভীরে, মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার কৌশলগুলোর মধ্যে। এই স্বভাবজাত প্রবণতাগুলো মানুষকে সম্ভাব্য রোগজীবাণু বহনকারী জীব, অসুস্থ মানুষ বা মৃতদেহ থেকে দূরে থাকবার তাগিদ দেয়। এই স্বভাবজাত প্রবণতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আপনি যদি নারী, ইহুদি, রোমান, সমকামী, কৃষ্ণাঙ্গ এসব শ্রেণিবিভেদ তৈরি করে সমাজের অন্য সবার থেকে এদের আলাদা রাখতে চান, সেটা করার সেরা উপায় হলো সবাইকে বোঝানো যে এরা অস্পৃশ্য, নোংরা এবং অপবিত্রতার উৎস।

হিন্দুদের বর্ণপ্রথা এবং এর সঙ্গে জড়িত অনেক আচার-অনুষ্ঠান ভারতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এমনকি অনেকদিন পর যখন মানুষ ইন্দো-আর্যদের ভারত দখলের কাহিনিও ভুলে গেল, বর্ণপ্রথা তখনো টিকে থাকল বীরদর্পে। হিন্দুরা সাধ্যমতো চেষ্টা করল ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে নিজেদের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে। তবে বর্ণপ্রথা অপরিবর্তনীয় কিছু ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, একেকটি বর্ণ আবার কতগুলো দল-উপদলে বিভক্ত হতে শুরু করল। কালক্রমে চারটি প্রধান বর্ণ বিভক্ত হলো প্রায় ৩ হাজারটি 'জাতি'তে (খেয়াল করুন, আক্ষরিক অর্থেই ব্যাপারটাকে 'জন্মের' সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেওয়া হলো)। কিন্তু, এতগুলো বর্ণ এবং জাতি তৈরি হওয়ার পরেও বর্ণপ্রথার মূল নিয়ম কিন্তু একই থাকল, তা হলো প্রত্যেক মানুষ জন্ম থেকেই একটি বর্ণ বা গোত্রের সদস্য হবে। এক বর্ণ বা গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে অন্য বর্ণ বা গোষ্ঠীর লোকজনের ছোঁয়াছুঁয়ি হলে বা তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ পুরো সমাজকে দূষিত করবে। একজন ব্যক্তির

‘জাতি’ নির্ধারণ করে সে কোন কোন পেশার জন্য উপযুক্ত, তার কী ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, কোন এলাকায় বসবাস করা উচিত এবং কোন ধরনের মানুষকে তার জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করা উচিত। আর অবধারিতভাবেই নিজ বর্ণের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার ফলে তাদের সন্তানেরা জন্মসূত্রেই সমাজের একই স্তরে স্থান পাবে।

যখনই সমাজে নতুন কোনো পেশা বিকাশ লাভ করত বা সমাজে নতুন ধরনের একদল লোকের উদ্ভব হতো, হিন্দু সমাজে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান লাভ করার জন্য তাদেরকে একটি নতুন ‘জাতি’ গঠন করতে হতো। কোনো দল বা কিছু মানুষ যদি ‘জাতি’ হিসেবে সমাজের কাছে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হতো, তাহলে তাদেরকে আক্ষরিক অর্থেই ‘জাতচ্যুত’, ‘অচ্ছুৎ’ বা ‘অস্পৃশ্য’ হিসেবে ঘোষণা করা হতো এবং তাদের অবস্থান হতো সমাজের সব জাতির নিচে। সমাজের আর সব জাতির সঙ্গে তাদের ওঠা-বসা বা সামাজিক কার্যকলাপ হতো নিষিদ্ধ। তাদেরকে কার্যত একঘরে হয়ে সমাজের অন্য লোকজন থেকে দূরে অপমানজনক ও বিরক্তিকর জীবন যাপন বেছে নিতে হতো। তারা হয়তো টোকাইয়ের মতো আবর্জনার স্তূপ থেকে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনকি সমাজের সবচেয়ে নিচু জাতির মানুষও তাদের সঙ্গে মিশতে, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতে বা ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে দূরে থাকত, বিয়ে-শাদি তো অনেক দূরের ব্যাপার। আধুনিককালে ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার বর্ণপ্রথার নামে মানুষের মধ্যের এই শ্রেণিভেদ দূর করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মিশ্রণে বা বিয়ে-শাদিতে যে আসলে সমাজের কোনো দূষণ হয় না, এটা সবাইকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও আধুনিক ভারতে বিয়ে এবং পেশার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই এই বর্ণপ্রথার প্রভাব এখনো লক্ষ করা যায়।[৩]

আমেরিকায় জাতপাত

ভারতীয়দের মতো আধুনিক আমেরিকানদের মধ্যেও বর্ণবৈষম্যের এই দুষ্টচক্র অনেক কাল ধরে চলে আসছে। আমেরিকার কয়লাখনি

এবং খেতখামারে কাজ করার জন্য ইউরোপের বিজেতাগণ ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লাখ লাখ আফ্রিকান মানুষকে দাস হিসেবে আমেরিকায় আমদানি করে। নানা রকম পরিস্থিতিগত কারণে তারা দাস আমদানির ক্ষেত্রে ইউরোপ বা পূর্ব এশিয়ার দিকে নজর না দিয়ে আফ্রিকার দিকে নজর দিয়েছিল। প্রথমত, ভৌগোলিকভাবে আফ্রিকা ছিল নিকটবর্তী, তাই ভিয়েতনাম থেকে দাস আমদানি করার চেয়ে সেনেগাল থেকে আমদানি করা ছিল ব্যয়সাশ্রয়ী।

দ্বিতীয়ত, যখন আমেরিকানরা দাস আমদানির কথা ভাবা শুরু করল তখন আফ্রিকায় দাস-ব্যবসায়ের বাজার ছিল রমরমা। আফ্রিকা থেকে দাসদের রপ্তানি করা হতো মধ্যপ্রাচ্যে। অন্যদিকে ইউরোপে তখনো দাস-ব্যবসায় সেভাবে শুরু হয়নি। ইউরোপে নতুন করে দাস-ব্যবসায়ের বাজার তৈরি করার চেয়ে আফ্রিকার চালু বাজার থেকে দাস কেনা আমেরিকানদের জন্য অনেক বেশি সহজসাধ্য ছিল।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো– সেসময় আমেরিকানদের প্রধান উপনিবেশগুলোতে ভার্জিনিয়া, হাইতি ও ব্রাজিলের মতো ম্যালেরিয়া এবং হলুদ জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল খুব বেশি। এই রোগগুলোর উৎপত্তিস্থল ছিল আফ্রিকা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আফ্রিকানদের মধ্যে জিনগতভাবেই এসব রোগের বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে এরকম কোনো প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় এসব রোগে তাদের নাকাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। সংগত কারণেই, একজন মালিকের পক্ষে সহজেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত ইউরোপীয় দাসের পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করার চেয়ে রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতাসম্পন্ন আফ্রিকান দাসের পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করা বেশি লাভজনক ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, একটা উলটো ঘটনা ঘটল। জিনগত উন্নতি (রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতার বিবেচনায়) পরিণত হলো সামাজিক অবহেলায়! আফ্রিকানরা ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে টিকে থাকার ব্যাপারে ইউরোপীয়দের থেকে বেশি দক্ষ ছিল, আর এই কারণেই তারা একসময় ইউরোপীয়ান

প্রভুদের দাসে পরিণত হয়। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার সমাজে দুই স্তরের স্তরবিন্যাস প্রকট হয়ে পড়ে, একদল সাদা চামড়ার ইউরোপীয়ান শাসকশ্রেণি আর একদল অবহেলিত কালো চামড়ার আফ্রিকান।

কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক লাভক্ষতির কথা চিন্তা করে আফ্রিকার মানুষজনকে দাস বানানো হয়েছিল, এ কথা স্বীকার করে নেওয়া মালিকদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। আর, ভারতবর্ষের আর্যদের মতোই কেবল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আমেরিকায় বসবাসরত সাদা চামড়ার ইউরোপীয়ানদেরও পুরোপুরি তৃপ্ত করতে পারেনি। সমাজের অন্যান্য জাতগোষ্ঠীর কাছে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ করে তোলা তথা নিজেদেরকে জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হিসেবে অন্যের কাছে তুলে ধরাও তাদের একটা অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাদের এই লক্ষ্য পূরণে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে ধর্মীয় উপকথা এবং বিজ্ঞান দিয়ে মোড়ানো কল্পকাহিনিগুলো। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকারীরা সাদা-কালোর বৈষম্যের ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে– আফ্রিকানদের আদি পিতা হলেন হ্যাম। এই হ্যাম নূহের পুত্র। নূহ তার পুত্র হ্যামকে এই বলে অভিশাপ দেন যে, ভবিষ্যতে তার উত্তরসূরিরা সবাই দাস হয়ে জন্ম নেবে। জীববিজ্ঞানীরা দাবি করলেন– কালোরা সাদাদের থেকে কম বুদ্ধিমান এবং মানবিকতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের ধারণাও সাদাদের থেকে কম। চিকিৎসকরা যুক্তিহীন গল্প ফাঁদলেন– কালোরা ময়লা, আবর্জনার মধ্যে বসবাস করে এবং তারাই নানা রকম রোগব্যাধি ছড়ানোর জন্য দায়ী; এক কথায়, কালোরা দূষণের একটি উৎস।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাদা-কালোর বিভেদের এইসব গল্পগাথা, উপকথাগুলো পশ্চিমা সংস্কৃতির শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আমেরিকান সংস্কৃতির মধ্যে, দেখতে পাই কমবেশি সব পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যেই। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আইন করে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং আটলান্টিক সমুদ্রে সব রকম দাস-ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পরবর্তী কয়েক দশকে আমেরিকার প্রায় সব উপমহাদেশেই দাসপ্রথা একে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে থাকে। লক্ষণীয় বিষয়

হলো, এটিই ছিল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র দাস-মালিকদের নিজস্ব উদ্যোগে দাসপ্রথা বন্ধ হওয়ার ঘটনা। কিন্তু দাসদের মুক্ত করা হলেও দাসপ্রথাকে সমাজে যুক্তিসংগত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজে যে গল্প, উপকথা, মতামত চালু হয়েছিল সেগুলো একরকম বহাল তবিয়তেই টিকে থাকল। সমাজে বর্ণবৈষম্যমূলক নানা আইন ও সামাজিক প্রথার মাধ্যমে ভিন্ন বর্ণের মানুষকে আলাদা আলাদা করে রাখা হলো।

আর এই ভিন্ন বর্ণের মানুষকে আলাদা আলাদা করে রাখার ফলেই সূচনা হলো বৈষম্যের অন্তহীন এক দুষ্টচক্রের। উদাহরণ হিসেবে গৃহযুদ্ধোত্তর দক্ষিণ আমেরিকার কথাই ধরা যাক। ১৮৬৫ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে আমেরিকার সংবিধানে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। চতুর্দশ সংশোধনীতে বলা হয়, নাগরিকত্ব এবং আইনগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যকে কখনো বিবেচনায় আনা হবে না। কিন্তু, ততদিনে ২০০ বছর ধরে চলে আসা দাসপ্রথার কারণে বেশিরভাগ কালো চামড়ার মানুষ হয়ে পড়েছে সাদাদের চেয়ে দরিদ্র এবং সাদাদের চেয়ে কম শিক্ষিত। সে কারণে ১৮৬৫ সালে আলাবামায় জন্ম নেওয়া একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের শিক্ষার সুযোগ লাভ বা ভালো চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের চেয়ে অনেকটাই কম ছিল। ফলে ১৮৮০ সাল ও ১৮৯০ সালে জন্ম নেওয়া তার সন্তানেরা সেই একই সামাজিক বৈষম্য নিয়েই জীবন শুরু করেছে। কারণ, তাদেরও জন্ম হয়েছে একটি অশিক্ষিত, দরিদ্র পরিবারে! পুরো ব্যাপারটা অনেকটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মতোই।

কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যই যে সাদা আর কালোদের আলাদা করে রেখেছিল এমন নয়। আলাবামায় তখন সাদা চামড়ার অনেক গরিব লোকও বাস করত, গরিব হওয়ার কারণে তাদের অনেক জ্ঞাতিভাই সাদা চামড়ার ধনী মানুষদের সমান সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। অর্থাৎ, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল কালো চামড়ার মানুষজনের মতোই। কিন্তু, সাদা চামড়ার মানুষ হওয়ার কারণে তারা কালোদের সঙ্গে একধরনের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলত। শিল্পবিপ্লবের পর নানা দেশের, নানা বর্ণ-গোত্রের

মানুষ আমেরিকায় বসতি স্থানান্তর করতে শুরু করে। আমেরিকান সমাজে ও অর্থনীতিতে গতিশীলতার সূচনা হয়। যে-কোনো বর্ণ বা গোত্রের লোক, ধনী বা গরিব মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল বা সম্পৎশালী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু, এসবের পরেও সমাজে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে স্তরবিন্যাসের ব্যাপারটি থেকেই যায়। যদি কেবল অর্থনৈতিক কারণই এই বৈষম্যের জন্য দায়ী হতো, তাহলে আমেরিকান সমাজে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যের এই বিভেদ টিকে থাকার কথা নায় আর কোনোভাবে হোক-না-হোক কেবল সাদা-কালো চামড়ার মানুষের মধ্যে বিয়ে-শাদির মাধ্যমেই এই বিভেদ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। ১৮৬৫ সালের মধ্যেই, সাদারা তো বটেই এমনকি কালোদের অনেকেই নিজে থেকেই একরকম স্বীকার করে নেন যে, জন্মগতভাবেই কালোরা সাদাদের থেকে একটু কম বুদ্ধিমান, বেশি সহিংস, যৌনতার ব্যাপারে অধিকতর স্বেচ্ছাচারী, অলস এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কম মনোযোগী। এসব কারণে তারা নৃশংসতা, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ এবং রোগব্যাধির বাহক হিসেবে কাজ করে। এক কথায়, তারা সমাজের সব রকম দূষণের উৎস। ১৮৯৫ সালে আলাবামার একজন কালো চামড়ার মানুষ যথাযথ শিক্ষা লাভ করে ব্যাংকের একটি সম্মানজনক পদে চাকরির জন্য আবেদন করলে তাকে চাকরি পাওয়ার জন্য একজন সাদা চামড়ার চাকরিপ্রার্থীর তুলনায় অনেক বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হতো। কালোরা অবিশ্বস্ত, অলস, কম বুদ্ধিমান– কালোদের নিয়ে সমাজে প্রচলিত এই সাধারণ ধারণাগুলোই এইসব প্রতিকূলতা তৈরিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করত।

আপনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই এ কথা ভাবতে শুরু করেছেন যে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কালো চামড়ার মানুষদের নিয়ে প্রচলিত এই ধারণাগুলো যে ভুল, সবাই সেটা একদিন বুঝতে পারবে। কালো চামড়ার মানুষগুলোও তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে পারবে যে, তারাও সাদাদের সমান দক্ষ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু, বাস্তবে এর উলটোটা ঘটেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাদা কালোর তফাত নিয়ে এইসব ধারণা, এইসব কাহিনি আরো গভীরভাবে মানুষের মনস্তত্ত্বে জায়গা দখল করে নিয়েছে। যেহেতু সব চাকরির সব বড়ো বড়ো পদ সাদাদের দখলে, মানুষ ভাবতে শুরু করেছে কালো চামড়ার মানুষদের যোগ্যতা আসলেই কম। একজন সাদা চামড়ার মানুষের খুব প্রচলিত যুক্তিটি এরকম– 'বাস্তব দুনিয়ার দিকে তাকান। কালোরা কয়েক প্রজন্ম আগে মুক্তি পেয়েছে দাসপ্রথা থেকে, লাভ করেছে স্বাধীনতা। কিন্তু, এতদিনেও সমাজে কালো চামড়ার প্রফেসর, আইনজীবী, ডাক্তার, ব্যাংকের বড়ো কর্মকর্তা প্রায় নাই বললেই চলে। কালো চামড়ার মানুষগুলো যে আসলেই বিদ্যাবুদ্ধিতে খাটো এবং একেবারেই অলস প্রকৃতির এটা প্রমাণের জন্য এই সময়টা কি যথেষ্ট নয়?' দিনের পর দিন কালো চামড়ার মানুষরা আটকে গেছে এই দুষ্টচক্রে। যেহেতু সমাজ কালো চামড়ার মানুষদের কম বুদ্ধিমান, অলস, অকর্মণ্য ভাবে, সে কারণে সাধারণত তাদের বড়ো বড়ো চাকরিবাকরিতে সুযোগ দেওয়া হয় না। আবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে যেহেতু সবাই দেখে বড়ো বড়ো পদে সব সাদা চামড়ার মানুষ, তাদের মনে এই কথা আরো স্থায়ী আসন গেড়ে বসে যে, কালোরা আসলেই অকর্মণ্য, অলস, দূষণের উৎস!

এখানেই এই দুষ্টচক্রের শেষ নয়। সমাজে কালোদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার পাহাড় জমতে জমতে একসময় তা জন্ম দিয়েছে বর্ণবাদী সামাজিক আইনের। এইসব আইনকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে 'জিম ক্রো আইন' (Jim Crow Law) বলেও ডাকা হয়। এইসব সামাজিক আইন ও রীতিনীতি গড়ে ওঠে বর্ণগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে! কালোদের নির্বাচনে ভোট দেওয়া বারণ, সাদাদের স্কুলে পড়া বারণ, সাদাদের রেস্টুরেন্টে খাওয়া বারণ, সাদাদের হোটেলে রাত্রিযাপন বারণ। এতসব বিধিনিষেধের পেছনে সাদাদের যুক্তি একটাই– কালোরা নোংরা, অলস, দুশ্চরিত্র, বোকার হদ্দ, আঁটকুড়ে এবং অভিশপ্ত। সুতরাং, সাদা চামড়ার মানুষদেরকে কালোদের থেকে আগলে রাখা উচিত, দূরে রাখা উচিত। সাদারা কালোদের সঙ্গে এক রেস্তোরাঁয় খেতে চাইত না বা এক হোটেলে রাত্রি যাপন করতে চাইত না, পাছে কালোদের থেকে

তাদের মধ্যে রোগবালাই ঢুকে পড়ে। অসৎ সঙ্গ এবং সহিংসতার ভয়ে সাদারা চাইত না তাদের কোনো সন্তান কালোদের স্কুলে পড়াশোনা করুক। কালোরা যেহেতু অজ্ঞ এবং তাদের মধ্যে ন্যায়নীতির বালাই নেই, সাদারা চাইত না কালোরা নির্বাচনে অংশ নিক। বিজ্ঞান কালোদের সম্পর্কে এইসব ভীতিকর ধ্যানধারণার ভিত পোক্ত করেছিল এবং প্রমাণ করেছিল কালোরা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান। তাদের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং তাদের মধ্যে নানা রকম অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে (এই গবেষণাগুলো একটা বিষয় আমলে আনেনি, সেটা হলো গবেষণায় দেখানো সংখ্যাগুলো কালোদের প্রতি সাদাদের দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক আচরণের পরিণতি মাত্র)।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এককালের যৌথ, কনফেডারেট রাষ্ট্রগুলোতে বর্ণবাদের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া বৈষম্যগুলো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের অংশ হয়ে পড়লে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ১৯৫৮ সালে ক্লেনন কিং (Clennon King) নামের একজন কালো চামড়ার মানুষকে মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার জন্য জোরপূর্বক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। আদালত এই রায় দেয় যে, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের কালো চামড়ার মানুষের পক্ষে মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার কথা কল্পনা করাই সম্ভব নয়। সুতরাং, আসামি অবশ্যই মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং মানসিক হাসপাতালই তার আসল ঠিকানা হওয়া উচিত।
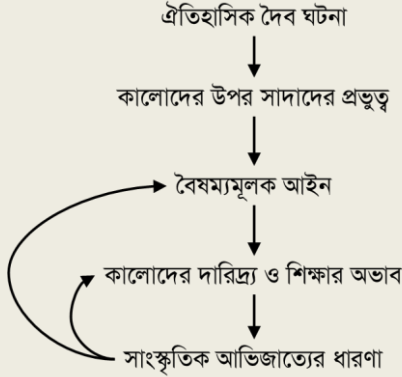
দুষ্টচক্র : যেভাবে একটি দৈব ঐতিহাসিক ঘটনা একটি রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার জন্ম দিল

এইসময়, দক্ষিণে বসবাসরত আমেরিকানদের কাছে, এমনকি উত্তর আমেরিকার অনেকের কাছেও কালো চামড়ার ছেলেদের সঙ্গে সাদা চামড়ার মেয়ের বিয়ে বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন ছিল সবচেয়ে গর্হিত কাজ। সাদা ও কালো মানুষদের মধ্যে যে-কোনো ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি ছিল সবচেয়ে নিষিদ্ধ কাজ, যে-কেউ এই কাজ করলে বা কারো মধ্যে এরকম কিছু করার সম্ভাবনা দেখা দিলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো। সাদাদের একটি গোপন উগ্রবাদী সংগঠন কু ক্লাক্স ক্ল্যান (Ku Klux Klan) এরকম অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। এদের নৃশংসতার কাছে হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথা লঙ্ঘনের শাস্তি রীতিমতো নগণ্য।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ণবাদ সংস্কৃতির নানা স্তরে আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সাদাদের সৌন্দর্যের আদর্শই আমেরিকানদের চোখে আদর্শ সৌন্দর্যের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। সাদাদের দেহ-বৈশিষ্ট্য, যেমন– সাদা চামড়া, সোনালি সোজা চুল, একটু ওপরের দিকে বাঁকানো নাক– এগুলোকেই সুন্দর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হতে থাকে। অন্যদিকে কালো চামড়া, কোঁকড়া চুল, ভোঁতা নাকের মতো কালোদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে কুৎসিত

হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হতে থাকে। বর্ণবৈষম্যকে ভিত্তি করে সৌন্দর্যের মতো এরকম সর্বজনীন বিষয়ের ধারণা বিকশিত হওয়ার ফলে নিজের অজান্তেই বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস আমাদের চেতনার আরো গভীরে গিয়ে শিকড় বিস্তার করে।

সাদা-কালো চামড়ার বৈষম্যের মতো স্তরবিন্যাসের দুষ্টচক্রগুলো চলতে পারে শতাব্দীর পর শতাব্দী, কোনো কোনো দুষ্টচক্রের প্রভাব টিকে থাকে হাজার হাজার বছর। অথচ এসবের সূচনা হয় সাধারণত ইতিহাসে ঘটে যাওয়া আকস্মিক কোনো ঘটনা, কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা তাৎক্ষণিক কোনো প্রয়োজন থেকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই ধরনের অন্যায্য বৈষম্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, গভীরভাবে গেঁথে যায় একটি সমাজের সংস্কৃতিতে। টাকায় টাকা আনে, দারিদ্র্য আনে আরো বেশি দরিদ্রতা, শিক্ষা পথ দেখায় অধিকতর উন্নত শিক্ষার, আর অজ্ঞতা থেকে বাড়ে অজ্ঞতা। একইভাবে, যেসব সমাজ ঘটনাক্রমে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণের সংস্কৃতির শিকার হয়, তাদের আবারও একই বা ভিন্ন রকম বৈষম্যমূলক অবস্থার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মজার ব্যাপার হলো, ঠিক একই নিয়মে যেসব সমাজ একবার অন্যদের থেকে বেশি মর্যাদার তকমা পায়, তাদের সম্ভাবনা থাকে আবারও সেইরকম তকমা বা মর্যাদাপূর্ণ আসন পাওয়ার!

বেশিরভাগ সামাজিক বা রাজনৈতিক স্তরবিন্যাসের মূলেই কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি বা কোনো অনিবার্য জৈবিক কারণ কাজ করে না। সেগুলোর ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকস্মিক ঘটনা, আকস্মিক প্রয়োজন এবং সেটাকে যুক্তিসংগত বা প্রাকৃতিক বলে আখ্যা দেওয়া কোনো মিথ বা লোকগাথা। সে কারণেই ইতিহাস জানা দরকারি। যদি সাদা ও কালোর কিংবা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যকার স্তরবিন্যাস কেবলই জৈবিক কোনো ব্যাপার হতো, তাহলে জীববিজ্ঞানই মানবসমাজকে বোঝার জন্য যথেষ্ট হতো। যেহেতু মানুষের সঙ্গে মানুষের জৈবিক পার্থক্যটুকু খুবই নগণ্য, সে কারণে জীববিজ্ঞানের একার পক্ষে ভারত উপমহাদেশের বর্ণপ্রথা বা আমেরিকার সাদা-কালোর মধ্যকার স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা এসব শ্রেণিবিন্যাস বা বৈষম্য জানতে পারি ওই

সময়কার ঘটনা অধ্যয়ন করে এবং তৎকালীন সময়ের ক্ষমতার মালিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করে। এসবই সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোনো ঘটনা, আকস্মিক অবস্থা বা কল্পনাকেও দিতে পারে বিশালাকার, নির্মম কোনো আকার-আকৃতি। আর অপ্রিয় সত্যটা হলো এইরকম নির্মম আকার-আকৃতির একটি কাঠামোকেই আমরা 'সামাজিক কাঠামো' বলে অভিহিত করে থাকি।

নারী ও পুরুষ

একেকটা সমাজ একেক রকমের কাল্পনিক বাস্তবতা তৈরি বা গ্রহণ করে। যেমন, গায়ের রং আমেরিকানদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মধ্যযুগের মুসলমানদের কাছে মোটেই তেমনটা ছিল না। বর্ণপ্রথা মুধ্যযুগের ভারতে জীবন-মরণের একটা ব্যাপার ছিল অথচ আধুনিক ইউরোপে এর অস্তিত্বই নেই। কিন্তু এমন একটা শ্রেণিবিভাগ আছে, যেটা সব সমাজেই সমানভাবে বিরাজমান। সেটা হলো লিঙ্গবৈষম্য। সমস্ত জায়গায়ই মানুষ নিজেদেরকে পুরুষ আর স্ত্রীতে বিভক্ত করে ফেলেছে। আর আশ্চর্যজনকভাবে সব ক্ষেত্রেই পুরুষেরাই অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়ে এসেছে। অন্তত কৃষিবিপ্লবের পর থেকে তো বটেই।

ইতিহাসের একদম প্রথম দিককার চীনা লিপিগুলো পাওয়া যায় কচ্ছপের খোলের ওপর খোদাই করা ওরাকলে (Oracle Bones), যেগুলো প্রায় ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সময়কার। এইসব লিপিতে ভবিষ্যতের কথা লেখা থাকত। এরকম একটা খোলে লেখা ছিল : 'লেডি হাওয়ের সন্তানভাগ্য কেমন হবে?' ওই খোলে এই উত্তরও লেখা ছিল : 'যদি বাচ্চাটি জন্মে "ডিং ডে"তে (Ding Day) তাহলে সব ঠিকঠাক থাকবে, আর যদি "গেং ডে"তে (Geng Day) জন্মায়, তাহলে তো খুবই ভালো'। যাই হোক, লেডি হাওয়ের সন্তান প্রসব করার কথা ছিল 'জিয়াইন ডে'তে (Jiayin Day)। সেই লিপির শেষটা খুব বেদনাদায়ক সুরে লেখা ছিল : 'তিন সপ্তাহ এক দিন পর, জিয়াইন ডে'তে নবজাতকের আগমন হলো। ভাগ্য খারাপ– কন্যাসন্তান'। এই ঘটনার প্রায় ৩ হাজার বছর পরও যখন চীনের

সমাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বড়োজোর একটি শিশু নেওয়ার আইন পাশ করল, তখনো চীনা পরিবারগুলো কন্যাশিশু জন্মানোকে একটা খারাপ ভাগ্য বলেই মনে করত। পিতা-মাতারা প্রায়ই কন্যাশিশুকে ত্যাজ্য করত কিংবা হত্যা করত, যাতে তারা ছেলে শিশু নেওয়ার জন্য আরেকটি সুযোগ পায়।

অনেক সমাজেই নারী হলো পুরুষের সম্পত্তির অংশ, বিশেষ করে বলতে গেলে বাবা, স্বামী কিংবা ভাইয়ের সম্পত্তির অংশ। এমনকি অনেক আইনি ব্যবস্থায় ধর্ষণকে সম্পদের ওপর অনধিকার হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার মানে হলো অপরাধের শিকার সেই নারী নয়, যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বরং সেই পুরুষ যে ওই নারীর মালিক। এই কারণেই ওইসব আইনি ব্যবস্থায় এই অপরাধের শাস্তি ছিল আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর। মানে, অপরাধী বা ধর্ষক ওই নারীর পিতা বা ভাইকে জরিমানাস্বরূপ কিছু অর্থ দেবে, যার ফলে ওই নারীর কিংবা 'নারী-সম্পত্তির' মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যাবে অপরাধীর কাছে। বাইবেলের হুকুম : 'যদি কোনো পুরুষ কোনো অবিবাহিত কুমারী নারীর সম্মুখীন হয় এবং জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে এবং সেটা প্রমাণিত হয়, তাহলে পুরুষটি ওই নারীর পিতাকে ৫০টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে ওই নারীকে বিবাহ করতে বাধ্য থাকবে। ওই নারীই হবে তার স্ত্রী (Deuteronomy 22:28–9)'। প্রাচীন হিব্রুরাও এটাকে একটা যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা বলেই মনে করত।

আর যে নারী কোনো পুরুষের অধীনস্থ নয়, তাকে ধর্ষণ করা কোনো রকম অন্যায় বলেই মনে করা হতো না। ঠিক যেমন ব্যস্ত রাস্তায় পড়ে থাকা মুদ্রা পকেটে ভরে ফেলাটা চুরি নয়। এ ছাড়া, একজন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ধর্ষণ কও, সেটাকেও কোনোভাবেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো না। এমনকি একজন স্বামী যে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে পারে– এই ধারণাটাই অবান্তর ছিল। স্বামী হওয়া মানেই হলো তার স্ত্রীর যৌনতার ওপর সম্পূর্ণ অধিকার। তাই 'একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে' এই কথাটা 'নিজের মানিব্যাগ নিজেই চুরি করার' মতোই একদম অযৌক্তিক শোনাত। এরকম চিন্তা শুধু প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এমনটা ভাবার

কোনো কারণ নেই। সর্বশেষ যে খবর নেওয়া হয়েছে তাতে এই ২০০৬ সাল পর্যন্তও পৃথিবীতে প্রায় ৫৩টা দেশ আছে যেখানে স্ত্রীকে ধর্ষণের দায়ে স্বামীর বিচারের কোনো বিধান নেই। এমনকি আধুনিক জার্মানিতেও ধর্ষণ আইনটি বদলে বিবাহভুক্ত ধর্ষণকে অপরাধের কাতারে ফেলা হয়েছে অল্প ক-বছর আগে, ১৯৯৭ সালে![৫]

পুরুষ আর নারীর এই বিভাজন কি ভারতের বর্ণপ্রথা কিংবা আমেরিকার বর্ণবাদের মতোই মানুষের কল্পনাশক্তির একটা দুঃখজনক প্রয়োগ? নাকি এটা নেহাতই একটা প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভেদ, যার পেছনে কোনো গভীর জীববৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে? আর যদি এটা প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাগই হয়ে থাকে, তাহলেও এই পুরুষের বেশি বেশি সুবিধা ভোগের জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?

ইারী-পুরুষের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক, আইনগত আর রাজনৈতিক বৈষম্য আসলে তাদের মধ্যকার জৈবিক পার্থক্যটাকেই প্রকাশিত করে। সন্তান জন্মদান, লালন-পালন সব সময়ই নারীর কাজ, কারণ পুরুষের তো আর গর্ভাশয় নেই। এই জিনিসটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত সমাজব্যবস্থাই একটার ওপর আরেকটা সাংস্কৃতিক কিংবা কাল্পনিক তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছে, যার সঙ্গে জীববিজ্ঞানের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। পুরুষত্ব এবং নারীত্ব নিয়ে সমাজগুলো নানান রকম সংজ্ঞায়ন, কর্তব্য অর্পণ করে চলেছে, যার বেশিরভাগের সঙ্গেই জীববিজ্ঞানের ন্যূনতম সম্পর্ক অনুপস্থিত।

উদাহরণস্বরূপ, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গণতান্ত্রিক গ্রিসে, গর্ভধারণ করতে পারে, এমন একজন মানুষের কোনো স্বাধীন আইনগত অস্তিত্ব ছিল না। আইনসভায় অংশগ্রহণ কিংবা বিচারক হওয়াও তার জন্য ছিল নিষিদ্ধ। অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে, সে সময় নারীরা মানসম্মত শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড কিংবা দর্শনচর্চার অধিকারও ছিল না তাদের। অ্যাথেন্সের কোনো রাজনৈতিক নেতা, বিখ্যাত দার্শনিক, শিল্পী কিংবা ব্যবসায়ী কারোরই গর্ভাশয় ছিল না। গর্ভাশয় থাকাটা কি একজন মানুষকে এইসমস্ত পেশায় কাজ করার জন্য জৈবিকভাবে অনুপযুক্ত করে ফেলে? অন্তত, তখনকার সেই প্রাচীন অ্যাথেন্সবাসীদের তা-ই

ধারণা ছিল। এখনকার অ্যাথেন্সবাসীরা অবশ্য তা মানে না। আজকের অ্যাথেন্সে নারীরা ভোট দেয়, সরকারি অফিসে কাজ করে, বক্তৃতা দেয়, অলংকার থেকে শুরু করে দালানকোঠা পর্যন্ত সবকিছুরই নকশা করে, সফটওয়্যার তৈরি করে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। তাদের গর্ভাশয় কোনো অবস্থাতেই এই সমস্ত কাজ করার জন্য বাধার সৃষ্টি করে না। এটা ঠিক যে রাজনীতি আর ব্যবসায়-বাণিজ্যে নারীদের উপস্থিতি এখনো বেশ কম। গ্রিসের আইনসভার শতকরা মাত্র ১২ ভাগ নারী সদস্য। তবে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে কোনো আইনগত বাধা নেই। কোনো সরকারি দপ্তরে একজন নারী কাজ করছেন– আজকের গ্রিসে এমন দৃশ্য কারো কাছেই অস্বাভাবিক মনে হবে না।

গ্রিসের অনেক আধুনিক মানুষও মনে করে যে, পুরুষ হওয়ার মূল কথাই হলো শুধু নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা এবং শুধু ওই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গেই যৌন সম্পর্কে অংশগ্রহণ করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা যে তারা তাদের সংস্কৃতির প্রভাবে পেয়েছে তা নয়, বরং তারা মনে করে এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে যৌন আকর্ষণটা হলো স্বাভাবিক আর একই লিঙ্গের মধ্যে যৌন আকর্ষণ অস্বাভাবিক। যদিও সত্য কথা হলো, একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের প্রতি যৌন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলে সেটা প্রকৃতিমাতা কিন্তু মোটেই খারাপভাবে দেখে না। নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা একজন মানবমাতাই বরং রেগে যায় যদি সে আবিষ্কার করে তার ছেলের সঙ্গে পাশের বাড়ির ছেলেটার কিছু একটা হচ্ছে। অন্যদিকে, বেশ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানবসংস্কৃতিই সমকামিতাকে শুধু যে স্বাভাবিকভাবে দেখছে তা-ই নয়, বরং সেটাকে সামাজিকভাবে গঠনমূলকও মনে করে। প্রাচীন গ্রিস ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। *ইলিয়াড*-এ কিন্তু আমরা এরকম দেখতে পাই না যে, ছেলে একিলিসের সঙ্গে পেট্রোক্লাসের সম্পর্ক নিয়ে মা থেটিস কোনো আপত্তি জানাচ্ছে। ওদিকে, মেসিডোনের রানি অলিম্পিয়াস খুব পরিচিত ছিল তার জাঁদরেল মেজাজের কারণে। সে নিজে তার

স্বামী রাজা ফিলিপকে হত্যা করিয়েছিল। অথচ সেই মানুষও এতটুকু খেই হারায়নি যখন তার ছেলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তার প্রেমিক হেফাশিওনকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল রাতের খাবার খাওয়ানোর জন্য।

কোন জিনিসটা যে আসলে জৈবিকভাবে নির্ণীত আর কোনটা একদল মানুষ কিছু জীববৈজ্ঞানিক মিথ তৈরি করে জোর করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে– সেটা আমরা আলাদা করব কীভাবে? সোজা পদ্ধতি হলো এই সহজ কথাটা মাথায় রাখা– 'প্রকৃতি উদার, সংস্কৃতি সংকীর্ণ।' প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভাবনার ব্যাপারে সব সময়ই অনুকূল। বরং আমাদের সংস্কৃতিই আমাদের শেখায় কিছু কিছু জিনিস ভালো আর কিছু কিছু খারাপ। কিছু কিছু সংস্কৃতি যেমন মেনে নিতে বলে যে প্রকৃতিই নারীকে সন্তান জন্মদানে সক্ষম করেছে। কিছু কিছু সংস্কৃতিই আবার অগ্রাহ্য করতে বলে যে প্রকৃতিই পুরুষকে অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে আনন্দ প্রাপ্তির ক্ষমতা দিয়েছে।

সংস্কৃতি অনেক সময় এভাবে সাফাই গায় যে, এটা শুধু সেগুলোকেই নিষিদ্ধ করে যেগুলো অস্বাভাবিক, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বলতে হয়, কোনো কিছুই প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। যা-কিছু সম্ভব, সংজ্ঞা অনুসারে তার সবকিছুই প্রাকৃতিক। এমন কোনো অস্বাভাবিক আচরণ থাকা সম্ভব নয়, যেটা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে। সুতরাং এর জন্য আলাদা করে কোনো কিছু নিষিদ্ধ করার দরকার পড়ে না। কোনো সমাজ-সংস্কৃতিই কিন্তু মানুষকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাবার উৎপাদনে বাধা দেয়নি, নারীকে আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটতে বাধা দেয়নি কিংবা ঋণাত্মক চার্জের দুটো ইলেকট্রনকে একে ওপরের প্রতি আকর্ষিত হতেও বাধা দেয়নি।

সত্যিকার অর্থে আমাদের এই 'প্রাকৃতিক' আর 'অস্বাভাবিক'-এর ধারণাটা এসেছে খ্রিষ্টীয় দর্শন থেকে, জীববিজ্ঞান থেকে নয়। এই দর্শনে 'প্রাকৃতিক' হলো 'সেই সমস্ত কিছুই যা ঈশ্বর তার প্রকৃত সৃষ্টির মহাপরিকল্পনায় রেখেছিলেন'। খ্রিষ্টীয় দর্শনের অনুসারীরা দাবি

করেন যে, ঈশ্বর মানুষের শরীর তৈরি করেছেন তার প্রত্যেকটি অঙ্গের কোনো একটা উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করেই। আমরা যদি আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈশ্বরের সেই স্বপ্নের মতো করেই ব্যবহার করি সেটাই হলো প্রাকৃতিক। ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনার থেকে আলাদা কোনো ব্যবহারই হলো অস্বাভাবিক। কিন্তু বিবর্তনের তো কোনো উদ্দেশ্য নেই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বিবর্তিত হয়নি। আর সেগুলোর ব্যবহার চিরপরিবর্তনশীল। মানুষের শরীরের এমন কোনো অঙ্গ নেই, যেটা তার কোটি কোটি বছর আগেকার একটা নকশা অনুযায়ী একই কাজ করে চলেছে। একটা অঙ্গ একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্যই বিবর্তিত হয় ঠিক, কিন্তু একবার সেটা তৈরি হলে, পরবর্তী সময়ে নানান রকম কাজেই সেটা ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুখের কথা বলতে পারি। মুখের আবির্ভাব হয়েছিল কারণ প্রথম দিককার বহুকোষী প্রাণীগুলোর শরীরের মধ্যে পুষ্টি সংগ্রহের জন্য কিছু একটার দরকার ছিল। হ্যাঁ, আমরা এখনো মুখ দিয়েই খাই কিন্তু মুখ দিয়ে আমরা চুমুও খাই, কথাও বলি। আমরা যদি র‍্যাম্বো হই, তাহলে হ্যান্ড গ্রেনেডের পিনটাও মুখ দিয়েই খুলি। এখন, যেহেতু আমাদের ৬ কোটি বছর আগের জোঁকের মতো পূর্বপুরুষরা তাদের মুখ দিয়ে এসব কিছু করত না, তাই বলে কি মুখের এখনকার এসব ব্যবহার সব অস্বাভাবিক হয়ে যাবে?

একইভাবে, পাখনা জিনিসটাও তার ওড়াউড়ির দারুণ সব ক্ষমতা নিয়ে একবারে উদ্ভব হয়নি। বরং সেটা বিবর্তিত হয়েছে এমন কিছু অঙ্গ থেকে যেগুলোর কাজ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একরকম তত্ত্ব মতে, পোকামাকড়ের পাখনার উদ্ভব হয়েছিল উড়তে না পারা কিছু পোকার শরীরের কিছু প্রসারিত অংশ থেকে। যেসব পোকার শরীরের কিছু আলাদা প্রসারিত জায়গা ছিল তাদের শরীরে ক্ষেত্রফলও বেশি হতো। ফলে তারা একটু বেশি সূর্যালোক পেত, যেটা দিয়ে একটু বেশি সময় উষ্ণ থাকা যেত। খুব ধীর একটা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই সূর্যালোক সংগ্রহকারী অংশটা বড়ো হতে লাগল। ওই অঙ্গের যেই আকৃতিটা পোকাটাকে একটু বেশি সূর্যালোক সংগ্রহ করতে সুবিধা দিত, একটু

বেশি খোলা জায়গা আর হালকা ওজনের মাধ্যমে– সেটাই কাকতালীয়ভাবে তাকে লাফালাফির সময় একটু বাড়তি সময় শূন্যে ভাসাতে সাহায্য করল। যাদের ওই প্রসারিত অঙ্গটা একটু বড়ো তারা একটু বেশিদূর লাফাতে পারল। কিছু কিছু পোকা এই অঙ্গটাকে ভেসে থাকার কাজেও ব্যবহার করতে লাগল। এভাবেই আস্তে আস্তে এটা উড়ে বেড়ানোর শক্তির জোগান দেওয়ার মতো পাখনায় পরিণত হলো। সুতরাং, এখন যদি একটা মশা আপনার কানের কাছে ভোঁ-ভোঁ করে উড়ে বেড়ায় তাকে বরং অভিশাপ দিন অস্বাভাবিক আচরণের জন্য! কারণ সে যদি আদবকায়দা মেনে চলত আর ঈশ্বরের দান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে তার পাখনাগুলো শুধু সোলার প্যানেল হিসেবেই ব্যবহার করত!

একইরকমভাবে, আমাদের যৌন অঙ্গগুলোও ভিন্ন-ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যৌনমিলনের ব্যাপারটা বিবর্তিত হয়েছিল মূলত বংশবৃদ্ধির জন্য এবং বিয়ের আগে হবু সঙ্গীর শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করার জন্য। কিন্তু বেশিরভাগ প্রাণীই এখন যৌনতার এই দুই কাজই ব্যবহার করছে অসংখ্য সামাজিক উদ্দেশ্যে, যার সঙ্গে বংশবৃদ্ধির তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, শিম্পাঞ্জি যৌনতাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক জোট তৈরি করার জন্য, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দূর করে আরো আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য। এটাও কি তাহলে অস্বাভাবিক? প্রকৃতিবিরুদ্ধ?

নারী-পুরুষ এবং নারীত্ব-পুরুষত্ব

‘প্রাকৃতিক ভাবে নারীর দায়িত্ব হলো শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া’, ‘সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ’– এসব ধারণা নিয়ে তর্ক করারও তেমন কোনো মানে হয় না। পুরুষত্ব কিংবা নারীত্বের ধারণাটা প্রতিষ্ঠা করে যেসব আইনকানুন কিংবা রীতিনীতি সেসব প্রকৃতপক্ষে মানুষের কল্পনাশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ, জৈবিক বাস্তবতা নয়।

জৈবিকভাবে, মানুষ স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গে বিভক্ত। একজন পুরুষ হোমো সেপিয়েন্স হলো সেই মানুষ, যার একটা X আর একটা Y ক্রোমোজোম আছে। আর একজন নারী হলো সে, যার দুটি X ক্রোমোজোম আছে। কিন্তু আসলে 'পুরুষ' আর 'নারী' নামগুলো আমাদের সামাজিক বিভক্তিকেই প্রকাশ করে, জৈবিক নয়। যদিও বেশিরভাগ মানবসমাজেই নারী আর পুরুষ বলতে সেই জৈবিক নারী আর পুরুষ লিঙ্গকেই বোঝাতে চায়, কিন্তু ওই শব্দ দুটোর ওপর নানা রকম বোঝাও চাপিয়ে দেয়, যেগুলোর সঙ্গে জীববিজ্ঞানের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি সম্পর্ক থেকেও থাকে সেটা বেশ দুর্বল সম্পর্ক। একজন পুরুষ মানুষ মানে একজন সেপিয়েন্স গোত্রের প্রাণী না যার XY ক্রোমোজোম আছে, অণ্ডকোষ আছে আর অনেক অনেক টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন আছে। বরং একজন পুরুষ মানুষ হলো সে যে তার সমাজের কাল্পনিক স্তরের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অধিষ্ঠিত। তার সংস্কৃতির মিথ তাকে কিছু পুরুষালি দায়িত্ব (যেমন, রাজনীতি করা), অধিকার (ভোট দেওয়া) আর কর্তব্য (সেনাবাহিনীর দায়িত্ব) অর্পণ করেছে। একইভাবে, একজন নারী সেই হোমো সেপিয়েন্স না যার দুটো X ক্রোমোজোম আছে, একটা গর্ভাশয় আছে আর প্রচুর এস্ট্রোজেন নামক হরমোন আছে। বরং একজন নারী হলো মানবসমাজের কাল্পনিক বাস্তবতার একজন নারী সদস্য। তার সমাজের মিথগুলো তাকে কিছু মৌলিক মেয়েলি দায়িত্ব (সন্তান লালনপালন), অধিকার (সহিংসতা থেকে রক্ষা) আর কর্তব্য (স্বামীর প্রতি আনুগত্য) অর্পণ করেছে। যেহেতু, জীববিজ্ঞান নয়, বরং এইসব সামাজিক মিথগুলোই পুরুষ ও নারীর দায়িত্ব, কর্তব্য কিংবা অধিকারগুলো নির্ধারণ করে, সেই কারণেই 'পুরুষত্ব' আর 'নারীত্বে'র ধারণাটাও এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

২২। অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরুষত্ব : ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের একটি আনুষ্ঠানিক ছবি। ভালো করে খেয়াল করুন তার লম্বা পরচুলা, স্টকিংস, উঁচু হিলের জুতো, নৃত্যশিল্পীর মতো দেহভঙ্গি– আর একটা বিশাল তলোয়ার। এখনকার ইউরোপে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই (তলোয়ার বাদে) মেয়েলিপনার পরিচায়ক। কিন্তু রাজা লুইয়ের সময়ে তিনি ছিলেন ইউরোপে পুরুষত্বের প্রতীক।

বিষয়টাকে একটু সহজ করার জন্য বিশেষজ্ঞরা জৈবিক ‘লিঙ্গ’ আর সাংস্কৃতিক লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট করে দিতে চান। জৈবিক লিঙ্গ মূলত পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গে বিভক্ত, আর এই বিভক্তি বস্তুগত যা অপরিবর্তিত আছে ইতিহাসের সূচনা থেকেই।

স্ত্রী লিঙ্গের একজন সেপিয়েন্স = জীববিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ		একজন নারী সেপিয়েন্স = সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিভাগ	
প্রাচীনকালের অ্যাথেন্সে	বর্তমানকালের অ্যাথেন্সে	প্রাচীনকালের অ্যাথেন্সে	বর্তমানকালের অ্যাথেন্সে
XX ক্রোমোজমের অধিকারী	XX ক্রোমোজমের অধিকারী	ভোটাধিকার ছিল না	ভোটাধিকার আছে
জরায়ু বিদ্যমান	জরায়ু বিদ্যমান	বিচারক হতে পারতেন না	বিচারক হতে পারেন
ডিম্বাশয় বিদ্যমান	ডিম্বাশয় বিদ্যমান	সরকারি অফিসে চাকরি করতে পারতেন না	সরকারি অফিসে চাকরি করতে পারেন
কিছুটা টেস্টোটেরন হরমোন বিদ্যামান	কিছুটা টেস্টোটেরন হরমোন বিদ্যামান	কাকে বিয়ে করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না	কাকে বিয়ে করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন
প্রচুর ইস্ট্রোজেন হরমোন বিদ্যমান	প্রচুর ইস্ট্রোজেন হরমোন বিদ্যমান	মূলত শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন	শিক্ষার অধিকার আছে
মাতৃদুগ্ধ উৎপাদনে সক্ষম	মাতৃদুগ্ধ উৎপাদনে সক্ষম	আইনগতভাবে বাবা কিংবা স্বামীর সম্পত্তি ছিলেন	আইনগতভাবে স্বাধীন
কোনো পরিবর্তন নেই		আমূল পরিবর্তন	

অন্যদিকে নারী, পুরুষ নামে যে বিভক্তি সেটা হলো সাংস্কৃতিক লিঙ্গ। প্রচলিত অর্থের 'পুরুষালি' বা 'মেয়েলি' ধারণাগুলো মানুষের কল্পনাপ্রসূত আর তাই সেটা নিয়মিতই বদলায়। উদাহরণস্বরূপ,

বলাই বাহুল্য, প্রাচীন অ্যাথেন্সের একজন নারীর আচার-ব্যবহার, চাওয়া-পাওয়া, পোশাক-আশাক আর এমনকি দেহভঙ্গির সঙ্গেও এখনকার আধুনিক অ্যাথেন্সের একজন নারীর আমূল পার্থক্য।[৬]

২৩। একবিংশ শতাব্দীর পুরুষত্ব : বারাক ওবামার একটি আনুষ্ঠানিক ছবি। পরচুলা, স্টকিংস, উঁচু হিলের জুতা আর তলোয়ারের কি হলো? ইতিহাসে প্রভাবশালী পুরুষদের এখনকার মতো এত নির্জীব আর নিরানন্দ কখনো লাগেনি। পুরো ইতিহাস জুড়েই প্রভাবশালী পুরুষরা খুব রঙিন আর জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। যেমন, পালকযুক্ত মুকুটওয়ালা আমেরিকান ইন্ডিয়ান নেতারা কিংবা হীরাখচিত সিল্কের পোশাক পরা হিন্দু মহারাজারা। এমনকি প্রাণিজগৎ জুড়েও পুরুষ প্রাণীগুলোই সাধারণত বেশি রঙিন আর সমৃদ্ধ হয় স্ত্রী প্রাণীদের তুলনায়– ময়ূরের পেখম কিংবা সিংহের কেশরের কথা চিন্তা করুন।

পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এসব তো ছেলে খেলা; কিন্তু নারী-পুরুষ খুবই গুরুতর ব্যাপার। পুংলিঙ্গের অধিকারী হওয়াটা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ একটা ব্যাপার। আপনার শুধু একটা X আর একটা Y ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মাতে হবে, ব্যস। স্ত্রীলিঙ্গের ব্যাপারটাও ওরকমই, খালি এক জোড়া X ক্রোমোজোম লাগবে। কিন্তু অন্যদিকে, পুরুষ কিংবা নারী হওয়াটা খুবই কঠিন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা

ব্যাপার। যেহেতু বেশিরভাগ পুরুষালি কিংবা মেয়েলি ব্যাপারগুলোই সাংস্কৃতিক, জৈবিক নয়, সুতরাং কোনো মানবসমাজেই একজন পুংলিঙ্গের অধিকারীকে পুরুষের মুকুট কিংবা স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারীকে নারীর মুকুট পরানো হয় না। আবার এমনও না যে, সেই মুকুট একবার পরতে পারলেই সারা জীবনের জন্য তা স্থায়ী হয়ে গেল। একজন পুরুষকে তার পুরুষত্বের পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয় সারা জীবন। একদম দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তাকে এক অন্তহীন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে পুরুষত্বের জয়মাল্য অধিকার করে রাখতে হয়। আর নারীর কপাল তো আরো খারাপ। তার সারাটা জীবনই ফুরিয়ে যায় নিজেকে আর অন্যদেরকে এটা বোঝাতে যে সে আসলেই একজন নারী।

এ ব্যাপারে সাফল্যেরও কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। বিশেষ কওে, পুরুষেরা সব সময় তাদের পুরুষত্ব হারানোর একটা ভয়ের মধ্যে বসবাস করে। ইতিহাস জুড়ে এমন অনেক হয়েছে যে একজন পুংলিঙ্গের অধিকারী স্বেচ্ছায় অনেক ঝুঁকি নিয়েছে, এমনকি জীবন উৎসর্গ পর্যন্ত করেছে শুধু অন্যদের কাছে শোনার জন্য– 'ওই হলো আসল পুরুষ!'

পুরুষতান্ত্রিকতার কারণ অনুসন্ধান

অন্তত কৃষিবিপ্লবের সময় থেকে তো বটেই, ইতিহাস জুড়ে বেশিরভাগ মানবসমাজই ছিল পুরুষতান্ত্রিক যেখানে পুরুষকেই অপেক্ষাকৃত বেশি মর্যাদা দেওয়া হতো। যেভাবেই 'নারী' আর 'পুরুষ'-এর সংজ্ঞায়ন হয়ে থাকুক না কেন, পুরুষ হওয়া সব সময়ই সুবিধাজনক ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ একটা ছেলেকে ছোটো থেকেই পুরুষালি কায়দা-কানুন শেখাত আর মেয়েদের শেখাত মেয়েলি আচরণ। কেউ যদি এই গণ্ডির বাইরে যেত, তার পরিণতি হতো ভয়ংকর। যারা এই নিয়মকানুন মেনে নিত, সেই নারী আর পুরুষদেরও সমাজ একই চোখে দেখত না। পুরুষালি ব্যাপারটাই

সেখানে দামি ছিল, আর মেয়েলি ব্যাপারগুলো কম দামি। একজন আদর্শ পুরুষ একজন আদর্শ নারীর চেয়েও সমাজে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই নারীদের স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষায় খুব কম বিনিয়োগ করা হয়। ফলে তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা তেমন নেই, রাজনৈতিক অংশগ্রহণও নেই তেমন। আর বলাই বাহুল্য, চলাফেরার স্বাধীনতাটাও ভোগ করতে পারে না তারা। সুতরাং বলা যায়, এই লিঙ্গবৈষম্য ব্যাপারটা অনেকটা এমন এক দৌড় প্রতিযোগিতার মতো, যেখানে কেউ কেউ শুধু ব্রোঞ্জ মেডেলটার জন্যই দৌড়ায়।

হ্যাঁ, এটা সত্যি যে ইতিহাসে হাতে-গোনা কয়েকজন নারী খুব প্রভাবশালী কিংবা প্রধান কিছু পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। মিশরের ক্লিওপেট্রা, চীনের সম্রাজ্ঞী উ যেইতান (৭০০ খ্রিষ্টাব্দ) আর ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের কথা বলা যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে। কিন্তু তারা নেহাতই ব্যতিক্রম। এলিজাবেথের শাসনামলের দীর্ঘ ৪৫ বছরে পার্লামেন্টের সব সদস্যই ছিল পুরুষ। সেনাবাহিনী কিংবা নৌবাহিনীর সব কর্মকর্তাও ছিল পুরুষ, সব বিচারক আর আইনজীবী, সব বিশপ আর আর্চবিশপ, ধর্মতাত্ত্বিক আর পুরোহিত, সব ডাক্তার আর সার্জন, সব কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, শহরের মেয়র আর শেরিফ এবং মোটামুটি সব লেখক, স্থপতি, কবি, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী আর বিজ্ঞানী– এরা সবাই ছিল পুরুষ।

মোটামুটি সব কৃষিভিত্তিক আর শিল্পভিত্তিক সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতার চর্চা হয়ে এসেছে। এটা সব রাজনৈতিক ওঠানামা, সামাজিক বিপ্লব আর অর্থনৈতিক হাওয়া-বদলের মধ্যে নিজের অবস্থানটা পাকাপোক্ত রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, মিশর জায়গাটা পুরো কয়েক শতাব্দী জুড়ে অসংখ্যবার দখল করা হয়েছে। আসিরিয়ান, পার্সিয়ান, মেসিডোনিয়ান, রোমান, আরব, মামেলুক, তুর্কি আর ব্রিটিশরা দখল করে ছিল মিশর। ওখানকার সমাজ পুরোটা সময় জুড়েই সেই পিতৃতান্ত্রিকই ছিল। মিশর শাসিত হয়েছে ফারাওয়ের আইনে, গ্রিক আইনে, রোমান আইনে, মুসলিম আইনে, অটোমান

আইনে আর ব্রিটিশ আইনে। তারা সবাই ‘আসল পুরুষ’দেরকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

যেহেতু দেখা যাচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতা এতটা সর্বজনীন, তার মানে এটা নিশ্চয় কোনো একটা কাকতালীয় ঘটনা থেকে শুরু হয়ে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে না। এটা বলে রাখা ভালো যে, এমনকি ১৪৯২ সালের আগেও আমেরিকা আর আফ্রো-এশিয়ার বেশিরভাগ সমাজই ছিল পিতৃতান্ত্রিক। আর মজার ব্যপার হলো, তাদের কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোনো যোগাযোগই ছিল না তখন। তার পরও তারা সবাই একই সময়ে পিতৃতান্ত্রিকই ছিল। এখন আফ্রো-এশিয়ার এই পিতৃতান্ত্রিকতা যদি কোনো একটা নেহাত কাকতালীয় ঘটনার ফলাফলও হয়, তবু প্রশ্ন থেকে যায়– অ্যাজটেক আর ইনকারা তাহলে পিতৃতান্ত্রিক কেন? যদিও পুরুষ ও নারীর নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়নে সমাজে-সমাজে ভালোই পার্থক্য আছে, কিন্তু তাও মোটামুটি সব সমাজই সব সময়ই পুরুষত্বকে নারীত্বের ওপরে স্থান দিয়েছে। এটা খুবই সম্ভব যে এর পেছনে আসলে হয়তো কোনো জৈবিক কারণ আছে। আমরা ঠিক নিশ্চিত করে জানি না কারণটা কী। নানান রকম মতবাদ পাওয়া যায় এ ব্যাপারে, কিন্তু কোনোটাই ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়।

পেশি শক্তির প্রভাব

নারী পুরুষের মধ্যে পুরুষের প্রাধান্যের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় কিংবা প্রচলিত তত্ত্বটি হলো– পুরুষ নারীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী, আর তারা তাদের এই শারীরিক শক্তির বলেই নারীকে তাদের অধীন হতে বাধ্য করেছে। এই তত্ত্বের আরেকটু কৌশলী ব্যাখ্যা হলো, জমি চাষ করা বা ফসল কাটার মতো বেশি কষ্টসাধ্য কাজগুলো পুরুষরা তাদের শারীরিক শক্তির কারণে নিজেরা একচেটিয়াভাবে করত। এর ফলে খাবার উৎপাদনে তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। এই নিয়ন্ত্রণই পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

পেশিশক্তির ওপর এই বাড়তি গুরুত্বের মূলত দুটো সমস্যা আছে। প্রথমত, পুরুষ নারীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী– এই কথাটা মোটামুটি সাধারণভাবে খাটে, তাও কিছু নির্দিষ্ট রকমের শক্তির ক্ষেত্রে। নারীরা সাধারণত ক্ষুধা, রোগবালাই আর ক্লান্তিতে কম দুর্বল হয়। এমন অনেক নারীই আছেন, যিনি অনেক পুরুষের চেয়ে বেশি জোরে দৌড়াতে পারেন কিংবা তার চেয়ে বেশি ওজনের কোনো কিছু ওঠাতে পারেন। দ্বিতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ইতিহাস জুড়ে নারীদেরকে মূলত এমন সব কাজ থেকেই দূরে রাখা হয়েছে যেগুলোতে আসলে খুব কমই শারীরিক শ্রমের দরকার হয় (যেমন পুরোহিতের কাজ, আইন আর রাজনীতি)। অন্যদিকে, ফসলের খেতে, হস্তশিল্পে কিংবা দৈনন্দিন কাজে অপেক্ষাকৃত বেশি শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি বরং বেশ স্বাভাবিকই। তাই, যদি সামাজিক আধিপত্যের সঙ্গে শারীরিক শক্তির সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকত, তাহলে নারীদের এখনকার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় থাকার কথা ছিল।

এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, মানুষের ক্ষেত্রে আসলে শারীরিক শক্তির সঙ্গে সামাজিক আধিপত্যের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। ৬০ বছর বয়সের বৃদ্ধ কিন্তু ঠিকই ২০ বছরের যুবকের ওপর ছড়ি ঘোরায়। অথচ ওই যুবক শারীরিক শক্তির দিক থেকে বৃদ্ধের চেয়ে ঢের এগিয়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার অ্যালাবামার একজন সাধারণ আবাদি জমির মালিককে কিন্তু তার তুলার খেতের শ্রমিকদের যে-কেউ এক নিমিষে মেরে মাটিতে পিষে ফেলতে পারত। বক্সিং ম্যাচগুলো কিন্তু মিশরের ফারাও কিংবা ক্যাথলিক পোপদের মধ্যে হতো না। এমনকি সেই প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক জীবনেও রাজনৈতিক আধিপত্যটা কিন্তু পেশিবহুল শরীর নয় বরং সামাজিকতার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করত। খুব পরিকল্পিত সন্ত্রাসের ক্ষেত্রেও মূল হোতা কিন্তু সে নয়, যার গায়ে জোর বেশি। সাধারণত সে হয় একজন বুড়ো লোক, যে সাধারণত নিজের হাত নোংরা না করে দলের তরুণ সদস্যদের দিয়ে এসব কাজ করিয়ে

নেয়। কেউ যদি মনে করে যে একটা সিন্ডিকেট দখলে নেওয়ার ভালো উপায় হলো সরাসরি ডনকে মেরে ফেলা, তাহলে নিজের বোকামিটা বোঝার আগেই সে নিজেও মারা পড়বে। এমনকি শিম্পাঞ্জিদের মধ্যেও, আলফা মেল তার পদবিটা পায় গোষ্ঠীর অন্যান্য নারী-পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে সহজ সমঝোতার সম্পর্কের কারণে, দিগ্‌বিদিকজ্ঞানহীন হিংস্রতার জন্য নয়।

সত্যি বলতে কি, মানুষের ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্টই দেখা যায় যে, শারীরিক শৌর্যবীর্যের সঙ্গে সামাজিক দক্ষতার একটা বিপরীত সম্পর্ক আছে। বেশিরভাগ সমাজেই সাধারণত নিচু শ্রেণির মানুষেরাই সরাসরি শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলো করে। এখান থেকে খাদ্যশৃঙ্খলে হোমো সেপিয়েন্সের অবস্থানের একটা ধারণাও করা যায়। যদি শুধু সরাসরি শারীরিক পরিশ্রমই আমলে নেওয়া হয়, তাহলে খাদ্যশৃঙ্খলে হোমো সেপিয়েন্সের অবস্থান হতো মোটামুটি মাঝামাঝি। কিন্তু আসলে তাদের মানসিক আর সামাজিক দক্ষতাই তাদের খাদ্যশৃঙ্খলের একদম ওপরের অবস্থানটাতে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, প্রজাতিগুলোর মধ্যে ক্ষমতার আধিপত্যটা তাদের মানসিক আর সামাজিক দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে, নেহাত শারীরিক শক্তির ওপর নয়। তাই মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে স্থিতিশীল সামাজিক স্তরবিন্যাসটা নেহাতই নারীর চেয়ে পুরুষের অধিকতর শারীরিক শক্তির কারণেই সম্ভব হয়েছে– এ কথাটা মেনে নেওয়াটা সত্যিই খুব কঠিন।

সমাজের আস্তাকুঁড়

অন্য একটা তত্ত্ব বলে, পুরুষের এই আধিপত্য আসলে তার শক্তি নয় বরং হিংস্রতা থেকে এসেছে। লাখো বছরের বিবর্তন পুরুষকে নারীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি হিংস্র করে গড়ে তুলেছে। নারী হয়তো ঘৃণা, লোভ কিংবা কটূক্তির দিক দিয়ে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। কিন্তু যখনই প্রশ্নটা উঠবে, ধাক্কা দিয়ে অন্যকে সরিয়ে

দেওয়ার, তখন আর তারা পাত্তা পাবে না। পুরুষ সব সময়ই সরাসরি শারীরিক আক্রমণের ব্যাপারে একধাপ এগিয়ে। এই কারণেই ইতিহাস জুড়ে সমস্ত যুদ্ধ বিশেষভাবে পুরুষেরই অধিকারে।

যুদ্ধের সময়ে, যুদ্ধাস্ত্রের ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ তাদেরকে সমাজেও প্রভুর আসনে বসায়। তারপর তারা সমাজের ওপর তাদের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে বেশি বেশি যুদ্ধ করে। যত বেশি যুদ্ধ হয় সমাজের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণও তত বাড়ে। এই চক্রাকার সম্পর্ক থেকেই আসলে ঘন ঘন যুদ্ধ আর পুরুষের আধিপত্যের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়।

পুরুষ ও নারীর হরমোন আর চিন্তাপ্রক্রিয়া নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাও পুরুষের অধিকতর হিংস্রতার দাবিকেই আরো জোরালো করে আর তাদেরই আদর্শ যুদ্ধসৈনিকের খেতাব দেয়। এখন, যদি-বা এটা মেনেও নিই যে, সব সৈনিকের পুরুষ হওয়াই ভালো, তার পরও প্রশ্ন থেকে যায়– যারা পর্দার আড়ালে থেকে যুদ্ধটা নিয়ন্ত্রণ করছে আর যুদ্ধের সুবিধা ভোগ করছে তাদেরও পুরুষ হওয়াটা কি জরুরি? সহজ উত্তর– না, জরুরি নয়। যদি তা-ই হতো, তাহলে তো যেসব কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক তুলার খেতে কাজ করছে তাদেরই কারো সেই তুলাবাগানের মালিক হওয়াটাও জরুরি। যদি সব কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শ্বেতাঙ্গদের শাসন দরকার হয়, তাহলে সেই কারণেই শুধু একদল পুরুষের সমন্বয়ে তৈরি একটা সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্যও নারীদের দিয়ে গঠিত একটা সরকারব্যবস্থাই ভালো হওয়ার কথা। এমনকি আংশিকভাবে নারীদের দিয়ে গঠিত হলেও ভালো। সত্যি বলতে কি, ইতিহাস জুড়ে বেশিরভাগ সমাজেই বড়ো বড়ো অফিসাররা আসলে সরাসরিই তাদের অফিসার পদবিটা পেয়ে যায়। নিচু পদ থেকে তাদের সংগ্রাম করে ওপরে উঠতে হয় না। অভিজাতরা, পয়সাওয়ালা আর উচ্চশিক্ষিতরা তেমন কোনো কষ্ট ছাড়াই পেয়ে যায় তাদের অফিসার পদবি।

নেপোলিয়ানের চিরশত্রু, ডিউক অব ওয়েলিংটন যখন আঠারো বছর বয়সে ব্রিটিশ আর্মিতে যোগদান করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে

অফিসার পদবিতে নিযুক্ত করা হলো। তিনি তার নিচের স্তরের সৈন্যদের নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এক অভিজাত সহকর্মীকে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের সৈনিকগুলো সব দুনিয়ার আবর্জনা।' এ সৈনিকগুলোকে সাধারণত সমাজের একদম নিচু দরিদ্রশ্রেণি কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু (যেমন, আইরিশ ক্যাথলিকরা) থেকেই নির্বাচন করা হতো। সেনাবাহিনীর উঁচু পদগুলোতে তাদের স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ, উঁচু পদগুলো আলাদা করে রাখা থাকত ডিউক, রাজপুত্র আর রাজাদের জন্য। কিন্তু কেন শুধু রাজপুত্রের জন্য, রাজকন্যার জন্য নয় কেন?

আফ্রিকায় যে ফরাসি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেটা মূলত সেনেগালিজ, আলজেরিয়ান আর শ্রমিক শ্রেণির ফরাসিদের ঘাম আর রক্ত দিয়েই গড়া। অসংখ্য সাধারণ পদগুলোর মধ্যে সচ্ছল ঘরে জন্মানো ফরাসিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কিন্তু অল্প কিছু উঁচু পদে বসে যারা ফরাসি সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছে, সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছে আর তার ফল ভোগ করেছে, তাদের মধ্যে স্বচ্ছল ঘরে জন্মানো ফরাসি পুরুষদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু কেন শুধু ফরাসি পুরুষ? নারী নয় কেন?

চীনে দীর্ঘদিনের একটা চল ছিল সেনাবাহিনীকে বেসামরিক আমলাদের কর্তৃত্বের অধীনে রাখার, ফলে যেসব ম্যান্ডারিন জীবনে কখনো তলোয়ারই ধরেননি তাঁরাই মাঝে মাঝে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। 'ভালো লোহা পেরেক বানিয়ে নষ্ট করা উচিত নয়'– এরকম একটা চীনা প্রবাদই আছে, যেটা বোঝায় যে, সত্যিকার মেধাবী মানুষদের বেসামরিক আমলা হিসেবেই যোগ দেওয়া উচিত, সেনাবাহিনীতে নয়। কেন? কেন শুধু ম্যান্ডারিন পুরুষরাই এ সুযোগ পেল? নারীরা নয় কেন?

কেউ যদি বলে, নারীরা সফল ম্যান্ডারিন, সফল জেনারেল কিংবা সফল রাজনীতিক হতে পারেনি তাদের শারীরিক দুর্বলতা কিংবা টেস্টোস্টেরনের ঘাটতির কারণেই, তাহলে সেটা খুব একটা গ্রহণযোগ্য যুক্তি হবে না। একটা যুদ্ধ জিততে হলে অদম্য মানসিক

শক্তি লাগে ঠিকই কিন্তু খুব বেশি শারীরিক শক্তি কিংবা হিংস্রতার দরকার আছে বলে মনে হয় না। যুদ্ধ মোটেই মোড়ের চায়ের দোকানের ঝগড়ার মতো নয়। যুদ্ধ খুবই জটিল একটা কাজ, যেখানে অসামান্য রকমের সাংগঠনিক দক্ষতা, সহযোগিতামূলক মনোভাব আর অনেকের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজন হয়। ঘরে শান্তি বজায় রাখা, প্রবাসে মিত্রবাহিনী জোগাড় করা আর অন্যদের (বিশেষ করে শত্রুদের) মাথার ভেতরে কী চলছে সেটা ধরতে পারাই মূলত যুদ্ধ জয়ের অন্যতম চাবিকাঠি। সুতরাং খুবই হিংস্র এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব আসলে যুদ্ধ পরিচালনা করার সবচেয়ে খারাপ একটা পন্থা। বরং তার চেয়ে ঢের ভালো এমন একজন মানুষ যে অন্যদের সন্তুষ্ট করতে জানে, সুযোগ কাজে লাগাতে পারে আর একটা বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারে। বিভিন্ন সফল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতারা আসলে এই গুণাবলির অধিকারী। সামরিক দক্ষতায় পিছিয়ে থাকা অগাস্টাসই এমন একটা রাজ্য গড়েছিলেন, যেটা জুলিয়াস সিজার কিংবা আলেকজান্ডারের মতো তুখোড় সেনাপতিদের ঘোল খাইয়েছে। তৎকালীন প্রতিপক্ষ থেকে আজকের দিনের ইতিহাসবিদ– সবাই মেনে নিয়েছে, এই সাফল্যের পেছনে আছে অগাস্টাসের ক্ষমাশীলতা আর কোমলতা।

প্রায়ই নারীদেরকে পুরুষের চেয়ে ভালো প্রভাবক কিংবা সন্তুষ্টি প্রদানকারী হিসেবে দাবি করা হয়ে থাকে। এমনকি বলা হয়, তারা নাকি একটা বিষয়কে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেশ ভালোমতো দেখতে পায়। যদি এইসব দাবির মধ্যে কোনো সত্যতা থেকে থাকে, তাহলে নারীরা অবশ্যই দারুণ রাজনীতিক আর সাম্রাজ্যপ্রধান হতে পারত। যুদ্ধক্ষেত্রের নোংরা কাজগুলো তারা টেস্টোস্টেরন চালিত সরলমনা পৌরুষপূর্ণ মানুষদের জন্যই ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু সত্যিকার জগতে এমনটা সেভাবে দেখাই যায় না। আর কেন যায় না সেটাও ঠিক নিশ্চিত নয়।

পিতৃতান্ত্রিক জিন

তৃতীয় একরকমের জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবার পেশিশক্তি কিংবা হিংস্রতাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেয়, আর দাবি করে যে লাখ লাখ বছরের বিবর্তনের ফলে পুরুষ ও নারী টিকে থাকা আর প্রজননের জন্য আলাদা আলাদা রকমের পদ্ধতি আত্মস্থ করেছে। যেহেতু একজন পুরুষ সদস্যকে একজন নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অন্য পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হতো সুতরাং প্রজননের সম্ভাবনাটা পুরোপুরি নির্ভর করত একজন পুরুষের অন্য পুরুষদের হারাতে পারার ক্ষমতার ওপর। তাই যতই সময় যেতে লাগল, সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী, আক্রমণাত্মক, আর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা পুরুষের জিনগুলোই পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছতে পারল।

অন্যদিকে একজন নারীর জন্য সন্তান ধারণের উদ্দেশ্যে একজন পুরুষ খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সে যদি চাইত তার ছেলেমেয়েরা তাকে তার নাতিপুতির মুখ দেখাবে, তাহলে তাকে নয় মাস ধরে কষ্ট করে গর্ভধারণ করতে হতো। তারপর আরো বেশ কিছু বছর ধরে ছেলেমেয়েদের লালনপালন করতে হতো। সেই সময়গুলোতে তার খাবার সংগ্রহ করার খুব বেশি সুযোগ ছিল না। আর সে সময়টা তাদেরকে অন্যদের সাহায্যের ওপরও নির্ভর করতে হতো। এজন্য একজন পুরুষের খুব দরকার ছিল। নিজে টিকে থাকার জন্য এবং ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য একজন নারীকে পুরুষের সব রকম শর্তেই রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তার শুধু এটা নিশ্চিত করতে হতো যে সেই পুরুষটি সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে আর তার কিছু বোঝা বইবে। এভাবেই যতই সময় যেতে লাগল শুধু সেইসব অনুগত যত্নশীল নারীদের জিনগুলোই পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত যেতে পারল। যে নারীরা ক্ষমতার জন্য অনেক লড়াই করেছিল, তারা তাদের সেই ক্ষমতাবান জিনগুলো পরের প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে রেখে যাতে পারেনি।

সুতরাং এই তত্ত্বমতে, এই আলাদা রকমের টিকে থাকার কৌশলের কারণেই পুরুষরা হয়ে উঠল উচ্চাভিলাষী আর প্রতিদ্বন্দ্বী, রাজনীতি আর ব্যবসায়ে পটু। আর অন্যদিকে নারীরা তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়ে লালনপালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাটাও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। দুটো অনুমান এখানে বেশ গোলমেলে মনে হয়। প্রথমটা হলো– বাইরের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা নারীকে অন্য নারীদের ওপর নির্ভর না করে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলল। আর দুই– প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনোভাব পুরুষকে সামাজিকভাবে আধিপত্যপ্রবণ করে তুলল। হাতি কিংবা বোনোবো শিম্পাঞ্জিদের মতো অনেক প্রজাতির প্রাণীই আছে, যাদের সমাজে নির্ভরশীল নারী আর প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ থাকা সত্ত্বেও তাদের সমাজটা মাতৃতান্ত্রিক। যেহেতু নারীদের একটু বাড়তি সাহায্যের দরকার হয়, তাই তারা বাধ্য হয়েই সামাজিকতার কিংবা অন্যকে তুষ্ট করার ক্ষমতা অর্জন করে। তারা শুধু নারীদের মধ্যে একটা সামাজিক বন্ধন তৈরি করে আর সন্তান লালনপালনে নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করে। অন্যদিকে পুরুষেরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আর মারামারি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাদের সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতার খুব একটা উন্নতি হয় না। বোনোবো আর হাতির সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ নারী সদস্যদের একটা চমৎকার দলের মাধ্যমে। অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিক আর অসহযোগী পুরুষদেরকে সমাজের বাইরের দিকটাতেই রাখা হয়। যদিও বোনোবোদের নারী সদস্যগুলো গড়পড়তা পুরুষ সদস্যদের তুলনায় শারীরিকভাবে দুর্বল, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বেশ কয়েকজন নারী সদস্য মিলে একজন পুরুষ সদস্যকে পেটাচ্ছে সীমা অতিক্রম করার জন্য।

যদি এটা বোনোবো আর হাতিদের মধ্যে সম্ভব হয়, তাহলে হোমো সেপিয়েন্সের ক্ষেত্রে কেন নয়? সেপিয়েন্স তো তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রাণী, যার মূল সুবিধাই হলো বড়ো সংখ্যায় নিজেদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়ার দক্ষতা। যদি তাই হবে,

তাহলে তো আমাদের এটাই আশা করা উচিত যে পরনির্ভরশীল নারীরাই খুব চাতুর্যের সঙ্গে ওইসব আক্রমণাত্মক, স্বেচ্ছাচারী আর আত্মকেন্দ্রিক পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ করবে। যদিও-বা তারা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু তারা তাদের উচ্চতর সামাজিক দক্ষতা ও নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহজেই এই নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করতে পারবে।

যে প্রজাতির সাফল্যই নির্ভর করছে একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের ওপর, তাদের মধ্যে যারা একটু কম সহযোগী (পুরুষ) যারা, তারাই অপেক্ষাকৃত বেশি সহযোগীদের (নারী) নিয়ন্ত্রণ করছে, এটা কেমন করে সম্ভব? এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এ প্রশ্নের খুব ভালো কোনো উত্তর নেই। একদম সাধারণ ধারণাগুলো হয়তো ভুল। হয়তো হোমো সেপিয়েন্স পুরুষদের মূল বৈশিষ্ট্য তাদের শারীরিক শক্তি, আক্রমণাত্মক আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনোভাব নয় বরং তাদের উচ্চতর সামাজিক দক্ষতা আর বেশি বেশি সহযোগিতার প্রবণতা। শুধু আমরা এখনো নিশ্চিতভাবে সেটা জানি না।

আমরা যেটা জানি সেটা হলো, গত এক শতকে নারী-পুরুষের ভূমিকার একটা বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই সমাজগুলো শুধু যে পুরুষ আর নারীকে সমান আইনগত সুবিধা, রাজনৈতিক অধিকার আর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে তা-ই নয়, বরং নারী পুরুষের ভূমিকা আর যৌনতাকে একদম নতুনভাবে চিন্তা করছে। যদিও লিঙ্গবৈষম্যটা এখনো অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ঘটনাগুলো খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নারীদের ভোটের অধিকার দেওয়াটাকে আমেরিকায় একটা সম্পূর্ণ উদ্ভট ধারণা বলে মনে করা হয়েছিল। সে সময় একজন নারী সচিব কিংবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হবে এমনটা ভাবাই যেত না। ওদিকে সমকামিতা এমনই বিতর্কিত একটা বিষয় ছিল যে সবার সামনে এটা নিয়ে কোনো কথাই বলা যেত না। একুশ শতকের শুরুর দিকেই নারীদের ভোট প্রদান খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপারে পরিণত হলো।

নারী সচিব নিয়েও আলাদা করে কথা বলার কোনো কিছু ছিল না। এই ২০১৩-তে আমেরিকার পাঁচ জন সুপ্রিম কোর্ট বিচারক সমকামী বিবাহের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল যাদের মধ্যে তিনজনই ছিল নারী (চার জন পুরুষ বিচারকের অস্বীকৃতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে)।

এই নাটকীয় পরিবর্তনগুলোই আসলে নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে একরকম কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। এখানে তো স্পষ্টভাবেই দেখানো হলো যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই ধারণাটা নেহাতই কিছু মিথের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, জীববৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর নয়। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন ধরে চলে আসা এই নারী-পুরুষের ভূমিকার বিশ্বজনীনতা কিংবা স্থিতিশীলতাকে ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

তৃতীয় পর্ব

মানবজাতির ঐকতান
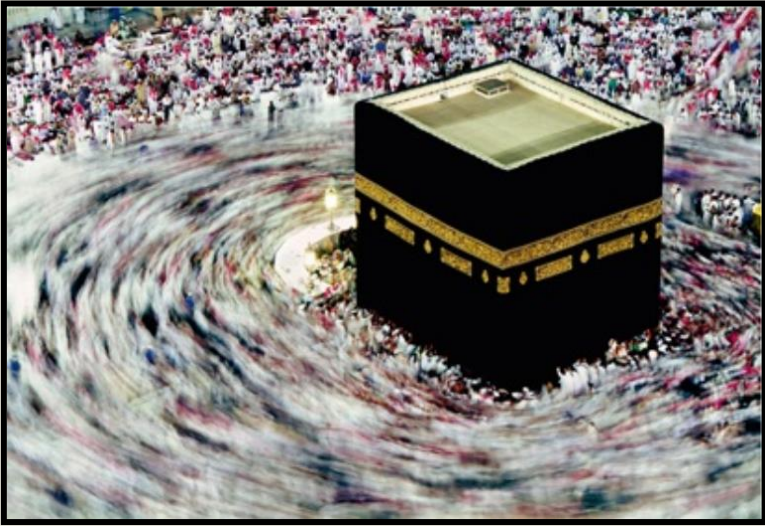
২৪। হজকারীরা মক্কার কাবা শরিফ প্রদক্ষিণ করছে

অধ্যায় ৯

ইতিহাসের ইশারা

কৃষিভিত্তিক বিপ্লবের পর আরো বড়ো আকারের এবং অধিকতর জটিল কাঠামোর সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করে। যেসব পৌরাণিক কাহিনি, লোকগাথা এবং কল্পকাহিনির কারণে এই বৃহদাকার সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভবপর হলো, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ডালপালা গজিয়ে সমাজে তৈরি করল নিজেদের পাকাপোক্ত অবস্থান। ফলে, পুরাণ ও কল্পকাহিনিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল মানুষের জীবন। জন্ম থেকেই মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল নানা বিধিবিধান। মানুষের সামষ্টিক কল্পনাপ্রসূত এইসব গল্প মানুষের কাঙ্ক্ষিত চিন্তার ধরন, সামাজিক আচার-আচরণ, তার আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি এসব বিষয়ে নির্দেশনা দিতে শুরু করল। এইসব নির্দেশনা মেনে চলার ফলে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠল জন্মগত জৈবিক প্রবৃত্তির বাইরে পৌরাণিক কাহিনি বা কাল্পনিক বাস্তবতানির্ভর আরেকটি নতুন পরিচয়। একসময় নতুন গড়ে ওঠা এই পরিচয় হয়ে উঠল তার সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। নিজেদের তৈরি করা নতুন এই পরিচয়ের ফলেই মানুষ অনেক বড়ো বড়ো গোষ্ঠী বা সমাজ গঠন করে একসঙ্গে বসবাস করতে সক্ষম হলো। জন্মের পর নিজেদের চেষ্টায় শেখা মানুষের কৃত্রিম এইসব আচার-আচরণের সমষ্টিকেই আমরা এক কথায় বলি ‘সংস্কৃতি’ বা ‘কৃষ্টি’।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমাদের শেখালেন, প্রতিটি সমাজের সংস্কৃতিই পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিটি সংস্কৃতিরই আছে একটি শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় রূপ, সময়ের ছাপ যাকে মলিন করতে পারে না। পৃথিবী সম্পর্কে প্রতিটি মানবগোষ্ঠীরই আছে একটা নিজস্ব ধ্যানধারণা এবং আছে নিজস্ব সমাজব্যবস্থা, আইনকানুন ও

রাজনৈতিক বিধিবিধান। সূর্যকে কেন্দ্র করে নিখুঁতভাবে গ্রহসমূহের প্রদক্ষিণের মতো এসব নিয়মকানুনও একটি গোষ্ঠীর মানুষজনের ভেতরে সুষ্ঠুভাবে বয়ে চলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় সে সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না। তা আগে যেমন ছিল তেমনভাবেই, একই গতিতে চলতে থাকে। বাইরে থেকে কোনো কিছু যদি এর পরিবর্তন করতে চায় তবেই কেবল তার পরিবর্তন সম্ভব। নৃতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিবিদরা তাই যখন 'সামোয়ান সংস্কৃতি' বা 'তাসমানিয়ান সংস্কৃতি'র কথা বলেন, তখন মনে হয় যেন সামোয়ানরা কিংবা তাসমানিয়ানরা গোড়া থেকেই ওই একই রকম বিশ্বাস ও রীতিনীতি মেনে চলছে।

আজকাল বেশিরভাগ সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরাই এই ধারণাকে ভুল বলে মেনে নিয়েছেন। প্রত্যেক সংস্কৃতির কিছু নিজস্ব বিশ্বাস, নির্দিষ্ট আচরণ এবং মূল্যবোধ আছে, কিন্তু এগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতও হচ্ছে। পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে বা আশপাশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে একটি সংস্কৃতি বদলে যেতে পারে। শুধু তা-ই না, সংস্কৃতি তার নিজের ভেতরকার চিরায়ত গতিময়তার জন্যও আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে। এমনকি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং স্থিতিশীল জৈবিক পরিবেশেও একটি সংস্কৃতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মানুষের তৈরি আইনকানুনগুলো পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের মতো নয় যে সেখানে কোনো পরস্পরবিরোধিতা থাকবে না। বরং মানুষের তৈরি প্রায় প্রত্যেকটি আইনকানুনের মধ্যেই অনেক রকম পরস্পরবিরোধিতা খুঁজে পাওয়া যাবে। সংস্কৃতি প্রতিনিয়তই এসব পরস্পরবিরোধিতা রোধ করার চেষ্টা করছে, আর তার ফলেই নিজেকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগীয় ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায় খ্রিষ্টধর্ম ও নাইটদের বীরত্বের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকালে চার্চে যেতেন এবং খ্রিষ্টীয় পুরোহিতদের কাছ থেকে সাধকদের জীবনকথা শুনতেন। পুরোহিত বয়ান করতেন– তুচ্ছের থেকেও তুচ্ছ সব, সব বস্তুগত অর্জনই বাহুল্য মাত্র। সম্পদ, কাম ও সম্মান মানুষের জন্য খুবই বিপজ্জনক ও লোভনীয়। তোমরা এই

সবকিছুর ঊর্ধ্বে ওঠো এবং যিশুর পদাঙ্ক অনুসরণ কর। যিশুর মতো নম্র ও ধৈর্যশীল হও, উগ্রতা পরিত্যাগ করো, সীমা অতিক্রম কোরো না এবং এক গালে চড় খেলে অন্য গালটা বাড়িয়ে দাও। বয়ান শেষে সবাই চার্চ থেকে নম্র ও ধৈর্যশীল, চিন্তামগ্ন অবস্থায় বাড়ি ফিরতেন। এর একটু পরে তারাই আবার সবচেয়ে ভালো ও দামি সিল্কের কাপড় পরে মনিবের প্রাসাদে যেতেন। সেখানে ছুটত ফুর্তি আর পানীয়ের ফোয়ারা, চারণকবিরা পুথি শোনাতেন প্রচলিত লোককাহিনি নিয়ে। অতিথিরা শোনাতেন চটুল, নোংরা কৌতুক অথবা রক্তাক্ত যুদ্ধের কাহিনি। ব্যারনরা সদর্পে ঘোষণা করতেন 'লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো। কেউ তোমাকে অসম্মান করলে একমাত্র রক্তক্ষরণেই সে অসম্মানের প্রতিকার হতে পারে। প্রাণভয়ে শত্রুর পালিয়ে যাওয়া এবং তাদের সুন্দরী কন্যাদের অসহায় হয়ে তোমার পায়ে লুটোপুটি খাওয়ার দৃশ্যের চেয়ে আনন্দের দৃশ্য আর কীই-বা হতে পারে?'

কোনোকালেই মানুষের এ ধরনের বৈপরীত্যপূর্ণ আচরণের পুরোপুরি অবসান হয়নি। কিন্তু ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায়, গির্জার যাজকমণ্ডলী এবং সাধারণ লোক একে সাদরে গ্রহণ করেছিল। ফলে, সূচনা হয়েছিল তাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের। সেই পরিবর্তনের ফলাফলই হলো ক্রুসেড (Crusade)। ক্রুসেডে নাইটরা তাদের সামরিক বীরত্ব বা ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করত তরবারির আঘাতে। ওই একই বিরোধের ফলে তৈরি হয় টেম্পলার (Templars) এবং হসপিটলার (Hospitallers), যারা খ্রিষ্টীয় ও সিভালরিক ধারণাগুলো আরো বেশি মিশিয়ে ফেলতে চাইত। মধ্যযুগীয় চিত্রশিল্প এবং সাহিত্যকেও তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। রাজা আর্থারের কাহিনি বা হোলি গ্রেইল (Holy Grail) তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেখানে ক্যামেলট (Camelot) ছিল মূলত একটা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা : 'একজন ভালো নাইট অবশ্যই একজন ভালো খ্রিষ্টান হবে, অন্যভাবে বললে, ভালো খ্রিষ্টানদের মধ্যে থেকেই শুধু ভালো নাইট পাওয়া যাবে।'

আরেকটি উদাহরণ হলো আধুনিক রাজনীতি। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে, সারা পৃথিবীর মানুষ সমতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে

মৌলিক অধিকার বলে মনে করে। অথচ এ দুটির মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। একটি অন্যটির প্রায় বিরোধী। সব মানুষের মধ্যে সমতা আনতে হলে কারো-না-কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেই হবে। আবার সবাইকে যার যার ইচ্ছামতো চলতে দিলে সমতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে যায়। ১৭৮৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসে ঘটা সবকিছুই যেন এই বিরোধকে একটা সংগতিপূর্ণ অবস্থানে আনার প্রচেষ্টা।

চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, উনিশ শতকের ইউরোপীয় উদার শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিল। সেটা করতে গিয়ে গরিব মানুষদের জেলে পুরতে আর অনাথ শিশুদের পকেটমার হতে বাধ্য করতেও পিছপা হয়নি তারা। আবার অন্যদিকে, আলেক্সান্দার সলঝেনিতসিনের উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সবাই জানেন যে, সাম্যবাদের আদর্শ ক্ষমতার এমন নির্মম ব্যবহার করেছে যে তা হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকের প্রাত্যহিক জীবনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার শামিল।

সমকালীন আমেরিকার রাজনীতিও এই একই অসংগতির ঘেরাটোপেই আবদ্ধ। ডেমোক্র্যাটরা (Democrats) সমতাভিত্তিক সমাজের পক্ষে। তারা প্রয়োজনের কর বৃদ্ধি করে হলেও গরিব, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে চান। কিন্তু, এর ফলে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত অর্থ কীভাবে খরচ করবে সে স্বাধীনতা খর্ব হয়। যে টাকা দিয়ে আমি আমার সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে পারি, সে টাকা দিয়ে কেন আমাকে স্বাস্থ্যবিমা কিনতে হবে? অন্যদিকে রিপাবলিকানরা (Republicans) মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়। এর জন্য যদি গরিব-ধনীর পার্থক্য বাড়ে বাড়ুক, গরিবেরা আরো গরিব হোক, আর ধনীরা আরো ধনী, সবাই স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারুক বা না পারুক, তাতে কিছুই যায়-আসে না। মানুষের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি যেমন খ্রিষ্টধর্ম ও সিভালরিকে মেলাতে পারেনি, তেমনই আধুনিক বিশ্ব সাম্য আর স্বাধীনতাকেও মেলাতে পারেনি। কিন্তু, এটাকে কোনো খুঁত হিসেবে বিবেচনা করা সংগত হবে না। এ

রকম অসংগতি বা পরস্পরবিরোধিতা প্রত্যেক সমাজ-সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বরং এটাই সংস্কৃতির চালিকাশক্তি। আমাদের প্রজাতির সৃজনশীলতা এবং গতিশীলতার মূল উৎস এটাই। বিবিধ সুর ও তানের অসামঞ্জস্য যেমন একটি সংগীতকে এগিয়ে নিয়ে যায় তেমনি আমাদের চিন্তা, ধারণা এবং মূল্যবোধের অসামঞ্জস্য আমাদের আরো চিন্তাশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে, নতুনভাবে দেখতে উৎসাহিত করে। চিন্তা ও কাজে সর্বদা একই নীতির অনুসরণ হলো অলস মস্তিষ্কের কাজ।

উত্তেজনা আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যদি হয় যে-কোনো সংস্কৃতিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাহলে সেসব সংস্কৃতির মানুষগুলোও স্ববিরোধী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন হবে এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যবোধের কারণে দ্বিধাবিভক্ত থাকবে। যে-কোনো সংস্কৃতির এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য যে এর একটা বিশেষ নামই আছে : 'চিন্তার অসংগতি' (Cognitive Dissonance)। চিন্তার অসংগতি মানে আসলে মানবসত্তারই এক ধরনের বিচ্যুতি। সত্যিকার অর্থে আসলে এটা বিরাট এক সম্পদ। মানুষ যদি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ধারণায় একই সঙ্গে বিশ্বাস করতে না পারত, তাহলে কোনো রকম মানবসংস্কৃতিই তৈরি করা কিংবা রক্ষা করা সম্ভব হতো না।

ধরুন একজন খ্রিষ্টান, মুসলমানদেরকে ভালোভাবে বুঝতে চায়। তাহলে তাকে আসলে প্রত্যেক মুসলমানের মনের ভেতরে আগলে রাখা আদিম কিছু মূল্যবোধের দিকে তাকালে হবে না। বরং তাকে তাকাতে হবে মুসলিম সংস্কৃতির দ্বন্দ্বের জায়গাগুলোতে যেখানে নিয়মকানুন আর মূল্যবোধগুলোর নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগে। ঠিক যে জায়গাটাতে মুসলমানরা কোন পথে যাবে ভাবতে ভাবতে সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়, সেখানেই তাদেরকে সবচেয়ে ভালোভাবে চেনা যাবে।

গুপ্তচরের স্যাটেলাইটের চোখে দেখা

মানুষের সংস্কৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন কি এলোমেলোভাবে হয়, নাকি কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয়? অন্য কথায় বলতে গেলে, ইতিহাসের কি চলার কোনো নির্দিষ্ট দিক আছে?

হ্যাঁ, আছে। হাজার বছর ধরে ছোটো ছোটো, সরল সংস্কৃতিগুলো আস্তে আস্তে বড়ো বড়ো সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। ফলে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে অল্পসংখ্যক কিন্তু বিশাল আকারের কিছু ‘মহা-সভ্যতা’। এগুলোর প্রত্যেকটি অনেক বড়ো এবং জটিল আকার ধারণ করেছে। অবশ্য, স্থূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এটা খুবই সরলীকৃত একটা ব্যাখ্যা। আর খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে দেখা যাবে যে বেশ কিছু ছোটো ছোটো সংস্কৃতি মিলে যেমন বিশাল বড়ো আকারের সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে, আবার বড়ো সংস্কৃতি ভেঙেও টুকরো টুকরো হচ্ছে। মোঙ্গল সাম্রাজ্য পুরো এশিয়া ও ইউরোপের আংশিক জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল, যেন কেবল ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার জন্যই। ওদিকে খ্রিষ্টধর্ম লাখ লাখ মানুষকে দীক্ষিত করেছে এবং একই সময়ে অগণিত সম্প্রদায়ে বিভক্তও হয়েছে। ল্যাটিন ভাষা পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তারপর আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ আঞ্চলিক ভাষার অনেকগুলোই জাতীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছে পরবর্তীকালে। এই ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়াটা আসলে এক বিশাল ঐক্যের পথে সামান্য উলটোযাত্রা মাত্র।

ইতিহাসের চলার পথটাকে বুঝতে চাওয়াটা আসলে অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়ার জন্য একটা উঁচু গাছের মগডালে উঠে বসার মতো। যখন আমরা ‘পাখির চোখ’ দিয়ে ইতিহাসকে দেখতে পারব, যেটা এক যুগ কিংবা শতক ধরে বয়ে চলা ঘটনাপ্রবাহকে আমাদের সামনে মেলে ধরবে, তখন বলা খুব মুশকিল হবে যে ইতিহাস কি আসলে ঐক্যের দিকে এগোচ্ছে নাকি বিভাজনের দিকে। সত্যি বলতে কি, মানব-ইতিহাসের মতো এত দীর্ঘ কলেবরের বিষয়কে বোঝার জন্য আমাদের ওই শখানেক বছরের দৃষ্টিসীমাটাও কম হয়ে যায়। তার চেয়ে আমরা যদি একটা মহাজাগতিক গুপ্তচর উপগ্রহের চোখ দিয়ে দেখতে পারতাম, যেটা আমাদের শত-সহস্র বছরের ঘটনা পরিক্রমা দেখাতে পারে, তাহলে বরং একটা ভালো দৃষ্টিভঙ্গি পেতাম। সে রকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এটা খুব পরিষ্কার হয়ে যেত যে ইতিহাস আসলে অবিশ্রান্তভাবে বয়ে চলেছে ঐক্যের দিকে। খ্রিষ্টধর্মের বিভাজন কিংবা

মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পতন আসলে ইতিহাসের মহাসড়কে ছোটো ছোটো গতি নিয়ন্ত্রক।

ইতিহাসের এই ঐক্যের দিকে পথ চলাকে সবচেয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার একটা উপায় হলো ইতিহাস জুড়ে একই সময় মোট কতগুলো আলাদা মানবসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, সেটা গুনতে থাকা। আমাদের হয়তো এখন মনে হয় পুরো পৃথিবীটা মিলে একটাই মানবসভ্যতা, কিন্তু ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়েই পৃথিবীটা ছিল আলাদা আলাদা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংখ্য মানবসভ্যতার এক মহাসমারোহ।

তাসমানিয়ার কথাই ধরা যাক, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে মাঝারি আকারের একটা দ্বীপ। এটা অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় প্রায় ১০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এর কারণ ছিল বরফ যুগের অবসানের পর সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি। কয়েক হাজার শিকারি-সংগ্রাহক থেকে গিয়েছিল সেই দ্বীপে। এরপর থেকে উনিশ শতকে ইউরোপীয়দের আগমনের আগ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে অন্য মানুষদের কোনো যোগাযোগই আর সম্ভব ছিল না। প্রায় বারো হাজার বছর ধরে কেউ জানতই না যে তাসমানিয়ানরা ওখানে আছে। আর তাসমানিয়ানরাও জানত না, পৃথিবীতে তারা ছাড়া অন্য মানুষও আছে। তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক উত্থান-পতন আর সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সবকিছুই হয়েছে। তাদের এই সবকিছুই বাকি পৃথিবী থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিল যে চীনের সম্রাটদের কাছে কিংবা মেসোপটেমিয়ার শাসকদের কাছে তারা অনেকটা বৃহস্পতি গ্রহের বাসিন্দার মতো। আসলে তাসমানিয়ানরা ছিল তাদের একেবারে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক জগতে।

আমেরিকা আর ইউরোপও কিন্তু ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়ে সম্পূর্ণ আলাদা দুই জগতে ছিল। ৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট ভ্যালেন্সকে (Valence) আদ্রিয়ানোপোলের যুদ্ধে পরাজিত এবং হত্যা করে গথরা। একই বছর টিকালের রাজা চাক টোক ইক’আককেও (Chak Tok Ich’aak of Tikal) পরাজিত ও হত্যা করে টিওটিহুয়াকান (Teotihuacan) সৈন্যরা। (টিকাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক মায়ান শহর, ওদিকে টিওটিহুয়াকান ছিল প্রায় আড়াই লাখ

বসবাসকারী নিয়ে আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো শহর– আকারে আর ক্ষমতায় সমকালীন রোমের মতোই) রোমের পতন আর টিওটিহুয়াকানের উত্থানের মধ্যে কোনো রকম যোগাযোগই ছিল না। ব্যাপারটা যেন এমন যে, রোম আছে মঙ্গল গ্রহে আর টিওটিহুয়াকান আছে বুধে।

এবারে আমাদের শুরুর দিককার প্রশ্নে ফিরে যাই– একই সময়ে কতগুলো আলাদা রকমের মানবসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে? ১০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রায় বেশ কয়েক হাজার আলাদা সভ্যতা ছিল। দুই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে এসে সেই সংখ্যাটা কমে কয়েক শতে এসে দাঁড়াল, কিংবা খুব বেশি হলে দু-এক হাজার। ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দের সময় সেই সংখ্যাটা একেবারে কমে গেল। সেই সময়, ইউরোপিয়ানদের পৃথিবী অনুসন্ধানের ঠিক আগ দিয়ে, পৃথিবীতে তাসমানিয়ার মতো বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ছোটো ছোটো সভ্যতা ছিল। কিন্তু প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই বসবাস করত এক বিশাল সভ্যতায় : তার নাম আফ্রো-এশিয়ান সভ্যতা। সে সময় এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকার বেশিরভাগই কিছু নির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সুতোয় বাঁধা ছিল।

সে সময়কার মানবজনগোষ্ঠীর বাকি ১০ ভাগকে মোটামুটি আকারের চারটে সভ্যতায় ভাগ করা যেতে পারে :

১। মেসোআমেরিকান সভ্যতা, মধ্য আমেরিকার প্রায় পুরোটা আর উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ নিয়ে।
২। আন্দিয়ান সভ্যতা, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমভাগের প্রায় পুরোটা নিয়ে।
৩। অস্ট্রেলিয়ান সভ্যতা, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ নিয়ে।
৪। দ্বীপ সভ্যতা, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে শুরু করে হাওয়াই থেকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত সবগুলো দ্বীপ নিয়ে।

এরপরের ৩০০ বছরের মধ্যে বিশাল ব্যাপ্তির আফ্রো-এশিয়ান সভ্যতা বাকি সব সভ্যতাকে একরকম গিলেই খেয়ে ফেলে। এটি মেসোআমেরিকান সভ্যতাকে গ্রাস করে ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে, যখন

স্প্যানিশরা অ্যাজটেকদের পরাজিত করে। দ্বীপ সভ্যতায় প্রথম আঘাতটা আসে ওই একই সময়ে যখন ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান (Ferdinand Magellan) নৌকায় চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরোয়। আন্দিয়ান সভ্যতা ধসে পড়ে ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে, যখন স্প্যানিশরা ইনকা সভ্যতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রথম ইউরোপিয়ানরা পা রাখে ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে আর তারপরই ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সেই আদি-অকৃত্রিম সভ্যতাটির সমাপ্তি হয় ব্রিটিশ কলোনির অভ্যুত্থানে। এর ১৫ বছর পর ব্রিটিশরা তাদের প্রথম বাসস্থান গড়ে তাসমানিয়ায়, আর এর মাধ্যমেই সর্বশেষ স্বায়ত্তশাসিত সভ্যতাটাও আফ্রো-এশিয়ান সভ্যতার আওতায় চলে আসে।

দৈত্যাকার আফ্রো-এশিয়ান সভ্যতার এই সবকিছু গিলে খেতে বেশ কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। আর এই প্রক্রিয়াটা ছিল অপরিবর্তনীয়। আজকের দিনে প্রায় প্রতিটি মানুষ একই ভূ্রাজনৈতিক ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে (পুরো পৃথিবীটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনেকগুলো দেশে বিভক্ত)। একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (পুঁজিবাদী বাজার এখন এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে দূরবর্তী কোণেও পৌঁছে গেছে), একই আইনগত ব্যবস্থা (মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন এখন সর্বত্র বিরাজমান, অন্তত তত্ত্বীয়ভাবে হলেও) এবং একই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও (ইরান, ইসরায়েল, অস্ট্রেলিয়া কিংবা আর্জেন্টিনার বিশেষজ্ঞরা সকলেই পরমাণুর গঠনের ব্যাপারে অথবা যক্ষ্মার চিকিৎসার ব্যাপারে একমত) মেনে নিয়েছে।

এই একটিমাত্র বৈশ্বিক সভ্যতা আবার সব জায়গায় ঠিক একই রকম নয়। ঠিক যেরকম একটা জীবন্ত দেহে বিভিন্ন রকম অঙ্গ কিংবা কোষ থাকে, সে রকম আমাদের বৈশ্বিক সভ্যতার মধ্যেও আছে বিচিত্র সব মানুষ এবং তাদের বিচিত্র জীবন যাপন। একইভাবে, নিউ ইয়র্কের শেয়ারবাজারের দালাল থেকে শুরু করে আফগান রাখাল পর্যন্ত সবাই এখন এই বৈশ্বিক সভ্যতার অংশ। মানবদেহের নানা রকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই তারাও একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং একে অপরকে নানা উপায়ে প্রভাবিত করছে। পূর্বের অনেকগুলো

বিচ্ছিন্ন সভ্যতার মানুষদের মতোই তারা এখনো তর্ক করে কিংবা যুদ্ধ করে কিন্তু সেই তর্ক হয় একই রকম কতকগুলো ধারণা নিয়ে আর সেই যুদ্ধও হয় একই রকম কিছু অস্ত্র দিয়ে। আজকের দিনে সত্যিকার 'সভ্যতার সংঘাত'-এর ধরনটি কয়েকজন বধিরের কথোপকথনের প্রচলিত প্রবাদটির মতো। সকলেই কিছু বলছে কিন্তু কেউই বুঝতে পারছে না অন্যজন কী বলছে। সে কারণেই জাতি, রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক অধিকার আর পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানের মতো একই সাধারণ বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও একে অপরের বিরুদ্ধে রণসজ্জায় মেতে উঠছে ইরাক আর যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুটি দেশ।
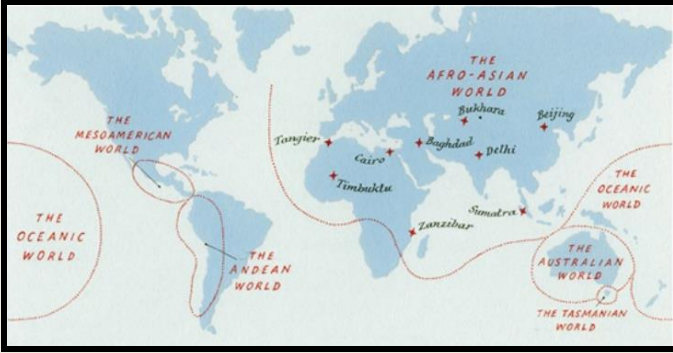
ম্যাপ ৩। ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দের পৃথিবী। আফ্রো-এশিয়ান সভ্যতার মধ্যেকার যে জায়গাগুলোর নাম চিহ্নিত আছে সেগুলো হলো চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম ভ্রমণকারী ইবনে বতুতার দর্শন করা স্থান। মরক্কোর তানজিয়ার অধিবাসী ইবনে বতুতা ভ্রমণ করেছিলেন টিমবুকতু, জানজিবার, দক্ষিণ রাশিয়া, মধ্য এশিয়া, ভারত, চীন আর ইন্দোনেশিয়া। তার এই ভ্রমণ আধুনিক সভ্যতার প্রারম্ভে আফ্রো-এশিয়ান সভ্যতার ঐক্যেরই ছবি আঁকে।

আমরা এখনো মৌলিক সংস্কৃতির কথা বলি, এই মৌলিকতা বলতে যদি আমরা বোঝাতে চাই এমন এক সভ্যতা, যা নিজে নিজেই গড়ে উঠেছে এবং যা বাইরের সব সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে এখনো প্রাচীন সব আঞ্চলিক প্রথা ধরে রেখেছে, তাহলে বলতেই হয় পৃথিবীতে আর কোনো মৌলিক সভ্যতা অবশিষ্ট নেই। গত কিছু

শতাব্দী ধরে প্রায় প্রতিটি সভ্যতাই বৈশ্বিক প্রভাবে এমনভাবে বদলে গেছে যে তাদের আলাদা করে চেনাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই বিশ্বায়নের অন্যতম উদাহরণ হলো 'ঐতিহ্যবাহী' খাবারদাবার। একটা ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে আমরা আশা করি টম্যাটো সস দেওয়া স্প্যাগেটি। আমরা ধরেই নিই যে কোনো পোলিশ কিংবা আইরিশ রেস্টুরেন্টে থাকবে অনেক অনেক আলু, আর্জেন্টিনিয়ান রেস্টুরেন্টে পাওয়া যাবে গোরুর মাংসের কয়েক ডজন পদ, একটা ভারতীয় রেস্টুরেন্টে প্রায় সবকিছুর সঙ্গেই থাকবে ঝাল মরিচ আর সুইস ক্যাফের বিশেষত্বই হলো ক্রিমসহ গরম চকলেট। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এসব খাবারের কোনোটাই কিন্তু তাদের নিজস্ব নয়! টম্যাটো, মরিচ আর কোকো সবগুলোই মূলত মেক্সিকো থেকে আসা। এগুলো ইউরোপ আর এশিয়াতে পৌঁছায় স্প্যানিশদের মেক্সিকো জয়ের পর। জুলিয়াস সিজার কিংবা দান্তে আলিঘিয়েরি কখনোই কাঁটাচামচ (এমনকি কাঁটাচামচও তখন আবিষ্কার হয়নি) দিয়ে টম্যাটো-চুপচুপে স্প্যাগেটি খাননি। উইলিয়াম টেল কখনো চকলেটের স্বাদই পাননি এবং বুদ্ধও কখনো তাঁর খাবারে একগাদা ঝাল মরিচ দেননি। আলু পোল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ডে আসে বড়োজোর ৪০০ বছর আগে। ১৪৯২ সালের দিকে আর্জেন্টিনার একমাত্র মাংস ছিল আসলে লামার মাংস।

হলিউডের চলচ্চিত্রগুলো আমেরিকার সমতলের আদিবাসীদের সব সময় খুব সাহসী ঘোড়সওয়ার হিসেবে উপস্থাপন করে আসছে। এসব চলচ্চিত্রে দেখা যায়, তারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য খুব বীরত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের যানবাহনে আক্রমণ করছে। কিন্তু এই আদিবাসীদের ঘোড়ায় চড়াটা কোনোভাবেই তাদের প্রাচীন সংস্কৃতির অংশ নয় বরং এটা হলো ইউরোপীয় ঘোড়ার আগমনের পর সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে ঘটে যাওয়া সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলাফল। সত্যি কথা বলতে, ১৪৯২ সালে আমেরিকায় কোনো ঘোড়াই ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সিওক্স (Sioux) আর অ্যাপাচি (Apache) সভ্যতার অনেক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু এগুলো

আসলে আধুনিক সভ্যতা এবং বৈশ্বিক প্রভাবের ফলাফল– মোটেই মৌলিক কিছু নয়।

বৈশ্বিক দর্শন

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, বৈশ্বিক ঐক্যের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপ সেটা ঘটেছে সাম্প্রতিক কিছু শতাব্দীতেই, সাম্রাজ্যগুলো বিস্তৃত হওয়ার এবং বাণিজ্য আরো জোরদার হওয়ার পর। আফ্রো-এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দ্বীপ সভ্যতার মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে অনেক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সেই কারণেই মেক্সিকোর মরিচ চলে গেছে ভারতীয় খাবারে আর স্প্যানিশ পশু চরে বেড়াচ্ছে আর্জেন্টিনায়। আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটেছে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে। এ সময়ই বৈশ্বিক সাম্রাজ্যের একটা ধারণা প্রথম প্রকাশিত হয়। যদিও হাজার বছর ধরে ইতিহাস একটা ঐক্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, তার পরও, এর আগে পর্যন্ত একটা বৈশ্বিক সাম্রাজ্য সারা পৃথিবী শাসন করছে এইরকম ধারণা কিন্তু বেশিরভাগ লোকের কাছেই ছিল অমূলক।

২৫। সিওক্স প্রধান (১৯০৫)। সিওক্স কিংবা অন্য কোনো সমতল ভূমির উপজাতিদের কাছে ১৪৯২ সালের আগে কোনো ঘোড়াই ছিল না।

হোমো সেপিয়েন্স বিবর্তিত হয়েছে নিজেদেরকে 'আমরা' এবং 'তারা' এই দুভাগে বিভক্ত করে। 'আমরা' হলো আমার চারপাশের মানুষজন, আর 'তারা' হলো বাকি সব মানুষ। সত্যি বলতে, কোনো সামাজিক প্রাণীই কখনোই সামগ্রিক ভাবে তাদের পুরো জাতির কথা ভেবে এগোয়নি। কোনো শিম্পাঞ্জিই কিন্তু শিম্পাঞ্জি প্রজাতির কথা চিন্তা করে না, কোনো শামুকই সারা বিশ্বের শামুক জাতির জন্য তার শুঁড় উঁচু করে না, কোনো সিংহ নেতা সারা বিশ্বের সিংহদের নেতা হওয়ার জন্য লড়াই করে না কিংবা কোনো মৌচাকের সামনেই– 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' স্লোগান শুনতে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের পর থেকে হোমো সেপিয়েন্স এই দিক থেকে অনেক বেশি আলাদা হতে থাকে। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সঙ্গেও তার সহযোগিতার সম্পর্ক আরো জোরদার হতে থাকে, যাদেরকে তারা 'ভাই' কিংবা 'বন্ধু' হিসেবে কল্পনা করতে থাকে। তবে তার এই ভ্রাতৃত্ববোধ তখনো বিশ্বজনীন ছিল না। সবাইকে তখনো তারা 'নিজেদের' বলে ভাবতে শেখেনি। পাশের উপত্যকা কিংবা পাহাড়ের ওপারেই তখনো 'তাদের' দেখা পাওয়া যেত। প্রথম ফারাও মেনেস (Menes) ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে মিশরকে একতাবদ্ধ করলেন। তখন মিশরের মানুষদের ধারণা ছিল যে, মিশরের একটা সীমারেখা আছে, আর তার বাইরে যারা আছে তারা সবাই 'বর্বর'। তাদের চোখে বর্বরেরা ছিল সম্পূর্ণ অচেনা কিছু, তারা ছিল একটা হুমকিস্বরূপ। তবে তাদের ব্যাপারে একমাত্র আগ্রহের বিষয় ছিল তাদের জমি আর সম্পদ, যা দখল করে নেওয়া যায়। এভাবেই মানুষ যত রকম কাল্পনিক কাঠামো বানিয়েছে সবখানেই তারা মানবজাতির একটা বড়ো অংশকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এসেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে তিনটি বড়ো আকারের বৈশ্বিক রীতির আগমন ঘটল। এর অনুসারীরা প্রথমবারের মতো পুরো পৃথিবীকে এবং পুরো মানবজাতিকে একটা নির্দিষ্ট সাম্রাজ্য হিসেবে কল্পনা করতে পারল, যে সাম্রাজ্য পরিচালিত হবে একটাই নির্দিষ্ট নিয়মে।

সেখানে সবাই ছিল ‘আমরা’, অন্তত তত্ত্বগতভাবে। সেখানে আর কোনো ‘তারা’ অবশিষ্ট ছিল না। প্রথম বৈশ্বিক রীতি ছিল অর্থনৈতিক রীতি : টাকার রীতি। দ্বিতীয় বৈশ্বিক রীতি ছিল রাজনৈতিক : সাম্রাজ্যের রীতি। তৃতীয় বৈশ্বিক রীতি ছিল বৈশ্বিক ধর্ম যেমন বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম আর ইসলাম।

ব্যবসায়ী, সম্রাট আর ধর্মপ্রচারকরা হলো প্রথম মানুষ যারা ‘আমরা বনাম তারা’ এই দ্বৈত বিভক্তির সীমার বাইরে গিয়ে সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের সম্ভাবনা অনুভব করতে পেরেছিল। ব্যবসায়ীদের জন্য পুরো পৃথিবীটা ছিল একটামাত্র বাজার আর সমস্ত মানুষই ক্রেতা। তারা চেষ্টা করেছিল এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে, যেটা সবার জন্য সর্বত্র প্রযোজ্য হবে। সম্রাটদের জন্য পুরো পৃথিবীটা জুড়ে একটাই সাম্রাজ্য আর সমস্ত মানুষ তার প্রজা। আর ধর্মপ্রচারকদের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে ছিল একটাই সত্য আর সব মানুষই ছিল সেই সত্যে বিশ্বাসী। তারাও চেষ্টা করেছিল এমন কোনো রীতি প্রতিষ্ঠা করার, যেটা সবার জন্য সর্বত্র প্রযোজ্য হবে।

সর্বশেষ তিন সহস্রাব্দ ধরে মানুষ আরো বেশি বেশি করে চেষ্টা করেছে সেই বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করার। সামনের তিন অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে টাকা, সাম্রাজ্য ও ধর্ম পৃথিবীকে আজকের এই অবস্থায় এনেছে। আমরা শুরু করব ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দিগ্‌বিজয়ী বীরকে দিয়ে, যে অসম্ভব রকম সহ্যশক্তি এবং অভিযোজন ক্ষমতারর অধিকারী, যে সব মানুষকে তার অনুগত শিষ্যে পরিণত করতে পারে। সেই দিগ্‌বিজয়ী বীর হলো টাকা। যেসব মানুষ একই ঈশ্বরে বিশ্বাস কওে না কিংবা একই রাজার প্রজা নয় তারাও একই টাকা ব্যবহারের সময় এক পায়ে খাড়া। ওসামা বিন লাদেন, যে কি না আমেরিকার সংস্কৃতি, আমেরিকার ধর্ম আর আমেরিকার রাজনীতিকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত তারও কিন্তু আমেরিকান ডলারের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। টাকা কীভাবে এমন অসাধ্য সাধন করল, যেটা কিনা দেবতারা কিংবা রাজারাও করতে পারল না?

অধ্যায় ১০

টাকার গন্ধ পাই

হার্নান কর্টেজ তাঁর দলবল নিয়ে ১৫১৯ সালে মেক্সিকো আক্রমণ করেন। তখনকার মেক্সিকো ছিল একটা আলাদা দুনিয়া, বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের পরিচয় দিত অ্যাজটেক (Aztecs) নামে। অ্যাজটেকরা খুব দ্রুতই আবিষ্কার করল, তাদের দেশের এই আগন্তুকদের মধ্যে হলুদ রঙের বিশেষ একটি ধাতুর ব্যাপারে একটু বেশিরকম আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তাদের আগ্রহ এত বেশি যে তারা এই একটা জিনিস ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। অ্যাজটেকরা যে সোনা চিনত না, তা নয়। দেখতে সুন্দর, আর সহজে নানা রকম আকার দেওয়া যায়, তাই সোনা দিয়ে মূর্তি আর গয়না বানাত তারা। মাঝেমধ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সোনার গুঁড়োও ব্যবহৃত হতো। তবে অ্যাজটেকরা কিছু কিনতে গেলে দাম দিত কোকো বীজ কিংবা কাপড়ের মাধ্যমে। তাই সোনার প্রতি স্পেনীয়দের আকর্ষণটা তাদের কাছে বেশ অদ্ভুত ঠেকল। খাওয়া যায় না, মাথায়ও দেওয়া যায় না, এমনকি জিনিসটা এত নরম যে সেটা দিয়ে কোনো হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতিও বানানো যায় না– তাহলে এটাতে কী আছে যে স্পেনীয়রা এর জন্য এমন পাগল হলো? কোনো এক অ্যাজটেকের এই প্রশ্নের উত্তরে কর্টেজ বলেছিলেন, ‘আমরা সবাই এমন এক রোগে আক্রান্ত, যা সারাবার একমাত্র ওষুধ হলো সোনা।’[১]

স্পেনীয়দের নিবাস আফ্রো-এশিয়ান ভূখণ্ডে তখন স্বর্ণের মোহ মহামারির মতো ছড়িয়ে গেছে। শত্রুমিত্র সবার কাছেই তখন সেটা এক পরম আরাধ্য বস্তু। মেক্সিকো দখলের শ-তিনেক বছর আগে কর্টেজের পূর্বপুরুষেরাই আইবেরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম

দেশগুলোর সঙ্গে এক ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যিশুখ্রিষ্টের অনুসারী আর আল্লাহর বান্দাদের মধ্যকার সেই যুদ্ধে প্রাণ হারায় হাজার হাজার মানুষ, নষ্ট হয় অগণিত সাজানো বাগান আর ফসলের মাঠ। আল্লাহ ও যিশুর মহিমা বৃদ্ধি করতে গিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় অনেক সমৃদ্ধ নগরী।

যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা যখন একটু এগিয়ে গেল, তখন তারা তাদের বিজয়চিহ্ন হিসেবে মসজিদ ভেঙে গির্জা গড়তে শুরু করল। শুধু তা-ই নয়, খ্রিষ্টানরা তখন চালু করল নতুন স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। সে মুদ্রায় ছিল ক্রুশ চিহ্ন, আর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার বাণী। এর সঙ্গে তারা চালু করল 'মিলারেস' (Millares) নামে একরকম চারকোনা মুদ্রা, যার কথাগুলো অন্যরকম। খ্রিষ্টানদের তৈরি সেই মুদ্রায় আরবিতে লেখা ছিল 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই, মুহাম্মদ তাঁরই দূত। মেলগিউয়েল (Melgueil) আর অ্যাগডের (Agde) ক্যাথলিক যাজকরাও এসব মুদ্রা তৈরি করতেন, আর ঈশ্বরভীরু খ্রিষ্টান জনতাও সেগুলো ব্যবহার করতেন নিঃসংকোচে।[২]

ওদিকে মুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম ঘটনাই ঘটেছিল। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম ব্যবসায়ীরা খ্রিষ্টানদের মুদ্রাও ব্যবহার করত। ফ্লোরেন্সের ফ্লোরিন, ভেনিসের ডুকাট বা নেপলসের গিগলিয়াটো– কোনো মুদ্রায়ই তাদের আপত্তি ছিল না। এমনকি অবিশ্বাসী খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলিম শাসকেরাও যিশুখ্রিষ্ট এবং তাঁর কুমারী মায়ের নামাঙ্কিত মুদ্রায় খুশি মনেই খাজনা গ্রহণ করতেন।[৩]

ফেলো কড়ি, মাখো তেল

শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের টাকা ছিল না। নিজেদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস তারা শিকার করে বা কুড়িয়ে পেত, অথবা বানিয়ে নিত নিজেরাই। খাবার, ওষুধ, জামা, জুতা– সবকিছুই। গোষ্ঠীর একেকজন মানুষ একেকটা কাজে পারদর্শী হতো, কিন্তু তারা একে

অপরকে সাহায্য করত সব সময়। একজন কারো কাছ থেকে খাবার জন্য মাংস পেলে বিনিময়ে হয়তো তাকে চিকিৎসাসেবা দিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীই অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কড়ি, রং, পাথর– এরকম অল্প কিছু জিনিসের জন্য তাদের নিজ গোষ্ঠীর বাইরের লোকের কাছে যেতে হতো। তাদের লেনদেনগুলোও হতো খুব সহজে– অল্প কয়েকটা কড়ির বিনিময়ে হয়তো পাওয়া যেত একটা চকমকি পাথর।

কৃষিবিপ্লবের পরেও মানবসমাজের অর্থনীতি খুব বেশি বদলায়নি। কৃষিযুগে মানুষ ছোটো ছোটো গ্রাম তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করে। এই গ্রামগুলোও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ছিল। গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজেদের এবং আশপাশের মানুষজনের বেশিরভাগ প্রয়োজন মেটাত, গ্রামের বাইরে লেনদেন করতে হতো খুব কম। কেউ হয়তো ভালো জুতো তৈরি করত, কেউ হয়তো নানান রোগের চিকিৎসায় পারদর্শী ছিল। গ্রামের বাকি লোকেরা জানত জুতো হারালে বা অসুস্থ হলে কার কাছে যেতে হবে। কিন্তু গ্রামগুলো ছিল ছোটো আর তাতে মানুষও ছিল কম, তাই সারা দিন ধরে জুতো তৈরি বা চিকিৎসা করতে পারত না কেউ, গৃহস্থালির অন্য কাজগুলোও তো করতে হবে।

বড়ো বড়ো শহর ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা আর যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরি হওয়ার পর একজন মানুষ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পুরোপুরি মনোনিবেশ করার সুযোগ পেল। ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোতে একেকজন মানুষ হয়ে উঠতে লাগল পেশাদার চিকিৎসক, কাঠমিস্ত্রি, ধর্মযাজক, সৈন্য কিংবা উকিল। অনেক গ্রামেই উৎকৃষ্ট মানের মদ, জলপাই তেল আর মাটির পাত্র তৈরি হতো। সেসব গ্রামের মানুষ ভাবল, যে জিনিসটা তারা ভালো বানাতে পারে শুধু সেটা বেশি করে বানালেই তো হয়। বাকি সব দরকারি জিনিস তো এগুলোর বিনিময়ে অন্যদের কাছ থেকে জোগাড় করা যায়। বুদ্ধিটা খারাপ নয়। সব জায়গার আবহাওয়া আর মাটির গুণাগুণ তো সমান নয়, তাই সবকিছু সব জায়গায় সমানভাবে হয় না। আমার বাগানে যদি ভালো

আঙুর না হয়, তবে পাশের গ্রামের চমৎকার মদ রেখে কেন কেন নিজের বানানো যেনতেন মদ খাব? আমার গ্রামের মাটিতে যদি ভালো পাত্র তৈরি না করা যায়, তবে পাশের গ্রাম থেকে ভালো পাত্র কেনাই তো উচিত। শুধু মদ আর মাটির পাত্রের মান নয়, সেই সময় মানুষের পেশাগত দক্ষতাও বেড়ে গেল। প্রচুর চর্চার ফলে চিকিৎসক ও উকিলের মতো পেশার মানুষেরা তাদের দক্ষতা ঝালিয়ে নেওয়ারও সুযোগ পেল। কিন্তু এর ফলে তৈরি হলো নতুন একটি সমস্যা। একেকজন মানুষ একেকটা জিনিস ভালোভাবে তৈরি করতে শিখলেও, প্রয়োজন তো আছে সবকিছুরই। তাহলে অন্যের তৈরি করা জিনিসের সঙ্গে নিজের তৈরি জিনিসের বিনিময়টা কীভাবে হবে?

অন্যের প্রয়োজনে নিজের উৎপাদিত পণ্য দেওয়া এবং নিজের প্রয়োজনে অন্যের থেকে নেওয়া– অনেকগুলো অচেনা মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠা একটা সমাজে এরকম বিনিময়প্রথা চালু রাখা কঠিন। নিজের পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীদের সাহায্য করা সহজ, কিন্তু বাইরের মানুষের ক্ষেত্রে? বহিরাগত মানুষকে সাহায্য করে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা কম। আবার কাউকে কোনোভাবে সাহায্য করলে সেও যে পালটা সাহায্য করতে পারবে তারও নিশ্চয়তা নেই। তার পরও যদি পণ্যের সংখ্যা কম হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিময়পদ্ধতি চললেও চলতে পারে। কিন্তু কোনো জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই পদ্ধতির ওপর গড়ে উঠতে পারে না।[৪]

ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক। মনে করুন, আপনি সেই সময়ের একজন আপেলচাষি। সারা দেশের সবচেয়ে মিষ্টি আপেল যে বাগানে ফলে, সেটা আপনার। পাহাড়ের কোলের সেই আপেল বাগানে সারা দিন খাটতে খাটতে একদিন আপনার জুতো গেল ছিঁড়ে। তো আপনি তখন একটা গাধায় চড়ে রওনা দিলেন নদীর ধারের বাজারে, ওখানে যে মুচি আছে তার কাছে থেকে শক্তপোক্ত এক জোড়া জুতো বানিয়ে আনতে। গিয়ে মুচিকে বললেন এমন এক জোড়া জুতো বানিয়ে দিতে যেটা টিকবে কমসে কম পাঁচ

বছর, বিনিময়ে আপনি তাকে দেবেন আপনার বাগানের চমৎকার কিছু আপেল।

মুচি মাথা চুলকে ভাবতে লাগল, এক জোড়া জুতোর বদলে কতগুলো আপেল চাইবে সে? প্রতিদিন অনেক মানুষকেই সে জুতো বানিয়ে দেয়– বিনিময়ে কেউ দেয় আপেল, কেউ দেয় গম, না হয় একটা ছাগল, নয়তো খানিকটা কাপড়– সবাই যে ভালো জিনিসটাই দেয় তাও নয়। আবার এমন লোকও জুতো কিনতে আসে যাদের রাজদরবারে ভালো যোগাযোগ আছে, কিংবা হয়তো পিঠের ব্যথা সারিয়ে দিতে পারে, জুতোর দাম হিসেবে সেটাও মন্দ নয়। আগেরবার যখন কেউ আপেল দিয়ে জুতো কিনতে এসেছিল, সেও মাস তিনেক আগের কথা। তখন জুতোর বিনিময়ে সে তিন বস্তা না চার বস্তা আপেল দিয়েছিল তা এখন মনে নেই। তবে এটা মনে পড়ছে যে আপেলগুলো বেশ টক ছিল। আবার সেবার সে যে জুতোটা বানিয়েছিল সেটা ছিল মেয়েদের জুতো, ছোটো আকারের, এবারেরটা তা নয়। এদিকে গত কয়েক মাস ধরে কী একটা রোগে গোরু-ছাগল মরে যাচ্ছে, চামড়াওয়ালারা তাই চামড়ার বদলে এক জোড়ার জায়গায় দুজোড়া করে জুতো চাইছে। সেটাও ভাববার বিষয়।

এই বিনিময়ের অর্থনীতিতে প্রতিদিন আপেলচাষি আর মুচিকে নতুন করে আপেল আর জুতোর বিনিময় মূল্য ঠিক করতে হবে। এখন বাজারে যদি ১০০ রকমের পণ্য থাকে তাহলে সবাইকে মোট ৪ হাজার ৯৫০ রকমের বিনিময়ের হিসাব মাথায় নিয়ে ঘুরতে হবে। আর ১ হাজারটা পণ্য থাকলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৪ লাখ ৯৯ হাজার ৫০০![৫] এভাবে কি চলে?

এখানেই শেষ নয়। ধরুন এক জোড়া জুতোর বদলে কতগুলো আপেল দেওয়া যায় সেটাও কোনো একভাবে ঠিক করা গেল। তাহলেও কি লেনদেন সম্ভব? বিনিময় হতে হবে দুপক্ষের সম্মতিতে। মুচি যদি বলে তার আপেলের কোনো দরকার নেই, আপাতত সে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পথ খুঁজছে, তাহলে? আপনি হয়তো

ভাবলেন, এ আর এমন কী, আপেল নিতে চায় এমন একজন উকিলকে খুঁজে বের করতে পারলেই তো বেশ একটা ত্রিপক্ষীয় বিনিময় করে ফেলা যায়। কিন্তু উকিল যদি আবার বলে আপেল চাই না, চুল ছাঁটাতে চাই– তখন?

এই সমস্যার সমাধান করতে কিছু কিছু সমাজে একটা কেন্দ্রীয় বিনিময় ব্যবস্থা তৈরি হলো। এই ব্যবস্থায় যে যা-কিছু উৎপাদন করে তা সংগ্রহ করা হলো, তারপর সেগুলো সবার মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বিলিবণ্টন করে দেওয়া হলো। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো এবং ব্যর্থ উদাহরণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ওখানে 'সবাই সাধ্যমতো কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ গ্রহণ করবে'– এই নীতিটা বাস্তবে পালটে গিয়ে হয়ে গেল 'সবাই যথাসম্ভব কম কাজ করবে এবং যত বেশি সম্ভব সম্পদ আদায় করবে'। কয়েক জায়গায় এই উদ্যোগ কিছুটা সফল হয়েছিল, তার মধ্যে একটা হলো ইনকা সাম্রাজ্য। তবে ঘুরেফিরে সব সমাজই একটা সমাধানে থিতু হয়েছে– সেটা হলো টাকা।

কড়ি আর বিড়ি

টাকা জিনিসটা নানা জায়গায় নানাভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। টাকা আবিষ্কারের জন্য কোনো প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের দরকার হয়নি, এটা ছিল সম্পূর্ণ মানসিক বিপ্লব। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা মানুষের যেসব সামষ্টিক কল্পনানির্ভর ধারণাগুলোর কথা বলেছিলাম, তার মধ্যে অন্যতম হলো টাকা।

টাকা মানে ধাতব পয়সা বা কাগজের নোট নয়, টাকা হলো এমন কিছু, যা দিয়ে যে-কোনো কিছুর একটা সুনির্দিষ্ট তুলনামূলক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। টাকায় মূল্য নির্ধারণ করলে খুব সহজে বিভিন্ন জিনিসের বিনিময় মূল্য বের করা যায়। কতগুলো আপেল দিয়ে এক জোড়া জুতো পাওয়া যাবে, সেটা খুব সহজে বোঝা যাবে, যদি আমরা দুটো জিনিসের দামই টাকায় হিসাব করি। টাকার কারণে এই

বিনিময়টাও খুব সহজ হয়ে যায়, সম্পদ সঞ্চয় করতেও সুবিধা হয়। টাকা অনেক রকমের হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত রূপ হলো ধাতব পয়সা। তবে পয়সা তৈরির বহু আগেই মুদ্রাব্যবস্থা চালু হয়। মুদ্রা হিসেবে অনেক কিছুই ব্যবহৃত হয়েছে– কড়ি, গৃহপালিত পশু, চামড়া, লবণ, খাদ্যশস্য, কাপড় কিংবা প্রতিজ্ঞাপত্র (নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার করা কাগজ– অনেকটা এখনকার চেকের মতো)। ৪ হাজার বছর আগে আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া আর ওশেনিয়াতে কড়ির মুদ্রা চালু ছিল। ব্রিটিশ শাসিত উগান্ডাতে গত শতাব্দীতেও কড়ি দিয়ে কর পরিশোধ করেছে মানুষ।
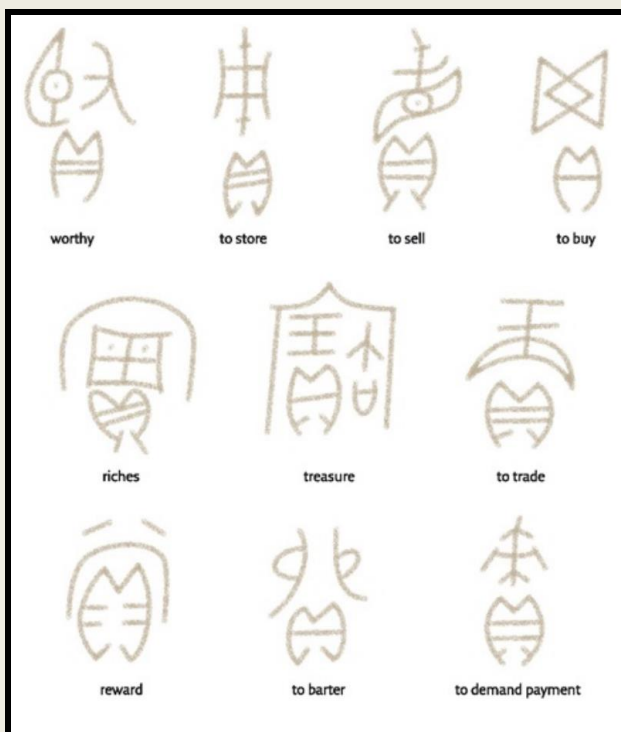
২৬। প্রাচীন চৈনিক লিপিতে কড়ির ওপর নানা ধরনের চিহ্ন দিয়ে টাকা বোঝানো হতো। 'বিক্রি' কিংবা 'পুরস্কার'-এর জন্য আলাদা আলাদা চিহ্ন ছিল

আজকের দিনের জেলখানা আর বন্দিশিবিরগুলোতে মুদ্রা হিসেবে সিগারেট বেশ চলে। এমনকি অধূমপায়ী বন্দিরাও এই মুদ্রায় বেচাকেনা করে। সব ধরনের দ্রব্য ও সেবার দাম হিসাব করা হয় সিগারেট দিয়ে। আউশভিৎস (Auschwitz) বন্দিশিবির থেকে ফেরা এক যুদ্ধবন্দির মুখেই শোনা যায়, 'আমরা সবাই সিগারেটকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। সবকিছুর দাম হিসাব করতাম সিগারেটে। 'স্বাভাবিক' সময়ে, মানে যখন গ্যাস চেম্বারের জন্য নিয়মিত নতুন কয়েদিরা আসত, তখন ১২টা সিগারেট দিয়ে একটা পাউরুটি পাওয়া যেত। ৩০টা সিগারেট দিয়ে পাওয়া যেত একটা ৩০০ গ্রামের মাখনের প্যাকেট, ৮০ থেকে ২০০ সিগারেটে একটা হাতঘড়ি। এক লিটার অ্যালকোহলের দাম ছিল পুরো ৪০০টা সিগারেট!"[৬]

সত্যি বলতে কি, আজকের দিনেও ছাপানো নোট আর পয়সাও টাকার ধারণার একটা ছোট্ট উদাহরণ বই আর কিছু নয়! ২০০৬ সালে সারা পৃথিবীর সব মানুষের মোট অর্থসম্পদের পরিমাণ ছিল ৬০ লাখ কোটি ডলার, কিন্তু পৃথিবীর সব কাগজের নোট আর পয়সা জড়ো করলে তার মোট মূল্যমান হতো ৬ লাখ কোটি ডলারেরও কম।[৭] অর্থাৎ মোট সম্পদের ৯০ শতাংশেরও বেশি হলো স্রেফ ব্যাংকের খাতায় বা কম্পিউটারের ডিস্কে লেখা কিছু সংখ্যা। আজকের দিনে বেশিরভাগ ব্যাবসায়িক লেনদেন হচ্ছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে। হাতে নগদ টাকা লেনদেন না করে সেটা করা হচ্ছে চেকের মাধ্যমে অথবা এক কম্পিউটার থেকে কিছু তথ্য অন্য এক কম্পিউটারে পাঠিয়ে। এক ফেরারি আসামি ছাড়া আর কেউ কি আজকের দিনে একটা বাড়ি কিনতে বস্তাভর্তি টাকা নিয়ে যাবে? নোট আর পয়সার চেয়ে টাকার পরিমাণটা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে একটা তথ্য হিসেবে বহন করা অনেক সহজ, হিসাব রাখাও সহজ।

জটিল বাণিজ্যিক পরিবেশে একটা মুদ্রাব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। এই মুদ্রাব্যবস্থা থাকার কারণেই একজন মুচির শুধু বিভিন্ন রকম জুতোর দাম জানলেই চলে, এক জোড়া জুতো কয়টা আপেলের সমান সেটা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয় না। আবার এই মুদ্রাব্যবস্থার জন্যই একজন আপেলচাষিকে জুতোর জন্য আপেলভক্ত

মুচি খুঁজে বেড়াতে হয় না। টাকার সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এটাই যে, টাকা সর্বজনগ্রাহ্য। একজন মানুষের কাছে টাকা গ্রহণযোগ্য, কারণ সমাজের বাকি সবার কাছেও সেটা গ্রহণযোগ্য। টাকার বিনিময়ে সবাই তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিক্রি করতে রাজি, কারণ টাকা দিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসটাও কিনে ফেলা যায়।

টাকা হলো এমন এক সর্বজনীন মাধ্যম, যা ব্যবহার করে যে-কোনো কিছুকে অন্য যে-কোনো কিছুতে রূপান্তর করা যায়। এই টাকার মাধ্যমেই পেশিশক্তি জ্ঞানে পরিণত হয়, যখন একজন সৈনিক ছুটি নিয়ে তার সৈনিকজীবনের জমানো টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। একজন জমিদার যখন তাঁর জমি বিক্রি করা টাকায় কর্মচারীদের বেতন দেন, আসলে তিনি তখন জমির বিনিময়ে অর্জন করেন আনুগত্য। টাকার মাধ্যমেই স্বাস্থ্যসেবা পরিণত হতে পারে আইনগত সাহায্যে, যখন একজন চিকিৎসক তাঁর পারিশ্রমিক থেকে উকিলের পারিশ্রমিক দেন। এমনকি যৌনতার মতো ব্যাপারকেও পরকালের পাপমুক্তির কাজে লাগাতে পারে এই টাকা– পঞ্চদশ শতাব্দীতে কিছু নারী পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত টাকা খরচ করতেন ক্যাথলিক গির্জা থেকে পাপমুক্তির সনদ কিনতে।

টাকা শুধু এক জিনিসকে অন্য জিনিসে রূপান্তরই করে না, টাকার আরেকটা গুণ হলো– সেটা সম্পদ সংরক্ষণের জন্যও খুব উপযোগী। অনেক মূল্যবান জিনিস আছে, যা ধরেই রাখা যায় না, যেমন সময় বা সৌন্দর্য। আবার অনেক সম্পদ ধরে রাখা যায় অল্প সময়ের জন্য, যেমন স্ট্রবেরি। কিছু সম্পদ আছে যা রেখে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে জায়গা আর যত্ন দুই-ই দরকার, যেমন খাদ্যশস্য। খাদ্যশস্য বছরের পর বছর রাখা যায়, কিন্তু সেজন্য বিরাট গোলা বানাতে হবে, শস্য শুকনো রাখতে হবে, চোর আর ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। অন্যদিকে টাকা, সেটা কাগজ হোক, কড়ি হোক বা কম্পিউটারের ডিস্কের কোনো সংখ্যাই হোক, এইসব সমস্যা থেকে মুক্ত। কড়ি পচে যায় না, ইঁদুরে খায় না, আগুনেও পোড়ে না, আবার রাখতে বেশি জায়গাও লাগে না।

সম্পদকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হলে সম্পদ শুধু এক জায়গায় রেখে দিলে চলে না, মাঝে মাঝে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন হয়। স্থাবর সম্পদ, যেমন ঘরবাড়ি, নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু কষ্টসাধ্য। কল্পনা করুন টাকার প্রচলনের আগের সেই প্রাচীন পৃথিবীর কথা। সেখানে একজন ধনী কৃষকের আছে বিশাল বাড়ি আর মাঠভরা ধান। সে যদি দূরে কোথাও চলে যেতে চায়, তার এত সম্পদের কী হবে? বাড়ি আর মাঠের ধান কোনোটাই সঙ্গে নেওয়ার মতো নয়। এগুলোর বিনিময়ে সে প্রচুর পরিমাণে চাল বা অন্য কোনো শস্য জোগাড় করতে পারে, কিন্তু সেটা নিয়ে যাওয়াও কি এত সহজ? টাকা থাকলে এটা কোনো সমস্যাই নয়। সে সোজা তার বাড়ি আর জমি বিক্রি করে দেবে, তারপর একথলে কড়ি সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে যেখানে ইচ্ছা।

টাকার তারল্যের কারণে তাকে যে-কোনো কিছুতে পরিণত করা যায়, জমিয়ে রাখা যায়, আবার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়েও যাওয়া যায়। এই গুণের কারণেই বর্তমান গতিময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পেছনে টাকার গুরুত্ব অপরিসীম। টাকা ছাড়া এমন বিশাল, জটিল ও গতিশীল অর্থনীতির কথা কল্পনাও করা যেত না।

টাকা কীভাবে কাজ করে?

কড়ি থেকে ডলার, যে রূপেই থাকুক, টাকা মূল্যবান; কারণ এর মূল্য আছে আমাদের সম্মিলিত কল্পনায়। এই মূল্য কড়ির রাসায়নিক গুণাগুণ বা কাগজের রং বা আকার-আকৃতির জন্য নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে টাকা আসলে কোনো বস্তু নয়, একটা মানসিক ধারণা মাত্র। তার মানে আমরা যখন কিছু বিক্রি করে টাকা নিই, তখন টাকা বাস্তব বস্তুকে রূপান্তরিত করে একটা কাল্পনিক বস্তুতে। তাই প্রশ্ন আসে, এই ধারণাটা কাজ করে কেন? কেন একজন কৃষক মাঠভরা ধানের বদলে কতগুলো কড়ি গ্রহণ করত? কেন আজকের দিনে কয়েকটা রংচঙে কাগজের জন্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নানা রকম কাজ করে মানুষ?

মানুষ এসব কাজ করে তাদের সম্মিলিত কল্পনার ওপর বিশ্বাস রেখে। পৃথিবীতে যত রকম মুদ্রাব্যবস্থা চালু আছে, তাদের প্রত্যেকটার মূল ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস। একজন কৃষক যখন কিছু কড়ির বিনিময়ে তার সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে দূরদেশে পাড়ি জমায়, সে তখন বিশ্বাস করে যে সে যেখানে যাচ্ছে সেখানকার মানুষও এই কড়ির বিনিময়ে তাকে খাবার ও আশ্রয় দেবে। টাকাকে মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের উপকরণ বললে কম বলা হয়, আসলে টাকা হলো সারা পৃথিবীর মানুষের সর্বজনীন ও সর্ববৃহৎ সমন্বিত বিশ্বাসের আধার।

এই বিশ্বাসটা একদিনে তৈরি হয়নি, এটা অনেক দিনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল। আমি কেন কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা বা কাগজের নোটে বিশ্বাস করব? আমি বিশ্বাস করব কারণ আমার আশপাশের সব মানুষ এতে বিশ্বাস করে। আবার আমার আশপাশের মানুষ বিশ্বাস কওে, কারণ আমি এতে বিশ্বাস করি। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, কারণ দেশের রাজাও এতে বিশ্বাস করেন; খাজনা আদায় করেন এর মাধ্যমেই। আমাদের পুরোহিতরাও এতে বিশ্বাস রেখেই সব খাজনা গ্রহণ করেন। একটা ডলারের নোটের এক পাশে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর, অন্য পাশে লেখা 'ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাস' (In God We Trust)। এই বিশ্বাসই আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক কাঠামোর সঙ্গে মুদ্রাব্যবস্থাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। এ সম্পর্ক এতই গভীর যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, ব্যবসায়ীদের মেজাজ-মর্জির ওপর নির্ভর করে শেয়ারবাজার ওঠে আর নামে।

শুরুতে যখন 'টাকা' জিনিসটার প্রচলন হয়, তখন এই বিশ্বাসের ব্যাপারটা ছিল না। তাই তখন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো এমন কিছু, যার একটা সত্যিকারের মূল্য আছে। মানুষের জানামতে, প্রথম অর্থ ছিল সুমেরীয় এলাকায় ব্যবহৃত বার্লি-টাকা। মজার ব্যাপার হলো টাকা হিসেবে বার্লির প্রচলন হয়েছিল ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে, ঠিক যখন মানুষ সেই একই জায়গায় লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করে। এই দুটো ঘটনা সমসাময়িক হওয়ার কারণ হলো, মানুষ

লিখতে শুরু করে মূলত তাদের প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার্থে। আর প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বেড়ে যায়। সেই বর্ধিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাহিদা পূরণ করতেই টাকার উদ্ভব।

বার্লি-টাকা আসলে বার্লিই, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্লিকে তখন কোনো জিনিসের মূল্য পরিমাপ ও বিনিময়ের জন্য একক হিসেবে ধরা হতো। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পরিমাণটার নাম ছিল 'সিলা' (Sila), সেটা প্রায় এক লিটারের সমান। বার্লি পরিমাপের জন্য এক সিলা প্রমাণ আয়তনের পাত্রও তখন প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হতো, তাই বার্লি দিয়ে লেনদেন করাটা বেশ সহজ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় কর্মীদের বেতনও দেওয়া হতো বার্লিতে। একজন পুরুষ শ্রমিক তার কাজের জন্য পেত মাসে ৬০ সিলা বার্লি, নারী শ্রমিক পেত তার অর্ধেক। শ্রমিকদের সর্দার পেত মাসে ১ হাজার ২০০ থেকে ৫ হাজার সিলা। সবচেয়ে বড়ো খাদকের পক্ষেও এক মাসে ৫ হাজার সিলা বার্লি খাওয়া সম্ভব নয়, তবে অতিরিক্ত বার্লি দিয়ে অন্য সব দরকারি জিনিস কেনা যেত।[৮]

বার্লির নিজের একটা মূল্য থাকলেও একটা পণ্যকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে মানুষকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। হওয়ারই কথা। আজ যদি আপনি এক বস্তা বার্লি নিয়ে কোনো ফাস্টফুডের দোকানে গিয়ে সেটার বিনিময়ে একটা পিজা অর্ডার দেন, দোকানের লোকজন সম্ভবত পুলিশে খবর দেবে। তবে 'টাকা' জিনিসটার ওপর সবাইকে যে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, বার্লির ক্ষেত্রে সেটা বেশ সহজেই হয়েছিল। কারণ বস্তু হিসেবে বার্লির তো আসলেই একটা সহজাত মূল্য আছে, খিদে পেলে সেটা খাওয়া যায়। কিন্তু বার্লি জমিয়ে রাখা বা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা তত সহজ নয়। টাকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বিপ্লবটা ঘটে যখন মানুষ আপাতমূল্যহীন, সঞ্চয় ও বহনযোগ্য কোনো বস্তুকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে। সেটা ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, মেসোপটেমিয়াতে। রূপাকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে সেখানকার মানুষ। একে বলা হতো শেকেল (Shekel)।

সেই রুপার শেকেলকে ঠিক পয়সা বলা যাবে না, মোটামুটি ৮.৩৩ গ্রাম রুপাকে এক শেকেল বলা হতো। হাম্মুরাবির আইনে যে বলা হয়েছিল কোনো উচ্চতর মানুষ কোনো দাসীকে হত্যা করলে দাসীর মালিককে ২০ শেকেল রুপা ক্ষতিপূরণ দেবে, এর মানে হলো তাকে ১৬৬ গ্রাম রুপা দিতে হবে, বিশটা রৌপ্যমুদ্রা নয়। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু জায়গায়ও রৌপ্যমুদ্রা নয়, রুপা দেওয়ার কথা আছে। জোসেফের ভাইয়েরা তাকে ২০ শেকেল, অর্থাৎ ১৬৬ গ্রাম রুপার বিনিময়ে বেচে দিয়েছিল ইসমায়েলিদের কাছে।

বার্লির সঙ্গে রুপার পার্থক্য হলো, বার্লির মতো রুপার বিশেষ কোনো উপযোগিতা নেই। রুপা খাওয়া যায় না, গায়েও দেওয়া যায় না, রুপা দিয়ে কোনো কাজের জন্য যন্ত্রপাতিও বানানো যায় না (রুপা দিয়ে লাঙলের ফলা বা তলোয়ার বানালে প্রথম আঘাতেই সেটা দুমড়েমুচড়ে যাবে)। হ্যাঁ, একটা কাজে সেটা লাগত বটে, সোনা আর রুপা দিয়ে গয়না বানানো হতো, আর সেটা ছিল আভিজাত্যের চিহ্ন। অর্থাৎ রুপা দিয়ে কোনো প্রয়োজন না মিটলেও বিলাসিতার জন্য, সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য সেটা ব্যবহৃত হতো। রুপার মূল্য ছিল পুরোপুরিই সাংস্কৃতিক।

মূল্যবান ধাতুগুলোর নির্দিষ্ট ওজনকে মানদণ্ড ধরে লেনদেন করতে করতে একসময় মানুষ ধাতব পয়সা আবিষ্কার করে ফেলে। খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪০ সালের দিকে ইতিহাসের প্রথম পয়সা তৈরি হয় পশ্চিম আনাতোলিয়ায়, লিডিয়ার রাজা আলিয়াতেসের (King Alyattes of Lydia) রাজত্বে। একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা বা রুপা দিয়ে একেকটা পয়সা তৈরি হতো। পয়সাগুলোর ওপরে খোদাই করা থাকত কোনো একটা চিহ্ন। এই চিহ্ন দিয়ে দুটো কাজ হতো। এক, পয়সার মূল্যমান বোঝা যেতো; আর দুই, পয়সাটা যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে সেটা নিশ্চিত হতো। আজকের পৃথিবীতে চালু থাকা প্রায় সব পয়সাই সেই একই নীতিতে তৈরি।

ধাতবখণ্ডের চেয়ে ধাতব পয়সা ব্যবহার করা দুটো কারণে বেশি সুবিধাজনক। প্রথমত, ধাতুখণ্ড দিয়ে বেচাকেনা করতে গেলে প্রতিবার সেটার ওজন মাপতে হতো; আর দ্বিতীয়ত, খালি ওজন মাপলেই নিশ্চিত হওয়া যেত না। যে রুপার টুকরোগুলো গ্রহণ করবে

সে কীভাবে জানবে যে ওগুলো আসল রূপা, রুপার প্রলেপ দেওয়া সিসা নয়? পয়সা ব্যবহার করলে দুটো সমস্যাই দূর হয়। পয়সার ওপরের চিহ্নটাই নিশ্চিত করে যে ওটার ওজন ঠিক আছে, দাঁড়িপাল্লায় না মেপেই ওগুলো গ্রহণ করা যায়। আর তার চেয়েও বড়ো কথা হলো, ওই চিহ্ন দেখেই বোঝা যায় যে পয়সাগুলো বানিয়েছে কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

যুগে যুগে পয়সার ওজন, আকার ও চিহ্ন নানাভাবে বদলেছে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত নীতি একই আছে। পয়সার ওপরের চিহ্নটা হলো রাজার বাণী : 'আমি, মহান সম্রাট, নিশ্চিত করছি যে এই পয়সাটায় ঠিক পাঁচ গ্রাম সোনা আছে। কেউ যদি এই পয়সা জাল করার দুঃসাহস দেখায়, অর্থাৎ আমার স্বাক্ষর নকল করে, সেটা হবে আমার মর্যাদার ওপর চরম আঘাত, আর সে অপরাধের জন্য সে পাবে চরমতম শাস্তি।'। এজন্যই টাকা জাল করাকে শুধু লোক ঠকানো নয়, তার চেয়েও বড়ো মাপের অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। টাকা জাল করার অর্থ হলো সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন, স্বয়ং রাজার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ। এ ধরনের অপরাধে সাধারণত শাস্তি হতো নির্যাতন ও মৃত্যু। মানুষ যতদিন রাজা ও তার রাজত্বে বিশ্বাস করবে, ততদিন ওই রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রাকেও বিশ্বাস করবে। রোমান সাম্রাজ্যের বাইরের মানুষও রোমের ডিনেরিয়াস (Denarius) মুদ্রা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করত, কারণ তারা রোমান সম্রাটকে বিশ্বাস করত, আর ওই মুদ্রায় আঁকা থাকত সেই সম্রাটেরই নাম ও ছবি।

২৭। ইতিহাসের অন্যতম পুরোনো এক মুদ্রা, খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর লিডিয়ায় ব্যবহার হতো

আবার উলটোভাবে রোমান সম্রাটের ক্ষমতাও নিহিত ছিল এই ডিনেরিয়াস মুদ্রার মধ্যে। শুধু চিন্তা করে দেখুন তো, ওই বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের প্রজাদের কাছ থেকে যদি খাজনা আদায় করা হতো গম আর বার্লিতে, কেমন হতো সেটা? আবার সেই খাজনা রোমের রাজকোষে জমাই-বা হতো কীভাবে, আর সেটা ব্রিটেনে নিয়ে গিয়ে সেখানকার সৈন্যদের বেতনই-বা দেওয়া যেত কীভাবে? কী হতো যদি শুধু রোমের মানুষ এই মুদ্রা ব্যবহার করত আর বাইরের লোকে সেটা গ্রহণ না করে কড়ি ব্যবহার করত? সেক্ষেত্রেও সেই পুরোনো সমস্যা রয়েই যেত।

স্বর্ণের মহিমা

রোমান মুদ্রা ডিনেরিয়াসের ওপর মানুষের আস্থা এতটাই বেশি ছিল যে রোমান সাম্রাজ্যের বাইরের মানুষও সেটা সাদরে গ্রহণ করে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতেও এই ডিনেরিয়াস চলত, যদিও রোমান সৈন্যবাহিনী তখনো ভারত থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। এই মুদ্রার ওপর ভারতীয়দের আস্থা এতই বেশি ছিল যে তারা ডিনেরিয়াসের আদলে মুদ্রা তৈরি করতে শুরু করে, এমনকি রোমান সম্রাটের ছবিসহ! 'ডিনেরিয়াস' শব্দটাই মুদ্রার প্রতিশব্দে পরিণত হয়। এই রোমান 'ডিনেরিয়াস' নামটাই আরব খলিফাদের হাতে হয়ে যায় আরবি 'দিনার'। আজও জর্দান, ইরাক, সার্বিয়া, মেসিডোনিয়া, তিউনিসিয়াসহ বেশ কিছু দেশের রাষ্ট্রীয় মুদ্রার নাম দিনার।

এই লিডীয় ধাঁচের মুদ্রা যখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক তখনই চীনে গড়ে উঠছিল নতুন এক মুদ্রাব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার মুদ্রা ছিল ব্রোঞ্জের পয়সা আর চিহ্নবিহীন সোনা ও রুপার পিণ্ড। তবে এই দুরকম মুদ্রার মধ্যে একটা জায়গায় মিল ছিল, সেটা হলো সোনা ও রুপার ব্যবহার। এ কারণেই চৈনিক অঞ্চলের সঙ্গে লিডীয় অঞ্চলের আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হতে সমস্যা হয়নি। মুসলিম ও ইউরোপীয় বণিক ও দিগ্‌বিজয়ীদের হাত ধরে স্বর্ণের মহিমা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর আনাচকানাচে। আর আজকের পৃথিবীটা জুড়েই একই মুদ্রাব্যবস্থা

চলে, যার মূলে আছে সোনা ও রুপা, আর আছে ব্রিটিশ পাউন্ড ও মার্কিন ডলারের মতো কয়েকটা মুদ্রা।

এই বহুজাতিক মুদ্রার উদ্ভব প্রথমে এশিয়া ও আফ্রিকা আর পরে পুরো পৃথিবীকেই অর্থনৈতিকভাবে একীভূত করে ফেলে। মানুষ আগের মতোই নানা ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন শাসকের প্রতি আনুগত্য জানায়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম পালন করে, কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রায় লেনদেন করতে তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। সোনা ও রুপার মূল্যের ওপর সব মানুষের এই যৌথ বিশ্বাস না থাকলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। ষোড়শ শতকে আমেরিকায় পাওয়া সোনা দিয়ে ইউরোপীয়রা পূর্ব এশিয়া থেকে সিল্কের কাপড়, চীনামাটির বাসন আর মসলা কিনেছিল। এভাবেই ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়া উভয় স্থানের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়। মেক্সিকোর খনি থেকে তোলা সোনা আর রুপা ইউরোপের ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে গিয়ে পৌঁছায় চীনের সিল্ক ও চীনামাটি ব্যবসায়ীর টাকার থলেতে। কর্টেজের মতো 'স্বর্ণই যার একমাত্র ওষুধ', সেই রোগে আক্রান্ত না হলে কি চীনা ব্যবসায়ীরা সোনা আর রুপার বিনিময়ে তাদের পণ্য বিক্রি করত?

এখন প্রশ্ন জাগে, চীনা, ভারতীয়, মুসলিম আর স্পেনীয়– এই বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না, যাতে তাদের সবাই বিশ্বাস করে। কিন্তু মুদ্রা তৈরির বেলায় সোনা ব্যবহার করেছে এদের সবাই, এই এক জায়গায় এদের কারো মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কীভাবে সম্ভব হলো এটা? এমন কি হতে পারত না যে একই সময়ে মুদ্রা হিসেবে স্পেনীয়রা ব্যবহার করছে সোনা, মুসলিমরা বার্লি, ভারতীয়রা কড়ি আর চৈনিকরা সিল্ক? এর একটা উত্তর পাওয়া যায় অর্থনীতিবিদদের কাছে। দুটো অঞ্চলের মধ্যে যখন একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন চাহিদা আর জোগানের ভারসাম্য রাখতে বহনযোগ্য পণ্যগুলোর দাম সমান হয়ে যেতে থাকে। এটা বোঝার জন্য ভাবুন, ভারত আর ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার মধ্যে যখন ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু হলো, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় তখন সোনা মর্যাদার চিহ্ন, তাই তার মূল্যও বেশি। ওদিকে তখন ভারতে সোনার কানাকড়িও দাম নেই। এরপর কী হলো?

ভ্রাম্যমাণ বণিকেরা দেখল ভূমধ্যসাগর আর ভারতে সোনার দামের অনেক ফারাক। তাই লাভের আশায় তারা ভারত থেকে সস্তায় সোনা কিনে ভূমধ্যসাগরে চড়া দামে বেচতে শুরু করল। এর ফলে ভারতে সৃষ্টি হলো সোনার আকাশছোঁয়া চাহিদা, তাই সেটার দামও গেল বেড়ে। ওদিকে ভূমধ্যসাগরের দিকে সোনার জোগান দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় তার দামও কমতে লাগল। এর ফলে কিছু দিনের মধ্যেই দুই জায়গাতেই সোনার দাম কাছাকাছি এসে গেল। তখন ভারতীয়দের কাছে সোনা তেমন দরকারি বা মূল্যবান না হলেও ভূমধ্যসাগরে এটার ব্যাপক চাহিদা দেখে তারাও এটাকে মূল্যবান ভেবে নিল।

একইভাবে আমরা যখন দেখি একজন মানুষ, যে বন্ধু হোক বা শত্রু, কড়ি, ডলার কিংবা ইলেকট্রনিক তথ্যকে মূল্যবান বলে বিশ্বাস করছে, তখন সেই বিশ্বাস আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এভাবে সেই জিনিসটার ওপর সব মানুষের যৌথ বিশ্বাস আরো পাকাপোক্ত হয়। খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে এক হতে পারেনি, কিন্তু একই মুদ্রাব্যবস্থায় বিশ্বাস করেছে ঠিকই। এর কারণ হলো, ধর্মের ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া কোনো কিছুতে বিশ্বাস করলেই হয়, কিন্তু মুদ্রার বেলায় অন্যরা যা বিশ্বাস করে তাতেই নিজের বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়।

হাজার হাজার বছর ধরে অনেক দার্শনিক, ধর্মপ্রচারক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি টাকাকে হেয় করেছেন, বলেছেন অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু তার পরেও, মানুষের সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত নিদর্শন হলো টাকা। মানুষের ভাষা, আইনকানুন, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সামাজিকতার চেয়ে টাকা অনেক বেশি উন্মুক্ত আর সর্বজনীন। টাকা হলো মানুষের তৈরি একমাত্র জিনিস, যা সব রকম সাংস্কৃতিক দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারে। টাকার কাছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গনির্বিশেষে সব মানুষই সমান। যে মানুষটাকে আমরা চিনি না বা বিশ্বাস করি না, তার সঙ্গেও আমরা নির্দ্বিধায় আর্থিক লেনদেন করতে পারি এই টাকারই বদৌলতে।

টাকার মূল্য

সব ধরনের মুদ্রার দুটো বৈশিষ্ট্য থাকে :

ক। সর্বজনীন বিনিময়যোগ্যতা : প্রাচীন আলকেমিস্টরা যেমন যে-কোনো কিছুকে সোনা বানাতে পারতেন বলে বলা হয়, তেমনি টাকাও যে-কোনো কিছুকে যে-কোনো কিছুতে পরিণত করতে পারে, যেমন জমিকে আনুগত্যে কিংবা সন্ত্রাসকে শিক্ষায়।

খ। সর্বজনীন বিশ্বাস : যে-কোনো দুজন মানুষের মধ্যে কোনো কাজে লেনদেনের মাধ্যম হতে পারে টাকা।

এই দুটো নীতির কারণেই পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ বাণিজ্য ও শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর একটা অন্ধকার দিকও আছে। যখন যে-কোনো কিছুকে যে-কোনো কিছুতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়, আর যখন সব মানুষ একই ধারণায় বিশ্বাস করে, তখন ঐতিহ্য, মানবিক সম্পর্ক আর মূল্যবোধে ভাঙন ধরে, আর এদের জায়গা নিয়ে নেয় চাহিদা-জোগানের হিসাব।

মানুষের পরিবার ও সমাজ যেসব ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে, তার মধ্যে আছে মর্যাদা, সততা, আদর্শ ও ভালোবাসার মতো কিছু জিনিস। এগুলোর প্রত্যেকটিই 'অমূল্য', এগুলো বাজারে বেচাকেনা হয় না, টাকায় এগুলোর দাম নির্ধারণ করা যায় না। এসব মানবীয় গুণের জন্যই মা-বাবা তার সন্তানকে দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারে না, একজন ধার্মিক পাপ করতে পারে না, একজন অনুগত সৈনিক দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।

নদীর খরস্রোত যেমন বাঁধের ফাটল ভেদ করে যেতে চায়, তেমনি টাকাও ভেঙে দিতে চায় মানুষের এই নীতি ও আদর্শের দেওয়াল। বাবা-মা পরিবারের অন্যদের খাবার জোগাতে নিজের সন্তানকে বেচে দিয়েছে– এমনও তো শোনা যায়। ধার্মিক মানুষও চুরি করে, মানুষকে ঠকায় বা হত্যা করে টাকার জন্য, আবার সে টাকা খরচ করে প্রার্থনালয়ে, স্রষ্টার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈনিক টাকার বিনিময়ে হাত মেলায় শত্রুর সঙ্গে।

টাকার আরো অন্ধকার দিক আছে। টাকা অপরিচিত মানুষদের মধ্যে একটা সর্বজনীন বিশ্বাস তৈরি করতে পারে বটে, কিন্তু এই

বিশ্বাস কখনো মানুষ, সমাজ বা মানুষের মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না– সে বিশ্বাস কাজ করে কেবল টাকার ওপরেই। আমরা একজন অপরিচিত মানুষকে, এমনকি পাশের বাড়ির মানুষটাকেও বিশ্বাস করি না, কিন্তু তার পকেটের টাকাকে বিশ্বাস করি ঠিকই। টাকা ফুরালে ফুরায় সেই বিশ্বাসও। টাকা যতই মানুষের সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শে ফাটল ধরায়, ততই এই পৃথিবীটা ধীরে ধীরে পরিণত হয় মানবিক অনুভূতিহীন একটা বাজারে।

মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাস দ্বন্দ্বময়। যে মানুষ একদিকে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে লেনদেন করছে টাকার ওপর নির্ভর করে, সেই মানুষই আবার শঙ্কিত হচ্ছে টাকার কাছে মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ হারানোর ভয়ে। টাকার জন্যই মানুষ নীতি ও আদর্শকে পায়ে ঠেলছে, আবার মানুষই টাকার কাছে সবকিছু বিকিয়ে না দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে প্রাণপণ।

ইদানীং মানুষ ধরেই নিয়েছে যে টাকার আগ্রাসনকে হয়তো রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজের চেষ্টায় আর প্রতিহত করা যাবে না। কিন্তু সেটা আসলে ঠিক নয়। এমন অনেকবারই হয়েছে যে বীর যোদ্ধা, গোঁড়া ধার্মিক আর সচেতন নাগরিকেরা চতুর ব্যবসায়ীদের সব হিসাবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অর্থনীতিরই মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাই সমগ্র মানবজাতি কীভাবে এক হলো সেটা বুঝতে হলে শুধু অর্থনীতির দিক থেকে চিন্তা করলেই হবে না। এই সুদীর্ঘ সময়ে হাজারো ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ মিলে যে একটা বৈশ্বিক সমাজ গড়ে তুলেছে, এর পেছনে সোনা আর রুপার বড়ো ভূমিকা আছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ইস্পাতের কথাটা ভুলে গেলে চলবে না।

অধ্যায় ১১

সাম্রাজ্যবাদী বাসনা

প্রাচীন রোমান শাসকদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ বড়ো সাম্রাজ্যের মতোই, রোমানরাও প্রায়ই যুদ্ধকালীন ছোটো ছোটো লড়াইয়ে একের পর এক পরাজিত হতো, কিন্তু শেষমেশ যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় তারাই ছিনিয়ে আনত। কোনো সাম্রাজ্য ছোটোখাটো এইসব সাময়িক পরাজয় মেনে নিয়ে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে না পারলে বা নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু না করতে পারলে সেটা প্রকৃতপক্ষে কোনো সাম্রাজ্যই নয়। সর্বদা হার-জিতে অভ্যস্ত এই রোমানরাও খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি উত্তর আইবেরিয়া (Iberia) থেকে আসা একটি সংবাদে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটি পুঁচকে, নগণ্য পাহাড়ি শহর নুমানশিয়া (Numantia), সাগরবেষ্টিত আদিবাসী সেল্টরা (Celt) ছাড়া আর কেউ যেখানে থাকে না, তারা নাকি বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বশ্যতা অস্বীকার করেছে! মেসিডোনিয়ান এবং সেলুসিড সাম্রাজ্যকে পরাস্ত করে, গ্রিসের বিখ্যাত নগররাষ্ট্রগুলোকে নিজের আয়ত্তে এনে আর কার্থেজ নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে রোম তখন ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সমস্ত ভূভাগের একচ্ছত্র অধিপতি। আর অন্যদিকে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি জমি ছাড়া নুমানশিয়ানদের সম্বল বলতে আর কিছুই নেই। তার পরও তারা হাজার হাজার সৈন্যের রোমান বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে যায়নি বা তাদের কাছে নতি স্বীকার করেনি।

১৩৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমানদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তাদের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদ নুমানশিয়ানদের শায়েস্তা করার জন্য সিপিও

এমিলিনাসকে (Scipio Aemilianus) মনোনীত করলেন। সিপিও ছিলেন রোমের সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং তাঁর নেতৃত্বেই রোমানরা কার্থেজ নগরকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এই কাজের জন্য নিয়োগ করা হলো ৩০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। সিপিও নুমানশিয়ানদের লড়াকু মনোভাব এবং সমরকৌশলকে সম্মান করতেন, তাই নিজেদের সৈন্যদের অযথা প্রাণহানি এড়ানোর জন্য তিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে নিজেদের বিরত রাখলেন। এর পরিবর্তে তিনি নিলেন এক অভিনব রণকৌশল। তিনি নুমানশিয়ার চারপাশে বৃত্তাকার দুর্গ নির্মাণ করে নুমানশিয়া শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন এবং বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে নুমানশিয়ার যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। ক্ষুধাই রোমানদের প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজ করল। একবছরের একটু বেশি সময় পর নুমানশিয়ানের খাবারের জোগান নিঃশেষ হয়ে এলো। নুমানশিয়ানরা যখন বুঝতে পারল তাদের বাঁচার আর কোনো আশা নেই, তারা নিজেরাই তাদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল এবং রোমান ঐতিহাসিকদের মতে, নুমানশিয়ানদের বেশিরভাগই নিজেদেরকে রোমানদের দাস হওয়া থেকে বাঁচাতে আত্মহত্যা করেছিল।

পরবর্তীকালে, নুমানশিয়া স্প্যানিশদের কাছে স্বাধীনতা এবং মনোবলের প্রতীক হয়ে ওঠে। *ডন কুইক্সোট* উপন্যাসের লেখক মিগুয়েল ডি সারভানতেস ‘নুমানশিয়া অবরোধ’ (The Siege of Numantia) নামে একটি ট্র্যাজেডি লেখেন। এই ট্র্যাজেডির ইতি ঘটে নুমানশিয়া নগর ধ্বংসের ঘটনার মধ্য দিয়ে, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় স্পেনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাবাদ। নুমানশিয়ার স্বাধীনতাকামী লড়াকু সৈন্যদের জন্য কবি রচনা করেন বিজয়গাথা, নুমানশিয়া অবরোধের চিত্র শিল্পীর তুলির আঁচড়ে রাজকীয় মহিমায় ফুটে ওঠে ক্যানভাসে। ১৮৮২ সালে নুমানশিয়ার ধ্বংসাবশেষকে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তা হয়ে ওঠে দেশপ্রেমিক স্প্যানিশদের জন্য এক তীর্থক্ষেত্র। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের বিখ্যাত স্প্যানিশ কমিকগুলোর মূল চরিত্র সুপারম্যান বা স্পাইডারম্যান ছিল না, ছিল এল হাবাতো (El Jabato), এক কাল্পনিক আইবেরিয়ান, যিনি রোমানদের দমনপীড়নের বিরুদ্ধে

সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সেকালের নুমানশিয়ানরা আজ স্পেনের বীরত্ব আর দেশপ্রেমের প্রতীক আর তরুণ স্প্যানিশদের অনুকরণীয় আদর্শের নাম।

এত কিছুর পরেও, স্পেনের মানুষজন স্প্যানিশ ভাষাতেই নুমানশিয়ানদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। এটি একটা রোমান ভাষা এবং এই ভাষার উৎপত্তি হয়েছে সমরনায়ক সিপিও-এর ল্যাটিন ভাষা থেকে। নুমানশিয়ানরা নিজেরা কথা বলত একধরনের সেল্টিক ভাষায়, যা আজ বিলুপ্ত ও মৃত। সারভানতেস তার 'নুমানশিয়া অবরোধ' ট্র্যাজেডি লিখেছেন ল্যাটিন লিপিতে এবং নাটকটিতে গ্রিস ও রোমের শিল্পভাষার ছাপ স্পষ্ট। নুমানশিয়ায় কোনো নাট্যশালা ছিল না। নুমানশিয়ানদের বীরত্বে মুগ্ধ স্প্যানিশ দেশপ্রেমিকরাও রোমান ক্যাথলিক চার্চের অন্ধ অনুসারী। খেয়াল করার বিষয় হলো, 'রোমান ক্যাথলিক চার্চ' বলতে এমন ক্যাথলিক চার্চ বোঝানো হচ্ছে, যার নেতারা এখনো রোমেই থাকেন এবং যাদের ঈশ্বর চান তাঁকে ল্যাটিন নামে ডাকা হোক। একইভাবে, আধুনিক স্পেনের আইনকানুন উদ্ভূত হয়েছে রোমানদের আইনকানুন থেকে, স্প্যানিশ রাজনীতির ভিত্তি হলো রোমান রাজনীতি, তাদের খাবারদাবার ও স্থাপত্যবিদ্যা যতটা না আইবেরিয়ায় সেল্টদের কাছে ঋণী, তার চেয়ে অনেক বেশি ঋণী রোমান সাম্রাজ্যের কাছে। নুমানশিয়ার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। এমনকি নুমানশিয়ানদের এই ইতিহাসটুকুও জানা গেছে রোমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকেই। স্বাভাবিকভাবেই, এই ইতিহাস লেখা হয়েছে রোমান পাঠকদের রুচির জন্য উপযোগী করে এবং এতে নুমানশিয়ানদের কাহিনিতে রং চড়িয়ে তাদের স্বাধীনতাকামী বর্বর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নুমানশিয়ানদের সঙ্গে রোমের বিজয় এতটাই সর্বগ্রাসী ছিল যে, তারা পরাজিত শক্তির ইতিহাসও নিজের মতো করে তৈরি করে নিতে পেরেছে।

এ ধরনের গল্প পাঠকপ্রিয়তা পায় না। আমরা সাধারণত দুর্বলের জয় দেখতে পছন্দ করি। কিন্তু, ইতিহাস ন্যায়বিচারের ধার ধারে না। অতীতের অধিকাংশ সংস্কৃতিই কখনো-না-কখনো কোনো-না-কোনো নির্দয় সাম্রাজ্যের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং হারিয়ে গেছে

বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। সাম্রাজ্যের নিজের পতনও অবশ্যম্ভাবী কিন্তু একটি সাম্রাজ্য তার অস্তিত্বের স্থায়ী ছাপ রেখে যায় পরবর্তী সময়ের কাছে। আজকের একবিংশ শতকের প্রায় সব মানুষ কোনো না কোনো সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি।

কাকে বলে সাম্রাজ্য?

সাম্রাজ্য হলো এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো, যার দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমত, সাম্রাজ্যের খেতাব পাওয়ার জন্য আপনাকে এমন কিছু মানুষকে শাসন করতে হবে, যাদের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিচয় আলাদা। প্রশ্ন হতে পারে, এরকম কত ধরনের ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিচয়ের মানুষ শাসন করলে তাকে সাম্রাজ্য বলা যাবে? দুই বা তিন রকম ভিন্নতা সাম্রাজ্যের জন্য যথেষ্ট নয়। আবার ২০ বা ৩০ ধরনের ভিন্নতা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার পরিমাণ হওয়া উচিত এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোনো সংখ্যা।

দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানা নির্দিষ্ট নয় এবং তা যত খুশি বিস্তৃত হতে পারে। একটি সাম্রাজ্য নতুন নতুন জাতি এবং রাজ্যকে তাদের অধীনে আনতে পারে নিজের মূল কাঠামো বা জাতিসত্তার পরিবর্তন না ঘটিয়েই। আজকের ব্রিটিশ রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানাটা নির্দিষ্ট। এই ভৌগোলিক সীমানাটা এতটুকু বাড়াতে চাইলেও সেটা ব্রিটিশ রাষ্ট্রকাঠামো বা জাতিসত্তার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব হবে না। অথচ, ১০০ বছর আগেও পৃথিবীর যে-কোনো স্থানই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হতে পারত।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক সীমারেখার নমনীয়তা সাম্রাজ্যকে শুধু একটা নতুন আঙ্গিক দেয় তা নয়, বরং এ দুটি বৈশিষ্ট্যই ইতিহাসে সাম্রাজ্যের মূল ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। এই দুটো বৈশিষ্ট্যের কারণে সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-আবহাওয়া-জলবায়ুর মানুষকে একই রাজনৈতিক ছাতার নিচে আনতে পারে

এবং পৃথিবীর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ক্রমাগত একত্র করার প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

এখানে যে ব্যাপারটা গুরুত্বের সঙ্গে বলা দরকার তা হলো, একটি সাম্রাজ্যের পরিচয় কেবল তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং নমনীয় ভৌগোলিক সীমানা দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। উৎপত্তিস্থল, শাসনকাঠামো, ভৌগোলিক বিস্তৃতি বা জনসংখ্যা সাম্রাজ্যের পরিচয় নির্ধারণ করে না। একটা সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের জন্য সামরিক অভিযানও অপরিহার্য নয়। অ্যাথেন্স সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল একটি স্বেচ্ছাসেবক দল হিসেবে, হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে, বিয়ের মাধ্যমে অনেকগুলো পরিবারকে জোড়া দিয়েই তৈরি হয়েছিল এই সাম্রাজ্যের ভিত। সাম্রাজ্যের জন্য একজন সম্রাটের শাসন থাকারও বাধ্যবাধকতা নেই। এ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতি ছিল গণতান্ত্রিক। অন্যান্য গণতান্ত্রিক (বা নিদেনপক্ষে প্রজাতান্ত্রিক) সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে আছে আধুনিক ওলন্দাজ, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও আমেরিকার সাম্রাজ্য এবং প্রাক্-আধুনিক যুগের নভগোরাড, রোম, কার্থেজ ও অ্যাথেন্স।

সাম্রাজ্যের জন্য আয়তন বা জনসংখ্যাও তেমন কোনো জরুরি বিষয় নয়। খুব ছোটো আয়তনের সাম্রাজ্যের অস্তিত্বও ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। অ্যাথেন্স সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে আয়তন ও জনসংখ্যায় অ্যাথেন্স ছিল আজকের গ্রিসের তুলনায় অনেক ছোটো। আজকের দিনের মেক্সিকোর থেকে অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল অনেক কম। তা সত্ত্বেও অ্যাথেন্স ও অ্যাজটেক ছিল সাম্রাজ্য, কিন্তু আজকের গ্রিস বা মেক্সিকো সাম্রাজ্য নয়। কারণ, অ্যাথেন্স ও অ্যাজটেক শাসন করত কয়েক ডজন থেকে শুরু করে কয়েক শ ভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোকে, একালের গ্রিস বা মেক্সিকো যেটা করে না। অ্যাথেন্স কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল ১০০-এরও বেশি স্বাধীন নগররাষ্ট্রের ওপর, অন্যদিকে অ্যাজটেক, তার খাজনার দলিল অনুযায়ী, শাসন করেছিল ৩৭১টি ভিন্ন গোত্রের মানুষকে।[১]

এত সব ভিন্ন গোত্র, দল এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মানুষকে কী করে একালে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সীমানার ভেতর আনা সম্ভব

হলো? এটা সম্ভব হয়েছে কারণ অতীতকালে পৃথিবীতে যে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিচয়ের মানুষের বসবাস ছিল, তাদের প্রত্যেকের দলের সদস্যসংখ্যা ছিল অল্প এবং তাদের অধিকৃত ভূমির পরিমাণও ছিল আজকের দিনের মানুষের তুলনায় কম। ভূমধ্যসাগর এবং জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী যে ভূমি নিয়ে আজ মূলত দুজন মানুষের অহংকারের লড়াই চলছে, সে সময় এই ভূমিতেই ঠাঁই হতো কয়েক ডজন জাতি, গোত্র, ছোটো রাজ্য ও নগর রাষ্ট্রের।

মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আকস্মিকভাবে হ্রাস পাওয়ার একটা প্রধান কারণ সাম্রাজ্যের উত্থান। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্টিমরোলার মানুষের নানা রকম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেকে পিষে ফেলে সবাইকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে সাম্রাজ্যবাদী রীতিনীতির ছাঁচে (উদাহরণস্বরূপ নুমানশিয়ানদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে) এবং তৈরি করেছে অনেক বড়ো আকারের মানবসংগঠন।

সাম্রাজ্য কি তবে শয়তান?

আধুনিককালে রাজনীতিতে নেতিবাচক শব্দগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা বা ফ্যাসিজমের পরই সাম্রাজ্যবাদকে স্থান দেওয়া হয়। সমালোচকেরা সাম্রাজ্যবাদের যেসব নেতিবাচক দিকের কথা বলেন সেগুলোকে মোটামুটি দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়–

প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদ একটি অকার্যকর প্রক্রিয়া। সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় জয় করা বিপুল জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘ মেয়াদে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভবপর হয় না।

দ্বিতীয়ত, যদি সেটা কোনোভাবে সম্ভবও হয়, তার পরও সাম্রাজ্যবাদকে বর্জন করা উচিত। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ হলো ধ্বংস আর শোষণের হাতিয়ার। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজেদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে এবং তাদেরকে কোনোভাবেই অন্যের শাসনের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা উচিত নয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, প্রথম দাবিটি একেবারেই অচল এবং দ্বিতীয়টি নানাবিধ দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।

বাস্তবতা হলো, গত আড়াই হাজার বছর ধরে দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে বেশি প্রচলিত রাজনৈতিক সংগঠন। এই আড়াই হাজার

বছর ধরে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাস করেছে। সাম্রাজ্যের সরকারব্যবস্থার স্থিতিশীলতার ব্যাপারটিও প্রশ্নাতীত। বেশিরভাগ সাম্রাজ্যই খুব সহজে তার বিদ্রোহীদেরকে দমন করতে পেরেছে। মোটা দাগে বলতে গেলে, বেশিরভাগ সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে প্রধানত বহিঃশত্রুর আক্রমণে অথবা তারা বিভক্ত হয়েছে শাসকদের মতবিরোধের কারণে। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যের বিজিত জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এমন নজির তেমন একটা চোখে পড়ে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা শত শত বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। কালক্রমে, তারা হয়ে পড়েছে বিজয়ী সাম্রাজ্যের অংশ, ধীরে ধীরে মুছে গেছে তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আর পরিচয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় কিছু জার্মানিক গোষ্ঠীর (Germanic tribes) হাতে। কিন্তু এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে, এরপর নুমানশিয়া, আরভারনি কিংবা হ্যালভেশিয়ানদের মতো অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলো রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। এমন গল্প হয়তো পুরাণে পাওয়া যায়। যেমন, ইউনুস নবি (Jonah) অনেকটা সময় মাছের পেটে থাকার পরও অক্ষত অবস্থায় মাছের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এমন নজির দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই রোমান অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলোর কোনোটাই আর টিকতে পারেনি। তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে যারা যারা নিজেদেরকে তাদের সাম্রাজ্য পূর্ববর্তী গোত্র বা দলের সদস্য বলে পরিচয় দিত, কথা বলত তাদের নিজেদের ভাষায়, উপাসনা করত তাদের নিজস্ব দেবদেবীকে এবং প্রচার করত নিজেদের গোত্রের বীরত্বগাথা, আজ তাদের চিন্তা, ভাষা, আরাধনা সবই রোমানদের মতো, যদিও রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটেছে অনেককাল আগেই।

অনেক ক্ষেত্রেই, সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি আর সাম্রাজ্যের অধীন মানুষগুলোর স্বাধীনতা– ব্যাপার দুটো সমার্থক ছিল না। বরং, একটা সাম্রাজ্যের পতনের পরপরই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য সেখানে আরেকটি সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটত। মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। এখানকার বর্তমান রাজনৈতিক

বলয় কতগুলো পৃথক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্ষমতার ভারসাম্য দ্বারা নির্মিত, যাদের প্রত্যেকের স্থায়ী বা অস্থায়ী ভৌগোলিক সীমানা আছে। মধ্যপ্রাচ্যের এরকম রাজনৈতিক অবস্থা বিগত কয়েকটি সহস্রাব্দে দেখা যায়নি। শেষ যেবার মধ্যপ্রাচ্য এরকম রাজনৈতিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল সেটা ছিল ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, প্রায় ৩ হাজার বছর আগে! খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে নিও-অ্যাসিরিয়ান সাম্রাজ্যের উত্থানের পর থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত সময়টাতে মধ্যপ্রাচ্যকে রিলে রেসের ছড়ির মতো এক সাম্রাজ্য থেকে আরেক সাম্রাজ্যের অধীনে যেতে হয়েছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সাম্রাজ্য তাদের শাসনের ছড়িটা যখন ছেড়ে দিল, ততদিনে তাদের পূর্ববর্তী স্বাধীন জাতি আরামানস (Aramaeans), অ্যামোনাইটস (Ammonites), ফিনিশিয়ানস (Phoenicians), ফিলিস্তিন (Philistines), মাবাইট (Moabites) এসবের স্বাধীন অস্তিত্ব আর নেই। অনেক কাল আগেই তারা হারিয়ে গেছে কালের অতল গহ্বরে।

এ কথা সত্য, আজকের দিনের ইহুদি, আর্মেনিয়ান ও জর্জিয়ানরা কিছু ন্যায়সংগত যুক্তির সাহায্যে দাবি করেন, তারা প্রাচীন মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী মানুষজনের বংশধর। এদের দাবিটুকু নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে তা সাম্রাজ্যের প্রভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয় অবলুপ্তির দাবিটি জোরালো করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে ইহুদি, আর্মেনিয়ান ও জর্জিয়ানদের দাবিকে অতিরঞ্জিতও মনে হয়। কারণ এ কথা স্পষ্ট যে, বর্তমানকালের ইহুদিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাচেতনা গত দুই সহস্রাব্দ ধরে তাদেরকে অধিকার করা সাম্রাজ্য দ্বারা যতটুকু প্রভাবিত, ইহুদিদের প্রাচীন রাজ্য যিহুদিয়ার (Judaea) রীতিনীতি দ্বারা ততটুকু প্রভাবিত নয়। যদি ইসরাইলের দ্বিতীয় রাজা ডেভিড আজ কোনো ঘোর রক্ষণশীল ইহুদি উপাসনালয়েও উপস্থিত হন, তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করবেন সেখানকার লোকজনের পরনে পূর্ব ইউরোপীয় পোশাক, তারা কথা বলছে জার্মানির একটি আঞ্চলিক ভাষায় (Yiddish) এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা একটি ব্যাবলিনীয় ধর্মগ্রন্থের (The Talmud) পাঠোদ্ধার নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণত একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য বিপুলসংখ্যক মানুষ হত্যা এবং বিজিতদের ওপর নির্মম নির্যাতনের দরকার পড়ে। একটি সাম্রাজ্য গঠনের জন্য প্রচলিত উপকরণগুলি হলো– যুদ্ধ, দাসপ্রথা, নির্বাসন এবং গণহত্যা। ৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা যখন স্কটল্যান্ড আক্রমণ করে, তখন তারা স্থানীয় ক্যালেডোনিয়ান গোত্রের (Caledonian) কাছ থেকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং ফলে রোমানরা পুরো দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করে। রোমানদের শান্তিপ্রস্তাবে ক্যালেডোনিয়ান নেতা ক্যালগাকাস (Calgacus) রোমানদের 'দুনিয়ার সেরা সন্ত্রাসী' আখ্যা দেন এবং বলেন, 'লুণ্ঠন, গণহত্যা আর ডাকাতিকে তারা সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা নামে অভিহিত করে আর একটি জনপদকে শ্মশানে পরিণত করার নাম দেয় "শান্তিস্থাপন"।'[২]

এসবের মানে এই নয় যে, সাম্রাজ্যের উত্থান মানুষের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেনি। সাম্রাজ্যকে ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করে তার সব উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা হলে মানবজাতির অধিকাংশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করতে হয়। সাম্রাজ্যের উঁচু পদে থাকা লোকজন রাজ্য অধিকারের ফলে অর্জিত মুনাফা কেবল সামরিক বাহিনী এবং দুর্গ নির্মাণেই ব্যয় করতেন না, তার একটি অংশের বরাদ্দ হতো দর্শন, শিল্প, আইন ও সেবামূলক কাজে। মানুষের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির একটি বড়ো অংশ তাদের অস্তিত্বের জন্য বিজিত জনগণের শোষণের ফলে পাওয়া সম্পদের কাছে ঋণী। রোমান সাম্রাজ্যের অগ্রগতি ও অর্জিত মুনাফাই নিশ্চিত করেছিল সিসেরো (Cicero), সেনেকা (Seneca) এবং সেইন্ট অগাস্টিনের (St Augustine) মতো মানুষদের চিন্তাভাবনা এবং লেখালেখির জন্য প্রয়োজনীয় অবসর ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা। মোগলদের ভারত লুঠ করে জমানো টাকাকড়ি ছাড়া তাজমহল নির্মাণ সম্ভব হতো না। হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্য স্লাভিক, হাঙ্গেরিয়ান ও অন্যান্য রোমান ভাষাভাষী অঞ্চল শাসন করে যে মুনাফা পেত, সেখান থেকেই দেওয়া হতো সুরকার হেইডেন (Haydn)-এর পারিশ্রমিক এবং সংগীতগুরু মোজার্টের ভাতা। কোনো ক্যালেডোনিয়ান লেখক ক্যালগাকাস (Calgacus)-এর বক্তৃতাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য

লিপিবদ্ধ করে যাননি। ক্যালগ্যাকাসের বক্তৃতার ব্যাপারে আমরা জানতে পারি রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের (Tacitus) বয়ান থেকে এবং সম্ভবত, বক্তৃতাটি ট্যাসিটাসের নিজেরই বানানো। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক ইদানীং এ ব্যাপারে একমত হন যে, ট্যাসিটাস কেবল ক্যালগ্যাকাসের বক্তৃতাটিই বানাননি, সমরনায়ক ক্যালগাকাসের চরিত্রটিই তাঁর কল্পনাপ্রসূত। তিনি ক্যালগাকাস চরিত্রটি তৈরি করেছিলেন নিজের দেশ সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং উঁচু শ্রেণির রোমানদের যে ধারণা, সেটি তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়ার জন্য।

এমনকি যদি আমরা ধনীদের সংস্কৃতি এবং উচ্চমার্গের শিল্পকলা থেকে চোখ ফিরিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের দিকেও তাকাই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিককালের মানুষের জীবনযাপন ও সংস্কৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে সাম্রাজ্যের প্রভাব। আজকের দিনে আমরা প্রায় সবাই কথা বলি নানা সাম্রাজ্যের মূল ভাষায়, যেসব ভাষা আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর পেশিশক্তির প্রভাবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ মানুষ হ্যান (Han) সাম্রাজ্যের ভাষায় কথা বলে, স্বপ্ন দেখে। বংশপরিচয় যা-ই হোক, আলাস্কার ব্যারো উপদ্বীপ থেকে শুরু করে ম্যাগেলান প্রণালি পর্যন্ত, আমেরিকার দুই মহাদেশের সবাই স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজি– এই চারটি সাম্রাজ্যভাষার কোনো একটি ব্যবহার করে। আজকের মিশরের অধিবাসীরা আরবি ভাষায় কথা বলে, নিজেদের আরব ভাবতে এবং আরব সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। অথচ এই আরবরাই সপ্তম দশকে মিশর দখল করেছিল এবং তাদের আইনের পরিপন্থি যে-কোনো মিশরীয় বিদ্রোহকে শক্ত হাতে দমন করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু গোত্রের প্রায় ১ কোটি মানুষ আজও তাদের উনিশ শতকের গৌরবময় দিনের স্মৃতিচারণা করে, অথচ তাদের অধিকাংশই সেই সব মানুষের বংশধর, যারা জুলু সাম্রাজ্যবিস্তার রুখতে একদিন প্রাণপণে লড়াই করেছিল।

যা-কিছু হচ্ছে, ভালোর জন্যই হচ্ছে

প্রথম যে সাম্রাজ্যের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তা হলো সম্রাট সারগনের আক্কাদিয়ান সাম্রাজ্য (সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব ২২৫০ অব্দ)। সারগন মেসোপটেমিয়ার একটি ছোট্ট নগররাষ্ট্র কিশ (Kish)-এর রাজা হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেন। কয়েক দশকের মধ্যে তিনি মেসোপটেমিয়ার অন্যান্য নগররাষ্ট্র এবং মেসোপটেমিয়ার বাইরের অনেক বড়ো ভূখণ্ড জয় করেন। সারগন গর্বভরে বলতেন, তিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজত্ব ছিল পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ আজকের ইরাক ও সিরিয়ার বেশিরভাগ অংশ এবং ইরান ও তুরস্কের সামান্য কিছু অংশ জুড়ে ছিল তার সাম্রাজ্যের বিস্তার।

সারগনের মৃত্যুর পর আক্কাদিয়ান সাম্রাজ্য আর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু, সারগন রেখে গেছেন এমন কিছু সাম্রাজ্যবাদী দীপশিখা, যা রয়ে গেছে আপন মহিমায় ভাস্বর। পরবর্তী ১ হাজার ৭০০ বছর জুড়ে অ্যাসিরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান ও হিট্টি রাজাদের জন্য সারগণ ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁরাও গর্বভরে বলতেন, তারা সমগ্র পৃথিবী জয় করেছেন। এরপর, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে, পারস্যের সাইরাস দি গ্রেট-এর চেয়েও বড়ো দম্ভোক্তি নিয়ে হাজির হলেন ইতিহাসের মঞ্চে।

অ্যাসিরিয়ার রাজা কিন্তু সব সময় নিজেকে অ্যাসিরিয়ার রাজাই মনে করতেন। এমনকি যখন তিনি নিজেকে পুরো পৃথিবীর শাসক দাবি করেন, তখনো একটা ব্যাপার সবার কাছে স্পষ্ট ছিল যে, এসব কিছুই করা হচ্ছে অ্যাসিরিয়ার গৌরব বৃদ্ধির জন্য এবং সে কারণে রাজ্য দখল করা, জয় করা এসব নিয়ে অ্যাসিরীয়দের মধ্যে কোনো অনুশোচনা ছিল না। অন্যদিকে সাইরাস পুরো পৃথিবী শাসন করার দাবি করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং বিজিতদের তিনি বললেন, এ সবকিছুই তিনি করছেন সব মানুষের জন্য। পারসিয়ানরা বলল, 'আমরা তোমাদের কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে অধিকার করছি।'
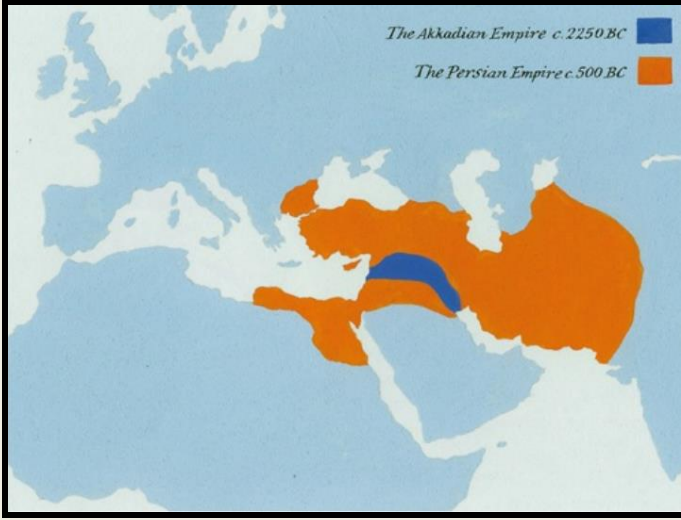
ম্যাপ ৪। আক্কাদিয়ান ও পারস্য সাম্রাজ্য

সাইরাস চাইতেন, বিজিত লোকেরা তাঁকে ভালোবাসুক এবং পারসিয়ান সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ার জন্য তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করুক। পরাজিত রাজ্যের মানুষদের অনুমোদন পাওয়ার জন্য সাইরাসের সৃষ্টিশীল উদ্যোগের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো তাঁর একটি আদেশ। এই আদেশে তিনি বলেন, নির্বাসিত ইহুদিরা চাইলে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে এসে সেখানে তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে। এমনকি তিনি নির্বাসিতদের অর্থনৈতিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেন। সাইরাস নিজেকে ইহুদিদের অধিকার করা একজন পারসিয়ান রাজা হিসেবে ভাবেননি বরং তিনি নিজেকে ইহুদিদের রাজাও ভাবতেন এবং সে কারণে তাদের ভালোমন্দের দেখভাল করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য সমস্ত পৃথিবী অধিকার করার ধারণাটা ছিল চমকপ্রদ। বিবর্তন অন্য সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো মানুষকেও জেনোফোবিক (Xenophobic, যারা অন্য দেশের মানুষজনকে অপছন্দ করে বা ভয় পায়) হিসেবে গড়ে তুলেছে। সেপিয়েন্স তার সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি থেকেই সমগ্র মানবজাতিকে

সব সময় দুটি ভাগে ভাগ করে– 'আমরা' ও 'তারা'। 'আমরা' হলো আপনার এবং আমার মতো লোকজন যারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই ধর্ম ও রীতিনীতি অনুসরণ করে। 'আমরা' একে অপরের ভালোমন্দের ভাগ নিতে রাজি, কিন্তু 'তাদের' ভালোমন্দের ভাগ নিতে রাজি নই। 'আমরা' সব সময়ই 'তাদের' থেকে আলাদা ছিলাম এবং 'তাদের' কাছে 'আমাদের' কোনো ঋণ বা 'তাদের' প্রতি 'আমাদের' কোনো দায়দায়িত্ব নেই। 'আমরা' 'তাদের' কাউকে 'আমাদের' এলাকায় দেখতে চাই না এবং ভুলবশত 'তারা' 'আমাদের' এলাকায় ঢুকে পড়লে যা-কিছু ঘটবে সেসব নিয়ে 'আমাদের' এতটুকু মাথাব্যথা নেই। 'তারা' আসলে মানুষের পর্যায়েই পড়ে না। সুদানের 'ডিনকা' (Dinka) নামক জনগোষ্ঠীর ভাষায় 'ডিনকা' শব্দের অর্থ 'জনগণ বা মানুষ'। সুতরাং, যারা 'ডিনকা' নয়, তারা মানুষই নয়। ডিনকাদের ঘোর শত্রু হলো 'নুয়ের' (Nuer) জনগোষ্ঠী। নুয়েরদের ভাষায় 'নুয়ের' কী অর্থ বহন করে? তাদের ভাষায় 'নুয়ের' শব্দের অর্থ 'আসল মানুষ'। সুদান মরুভূমি থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে আলাস্কা ও উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার বরফঢাকা অঞ্চলে ইউপিকদের (Yupik) বাস। ইউপিকদের ভাষায় 'ইউপিক' শব্দের অর্থ কী? যা ভাবছেন ঠিক তা-ই, এর অর্থও 'আসল মানুষ'![৩]

সাইরাসের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা জাতি বা গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের অহংবোধের বিপরীতে গিয়ে সবাইকে নিয়ে এবং সবার জন্য ভাবার চেষ্টা করে। যদিও তার শাসনব্যবস্থায় প্রায়ই শাসক ও শাসিতের বর্ণগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আনা হয়েছে, তা সত্ত্বেও সাইরাসের শাসনব্যবস্থাকে সব স্থানের, সব সময়ের মানুষের যৌথ অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা একটি একক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মানবজাতি হলো একটি বৃহৎ পরিবার– এখানে পিতা-মাতার প্রাধান্য যেমন আছে, তেমনি আছে সন্তানের কল্যাণের জন্য পিতামাতার দায়িত্বের নির্দেশ।

এই নতুন সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ সাইরাস এবং পারসিয়ানদের হাত ঘুরে পৌঁছায় সম্রাট আলেকজান্ডারের কাছে, তার থেকে এ আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে হেলেনীয় রাজা, রোমান সম্রাট, মুসলিম খলিফা ও

ভারতীয় রাজবংশগুলোর কাছে এবং কালক্রমে এর প্রতিফলন দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদের এই পরার্থপর রূপ কেবল যে সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের ন্যায্যতা তুলে ধরে আর সাম্রাজ্যের অধীন মানুষের সামষ্টিক বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমায় তা-ই নয়, এই ধ্যানধারণা স্বাধীন ব্যক্তিমানুষকে সাম্রাজ্য-বিস্তারের বিপরীতে প্রতিবাদ করতেও নিরুৎসাহিত করে।

মূলত মধ্য আমেরিকা, আন্দিজ পর্বতসংলগ্ন এলাকা এবং চীনে স্বাধীনভাবে পারসিয়ান সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের অনুরূপ আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের জন্ম হয়। চীনের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী, স্বর্গ (Tian) পৃথিবীর সবকিছুর প্রকৃত অধিকর্তা। সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বা পরিবারকে নির্বাচন করেন স্বর্গ এবং স্বর্গই সেই ব্যক্তি বা পরিবারকে শাসনের অনুমতি দেন। এরপর ওই ব্যক্তি বা পরিবার স্বর্গের অধীনস্থ সবকিছুর (Tianxia) আজ্ঞাবহ হয়ে সব প্রজার কল্যাণের উদ্দেশ্যে রাজ্য শাসন করেন। সুতরাং, এখানেও দেখা যাচ্ছে ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিকানার ব্যাপারটি বৈশ্বিক। যদি কোনো শাসক স্বর্গের অনুমতি হারান, তাহলে তাঁর পক্ষে একটি শহরও শাসন করা সম্ভব নয়। যদি কোনো শাসক স্বর্গের এই অনুমোদন বজায় রাখতে চান, তাহলে তাকে অবশ্যই ন্যায়বিচার এবং শান্তি-শৃঙ্খলার আদর্শকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। স্বর্গের এই অনুমোদন একই সঙ্গে একের বেশি প্রার্থীকে দেওয়া হবে না, সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে একের বেশি আইনসংগত, সুশৃঙ্খল স্বাধীন রাষ্ট্রের অনুমোদন দেওয়াও সম্ভব নয়।

চিন শি হুয়াংদি (Qín Shǐ Huángdì), একীভূত চীনের প্রথম সম্রাট, গর্বভরে ঘোষণা করেন যে, 'মহাবিশ্বের ছয় দিকে যা-কিছু আছে তার সবকিছু চীনা সাম্রাজ্যের অধীন, পৃথিবীর যে প্রান্তে মানুষের পায়ের একটি ছাপও পড়েছে সেখানে এমন কোনো মানুষ নেই যে এই সাম্রাজ্যের অধীন নয়, সম্রাটের মহানুভবতা এমনকি গাভি ও ঘোড়াদের কাছেও সুবিদিত। এমন কেউ নেই যে এই শাসনের ফলে উপকৃত হয়নি। সকলেই সম্রাটের শাসনের ছায়াতলে নিরাপদে ও শান্তিতে আছে।'[৪] চীনাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো চীনাদের রাজনৈতিক দর্শনও সাম্রাজ্যবাদী চীনকে ঐক্য ও ন্যায়বিচারের এক

স্বর্ণযুগ মনে করে। আধুনিক পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি ন্যায়পরায়ণ পৃথিবী অনেকগুলো পৃথক জাতিরাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত। প্রাচীন চৈনিক বিশ্বে এই রাজনৈতিক বিভক্তকরণ ছিল অন্ধকার যুগের বিশৃঙ্খলা এবং অবিচারের মূর্ত প্রতীক। চীনের ইতিহাসে এরকম ভাবনা-চিন্তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। চীনে যখনই একটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে, তাদের বিরাজমান রাজনৈতিক ভাবধারা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে ছোটো ছোটো তুচ্ছ স্বাধীন রাষ্ট্র বা সরকার বানিয়ে থিতু না হতে, তাদের উৎসাহিত করেছে পুনরায় একীভূত হতে। এবং কোনো না কোনোভাবে তাদের এই একীভূত হওয়ার প্রয়াস সব সময় সফল হয়েছে।

যখন 'তারা' 'আমাদের' অন্তর্ভুক্ত হলো

সাম্রাজ্য অনেকগুলো ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অবসান ঘটিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুসরণ করা অল্প কিছু সাংস্কৃতিক পরিচিতির উদ্ভবের পেছনে প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো স্বাধীন এলাকার চেয়ে একটি সাম্রাজ্যে ধ্যানধারণা, মানুষ, পণ্য ও প্রযুক্তি অনেক দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। কখনো কখনো সাম্রাজ্য নিজেই ধ্যানধারণা, প্রতিষ্ঠান, আইন ও রীতিনীতি প্রসারের দায়িত্ব নিয়েছে। সাম্রাজ্যের শাসকদের জীবন আরো আয়াসসাধ্য করা এ কাজের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো এলাকার যদি নিজেদের আইন, নিজেদের লিখনপদ্ধতি, নিজস্ব ভাষা এবং নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা থাকে, তাহলে সাম্রাজ্যের শাসকদের পক্ষে সবগুলো এলাকা শাসন করা সত্যিই কঠিন। সুতরাং, বিভিন্ন এলাকার এতসব ভিন্নতাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় আনা সাম্রাজ্যের জন্য অপরিহার্য ছিল।

সাম্রাজ্যগুলো কেন সবার জন্য একটি সাধারণ আচরণবিধি বা সংস্কৃতির বিস্তার করেছিল তার দ্বিতীয় কারণটি হতে পারে– সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের প্রয়াস। অন্তত সাইরাস এবং চিন শি হুয়াংদির সময় থেকে, সাম্রাজ্যগুলো জনগণকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, রাস্তা বানানো বা গণহত্যা যা-ই করা হোক না

কেন, তা সবার ভালোর জন্যই করা হচ্ছে; একটি উন্নত সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য এসব জরুরি এবং তাতে লাভ যত না সাম্রাজ্যের শাসকদের, তার চেয়ে ঢের লাভ বিজিতদের।

কোনো কোনো সময় এই লাভ স্পষ্টভাবে দেখা যেত, যেমন– আইনের যথাযথ প্রয়োগ, নগর পরিকল্পনা, ওজন এবং পরিমাপের মাপকাঠি নির্দিষ্ট করা। আবার কখনো কখনো এই লাভ ছিল প্রশ্নবিদ্ধ, যেমন– কর প্রদান, সেনাবাহিনীতে যোগদানের বাধ্যবাধকতা এবং সম্রাটের বন্দনা করা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থরা মনে করতেন তাঁরা সাম্রাজ্যের সব অধিবাসীদের কল্যাণের জন্যই কাজ করছেন। চীনের শাসকশ্রেণি তাদের প্রতিবেশী দেশের প্রজাদের অসভ্য, বর্বর, দুর্ভাগা মনে করত এবং তারা বিশ্বাস করত চীনা সাম্রাজ্যের অবশ্যই উচিত এই মানুষগুলোকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অধীনে এনে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। চীনাদের ওপর স্বর্গের যে আদেশ আছে তা কেবল দুনিয়াকে জয় করার জন্যই নয়, মানুষকে মানবতার শিক্ষা দেওয়ার জন্যও। ‘কিছু বর্বর মানুষকে আমরা শান্তি, সুবিচার ও শিষ্টাচারসমৃদ্ধ জীবনের সন্ধান দিচ্ছি’– এরকম দাবি করে রোমানরাও তাদের শাসনের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টা করত। বন্য জার্মান ও গল সম্প্রদায়ের মানুষজনকে আইন শিক্ষা দিয়ে, তাদের গণগোসলখানায় গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, তাদের দর্শনের শিক্ষা দিয়ে উন্নত করার আগ পর্যন্ত তো তারা অপরিচ্ছন্নতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারেই নিমজ্জিত ছিল– এমনটাই ছিল রোমানদের বিশ্বাস। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে গৌতম বুদ্ধের মহান শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তোলবার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিল। মুসলিম খলিফারা সম্ভব হলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, তা না হলে তরবারির শক্তিতে সারা বিশ্বে মহানবির উপলব্ধি ও বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার এক স্বর্গীয় আদেশ পেয়েছিলেন। স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ সাম্রাজ্য ঘোষণা করেছিল, তারা ইন্দিজ পর্বতে ও আমেরিকায় ধনসম্পদের সন্ধান করতে আসেনি, এসেছে মানুষকে সত্যিকারের বিশ্বাসের দীক্ষা দিতে, প্রকৃত ধর্মে তাদের ধর্মান্তরিত করতে। স্বাধীনতা ও মুক্ত বাজারের মতো মহৎ ধারণার বিস্তার করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো

অস্ত যেত না। সোভিয়েতরা ধনতন্ত্র থেকে প্রলেতারিয়েত বা সাধারণ মানুষের হাতে কাল্পনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইতিহাসের নির্মম পথে যাত্রাকে তাদের অবশ্যকর্তব্য মনে করত। আজকের দিনের অনেক আমেরিকান মনে করেন, ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করেই হোক আর এফ-১৬ বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করেই হোক, তাদের সরকার বস্তুতপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সুফল দেওয়ার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক রূপরেখা শাসক শ্রেণির নিজেদের তৈরি ছিল না। যেহেতু সবাইকে নিয়ে এবং সবার জন্যই গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি, তাই সাম্রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায় একে উগ্রভাবে একটি একক, বদ্ধ সামাজিক নিয়মকানুনের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে প্রায়শই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জাতিগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ ও ঐতিহ্যকে সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতেন। যদিও কিছু কিছু সম্রাট সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক শুদ্ধতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং তারা নিজেরা যাকে তাদের সংস্কৃতির শিকড় বলে জানতেন, সাম্রাজ্যেও সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যের সভ্যতা ছিল অধীনস্থ জাতিগোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর মিশেল। রোম সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল গ্রিক আর রোমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে; পারসিয়ান, গ্রিক আর আরবদের সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল আব্বাসিড (Abbasid) সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি। সাম্রাজ্যবাদী মোঙ্গলদের সংস্কৃতি ছিল চৈনিক সংস্কৃতির প্রতিলিপি মাত্র। সামাজ্র্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রে কেনিয়ান বংশোদ্ভূত একজন প্রেসিডেন্ট স্বচ্ছন্দে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র *লরেন্স অব অ্যারাবিয়া* দেখতে পারেন, যেখানে আরবরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এমনকি চলচ্চিত্র দেখার সময় তিনি আয়েশে কুড়মুড় করে একটি ইতালিয়ান পিজায় কামড়ও বসাতে পারেন।

সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সময় অধীনস্থ জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক উপাদানের এই মিশেল অন্তর্গত জাতি-গোষ্ঠীগুলিকে এই নতুন সংস্কৃতি আত্মীকরণে সহায়তা করেছে এমনটা ভাবার কারণ নেই। সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিতে বিজিত জাতি-গোষ্ঠীদের অনেক

সাংস্কৃতিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে শেষমেশ সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির যে সংকর রূপের সৃষ্টি হয়, তা বিজিত জনগোষ্ঠীর নিজেদের সংস্কৃতি থেকে ছিল অনেকটাই ভিন্ন। সুতরাং, বিজিত জাতি-গোষ্ঠীগুলোর কাছে সাম্রাজ্যের নতুন এই সংস্কৃতির আত্মীকরণ ছিল একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো। একদিকে বহুদিনের অভ্যস্ত রীতিনীতি ও আচরণগুলো ত্যাগ করা তাদের জন্য সহজ ছিল না, অন্যদিকে সংস্কৃতির নতুন উপাদানগুলোকে বোঝা, শেখা ও আত্মীকরণ করা তাদের জন্য ছিল আরো কঠিন এবং কষ্টসাধ্য। এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো, বিজিত জাতি-গোষ্ঠী সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও, সাম্রাজ্যের শাসকদের অনেক অনেক বছর লেগে যেত পরাজিত জাতি-গোষ্ঠীর মানুষজনকে নিজেদের অংশ ভাবতে। 'তাদের'-কে 'আমরা' হিসেবে স্বীকার করতে। বিজিত জাতি-গোষ্ঠীগুলোর জন্য এই মধ্যবর্তী সময়টুকু ছিল ভয়াবহ। কারণ, তারা ততদিনে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে এবং নতুন সাম্রাজ্যে তাদের সমান অধিকার নিয়ে অংশগ্রহণের সুযোগও নেই। আর এইদিকে, সাম্রাজ্যের যে নতুন সংস্কৃতিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেই সংস্কৃতিতে তাদের পরিচয় বর্বর ছাড়া আর কিছু নয়।

নুমানশিয়ানদের পতনের ১০০ বছর পরের একজন সচ্ছল আইবেরিয়ানের কথা ধরা যাক। তিনি তার বাবা-মার সঙ্গে নিখুঁত উচ্চারণে তার অতি পরিচিত সেলটিক ভাষাতেই কথা বলেন, কিন্তু বড়োকর্তাদের সঙ্গে কথা বলা এবং ব্যাবসাপাতি পরিচালনার জন্য এতদিনে তিনি ল্যাটিন ভাষাটা বেশ ভালোমতোই আয়ত্ত করেছেন, যদিও উচ্চারণটা এখনো অতটা সড়োগড়ো হয়নি। স্ত্রীর সেলটিক ঘরানার নকশাদার গয়নার প্রতি আকর্ষণকে তিনি কোনোমতে মেনে নেন, কিন্তু তার সহধর্মিণী যে এখনো সেলটিকদের গতানুগতিক রুচির বাইরে বেরোতে পারল না, এটা নিয়ে তার মনে খানিকটা আক্ষেপও কাজ করে। আফসোস করেন, রোমান গভর্নরের স্ত্রীর সাদামাটা নকশার গয়নার সৌন্দর্যটা যদি বুঝতেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী! তিনি নিজে রোমানদের মতো টিউনিক (আজানুলম্বিত, ঢিলা, খাটো আস্তিনযুক্ত বা আস্তিনহীন একধরনের পোশাক) পরিধান করেন, গবাদিপশুর ব্যবসায়ে লাভ হওয়ার দরুণ এবং রোমান বাণিজ্যনীতির সঙ্গে তার ব্যবসায়ের

কোনো দ্বন্দ্ব না থাকায় রোমানদের বাড়ির আদলে একটি বড়োসড়ো বাড়িও নির্মাণ করেছেন। এমনকি তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারেন বিখ্যাত কবি ভার্জিল (Virgil)-এর জর্জিকস (Georgics) কবিতার তৃতীয় খণ্ডের পঙ্‌ক্তিমালা। কিন্তু, এত কিছুর পরও রোমানরা তাকে একজন আধাবর্বর হিসেবেই গণ্য করে। চরম হতাশা নিয়ে তিনি লক্ষ করেন, সরকারি পদস্থদের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন না অ্যাম্ফিথিয়েটারের সুবিধাজনক কোনো আসন।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে অনেক শিক্ষিত ভারতীয়দের অবস্থাও ছিল একইরকম। তাদের ব্রিটিশ প্রভুরাও তাদের সঙ্গে একই রকম আচরণ করতেন। এ ব্যাপারে ইংরেজি ভাষায় বিশেষভাবে পারদর্শী একজন উচ্চাভিলাষী ভারতীয়র একটি গল্প বলা যেতে পারে। তিনি পশ্চিমা নাচের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, দৈনন্দিন জীবনে ছুরি এবং কাঁটাচামচ দিয়ে খাওয়ার অভ্যাসও করেছিলেন। এসব সাহেবি আদবকেতা শেখার পর তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি অর্জন করেন। সুট-টাই পরা কেতাদুরস্ত এই তরুণ আইনজীবী কালো চামড়ার মানুষজনের জন্য নির্ধারিত ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণ করার বদলে প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শুধু এই কারণে তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশে একটি ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। লোকটির নাম ছিল 'মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী'।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরাজিতদের সাংস্কৃতিক অভিযোজন এবং শাসকদের আত্মীকরণের এই প্রক্রিয়াটি একসময় বিজিত এবং শাসকশ্রেণির মধ্যকার বিভেদের দেওয়াল সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বিজিতরা নিজেদেরকে সাম্রাজ্যের অংশ ভাবতেন এবং শাসকশ্রেণিও বিজিতদেরকে নিজেদের সমান মনে করতেন। শাসক ও শাসিত– দুই পক্ষই 'তাদের'কে 'আমাদের' মতো ভাবতে শুরু করেন। অনেক শতকের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পর রোমান সাম্রাজ্যের সব অধিবাসীকেই রোমান নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। রোমান বংশোদ্ভূত নন, এমন অনেকেই রোমান সৈন্যবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে নিয়োগ লাভ করেন। ৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ক্লডিয়াস বেশ

কিছুসংখ্যক গ্যালিক (ফরাসি) সম্প্রদায়ের মানুষকে রাষ্ট্রীয় পরিষদে নিয়োগ দেন এবং বলেন, 'তারা তাদের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও বিবাহবন্ধনের দ্বারা আজ আমাদের একজন হয়ে উঠেছে।' সংসদের অনেক সভ্য জাতিগতভাবে এককালের শত্রুদেরকে রোমান রাজনীতির একদম কেন্দ্রবিন্দুতে সুযোগ করে দেওয়ার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। উত্তরে ক্লডিয়াস তাদের একটি অপ্রিয় সত্য কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সেটি হলো– সাংসদদের বেশিরভাগেরই পূর্বপুরুষ ছিল ইতালিয়ান আদিবাসী, যারা এককালে রোমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং পরে তাদেরকে রোমের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। রোমান সম্রাট সবাইকে এটাও স্মরণ করিয়ে দেন, তার নিজের পূর্বপুরুষও ছিলেন ইতালির স্যাবাইন (Sabine) গোত্রভুক্ত।[৫]

২০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেন আইবেরিয়ায় জন্ম নেওয়া বেশ কিছু সম্রাট, যাঁদের ধমনিতে কোনো-না-কোনোভাবে বইছে সেই সংগ্রামী আইবেরিয়ানদের রক্ত। ট্রাজান (Trajan), হ্যাডরিয়ান (Hadrian), অ্যান্টোনিয়াস পিয়াস (Antoninius Pius), মার্কাস অরিলিয়াস (Marcus Aurelius)– এঁদের শাসনামলকে সাধারণভাবে রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে ধরা হয়। এর পর থেকে ঘুচে গেছে সবার পৃথক জাতিগত পরিচয়। সম্রাট সেপটিমিয়াস সেভেরাস (Septimius Severus) (১৯৩-২১১) ছিলেন লিবিয়ার পিউনিক পরিবারের সদস্য। ইলাগাবালুস (Elagabalus) (২১৮-২২) ছিলেন একজন সিরিয়ান। সম্রাট ফিলিপের (২৪৪-২৪৯) আরেক নাম ছিল 'আরবের ফিলিপ'। সাম্রাজ্যের পরবর্তী প্রজন্মগুলো রোমান সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিকে এতটাই গভীরভাবে গ্রহণ করেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের হাজার বছর পরও, তারা রোমান সাম্রাজ্যের ভাষায়ই কথা বলতে থাকলেন, বিশ্বাস অটুট রাখলেন খ্রিষ্টধর্মের ঈশ্বরের প্রতি, যে ধর্ম রোমান সাম্রাজ্য পেয়েছিল লেভানটাইন (Levantine) অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে এবং মানতে থাকল রোমান সাম্রাজ্যের সব আইনকানুন।

আরব সাম্রাজ্যের ঘটনাও অনেকটা এরকম। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন এই সাম্রাজ্যের পত্তন হয়, তখন সাম্রাজ্যের আরব-মুসলিম শাসক এবং অধিকৃত মিশরীয়, সিরীয়, ইরানি এবং

বারবার জাতি– যারা আরব বা মুসলিম কোনোটাই ছিল না, তাদের মধ্যে বৈষম্যের একটি স্পষ্ট ভেদরেখা ছিল। অধীনস্থ অনেক জাতিই পরে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে, আরবি ভাষাকে গ্রহণ করে এবং অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সাম্রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতিতে। আরবের প্রাচীন শাসকশ্রেণি নতুন জাতে ওঠা এসব অধিকৃতদের শত্রুতার চোখে দেখত, তাদের ভেতর কাজ করত একান্ত নিজস্ব পরিচিতি এবং সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলার ভয়। অন্যদিকে, হতবুদ্ধি ধর্মান্তরিতরা এরপর সাম্রাজ্যে এবং ইসলামের দুনিয়ায় তাদের সমান অধিকারের দাবি করতে শুরু করে। শেষমেশ তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। মিশরীয়, সিরীয় ও মেসোপটেমিয়ানরা ক্রমাগত 'আরব' নামে পরিচিতি পেতে থাকে। আরবরা, সে প্রাচীন আরব বংশোদ্ভূত আরবই হোক আর নতুন রূপান্তরিত আরবই হোক, ক্রমাগত অনারব মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে, বিশেষত ইরানি, তুর্কি ও বারবার জাতির দ্বারা। আরব সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হলো, এই সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিকে অনেক অনারব মানুষ অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছে। প্রকৃত আরব সাম্রাজ্যের পতন এবং প্রকৃত আরবদের আধিপত্য চলে গেলেও এরাই এই সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করে চলেছে।

চীনাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প ছিল আরো অনেক বেশি সফল। একসময় বর্বর হিসেবে অভিহিত, জগাখিচুড়ি পাকানো বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ২ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ধীরে ধীরে সফলভাবে চীনা সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং 'হান চাইনিজ' (এই নামটি এসেছে হান সাম্রাজ্যের নাম থেকে যার স্থায়িত্ব ছিল ২০৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নামে পরিচিতি লাভ করে। চীন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো সফলতা হলো এটি এখনো বহাল তবিয়তে জীবিত, যদিও বাইরে থেকে দেখলে তিব্বত ও শিনজিয়াংকে ঘেরা একটা ভৌগোলিক সীমানা ছাড়া সাম্রাজ্যের আর কোনো বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে না। চীনে ৯০ শতাংশের বেশি মানুজনকে তারা নিজেরা এবং বাইরের লোকজন এখনো 'হান' নামে জানে।

একই পদ্ধতিতে আমরা দুনিয়া জুড়ে গত কয়েক দশক ধরে চলা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (Decolonisation) প্রক্রিয়াটিও ব্যাখ্যা করতে পারি। আধুনিককালে ইউরোপীয়রা উন্নত পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রচারের নামে প্রায় পুরো দুনিয়াটাকেই জয় করে ফেলেছে।

তারা এ কাজে এতটাই সফল যে, কোটি কোটি মানুষ একে একে নিজেদের জীবনে এই সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রহণ করছে। ভারতীয়, আফ্রিকান, আরব, চাইনিজ ও মাওরিরা এখন ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি বা স্প্যানিশ ভাষা শেখে। তারা এখন 'মানবাধিকার' ও 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'র ধারণায় বিশ্বাস করে এবং 'স্বাধীনতা', 'পুঁজিবাদ', 'সমাজতন্ত্র', 'নারীবাদ' ও 'জাতীয়তাবাদের' মতো পশ্চিমা ধ্যানধারণাগুলো তারা গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

বিশ শতকে, বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠী, যারা পশ্চিমা মূল্যবোধগুলোকে গ্রহণ করেছিল, তারা সেইসব মূল্যবোধের দোহাই দিয়েই তাদের ইউরোপীয় শাসকদের কাছে সমতার দাবি তোলে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো পশ্চিমা ধ্যানধারণাগুলোই জন্ম দেয় পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অনেক উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের। যেভাবে মিশরীয়, ইরানি ও তুর্কিরা আরবের প্রকৃত বিজয়ীদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ গ্রহণ ও পরিমার্জন করেছিল, ঠিক একইভাবে আজকের দিনের ভারতীয়, আফ্রিকান এবং চাইনিজরাও তাদের পূর্ববর্তী পশ্চিমা শাসকদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে গ্রহণ করে সেগুলোকে নিজেদের প্রয়োজন এবং ঐতিহ্যের উপযোগী করে পরিমার্জন করে নিচ্ছে।

সাম্রাজ্যের চক্র

ধাপ	রোম	ইসলাম	ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ
প্রথমে একদল মানুষ একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে	রোমানরা তৈরি করল রোমান সাম্রাজ্য	আরবরা তৈরি করল আরব খিলাফত	ইউরোপীয়রা তৈরি করল ইউরোপীয় সাম্রাজ্য
সেই সাম্রাজ্য জুড়ে একটা সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে	গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতি	আরব-মুসলিম সংস্কৃতি	পশ্চিমা সংস্কৃতি
সাম্রাজ্যের প্রজারা ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে	জনগণ ল্যাটিন, রোমান আইনকানুন, রোমান রাজনৈতিক ধারণাগুলো গ্রহণ করল	জনগণ আরবি ভাষা, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল	জনগণ ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা এবং সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, মানবাধিকার ইত্যাদি ধারণা গ্রহণ করল
এরপর এই নতুন সাম্রাজ্যবাদী মূল্যবোধে দীক্ষিত জনগণ শাসকগোষ্ঠীর সমান অধিকার পেতে সচেষ্ট হয়	ইলিরিয়ান, গল এবং পিউনিকরা রোমান মূল্যবোধের ভিত্তিতে রোমানদের সমান অধিকার দাবি করল	মিশরীয়, ইরানি এবং বারবাররা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে আরবদের সমান অধিকার দাবি করল	ভারতীয়, চীনা ও আফ্রিকানরা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদি পশ্চিমা মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সমান অধিকার দাবি করল

ইতিহাসের নায়ক, ইতিহাসের খলনায়ক

ইতিহাসকে ভালো আর খারাপ এই দুইটি সুস্পষ্ট আলাদা ভাগে ভাগ করে ফেলার প্রবণতা প্রায়শই দেখা যায়। এই ভাগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য আর তার শাসকরা পড়েন মন্দের খাতায়। এটা সত্য, বেশিরভাগ সাম্রাজ্যের জন্ম হয়েছে নির্দয় রক্তপাতের মাধ্যমে, আর সাম্রাজ্য টিকে থাকে যুদ্ধ আর বঞ্চনার স্তম্ভের ওপর ভর করে। কিন্তু, এ কথাও সত্য যে, আজকের দিনের সংস্কৃতি, সভ্যতা, রীতিনীতির অধিকাংশই এসেছে সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ছাই থেকে। সুতরাং, সাম্রাজ্যকে পুরোপুরি খারাপের তালিকায় ফেলা হলে, নিজেদের আজকের পরিচয়, রীতি, আইনকে আমরা কোন তালিকায় ফেলব?

বেশ কিছু রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মতবাদ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ছেঁকে নিয়ে একটি বিশুদ্ধ, নতুন সভ্যতার কথা বলতে চায়, যেখানে খারাপ কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। এই ধরনের তত্ত্বগুলো হয় একেবারেই অপরিপক্ব নতুবা নতুন মোড়কে মোড়া উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং গোঁড়ামির ভিন্ন একটি রূপ মাত্র। আপনি হয়তো এরকম দাবি করতে চাইবেন, মানুষের গ্রন্থিত ইতিহাসের শুরুতে উদ্ভূত অগণিত সংস্কৃতির কিছু উপাদান বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ এবং পুরোপুরি অবিকৃত। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সংস্কৃতিই এরকম কোনো দাবি করে না, বিশেষত বর্তমান পৃথিবীতে টিকে থাকা কোনো সংস্কৃতিই এরকম কোনো দাবি করতে পারে না। মানুষের সব সংস্কৃতি কোনো না কোনো সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা রাজনৈতিক ছুরি-কাঁচি সাম্রাজ্যকে কেটে আলাদা করে তার সংস্কৃতিকে নিতে পারে না, তার অনেক আগেই সে সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে।

উদাহরণ হিসেবে আজকের স্বাধীন ভারত এবং ব্রিটিশরাজের মধ্যকার অম্ল-মধুর সম্পর্কের কথাই ধরুন। ব্রিটিশরা ভারত অধিকার করার সময় লাখ লাখ ভারতীয় নিহত হয়, তাদের উপেক্ষা ও অত্যাচারের শিকার হয় কোটি কোটি ভারতীয়। এত কিছুর পরেও অনেক ভারতীয়ই নতুন স্বাদের লোভে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' এবং 'মানবাধিকারের' মতো পশ্চিমা ধারণার চাটনি গ্রহণ করেন এবং

পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা যখন তাদের ‘সমঅধিকার’ বা ‘স্বাধীনতা’ দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে।

এত কিছুর পরেও, আধুনিক ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে। ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে, নিপীড়ন করেছে, আহত করেছে কিন্তু তারাই আবার ভারতের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অগণিত রাজ্য, মতবাদ এবং গোত্রকে একত্রিত করে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে, তাদের মধ্যে তৈরি করেছে অভিন্ন জাতীয়তাবাদের ধারণা এবং জন্ম দিয়েছে একটি দেশের যা কমবেশি একটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব হিসেবে কাজ করতে পারে। ব্রিটিশরাই তৈরি করে দিয়েছে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ভিত্তি, তৈরি করেছে এর প্রশাসনিক কাঠামো এবং দেশ জুড়ে নির্মাণ করেছে রেলপথ– যা ভারতীয় অর্থনীতিকে একীভূতকরণের জন্য ছিল অপরিহার্য। ইংরেজি এখনো এই উপমহাদেশের প্রধান ভাষা, কোনো রাজ্যের জনগণের মাতৃভাষা হিন্দি, তামিল, মালায়ালাম যা-ই হোক না কেন একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার মাধ্যম হিসেবে তারা ব্যবহার করে ইংরেজি ভাষা। ভারতীয়রা ক্রিকেটের অন্ধ ভক্ত আর চা তাদের সবচেয়ে প্রচলিত পানীয়, এই খেলা এবং চা এই দুটোই তারা পেয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে। ব্রিটিশরাই উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ভারতে চায়ের চাষ শুরু করে। এর আগে পর্যন্ত ভারতে চায়ের চাষ হতো না। অহংকারী ব্রিটিশ সাহেবরা চা পানের অভ্যাস পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে দেয়।

বর্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে একটি ভোট করা হলে কতজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে পাওয়া গণতন্ত্র, ইংরেজি, রেলওয়ে, আইনব্যবস্থা, ক্রিকেট এবং চা তাদের জীবন থেকে বর্জন করতে রাজি হবেন?

২৮. মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি স্টেশন। বোম্বে ভিক্টোরিয়া স্টেশন নামে এর যাত্রা শুরু হয়। ব্রিটিশরা উনিশ শতকের ব্রিটেনে জনপ্রিয় নিও-গথিক স্থাপত্যশৈলীতে এটি নির্মাণ করে। একটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার শহর ও স্টেশনের নাম পরিবর্তন করেছে কিন্তু এত সুন্দর একটি স্থাপনা ভাঙবার কোনো আগ্রহ তার মধ্যে দেখা যায়নি, যদিও এটির নির্মাতা ছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকবর্গ

যদি তারা এসব বর্জন করতে রাজিও হন, এই ভোট দেওয়াটাই কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে তাদের ঋণের পরিমাণকে তুলে ধরবে না?
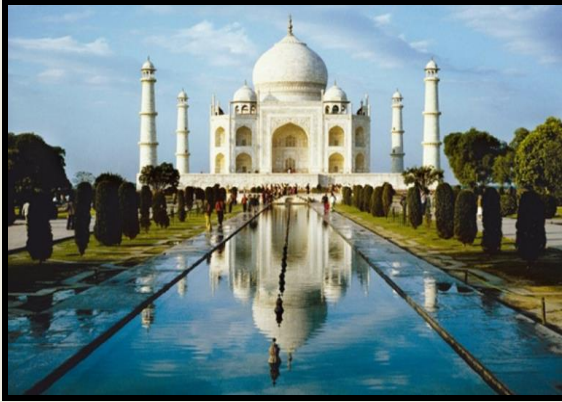
২৯. তাজমহল। বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি উদাহরণ নাকি মুসলিম সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিতে প্রভাবিত একটি স্থাপত্য?

যদি আমরা একটি নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী বিশুদ্ধ সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের জন্য সেই সাম্রাজ্যের সব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বর্জনও করি, শেষমেশ আমরা কী সংরক্ষণ করব? সম্ভবত, এই সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী কোনো সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিকে যা স্বাভাবিকভাবেই হবে এই সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির থেকেও অনেক বেশি নির্মম। যারা ব্রিটিশরাজকে ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গহানির জন্য দায়ী করত, তারা দিল্লির মসনদ দখল করা মোগল সম্রাট এবং তার সাম্রাজ্যের রেখে যাওয়া সংস্কৃতিকেই বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি বলে মনে করত। এবং কেউ মুসলিম সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকেও বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষার চিন্তা করলে, তিনি সম্ভবত তার আগের গুপ্ত সাম্রাজ্য, কুশান সাম্রাজ্য এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি ভেবে থাকবেন। যদি একজন উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশদের নির্মিত সব দালানকোঠা ধ্বংসও করে ফেলেন, ভারতের মুসলিম শাসকদের সময় তৈরি হওয়া স্থাপনাগুলোর ব্যাপারে তিনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন? ভেঙে ফেলবেন তাজমহল?

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এই বিব্রতকর প্রশ্নের সমাধান কী তা কারোরই জানা নেই। যে পথেই আমরা এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি, প্রথমে আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে এটা একটা জটিল গোলকধাঁধা এবং এখানে কাউকে ঢালাওভাবে নায়ক, কাউকে খলনায়ক বানানোর সুযোগ নেই। আর যদি আমরা সেটা করি, তাহলে আমাদের এ কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা এতদিন মূলত খলনায়কদের দেখানো পথ ধরেই হেঁটেছি।

নতুন বৈশ্বিক সাম্রাজ্য

প্রায় ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে বেশিরভাগ মানুষ কোনো-না-কোনো সাম্রাজ্যে বসবাস করে আসছে। যতদূর মনে হয়, ভবিষ্যতের মানুষও তা-ই করবে, সাম্রাজ্যের অধীনেই হবে তার বসবাস। তবে, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে সাম্রাজ্য হবে বৈশ্বিক সাম্রাজ্য। প্রকট হয়ে

উঠবে গোটা দুনিয়াকে শাসন করা একটি একক সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যবাদী দর্শন।

একবিংশ শতাব্দী যত এগিয়ে যাচ্ছে, জাতীয়তাবাদ তত বেশি জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে, একটি বিশেষ জাতির মানুষ নয়, দুনিয়ার সব মানুষ পৃথিবীর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস এবং মানুষের অধিকার রক্ষা এবং সব মানুষের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়াই হওয়া উচিত রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে ২০০টি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র এই চিন্তার পক্ষে সুবিধার চেয়ে বিপত্তিই বেশি তৈরি করে। যেহেতু সুইডিশ, ইন্দোনেশিয়ান, নাইজেরিয়ান সবাই একই রকম সমান অধিকার চায়, সুতরাং তাদের সে অধিকার রক্ষার জন্য একটি একক সাধারণ সরকার গঠনই কি সহজ সমাধান নয়?

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার মতো বিশ্বজনীন সমস্যাগুলোর উদ্ভব ধীরে ধীরে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফিকে করে দিচ্ছে। কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রই এককভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতার মতো সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারবে না। চাইনিজরা স্বর্গ থেকে মানবজাতির সমস্যা সমাধানের জন্য ‘স্বর্গীয় অনুমোদন’ পেয়েছিল। আধুনিকালের মানুষ মানুষকে ওজন স্তরের ছিদ্র মেরামত এবং গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ এর মতো স্বর্গীয় সমস্যাগুলোকে সমাধানের জন্য ‘স্বর্গীয় অনুমোদন’ দেবে। বৈশ্বিক এই সাম্রাজ্যের শনাক্তকারী রং হতে পারে সবুজ।

২০১৪ সালে এসেও পৃথিবী রাজনৈতিকভাবে অনেক ভাগে বিভক্ত, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো খুব দ্রুত তাদের স্বাধীনতা হারাচ্ছে। কোনো রাষ্ট্রই তাদের ইচ্ছামতো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারছে না, ইচ্ছে হলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না যুদ্ধে, এমনকি সবাইকে অগ্রাহ্য করে খেয়ালখুশিমতো কোনো অভ্যন্তরীণ রীতিনীতিও তৈরি করতে পারছে না। রাষ্ট্রগুলো ক্রমশ ঝুঁকছে বিশ্ববাজারের কৌশলের প্রতি, উদার হচ্ছে বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোর ব্যাপারে। সাহায্য নিচ্ছে বিশ্বের জনমত ও আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার। রাষ্ট্রকে বাধ্য হয়েই তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পরিবেশবিষয়ক পরিকল্পনা এবং ন্যায়বিচারের জন্য বৈশ্বিক মানদণ্ড মেনে চলতে হচ্ছে। কমছে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা আর

মতামতের প্রতি একাত্মতা; পুঁজি, শ্রম আর তথ্যের অফুরন্ত স্রোত পালটে দিচ্ছে পৃথিবী, গড়ে তুলছে নতুন বিশ্ব।

বৈশ্বিক সাম্রাজ্যের যে রূপ আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, কোনো বিশেষ রাষ্ট্র বা জাতি-গোষ্ঠী সেই সাম্রাজ্যের শাসক নয়। অনেকটা রোমান সাম্রাজ্যের মতো, একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সাধারণ স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য সেই বৈশ্বিক সাম্রাজ্য শাসন করে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর উচ্চপদস্থ কিছু মানুষ। দুনিয়া জুড়ে অনেক অনেক উদ্যোক্তা, প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত, আইনজীবী, ব্যবস্থাপককে প্রতিনিয়ত এই নতুন সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। তারা কি নতুন সাম্রাজ্যের এই ডাকে সাড়া দেবে, নাকি নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবে– এই সিদ্ধান্ত তাদের হাতে। মানুষ ক্রমাগত দলে দলে এই সাম্রাজ্যের ডাকেই সাড়া দিচ্ছে।

অধ্যায় ১২

ধর্মের রীতিনীতি

মধ্যযুগে মধ্য এশিয়ার মরুশহর সমরখন্দের (Samarkand) বাজার ছিল জমজমাট। সেখানে একদিকে যেমন সিরিয়ার ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসত চমৎকার চীনা রেশম, অন্যদিকে স্তেপ (Steppes) অঞ্চলের যুদ্ধবাজ লোকেরা বেচাকেনা করত পশ্চিমের দেশ থেকে আনা ক্রীতদাস। দোকানিরা তাদের পণ্য বেচে পকেটে পুরত কোনো নাম-না-জানা রাজার ছবি আর স্বাক্ষরওয়ালা চকচকে সোনার মোহর। সেই বাজারে ছিল উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশের, নানা জাতের মানুষের নিত্য আনাগোনা। এই নানান জাতের মানুষের মিলনমেলা শুধু যে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে ঘটত এমনটা নয়, একই চিত্র দেখা যেত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও। ১২৮১ সালে কুবলাই খান যখন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে জাপান আক্রমণ করেন, তখন যুদ্ধ উপলক্ষ্যেও অনেক জাতের মানুষ একত্র হয়েছিল। সে যুদ্ধে চামড়া ও পশমের পোশাক পরা মোঙ্গল ঘোড়সওয়ারের পাশাপাশি লড়েছিল বাঁশের টুপি পরা চীনা পদাতিক বাহিনী। কোরিয়ার মাতাল সৈন্যদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বাধত গায়ে উল্কি আঁকা দক্ষিণ চীন সাগরের নাবিকদের। মধ্য এশিয়ার কারিগরেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনত ইউরোপীয়দের অভিযানের কাহিনি। কিন্তু এরা সবাই ছিল একই সম্রাটের অনুগত।

সেই সময়েই, ১৩০০ সালের দিকে মক্কা শহরের কাবাকে কেন্দ্র করেও তৈরি হয়েছিল হরেক রকম মানুষের মিলনমেলা। অবশ্য এক্ষেত্রে উপলক্ষ্যটা ছিল ভিন্ন। ইসলাম ধর্মের পবিত্রতম তীর্থস্থান মক্কার কাবাঘরকে প্রদক্ষিণ করতে দেখা যেত নানা দেশের মানুষকে। সে সময় হয়তো দেখা যেত দুচোখে জ্বলজ্বলে ভক্তি আর মুখে আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম জপতে জপতে হাঁটছে মেসোপটেমিয়া থেকে আসা

আলখাল্লা পরা একদল মানুষ। তাদের সামনেই লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে হাঁটছে এশিয়ার স্তেপ এলাকা থেকে আসা চিন্তামগ্ন এক তুর্কি বৃদ্ধ। তার পাশেই আফ্রিকার মালি (Mali) থেকে আসা একজনের কুচকুচে কালো শরীরে ঝিলিক দিচ্ছে সোনার গয়না। বাতাসে লবঙ্গ, হলুদ, দারুচিনি আর সামুদ্রিক লবণের মিশ্র গন্ধ বলে দিচ্ছে কাছেই কেউ একজন এসেছে ভারত কিংবা আরো দূরের কোনো দ্বীপ থেকে।

আজকের দিনে প্রায়ই ধর্মকে মানুষের মধ্যে বৈষম্য ও মতানৈক্য সৃষ্টির কারণ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই ধর্মই মানবজাতিকে একীভূত করার তৃতীয় বৃহত্তম উপকরণ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে, এর চেয়ে বড়ো দুটো উপকরণ হলো টাকা ও রাজ্য। আমরা আগেই দেখেছি, আমাদের সমাজের সমস্ত আইনকানুন ও রীতিনীতি মানুষের সামষ্টিক কল্পনা বই আর কিছু নয়। মানুষ যেহেতু এগুলোকে কাল্পনিক বলেই জানে, সে কারণে এগুলো অস্থিতিশীল। সমাজের আকার যত বাড়ে, এই অস্থিতিশীলতাও তত বাড়তে থাকে। ইতিহাসে ধর্মের সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো এই সামাজিক কাঠামোকে আরো স্থিতিশীল করা। প্রায় সব ধর্মই বলে, আমাদের মেনে চলা নিয়মগুলো মানুষের তৈরি নয়, এগুলো এসেছে মানুষের চেয়েও উচ্চতর পরম ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো সত্তার কাছ থেকে। এতে নিয়মগুলো থেকে যায় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে, তাই সমাজ অস্থিতিশীল হওয়ার ঝুঁকিও কমে।

ধর্মকে তাই বলা যায় উচ্চতর কোনো শক্তিতে বিশ্বাস রেখে মানুষের মেনে চলা নিয়ম ও মূল্যবোধের সমষ্টি। ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দুটো :

১। ধর্ম এমন কিছু নিয়ম ঠিক করে দেয়, যা মানুষের মতৈক্য বা মতবিরোধ থেকে তৈরি হয় না, এগুলো আসে কোনো অতিমানবীয়, উচ্চতর ক্ষমতাধর কারো কাছ থেকে। পেশাদার ফুটবল কোনো ধর্ম নয়, কারণ এর অনেক রকম নিয়ম ও আচার থাকলেও সেগুলো মানুষেরই তৈরি। সবাই জানে, ফিফা যে-কোনো সময় গোলপোস্টের আকার বাড়িয়ে দিতে পারে বা অফসাইড জিনিসটাই তুলে দিতে পারে।

২। ধর্ম এইসব নিয়মের ভিত্তিতে মানুষের আচরণবিধি স্থির করে দেয়। পশ্চিমা দেশগুলোর অনেক মানুষই ভূত, পরি বা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু এই বিশ্বাস তাদেরকে কোনো নৈতিক বা আচরণগত নির্দেশনা দেয় না। তাই এই বিশ্বাসকেও ধর্ম বলা যায় না।

প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতিগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা ধর্মের থাকলেও সব ধর্ম এ কাজটা করেনি। সুবিশাল ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীগুলোকে একই শৃঙ্খলায় বাঁধতে ধর্মের আরো দুটো বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এক, সব স্থান ও কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর দুই, এই বিশ্বাসকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ধর্মকে হতে হবে সর্বজনীন ও প্রচারমুখী।

ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধর্মের মধ্যে আছে ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম। এ দুটো ধর্মই সর্বজনীন ও প্রচারমুখী। তাই অনেকের ধারণা হতে পারে ধর্মমাত্রই এমন, কিন্তু আসলে তা নয়। বলতে গেলে, প্রাচীন ধর্মগুলোর বেশিরভাগই ছিল আঞ্চলিক। সেসব ধর্মের অনুসারীরা তাদের আঞ্চলিক দেবদেবীর পূজা করত, আর সে ধর্মের প্রচারের দিকে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। আমাদের জানামতে সর্বজনীন ও প্রচারমুখী ধর্মগুলোর আবির্ভাব হয় খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। এ ধরনের ধর্মের উদ্ভব মানুষের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ রাজ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য টাকার পর এসব সর্বজনীন ধর্মই পৃথিবীর মানুষকে একত্র করতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে।

হারাধনের দশটি ছেলে, রইল বাকি এক

একটা সময় সর্বপ্রাণবাদে (সব বস্তু, প্রাণী, বৃক্ষ সবার মধ্যেই এক প্রাণ বা আত্মা বিরাজিত এমন ধারণা, Animism) বিশ্বাস মানুষের মধ্যে বেশ প্রবল ছিল। সে সময় মানুষের রীতিনীতি, আচার-আচরণ সবই তৈরি হতো নানা রকম পশুপাখি, গাছপালা কিংবা পরি, ভূতপ্রেত– এসব ঘিরে। যেমন, গঙ্গা অববাহিকার মানুষ হয়তো

এমন একটা নিয়ম চালু করল যে একটি নির্দিষ্ট বড়ো আকারের নাশপাতি গাছ কেউ কাটতে পারবে না, কাটলে সে গাছের আত্মা অভিশাপ দেবে। আবার সিন্ধু (Indus Valley) তীরের কোনো মানবসমাজে হয়তো সাদা লেজের শেয়াল হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করল, কারণ কোনো এককালে এমন একটা শেয়াল এক বুড়ির কাছে কিছু দামি রত্নের খোঁজ দিয়েছিল।

এই ধরনের ধর্মগুলো ছিল পুরোপুরিই আঞ্চলিক, আর এসব ধর্মের মধ্যে ওই অঞ্চলের অবস্থান, জলবায়ু ও বিভিন্ন ঘটনার ছাপ থাকত প্রবলভাবে। খাদ্যসংগ্রাহক মানুষের পুরো জীবনটাই কাটত বড়োজোর হাজারখানেক বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে। বেঁচে থাকার জন্য তাদের সবাইকে ওই এলাকার অতিপ্রাকৃত নিয়মগুলো মেনে জীবন কাটাতে হতো। দূরের কোনো এলাকার মানুষকে এসব নিয়ম মানতে বলাটা ছিল অর্থহীন। এজন্যই ইন্ডাস নদীতীরের মানুষ গাঙ্গেয় অঞ্চলের মানুষকে সাদা লেজের শেয়াল হত্যা করতে মানা করতে লোক পাঠায়নি।

ধারণা করা হয়, কৃষিবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল ধর্মীয় বিপ্লব। শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ যেসব প্রাণী শিকার করত, প্রাণিজগতে সেগুলোর অবস্থান হোমো সেপিয়েন্সের সঙ্গে একই স্তরেই ছিল। মানুষ ভেড়া শিকার করত বলে তারা ভেড়ার চেয়ে উচ্চস্তরের কোনো প্রাণী হয়ে যায়নি, ঠিক যেমন মানুষ শিকার করেও মানুষের ওপরে স্থান পায়নি বাঘ। মানুষে মানুষে যোগাযোগ হতো সরাসরি, এলাকার নিয়মগুলো তৈরি হতো মানুষের আলোচনার মাধ্যমে। অন্যদিকে কৃষিনির্ভর সমাজে দেখা গেল, কৃষকই তার ফসল আর পশুর মালিক। আর সেগুলো সে আর কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করতে আগ্রহী নয়। এভাবেই কৃষিবিপ্লবের হাত ধরে সূচিত হলো প্রাথমিক ধর্মীয় রীতিনীতির, আর গাছপালা-পশুপাখি প্রাণিজগতের সদস্য থেকে পরিণত হলো সম্পত্তিতে।

এর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল একটা বড়ো সমস্যাও। কৃষক চাইত তার ভেড়ার পালের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে, কিন্তু সে এও জানত যে তার ক্ষমতা সীমিত। কৃষক চাইলে তার ভেড়ার পালকে খোঁয়াড়ে আটকে রাখতে পারে, খাসি করে দিতে পারে, নিজের ইচ্ছামতো সুস্থ ভেড়ার মধ্যে প্রজননের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু

ভেড়ারা যে সুস্থ সন্তান জন্ম দেবে এর নিশ্চয়তা দিতে পারে না। মহামারির হাত থেকে ভেড়াগুলোকে বাঁচানোর সাধ্যও তার ছিল না। তাহলে সে তার ভেড়াগুলোর বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে কীভাবে?

এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতেই ঈশ্বরের গুরুত্ব বেড়ে যায়– এমনটিই দাবি করে ঈশ্বরের উৎপত্তি বিষয়ক একটি তত্ত্ব। প্রাণিজগতে মানুষ যখন উঠে গেল এক ধাপ ওপরে, আর সব প্রাণী ও উদ্ভিদ তখনো পড়ে রইল সাধারণের কাতারে। উর্বরতার দেবী, আকাশের দেবতা, চিকিৎসার দেবতাসহ আরো নানা দেবতা হয়ে গেল এসব নির্বাক পশুপাখি আর গাছপালার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম। এ কারণেই প্রাচীন পুরাণগুলোর বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে অনেকটা আইনি চুক্তির মতো, যেখানে মানুষ দেবতাদের দেবে তাদের চিরস্থায়ী আনুগত্য, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে পাবে গাছপালা ও জীবজন্তুর ওপরে নিজেদের আধিপত্য। খ্রিষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বইয়ের শুরুর (Book of Genesis) দিকের অধ্যায়গুলো এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কৃষিবিপ্লবের পর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে উৎসর্গ করছে ভেড়া, মদ কিংবা রুটি, আর বিনিময়ে প্রার্থনা করছে ফসল ও পশুসম্পদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

পাথর, ঝরনা বা ভূতপ্রেতের আরাধনার যে ধর্ম আগে প্রচলিত ছিল, শুরুতে তার ওপর কৃষিবিপ্লবের প্রভাব ছিল সামান্যই। কিন্তু ধীরে ধীরে এগুলো তাদের আবেদন হারাতে শুরু করে, আর তাদের জায়গা নিয়ে নেয় নতুন দেবতারা। যতদিন মানুষের বিচরণ তাদের আশপাশের কয়েক শ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল ততদিন এসব আঞ্চলিক দেবতাদের দিয়েই তাদের কাজ চলত। কিন্তু এরপর মানুষ যখন বিরাট এলাকা জুড়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে শুরু করল, প্রতিষ্ঠা করল বিশাল সব রাজ্য, তখন সেই বিপুল ভূখণ্ডের সব মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন কোনো শক্তিমান সত্তার প্রয়োজন দেখা দিল।

এই প্রয়োজন মেটাতেই একসময় বহু-ঈশ্বরবাদী (Polytheistic, গ্রিক শব্দ Poly মানে 'বহু', Theos মানে 'ঈশ্বর') ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এইসব ধর্মমত অনুসারে, এই পৃথিবী চালিত

হয় একাধিক শক্তিশালী দেবদেবীর দ্বারা, যেমন উর্বরতার দেবী, বৃষ্টির দেবতা কিংবা যুদ্ধের দেবতা। মানুষ এইসব দেবদেবীকে তুষ্ট করে চলত, আর মানুষের উপাসনা ও উৎসর্গে সন্তুষ্ট হলে দেবতারা তাদের দান করতেন বৃষ্টি, সুস্বাস্থ্য বা যুদ্ধে বিজয়।

তবে বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মের প্রভাবে আগের সেই সর্বপ্রাণবাদ কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায়নি, বরং সেগুলো একীভূত হয়ে গেছে নতুন ধর্মের সঙ্গে। প্রায় সব বহু-ঐশ্বরিক ধর্মেই ভূতপ্রেত, পরি, পবিত্র পাথর, ঝরনা বা গাছের কথা এসেছে। মহান দেবদেবীর ক্ষমতার সামনে এদের গুরুত্ব অনেকটা ম্লান হয়ে গেলেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে এদের প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। রাজ্যের সম্রাট যখন রাজধানীতে যুদ্ধদেবতার উদ্দেশে ১০০টা স্বাস্থ্যবান ভেড়া বলি দিয়ে যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতেন, ঠিক সে সময়েই হয়তো একজন কৃষক তার পুত্রের রোগমুক্তির আশায় কোনো পবিত্র বৃক্ষের নিচে জ্বালতেন একটি ছোট্ট প্রদীপ।

এইসব দেবতার উত্থানের প্রভাব যতটা না পড়েছিল ভেড়া আর ভূতপ্রেতের ওপরে, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়েছিল প্রাণিজগতে হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিটির অবস্থানের ওপর। আগের সর্বপ্রাণবাদীরা মনে করত, তারাও পৃথিবীর আর সব প্রাণীর মতোই আরেকটি প্রাণী। কিন্তু বহু-ঈশ্বরবাদী মানুষ নিজেদের আর সব প্রাণীর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে শুরু করল। তাই এসব ধর্মের চোখে পৃথিবীটা হয়ে গেল শুধু মানুষ ও দেবতার সম্পর্কের প্রতিরূপ। তারা ভাবত, মানুষের সব প্রার্থনা, উৎসর্গ, পাপ ও পুণ্য– এগুলোই পৃথিবী ও পরিবেশের পরিণতি নির্ধারণ করে। তাই অল্প কিছু অপরিণামদর্শী সেপিয়েন্সের দোষে ঈশ্বর রুষ্ট হলে প্রবল বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে কোটি কোটি পিঁপড়া, ফড়িং, কচ্ছপ, হরিণ, জিরাফ, হাতি। বহু-ঈশ্বরবাদ তাই শুধু দেবতাদের ক্ষমতাই বৃদ্ধি করল না, বাড়িয়ে দিল মানুষের মর্যাদাও। আর জীবজগতের বাকি সব সদস্য, যারা এর আগের সর্বপ্রাণবাদী ধর্মে মানুষের সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল, তারা তাদের মর্যাদা হারিয়ে ঢাকা পড়ে গেল মানুষ ও ঈশ্বরের নাটকীয় সম্পর্কের ছায়ায়।

পুতুলপূজার ফজিলত

প্রায় ২ হাজার বছরের একেশ্বরবাদী মগজধোলাইয়ের কারণে আজকের পশ্চিমা দেশের অধিকাংশ মানুষ বহু-ঈশ্বরবাদিতাকে একরকম নির্বুদ্ধিতা বা হাস্যকর মূর্তিপূজা হিসেবেই দেখে। কিন্তু এটা যুক্তিহীনভাবে মেনে নেওয়া প্রচলিত একটি ধারণা মাত্র। বহু-ঈশ্বরবাদিতার ভেতরকার যুক্তিগুলো বুঝতে হলে আগে আমাদেরকে অনেকগুলো ঈশ্বরে বিশ্বাসের পেছনের মূল কারণটির অনুসন্ধান করতে হবে।

বহু-ঈশ্বরবাদ মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় কোনো একক মহাশক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। বরং বেশিরভাগ বহু-ঈশ্বরবাদী, এমনকি সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী মানুষও সব দেবদেবী, ভূতপ্রেত আর পবিত্র গাছ-পাথরের পেছনে আরো বড়ো, পরম এক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। বহু-ঈশ্বরবাদী গ্রিক পুরাণের দেবতা জিউস, হেরা, অ্যাপোলো ও অন্য দেবদেবীরাও সর্বগ্রাসী, সর্বশক্তিমান নিয়তির (Moira, Ananke– গ্রিক পুরাণে নিয়তির ব্যক্তিরূপ) অধীন ছিলেন। নর্ডিক দেবতারাও ছিলেন নিয়তির দাস, যার জন্য পুরাণমতে ভবিষ্যতে র‍্যাগনারক (Ragnarök) নামক মহাবিপর্যয়ে মহাবিশ্বের সঙ্গে বিনাশ হবে তাঁদেরও। পশ্চিম আফ্রিকার ইয়োরুবা (Yoruba) জনগোষ্ঠীর বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মে বলা হয়, সব দেবতার জন্ম হয়েছে ওলোডুমারে (Olodumare) নামক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থেকে। হিন্দুধর্মমতে সব দেবতা, অশরীরী, মানুষ, সব জীব ও জড়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে 'আত্মা'। এই 'আত্মা'ই এ মহাজগতের প্রাণ, আত্মাই সব প্রাণী ও সব ঘটনাকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে।

একেশ্বরবাদ এবং বহু-ঈশ্বরবাদ দুটো ধারণাতেই একটি একক পরম সত্তার কথা বলা হলেও বহু-ঈশ্বরবাদের মূল যে বৈশিষ্ট্যটি একে একেশ্বরবাদ থেকে পৃথক করে তা হলো– বহু-ঈশ্বরবাদে যে বিশ্বনিয়ন্তা পরম শক্তির কথা বলা হয় তা সব রকম মোহ ও পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে। মানুষের জাগতিক চাওয়া-পাওয়া, আশা বা ভয়ের সঙ্গে সে শক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। সে পরম শক্তির কাছে যুদ্ধে বিজয়, স্বাস্থ্য বা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা অর্থহীন, কারণ সেই সর্বব্যাপী সত্তার কাছে দুই দল ক্ষুদ্র মানুষের যুদ্ধে কে জিতল কে

হারল, কে বাঁচল কে মরল– সে নিতান্তই তুচ্ছ। তাই গ্রিকরা নিয়তির উদ্দেশে একটাও পশু বলি দেয়নি, হিন্দুরা আত্মাকে পূজা দিতে বানায়নি কোনো মন্দির।

তাই সেই পরম শক্তির নিকটবর্তী হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল সব রকম জাগতিক মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর ভালোর পাশাপাশি মন্দকেও সমানভাবে গ্রহণ করা– দারিদ্র্য, জরা, ব্যাধি, এমনকি মৃত্যুকেও। এই উদ্দেশ্যে হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেকে আলোকিত করতে সারা জীবন উৎসর্গ করে দিতেন। তাঁরা সেই পরমাত্মার দৃষ্টিতে পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা করতেন, বুঝতে চেষ্টা করতেন মহাকালের কাছে মানুষের পার্থিব সব আকাঙ্ক্ষা আর ভয়গুলো কতটা অর্থহীন, কতটা ক্ষণস্থায়ী।

জগতে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম, বিষয়ী মানুষের সংখ্যাই বেশি। বেশিরভাগ হিন্দুই নানা রকম জাগতিক কামনা-বাসনায় জর্জরিত, নির্বাক-নির্বিকার আত্মা তাই তাদের কাছে অর্থহীন। জাগতিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তাই তাদের ভরসা ছিল 'আংশিক ক্ষমতাধর' দেবতারা। গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো দেবদেবীদের ক্ষমতা ছিল সীমিত, তাই সর্বময় আত্মার মতো তাঁরা নির্লিপ্ত থাকতে পারতেন না। এসব দেবতাদেরও বিভিন্ন দিকে আগ্রহ কিংবা পক্ষপাত ছিল। তাই মানুষ যুদ্ধে জেতা কিংবা রোগমুক্তির মতো বিষয়ে এসব দেবতার কাছেই সাহায্য চাইত। কোনো সর্বময় শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলতে গেলে অবধারিতভাবেই একাধিক দেবতার আবির্ভাব ঘটে।

বহু-ঈশ্বরবাদিতার এই মূলনীতির জন্যই এসব ধর্মে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বেশি দেখা যায়। বহু-ঈশ্বরবাদীরা একদিকে বিশ্বাস করে একটা পরম ও নির্লিপ্ত শক্তিতে, অন্যদিকে আংশিক ক্ষমতার অধিকারী দেবতার অস্তিত্বও স্বীকার করে নেয়। এক দেবতার অনুসারী অন্য দেবতার অস্তিত্ব ও ক্ষমতার কথা সহজভাবেই গ্রহণ করে। এজন্য বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলো সহজাতভাবেই খোলা মনের পরিচয় দেয়, আর এসব ধর্মে 'অবিশ্বাসী' বা 'ধর্মদ্রোহী' মানুষকে শাস্তি দেওয়ার কথাও কমই শোনা যায়।

এই বহু-ঈশ্বরবাদী মানুষেরা বিরাট কোনো রাজ্য দখল করলেও তার অধিবাসীদের ওপর নিজেদের ধর্ম চাপিয়ে দিত না। মিশরীয়,

রোমান বা অ্যাজটেকরা কখনো তাদের দেবতা ওসাইরিস (Osiris), জুপিটার (Jupiter) বা হুইটজিলোপোক্টলির (Huitzilopochtli–অ্যাজটেকদের প্রধান দেবতা) অনুসারী বাড়াতে অন্যান্য দেশে ধর্মপ্রচারক বা সৈন্য কোনোটাই পাঠায়নি। প্রজাদেরকে রাজ্যের প্রভুর উপাসনা করতে হতো, কারণ ওই প্রভুই তো রাজ্যের রক্ষক। তাই বলে তাদের নিজেদের দেবতা ও ধর্মীয় আচার ত্যাগ করতে হয়নি। অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের প্রজারা হুইটজিলোপোক্টলির মন্দির তৈরি করতে বাধ্য হতো বটে, কিন্তু সে মন্দির তৈরি হতো সেখানকার আঞ্চলিক দেবতার মন্দিরের পাশেই, সেটাকে অক্ষত রেখে, ভেঙে দিয়ে নয়। আবার অনেক সময় রাজ্যের অভিজাত শ্রেণির মানুষেরাও আমজনতার ধর্মাচরণকে গ্রহণ করত। রোমানরা এশিয়ার দেবী সিবিলি (Cybele) বা মিশরের দেবী আইসিসের (Isis) মূর্তিকে সানন্দে স্থান দিয়েছিল নিজেদের প্যান্থিয়নে (Pantheon, Pan মানে 'সব', Theon মানে 'দেবতা')।

শুধু একজনকেই রোমানরা অনেক দিন পর্যন্ত মেনে নেয়নি, তিনি খ্রিষ্টধর্মের ঈশ্বর। রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টানদের ধর্মত্যাগ করতে বলা হতো না, কিন্তু তাদেরকে বলা হতো রাজ্যের আর সব দেবদেবী ও সম্রাটকে সম্মান জানাতে। মানুষ অবশ্য এটাকে রাজনৈতিক আনুগত্য আদায়ের পথ হিসেবে দেখেছিল। খ্রিষ্টানরা এই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানালে রোমানরাও সেটাকে রাজনৈতিক বিরোধিতা হিসেবে গণ্য করে এবং তা দমনের ব্যবস্থা নেয়। তবে এ ব্যাপারেও রোমানদের যে খুব বেশি আগ্রহ বা তৎপরতা ছিল এমনটা নয়। যিশুখ্রিষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর থেকে রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটিনের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের মাঝের ৩০০ বছরে বহু-ঈশ্বরবাদী রোমান সম্রাটদের হাতে খ্রিষ্টানরা নির্যাতিত হয়েছে বড়োজোর চার বার। স্থানীয় প্রশাসকদের দ্বারাও এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে। তার পরও, এই ৩০০ বছরের নির্যাতনে নিহত হওয়া মোট খ্রিষ্টানের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি হবে না।[১] অন্যদিকে পরের ১৫০০ বছরে ভালোবাসা ও সহানুভূতির ধর্ম খ্রিষ্টধর্মের বিষয়ে সামান্য মতভেদের কারণে খ্রিষ্টানরাই হত্যা করেছে লাখ লাখ খ্রিষ্টানকে।

এ প্রসঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপ জুড়ে সংঘটিত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার ধর্মীয় সংঘর্ষ বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এ যুদ্ধের দুপক্ষই ছিল যিশুখ্রিষ্টের মহিমা ও তাঁর ভালোবাসার বাণীতে অনুপ্রাণিত। তাদের মতানৈক্যটাও হয়েছিল সেই ভালোবাসার প্রকৃতি নিয়েই। প্রোটেস্ট্যান্টরা বলত ঈশ্বরের ভালোবাসা এতই মহান যে তিনি নিজে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসে মানুষের আদিম পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে, আর বিশ্বাসীদের জন্য খুলে দিয়েছেন স্বর্গের দ্বার। ক্যাথলিকরাও এটুকু মানত, পাশাপাশি তারা এটাও দাবি করত যে, শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। স্বর্গলাভের জন্য মানুষকে বিশ্বাসের পাশাপাশি নিয়মিত গির্জায় যেতে হবে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে আর করতে হবে ভালো কাজ। এখানেই প্রোটেস্ট্যান্টদের আপত্তি। তারা বলে এতে ঈশ্বরের অমর্যাদা হয়। স্বর্গে যাওয়া যদি নিজ কৃতকর্মের ওপরেই নির্ভর করে তাহলে তো যিশুখ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও ঈশ্বরের ভালোবাসার চেয়ে নিজেকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই ধর্মীয় মতবিরোধ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে চরমে পৌঁছায়। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট– দুই দলের মানুষই অন্য দলের শত শত মানুষকে হত্যা করে। ১৫৭২ সালের ২৩ আগস্টে সৎকর্মের সমর্থক ফ্রান্সের ক্যাথলিকরা সে দেশের প্রোটেস্ট্যান্টদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। সেই আক্রমণে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫ থেকে ১০ হাজার প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাণ হারায়। এই ঘটনাকেই ইতিহাসে বলা হয় সেইন্ট বার্থোলোমিউ দিবসের গণহত্যা (St Bartholomew’s Day Massacre)। এই গণহত্যার খবর রোমে পৌঁছলে পোপ উল্লসিত হয়ে বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে তা উদ্‌যাপন করেন, আর শিল্পী জর্জিও ভাসারিকে (Giorgio Vasari) দায়িত্ব দেন ভ্যাটিক্যানের একটা ঘরের দেওয়াল জুড়ে এই গণহত্যার ছবি এঁকে রাখতে।[২] ওই ২৪ ঘণ্টায় খ্রিষ্টানদের হাতেই যতজন খ্রিষ্টান নিহত হয়, বহু-ঈশ্বরবাদী রোমান সাম্রাজ্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়েও ততজন খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হয়নি।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম পালন করতে করতে একসময় কিছু মানুষ একেকজন বিশেষ দেবতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যায়। এই ভক্তির কারণে তারা আস্তে আস্তে বহু-ঐশ্বরিক দর্শন থেকে সরে আসে। তারা বিশ্বাস করতে থাকে, তাদের ওই একজন দেবতাই একমাত্র ঈশ্বর, তাঁর হাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব ক্ষমতা। আবার সে ঈশ্বরের পছন্দ-অপছন্দ ও পক্ষপাত আছে, সুতরাং তাঁর সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদান চলতে পারে। এভাবেই পৃথিবীতে উদ্ভব হলো একেশ্বরবাদের। এসব ধর্মের অনুসারীরা মহাবিশ্বের পরম শক্তিধরের কাছেই সরাসরি সাহায্য চাইতে পারে। সেটা রোগ সারানোর জন্যই হোক কিংবা যুদ্ধে বা লটারিতে জেতার জন্যই হোক।

৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ফারাও আখেনাতেন, আতেন নামের মিশরীয় প্যান্থিয়নের এক দেবতাকে সর্বশক্তিমান বলে প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের জানামতে সেটাই পৃথিবীর প্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম। আখেনাতেন সারা রাজ্যে আতেনের উপাসনা চালু করেন, সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীদের উপাসনা বন্ধ করতেও সচেষ্ট হন। তবে ধর্মে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য তাঁর এই চেষ্টা শেষমেশ সফল হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর আতেনের উপাসনাও বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবেই বিভিন্ন জায়গায় বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকে একেশ্বরবাদী ধর্মের উদ্ভব হতে থাকে, কিন্তু সেগুলো প্রচার ও সর্বজনীনতার অভাবে বিকশিত হয় না, এক জায়গায় আটকে থাকে। এই যেমন ইহুদি ধর্মমতে পরমেশ্বরের আগ্রহ বা পক্ষপাত আছে, কিন্তু সে আগ্রহ কেবল ইসরায়েল নামক একটা জায়গার ক্ষুদ্র ইহুদি জনগোষ্ঠীকে ঘিরে। ইহুদিদের ধর্মে অন্যান্য জাতিকে আকৃষ্ট করার মতো উপাদান কিছু ছিল না এবং তারা বেশিরভাগ সময়েই ছিল প্রচারবিমুখ। একেশ্বরবাদের এই অবস্থাটিকে 'আঞ্চলিক একেশ্বরবাদ' নামে ডাকা যেতে পারে।

এ অবস্থার সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন আনে খ্রিষ্টধর্ম। এর উৎপত্তি ঘটে ইহুদিদেরই একটা অংশ থেকে। তারা অন্যদের বোঝাতে শুরু করে যে, নাজারেথের যিশুই তাদের বহু প্রতীক্ষিত উদ্ধারকর্তা (Messiah)। এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন মধ্য-দক্ষিণ তুরস্কের

শহর টারসাসের ধর্মপ্রচারক পল (Paul of Tarsus)। তিনি বলেন, যদি মহাবিশ্বের পরম শক্তিধর ঈশ্বর নির্লিপ্ত না হন, আর তিনি রক্তমাংসের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসে মানবমুক্তির উদ্দেশ্যে ক্রুশে প্রাণ দেন, তাহলে সে ঈশ্বরের কথা শুধু ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সব মানুষকে জানানো উচিত। এরপরই ঈশ্বরের বাণী আর যিশুর কথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে পৃথিবীর সর্বত্র।

পলের কথায় কাজ হয়েছিল। খ্রিষ্টানরা সব মানুষের কাছে খ্রিষ্টধর্ম পৌঁছে দিতে শুরু করল নানা রকম প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড। আর ইতিহাসের বিচিত্র খেয়ালে ইহুদিদের সেই ছোটো জনগোষ্ঠীর ধর্মটাই একদিন দখল করে বসল শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য।

খ্রিষ্টধর্মের এই সাফল্য পরবর্তীকালে আরব উপদ্বীপে সৃষ্ট আরেকটি একেশ্বরবাদী ধর্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়– সে ধর্মের নাম ইসলাম। খ্রিষ্টধর্মের মতো ইসলামও একটা ছোটো এলাকার ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয়, কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের চেয়েও নাটকীয়ভাবে তা আরব এলাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপর থেকে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো বিশ্বের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

একেশ্বরবাদী মানুষের মধ্যে প্রচারমুখিতা আর গোঁড়ামি, এ দুটো জিনিস বহু-ঈশ্বরবাদীদের চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায়। কোনো ধর্ম যদি অন্যান্য বিশ্বাসকেও মেনে নেয় তবে এর অর্থ হতে পারে দুরকম– হয় সে ধর্মের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নয়, অথবা সে ধর্ম পরমেশ্বরের কাছ থেকে পরম সত্যের একটা অংশ লাভ করেছে, পুরোটা নয়। একেশ্বরবাদীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর একজনই আর সে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাণীই তারা পেয়েছে, তাই অন্য সব ধর্মকে তারা অস্বীকার করতে থাকে। বিগত ২ হাজার বছরে একেশ্বরবাদীরা ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্মূল করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেছে বহুবার।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীতে একেশ্বরবাদী মানুষ ছিল না বললেই চলে। ৫০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রোমান সাম্রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী ছিল খ্রিষ্টান। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই সাম্রাজ্য থেকে

ধর্মপ্রচারকরা ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায়। খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের শেষ নাগাদ ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া আর উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ মানুষই একেশ্বরবাদী ধারণায় বিশ্বাস করতে শুরু করল। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে হিমালয় পর্যন্ত যত সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল সেগুলোর সবই তখন ছিল একজন ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ষোড়শ শতকের শুরুতে এশিয়ার পূর্ব আর আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ ছাড়া বিশাল আফ্রো-এশিয়া ভূখণ্ডে ছিল একেশ্বরবাদী ধর্মের জয় জয়কার। আর আজ পূর্ব এশিয়ার বাইরের বেশিরভাগ মানুষই কোনো-না-কোনো একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিও চলছে এসব ধর্মের ওপর ভর করেই।

মজার ব্যাপার হলো, সর্বপ্রাণবাদ যেমন বহু-ঈশ্বরবাদের মধ্যেও টিকে ছিল, ঠিক তেমনি বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মও একেশ্বরবাদী ধর্মের পাশাপাশি বেঁচে রইল। তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে, যদি পরম শক্তিধর ঈশ্বরই মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের দায়িত্ব নেন, তবে আংশিক ক্ষমতার অধিকারী দেবতার পূজা কেন করবে মানুষ? স্বয়ং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের দরজা খোলা পেলে কে যাবে তাঁর অধীনস্থ কোনো আমলার কাছে? একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো তাই আর সব দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, আর যারা পরমেশ্বর বাদে অন্য কোনো দেবতার আশ্রয় নেয় তাদের জন্য নিশ্চিত করে পরকালে অনন্ত নরকবাস।
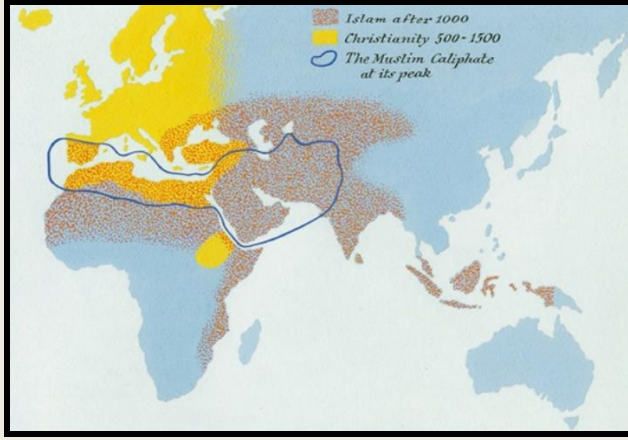
ম্যাপ ৫। মানচিত্রে খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের ব্যাপ্তি

তবে তত্ত্বকথা ও বাস্তবতা সব সময় মেলে না। অনেক মানুষই একেশ্বরবাদের এই মূল ব্যাপারটা পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারেনি। তাদের কাছে পৃথিবীটা বরাবরই 'আমাদের' আর 'তাঁদের'– এই দুই অংশে বিভক্ত। তারা মনে করে সেই মহাশক্তি ও মানুষের পার্থিব মামুলি কর্মকাণ্ডের দুস্তর ব্যবধান কখনো ঘুচবার নয়। তাই একেশ্বরবাদ এসে পুরোনো দেবতাদের সদর দরজা দিয়ে পত্রপাঠ বিতাড়িত করলেও, বহু-ঈশ্বরবাদী চেতনার প্রবেশের জন্য জানালাটা আবার ঠিকই খোলা রেখেছে। খ্রিষ্টধর্ম তৈরি করেছে আরেক প্যান্থিয়ন, যেখানে দেবতার বদলে আছেন নানান সাধু-সন্ন্যাসী। বহু-ঐশ্বরিক দেবতাদের মতোই এসব সাধু-সন্ন্যাসীর রয়েছে নিজ নিজ ভক্ত ও অনুসারীর দল।

দেবতা জুপিটার যেমন রোমের রক্ষক ছিলেন, তেমনি প্রত্যেক খ্রিষ্টান রাজ্যেরও একজন করে প্রধান সন্ন্যাসী থাকতেন। সেই সন্ন্যাসীর কাজ ছিল বিভিন্ন সমস্যা সমাধান আর যুদ্ধে জিততে ওই রাজ্যের মানুষকে সাহায্য করা। ইংল্যান্ডের রক্ষাকর্তা হিসেবে ছিলেন সেইন্ট জর্জ, স্কটল্যান্ডে সেইন্ট অ্যান্ড্রু, হাঙ্গেরিতে সেইন্ট স্টিফেন আর ফ্রান্সে সেইন্ট মার্টিন। প্রত্যেক শহরের জন্য, পেশার জন্য, এমনকি রোগের জন্যও আলাদা আলাদা সন্ন্যাসী ছিলেন। ইতালির

মিলান শহরের সন্ন্যাসী ছিলেন সেইন্ট অ্যামব্রোস, ভেনিসে সেইন্ট মার্ক। চিমনি পরিষ্কার করা লোকেদের রক্ষা করতেন সেইন্ট ফ্লোরিয়ান, কর সংগ্রাহকদের বিপদে এগিয়ে আসতেন সেইন্ট ম্যাথিউ। মাথাব্যথায় প্রার্থনা করতে যেতে হতো সেইন্ট আগাথিয়াসের কাছে, আর দাঁত ব্যথার জন্য ছিলেন সেইন্ট অ্যাপোলোনিয়া।

খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরা যে শুধু আগের বহু-ঐশ্বরিক দেবতাদের মতো ছিলেন তা নয়, অনেক সময় দেবতাই রূপান্তরিত হতেন সন্ন্যাসীতে। এই যেমন খ্রিষ্টধর্ম চালু হওয়ার আগে কেল্টিক আয়ারল্যান্ডের প্রধান দেবী ছিলেন ব্রিজিদ (Brigid)। আয়ারল্যান্ডে খ্রিষ্টধর্ম প্রচলনের পর কেল্টিক আয়ারল্যান্ডের এই দেবী হয়ে উঠলেন খ্রিষ্টানদের সেইন্ট ব্রিজিদ। আজ পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী সন্ন্যাসিনী তিনিই।

ভালো আর খারাপের যুদ্ধ

বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকে শুধু একেশ্বরবাদী ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে– এমনটা ভাবলে ভুল হবে। দ্বৈতবাদী (Dualistic) ধর্মের উদ্ভবও হয়েছে বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকেই। এসব ধর্ম দুটো বিপরীতধর্মী শক্তির কথা বলে, ভালো আর খারাপ। একেশ্বরবাদী ধর্মমতে এই মন্দের উৎপত্তি হয় ভালো থেকেই (অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে), কিন্তু দ্বৈতবাদী ধর্মে ভালো আর খারাপ দুটোই স্বাধীনভাবে বিরাজ করে। এসব ধর্ম বলে যে এই জগৎ হলো ভালোমন্দের একটা যুদ্ধক্ষেত্র। যা-কিছু ঘটে, তার সবই এই দ্বন্দ্বের অংশ।

দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বেশ আকর্ষণীয়, কারণ এতে মানুষের চিন্তাজগতের একটা মৌলিক প্রশ্নের ছোট্ট, সরল উত্তর পাওয়া যায়। প্রশ্নটা হলো, ‘পৃথিবীতে মন্দের অস্তিত্বের কারণ কী? কেন মানুষের এত দুর্ভোগ? ভালো মানুষের সঙ্গেও কেন খারাপ ঘটনা ঘটে?’ একেশ্বরবাদ যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও দয়ালু ঈশ্বরের কথা বলে, তা দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে একেশ্বরবাদীদের বেশ বেগ পেতে হয় বইকি। প্রচলিত একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যাগুলোর একটা বলে যে, ঈশ্বর মানুষকে যে স্বাধীন ইচ্ছার সুযোগ দিয়েছেন, এটা বোঝাতেই মন্দের

সৃষ্টি। জগতে যদি মন্দ না থাকত, তাহলে মানুষ ভালো আর মন্দের মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নিতে পারত না। অবশ্য এই যুক্তি খুব সহজবোধ্য নয়, আর এখান থেকে আরো কিছু প্রশ্ন জাগে। ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলে মানুষ ভালো ছেড়ে মন্দকে গ্রহণ করতে পারে। অনেক মানুষ সেটা করেও। একেশ্বরবাদী ধর্ম বলে, মন্দকে বেছে নেওয়ার জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যদি আগে থেকেই জানেন যে ওই মানুষটি স্বেচ্ছায় মন্দকেই বেছে নিয়ে অনন্ত নরকবাস ভোগ করবে, তাহলে তিনি ওই মানুষটিকে সৃষ্টি করলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। সেসব উত্তর কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, কারো কাছে হয় না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, একেশ্বরবাদ এই প্রশ্নের সহজ কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

দ্বৈতবাদীরা খুব সহজে মন্দের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে। তাদের মতে, ভালো মানুষের সঙ্গেও খারাপ ঘটনা ঘটে, কারণ এই মহাবিশ্ব শুধু একজন 'ভালো' ঈশ্বরের হাতেই পরিচালিত হয় না। এখানে ভালোর পাশাপাশি মন্দও আরেকটা মহাশক্তি হিসেবে স্বাধীনভাবে বিরাজ করে। সে মহাশক্তিই মন্দ ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী।

দ্বৈতবাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। দ্বৈতবাদ মন্দের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা ঠিকমতো দিতে পারে না। এই মহাজগৎ যদি একজন ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তাহলে কীভাবে সবকিছু একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে চলছে তার উত্তর পাওয়া যায়– যাঁর হাতে সবকিছু তৈরি, তাঁর নিয়মেই চলছে। কিন্তু জগতের নিয়ন্ত্রণ নিতে যদি ভালোমন্দের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, তাহলে সেই যুদ্ধের নিয়ম ঠিক করে দেয় কে? দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলতে পারে, কারণ দুই দেশই পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে। ভারতকে লক্ষ্য করে পাকিস্তান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে পারে কারণ মাধ্যাকর্ষণ দুই জায়গাতেই একই রকম। কিন্তু যখন ভালোর সঙ্গে লড়াই বাধে মন্দের, তখন ঠিক কোন কোন নিয়ম দুপক্ষই মেনে চলে? আর সেসব নিয়ম ঠিক করেই-বা দেয় কে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একেশ্বরবাদ জগতের শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু মন্দের অস্তিত্বের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

আবার দ্বৈতবাদ মন্দের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলেও শৃঙ্খলার বিষয়ে নীরব। এই দুটো তত্ত্বকে সমন্বয় করার জন্য একটা সম্ভাব্য যুক্তি হতে পারে এমন– এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আর তিনি একই সঙ্গে ভালো ও মন্দ। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই যুক্তিটা হজম করার মতো মস্তিষ্ক কোনো মানুষের মাথায় গজিয়েছে বলে জানা যায়নি।

দ্বৈতবাদী ধর্মের উদ্ভব হয় আজ থেকে হাজার বছরেরও বেশি আগে। ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে মধ্য এশিয়ায় জরাথুস্ত্র (Zoroaster/Zarathustra) নামক একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁর প্রচারিত বিশ্বাস অনেক প্রজন্ম পার হয়ে পরিণত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈতবাদী ধর্মে, যার নাম জরাথুস্ত্রবাদ (Zoroastrianism)। এই ধর্মানুসারে এই জগতে ভালো ঈশ্বর আহুরা মাজদা (Ahura Mazda) এবং খারাপ ঈশ্বর আংরা মাইনিউ (Angra Mainyu)-এর মধ্যে লড়াই চলছে। মানুষের কর্তব্য হলো এই যুদ্ধে ভালো ঈশ্বরকে সাহায্য করা। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ থেকে ৩৩০ সালের মধ্যে একিমেনিদ পারস্য সাম্রাজ্যে (Achaemenid Persian Empire) এই ধর্ম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। পরে ২২৪ থেকে ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে সাসানিদ সাম্রাজ্যে (Sassanid Persian Empire) এটাই হয় প্রধান ধর্ম। এ সময়ের পরে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় উদ্ভূত প্রায় সব ধর্মের ওপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়। নোস্টিসিজম (Gnosticism) এবং ম্যানিকিয়ানিজম (Manichaeanism)-এর মতো দ্বৈতবাদী ধর্মের উৎপত্তিও হয় জরাথুস্ত্রবাদ থেকেই।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ম্যানিকিয়ান মতবাদ চীন থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস এত বেশি বিস্তৃত হয় যে একসময় মনে করা হতো রোমান সাম্রাজ্যের ওপর এর প্রভাব হয়তো খ্রিষ্টধর্মের চেয়েও বেশি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। সাসানিদ সাম্রাজ্যে একেশ্বরবাদী মুসলিমদের আধিপত্য শুরু হওয়ার পর এই দ্বৈতবাদী বিশ্বাস ঝিমিয়ে পড়ে। বর্তমানে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে হাতে-গোনা কিছু মানবগোষ্ঠী এই বিশ্বাস ধরে রেখেছে।

তার পরও, একেশ্বরবাদের উত্থান দ্বৈতবাদকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম– এই তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মই দ্বৈতবাদের অনেক বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছে। একেশ্বরবাদের অনেক মৌলিক ধারণাই আসলে দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত। অসংখ্য ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম একটা খারাপ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যে শক্তি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কাজ করে। খ্রিষ্টধর্মের 'ডেভিল' (Devil) বা ইসলাম ধর্মের 'শয়তান'ই হলো সেই খারাপ শক্তি।

একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মানুষ কীভাবে এমন দ্বৈতবাদী বিশ্বাসকে গ্রহণ করে? যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। হয় একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে, নয়তো দুটি ভিন্ন পরস্পরবিরোধী শক্তিকে মেনে নিতে হবে, যার কোনোটাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী নয়। কিন্তু একই সঙ্গে দুটি পরস্পরবিরোধী যুক্তিকে মেনে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা মানুষের আছে। তাই লাখ লাখ ধার্মিক ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম যে একই সঙ্গে ঈশ্বর ও শয়তানের অস্তিত্ব ও ক্ষমতায় বিশ্বাস করে– এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে 'জিহাদ' কিংবা 'ক্রুসেড'-এর নামে মানুষ প্রাণ পর্যন্ত নিতে দ্বিধা বোধ করে না।

দ্বৈতবাদী ধর্মের আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো দেহ ও আত্মার সুস্পষ্ট বিভাজন। বিশেষ করে নোস্টিসিজম ও ম্যানিকিয়ানিজমে বস্তুগত ও অবস্তুগত জগৎকে আলাদা করে দেখার ব্যাপারটা লক্ষণীয়। এ দুটি মতবাদই বলে আত্মা ও অবস্তুগত সবকিছু ভালো ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর শরীর ও সব বস্তু মন্দ ঈশ্বরের সৃষ্টি। কাজেই মানুষকে বলা যায় 'ভালো' আত্মা আর 'মন্দ' শরীরের একটা যুদ্ধক্ষেত্র। একেশ্বরবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিভাজন অর্থহীন। কেন শরীর ও আত্মার মধ্যে, বস্তু ও অবস্তুর মধ্যে এমন সীমারেখা টানতে হবে? আর শরীর আর বস্তুই-বা মন্দ বলে গণ্য হবে কেন? সবকিছুই তো একজন ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। কিন্তু একেশ্বরবাদীরা এই দ্বিবিভাজনের ধারণা থেকে পুরোপুরি সরেও আসতে পারে না, কারণ এ ছাড়া মন্দকে ব্যাখ্যা করার সহজ কোনো পথ নেই। এই দুটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব থেকেই ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের অন্যতম একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুই ধর্মের মানুষ যে স্বর্গ (ভালো

ঈশ্বরের অধীন জগৎ) এবং নরক (মন্দ ঈশ্বরের অধীন জগৎ)-এর ধারণায় বিশ্বাস করে, তা মূলত দ্বৈতবাদী ধারণা। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন কোনো ধারণার দেখা পাওয়া যায় না। সেখানে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের বিষয়েও কিছু বলা হয়নি।

সমস্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একেশ্বরবাদী, দ্বৈতবাদী, বহু-ঈশ্বরবাদী ও বস্তুপ্রধান ধর্মের ধারণাগুলোর মিশ্রণে তৈরি হয়েছে আজকের একেশ্বরবাদী দর্শন। এখনকার একজন গড়পড়তা খ্রিষ্টান একেশ্বরবাদী হয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, দ্বৈতবাদীর মতো শয়তানকে বিশ্বাস করে, বহু-ঈশ্বরবাদীদের মতো বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করে, আবার প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদীদের মতো ভূতেও বিশ্বাস করে। এই যে মানুষ কয়েক রকম ভিন্ন, এমনকি পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসকে একসঙ্গে গ্রহণ করছে, ধর্মবিশারদরা এর একটা নাম দিয়েছেন। নামটা হলো Syncretism, বাংলায় বলা যায় সমন্বিত ধর্ম। সম্ভবত এই সমন্বিত ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ধর্ম।

প্রকৃতির নিয়ম

এ পর্যন্ত যত রকমের ধর্মের বিষয়ে আলোচনা হলো তাদের প্রত্যেকের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হলো, এদের প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো ধরনের ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত সত্তার কথা বলে। পশ্চিমা দেশগুলোর প্রায় সব মানুষই একেশ্বরবাদী বা বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাসী, তাই তাদের কাছে এই বিশ্বাসটাকে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু সারা পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসের সূত্র ধরে একেবারে গোড়ার দিকে গেলে সব সময় সেখানে ঈশ্বরের দেখা মেলে না। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শুরুর দিকে আফ্রো-এশীয় এলাকায় অন্য একধরনের ধর্মের বিকাশ হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভারতের জৈন ও বৌদ্ধধর্ম, চীনের তাওবাদ (Taoism) ও কনফুসিয়াসের মতবাদ (Confucianism) এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকার বৈরাগ্যবাদ (Stoicism), নৈরাশ্যবাদ (Cynicism) ও ভোগবাদ (Epicureanism)। এই সবগুলো ধর্মেরই

সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এদের কোনোটাই কোনো ধরনের ঈশ্বর বা দেবতার কথা বলে না।

এই ধরনের ধর্মগুলোতে বলা হয় মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা কার্যকর থাকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে, কোনো ঈশ্বর বা দেবতার ইচ্ছায় নয়। অনেক ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু সে ঈশ্বরও এসব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এই প্রাকৃতিক নিয়মের সামনে ঈশ্বর, মানুষ, সব প্রাণী ও উদ্ভিদ সমান। এই ধর্মীয় ব্যবস্থায় দেবতাদের অবস্থান হাতি কিংবা শজারুর মতোই, অর্থাৎ প্রকৃতিতে একটা হাতি যতটা প্রভাব রাখতে পারে একজন দেবতার প্রভাব তার চেয়ে একটুও বেশি নয়। এর একটা বড়ো উদাহরণ হলো বৌদ্ধধর্ম। প্রাচীনকাল থেকে যেসব প্রাকৃতিক ধর্ম তৈরি হয়েছে, বৌদ্ধধর্ম সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে সেটা এখনো টিকে আছে।

বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি কোনো দেবতা নন, একজন মানুষ। তাঁর নাম সিদ্ধার্থ গৌতম। বৌদ্ধধর্মের কিংবদন্তি বলে, গৌতম ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের দিকে হিমালয়ের কাছের একটা রাজ্যের রাজপরিবারের সন্তান। মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখে এই তরুণ রাজকুমার খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, তাঁর চারপাশে যত নারী ও পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ– সবারই নানা রকমের দুঃখ। এই দুঃখের উৎস কেবল যুদ্ধ বা মহামারির মতো ক্ষণস্থায়ী ঘটনা নয়, সঙ্গে আরো আছে মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকা চিরস্থায়ী দুশ্চিন্তা, হতাশা ও অভাব। মানুষ সম্পত্তি ও ক্ষমতার পেছনে ক্রমাগত ছুটছে, জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করে যাচ্ছে, সন্তানের জন্ম দিচ্ছে, ঘরবাড়ি বানাচ্ছে, কিন্তু তাদের অভাব আর শেষ হয় না। অর্জন যতই থাকুক, তার আরো চাই। গরিব মানুষ স্বপ্ন দেখে সম্পদের। যার ১ লাখ টাকা আছে সে চায় ২ লাখ টাকা। যার ২ লাখ আছে তার চিন্তা কীভাবে সেটাকে ১০ লাখ বানানো যায়। সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষটাও তার অর্জনে সন্তুষ্ট নয়। সারা জীবন এসব চিন্তাই মানুষকে তাড়া করে বেড়ায়, যতদিন না জরা, ব্যাধি বা মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে। এক জীবনের সমস্ত অর্জন মৃত্যুর পর নিভে যাওয়া আগুনের ধোঁয়ার মতোই মিলিয়ে যায়। এই অর্থহীন ছুটে চলা থেকে মুক্তি কোথায়?

২৯ বছর বয়সে এক রাতে গৌতম ঘর ছাড়লেন। পরিবার ও সব সম্পদ ত্যাগ করে ভবঘুরে হয়ে সারা উত্তর ভারত চষে বেড়ালেন মানুষের দুঃখমোচনের উপায় খুঁজতে। অনেক আশ্রমে গেলেন, অনেক গুরুর সঙ্গ নিলেন কিন্তু তাঁর প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর মিলল না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে একাই চালিয়ে গেলেন সাধনা। মানুষের দুর্দশার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে দীর্ঘ ছয় বছর ধ্যানমগ্ন থেকে অবশেষে উত্তর পেলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, মানুষের এই দুঃখের কারণ মন্দভাগ্য, সামাজিক বৈষম্য বা কোনো দৈব আক্রোশ নয়। এই কষ্টের মূলে আছে মানুষের নিজ চরিত্র।

গৌতমের মতে, যে-কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলো কামনা, আর এই কামনা অপূর্ণ থাকলে সেখান থেকে তৈরি হয় অপ্রাপ্তি। কোনো বেদনাদায়ক ঘটনায় মানুষের মন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। আর আনন্দের সময়ে চায় তার আনন্দ আরো বাড়ুক, আরো স্থায়ী হোক। এই চাওয়ার কারণেই মানুষের মন কখনো শান্তি পায় না, স্থিরতা পায় না। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এটা বুঝতে পারি। যখন আমরা ব্যথা পাই, সেই ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য আমরা সম্ভাব্য সবকিছু করি, আর সেটাই আমাদের মানসিক স্থিরতা নষ্ট করে। আবার যখন আমরা আনন্দে থাকি, তখনো সেটা আমাদের শান্তি দেয় না, মনের মধ্যে জেগে থাকে সেই আনন্দ হারাবার ভয়। মানুষ ভালোবাসার খোঁজে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়, কিন্তু ভালোবাসার মানুষটিকে পেয়ে কি সম্পূর্ণ শান্তি পায়? কারো মনে থাকে সঙ্গীকে হারাবার ভয়, আবার কেউ ভাবে এর চেয়েও ভালো সঙ্গী পাওয়া যেত। অনেকের ক্ষেত্রে তো এই দুরকম একসঙ্গেও ঘটে।
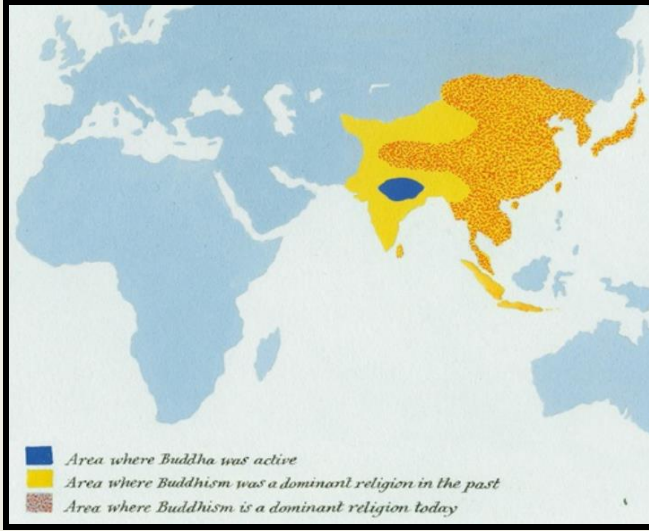
ম্যাপ ৬। বৌদ্ধধর্মের প্রসার

দেবতারা বৃষ্টি ঝরাতে পারেন, নানান সামাজিক প্রতিষ্ঠান আমাদের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে, সৌভাগ্য কখনো কখনো এনে দিতে পারে বিপুল সম্পদ; কিন্তু তাতে কি মানুষের মৌলিক চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন হয়? তাই তো সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাজাও দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচতে পারেন না, সুখের পেছনে ছুটে আর দুঃখ থেকে পালিয়ে বাঁচতে মানুষ এক জীবন শেষ করে ফেলে।

গৌতম দেখলেন, এই চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার একটা পথ আছে। সুখ ও দুঃখকে কামনা ছাড়া সহজভাবে গ্রহণ করলেই আর এই দুর্দশা থাকে না। দুঃখের সময়ে মুক্তির কামনা ত্যাগ করলেই দুঃখ আর থাকে না, কিংবা দুঃখবোধ করলেও তা মানুষকে মানসিক পীড়া দেয় না। বিষণ্নতার মধ্যেও আসলে একরকম ঐশ্বর্য থাকতে পারে। আবার সুখের সময়েও সুখ চলে যাওয়ার দুশ্চিন্তাটুকু ঝেড়ে ফেললেই সুখটুকু শান্তিতে উপভোগ করা যায়।

কিন্তু মানুষের মন এই কামনাটাকে ত্যাগ করবে কী করে? কোনো প্রকার কামনা ছাড়া কি সুখ বা দুঃখকে গ্রহণ করা যায়? এটা সম্ভব করতে গৌতম কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করলেন। এই নীতি অনুশীলনের জন্য মানুষকে 'কী হতে পারত' না ভেবে ভাবতে হবে 'কী হচ্ছে'। নিজের চিন্তাধারাকে এভাবে পরিবর্তন করাটা কঠিন কাজ, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়।

মানুষকে এই কামনা-বাসনা এড়িয়ে বাস্তবতাকে গ্রহণ করার সহজ পথ হিসেবে গৌতম কয়েকটি নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের হত্যা, লালসা ও চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। কারণ, এই কাজগুলোই মানুষের মনে ক্ষমতা, যৌনতা বা সম্পদের মোহ তৈরি করে। এই মোহমুক্তির ফলে মানুষের মন নির্ভার, নিশ্চিন্ত ও পরিপূর্ণ হয়। এই অবস্থাকেই বৌদ্ধধর্মে বলা হয় 'নির্বাণ' লাভ করা ('নির্বাণ'-এর শাব্দিক অর্থ 'আগুন নিভে যাওয়া')। যারা নির্বাণ লাভ করে তারা সব দুর্দশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। সব রকম কল্পনা ও মোহকে দূরে সরিয়ে তারা সুস্পষ্ট বাস্তবকে গ্রহণ করতে পারে। এতে তারা দুঃখ-ব্যাথা অনুভব করে না তা নয়, কিন্তু এগুলো তাদেরকে আর পীড়িত করে না।

বৌদ্ধধর্মমতে গৌতম নিজেও নির্বাণ লাভ করে সব শোক-তাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই মুক্তিলাভের পর তাঁর নাম হয় 'বুদ্ধ' (এর অর্থ 'আলোকিত')। বুদ্ধ তাঁর বাকি জীবন জুড়ে তাঁর এই জ্ঞান বিতরণ করে মানুষকে নির্বাণ লাভের পথ দেখান। তাঁর এই শিক্ষাকে এক বাক্যে সহজে বলা যায় এভাবে : 'মোহ থেকে দুঃখ আসে, দুঃখমোচনের একমাত্র উপায় মোহ থেকে মুক্ত হওয়া আর মোহমুক্তির একমাত্র উপায় হলো বাস্তবতা যেমন, তাকে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করা।'

এই মূলনীতিকে বলা হয় 'ধর্ম' (কিংবা 'ধম্ম')। 'অপ্রাপ্তি থেকে দুঃখ আসে'– বৌদ্ধধর্ম এটাকে স্থান-কাল নির্বিশেষে চিরন্তন সত্য বলে স্বীকার করে, ঠিক যেমন পদার্থবিজ্ঞানের $E=mc^2$ সূত্র সব সময় সবখানে সত্য। এই সত্যটুকুই একজন বৌদ্ধের বিশ্বাস ও সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা তার কাছে গৌণ। যেখানে একেশ্বরবাদ প্রশ্ন করে, 'ঈশ্বর আছেন, তিনি আমার কাছ

থেকে কী চান?’ সেখানে বৌদ্ধধর্ম জানতে চায়, ‘দুঃখ আছে, এ থেকে মুক্তির উপায় কী?’

বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। এখানে বৃষ্টি নামানো বা যুদ্ধে জেতানোর মতো ক্ষমতা দেবতাদের আছে, কিন্তু ‘অপ্রাপ্তি থেকে দুঃখ আসে’– এই সত্যকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের নেই। মোহমুক্ত মানুষকে দুঃখ দেওয়ার ক্ষমতা কোনো ঈশ্বরের নেই। আবার মোহ থেকে মুক্ত হতে না পারলে কোনো ঈশ্বর তাকে দুর্দশা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

তার পরও বৌদ্ধধর্মের মতো প্রাক-আধুনিক যুগের প্রাকৃতিক ধর্মগুলো ঈশ্বরের উপাসনা পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম বলে মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো নির্বাণ লাভ করা, সম্পদ বা ক্ষমতা অর্জন করা নয়। অথচ ৯৯ শতাংশ বৌদ্ধই নির্বাণ লাভ করতে পারে না। যারা ভবিষ্যতে নির্বাণ লাভের আশায় থাকে, তারাও তাদের বর্তমানকে বিলিয়ে দেয় জাগতিক অর্জনের জন্য। এ কারণেই তারা নানান দেবতার উপাসনা করে। ভারতে হিন্দুধর্মের দেবতা, তিব্বতের ‘বন’ (Bon) ও জাপানের ‘শিনতো’ (Shinto) দেবতারা অনেক বৌদ্ধেরই উপাস্য।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের নিজেদের মতো করে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের ধারণা তৈরি করে নিয়েছে। বুদ্ধ হলো সেই ব্যক্তি যিনি নিজে নির্বাণ লাভ করেছেন। আর বোধিসত্ত্ব বলতে বোঝানো হয় মানব বা মানবাতীত কোনো সত্তাকে যিনি নিজে জাগতিক শোক-দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা সত্ত্বেও অসংখ্য মানুষকে জন্ম-শোক-জরা-মৃত্যুর অন্তহীন চক্র থেকে মুক্ত করার জন্য সে সুযোগ পরিত্যাগ করেছেন। একসময় অনেক বৌদ্ধই ঈশ্বরের আরাধনা করার পরিবর্তে এইসব বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের আরাধনায় নিয়োজিত হলেন। শুধু নির্বাণ লাভ তাদের এই আরাধনার লক্ষ্য ছিল না, জাগতিক নানা সমস্যা সমাধান খোঁজাও ছিল এই আরাধনার অন্যতম কারণ। ফলে, সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে আমরা এমন অনেক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের দেখা পেলাম যাদের অধিকাংশ সময় কাটত প্রার্থনা, রঙিন ফুল, সুগন্ধি, ধান ও মিঠাই উপহার

হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিদানে বৃষ্টি নামানো, মহামারি প্রতিকার আর যুদ্ধে জয়লাভের উপায় বাতলে দিতে।

মনুষ্যত্বের আরাধনা

গত ৩০০ বছরকে বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষতার যুগ। এই সময়ের মধ্যে ধর্ম ক্রমশ তার গুরুত্ব হারিয়েছে। ঈশ্বরের ধারণা আছে যেসব ধর্মে, তাদের জন্য এই কথাটা অনেকাংশে সত্য। কিন্তু অন্যান্য যেসব প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠা ধর্ম আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উলটোটা। গত কয়েক শতাব্দীতে এই ধর্মগুলো পেয়েছে ব্যাপক প্রচারণা আর ঘটিয়েছে ইতিহাসের কয়েকটি ভয়ংকরতম যুদ্ধ। এই সময়ে যেসব প্রাকৃতিক ধর্ম মাথা তুলেছে তাদের মধ্যে আছে উদারনীতি, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ ও নাৎসিবাদের মতো কিছু ধারণা। অনেকে এগুলোকে ধর্ম বলতে চান না, বরং নীতি বা মতবাদ হিসেবে দেখতে চান। কিন্তু নামে কী আসে যায়? যদি ধর্মকে আমরা 'মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোনো শক্তিতে বিশ্বাস রেখে মানুষের পালিত আচার-আচরণ' বলে সংজ্ঞায়িত করি, তাহলে ধর্ম হিসেবে সোভিয়েত সাম্যবাদ ইসলামের চেয়ে কোনোভাবেই কম যায় না।

ইসলাম অবশ্যই সাম্যবাদ থেকে ভিন্ন। ইসলাম ধর্মে মহাবিশ্ব চলে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সেখানে সাম্যবাদে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মেও তো ঈশ্বরের ধারণা নেই, তার পরেও সেটাকে আমরা ঠিকই ধর্ম বলি। বৌদ্ধদের মতো সাম্যবাদীদের আচরণও কিছু নিয়মনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৌদ্ধরা যেমন জানে যে তাদের আচরণবিধি গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত, তেমনি সাম্যবাদের নীতিগুলো এসেছে কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস আর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কাছ থেকে। এখানেই শেষ নয়, আরো মিল আছে। সাম্যবাদেরও আছে নিজস্ব 'পবিত্র গ্রন্থ', যেমন মার্কসের *ডাস ক্যাপিটাল* (Das Kapital), যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে ইতিহাসের শেষ হবে শোষিত শ্রেণির অনিবার্য বিজয়ের মাধ্যমে। সাম্যবাদের নির্দিষ্ট ছুটি কিংবা উৎসবের দিন আছে, যেমন পয়লা মে

বা অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী। ধর্মগুরুও খুঁজে পাওয়া যাবে এতে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রত্যেক দলে একজন করে ‘কমিসার’ (Commissar) থাকতেন, যার কাজ ছিল সেনাসদস্য ও সেনানায়কদের ‘ধর্মানুরাগ’ নিশ্চিত করা। এই ধর্মের জন্য ধর্মযুদ্ধ হয়েছে, সেসব যুদ্ধে শহিদও হয়েছে অনেক অনুসারী। ‘ধর্মদ্রোহিতা’ও আছে সাম্যবাদে, যেমন ট্রটস্কির মতবাদ। সোভিয়েত সাম্যবাদকে বলা যায় একটা গোঁড়া প্রচারমুখী ধর্ম। একজন নিবেদিতপ্রাণ সাম্যবাদী তার জীবনের বিনিময়ে হলেও মার্কস ও লেনিনের বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়।

এভাবে চিন্তা করাটা অনেক পাঠকের জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর হতে পারে। বেশি অস্বস্তি হলে পাঠক সাম্যবাদকে ধর্ম না বলে মতাদর্শও বলতে পারেন। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা আমাদের বিশ্বাসগুলোকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্ম ও ঈশ্বরবিহীন প্রাকৃতিক মতাদর্শ– এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। অথচ তখনো বৌদ্ধ ও তাওবাদীদের বিশ্বাসকে আমরা ঠিকই ধর্ম হিসেবেই বিবেচনা করি। আবার উলটোটাও হয়, বর্তমানের অনেক মতাদর্শেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। এর মধ্যে কয়েকটা, বিশেষ করে উদারনীতি, সব মানুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি এরকম একটি ব্যাপার মেনে না নিলে যে ধারণাটির অস্তিত্বই প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ে।
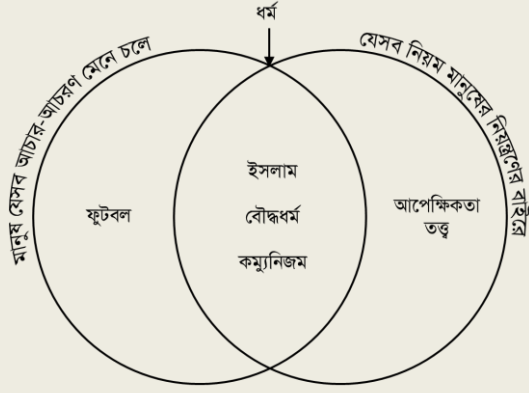
ধর্ম হলো মানুষের কিছু প্রচলিত আচার ও মূল্যবোধের সমষ্টি, যা দাঁড়িয়ে থাকে এমন কিছু বিষয়ে বিশ্বাসের ওপর যা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। পদার্থবিজ্ঞানের আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে ধর্ম বলা যাবে না, কারণ আজ পর্যন্ত কোনো মানুষকে এর ওপর ভিত্তি করে কোনো প্রথা পালন করতে দেখা যায়নি, এটা মানুষের কোনো মূল্যবোধও গড়ে দেয়নি। ফুটবলও ধর্ম নয়, কারণ এর নিয়মগুলো মানুষের তৈরি, সেটা অতিমানবীয় কিছু নয়। ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম আর সাম্যবাদ– এ তিনটাই ধর্ম, কারণ এগুলো মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে আর সেই নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলো মানুষের তৈরি নয়। (এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে, ‘অতিমানবীয়’ আর ‘অতিপ্রাকৃত’ এ দুটো বিষয় আলাদা। বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতির নিয়ম আর মার্কসীয় সাম্যবাদের ইতিহাসের নিয়ম– এদের কোনোটাই মানুষের হাতে তৈরি হয়নি, তাই এরা অতিমানবীয়। কিন্তু অতিপ্রাকৃত নয় কোনোটাই।)

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিশ্বাসগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা না টানলে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা কঠিন হয়ে যাবে। এই বিশ্বাসগুলোর মধ্যে যে মিশ্রণ দেখা যায় তা একেশ্বরবাদী কিংবা বৌদ্ধধর্মের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। একজন বৌদ্ধ যেমন হিন্দু দেবতার পূজা করে, একেশ্বরবাদী মানুষ যেমন শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, ঠিক তেমনি একজন আমেরিকান একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী, পুঁজিবাদী এবং মানবতাবাদী হতে পারে। জাতীয়তাবাদী হিসেবে সে ভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে আমেরিকান জাতিটা বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারে। পুঁজিবাদী হিসেবে সে

ভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মানুষের যার যার ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করাটাই সমাজের সার্বিক উন্নয়নের পথ। আবার উদারমনা মানবতাবাদী হয়ে সে ভাবে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার নিয়ে এসেছে। এই সব রকম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা একই সঙ্গে একজন মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। ১৮ নম্বর অধ্যায়ে আমরা জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনা করব। অধ্যায় ১৬-এর পুরোটা জুড়ে থাকবে বর্তমানকালের সবচেয়ে সফল ধর্ম পুঁজিবাদের কথা। এই অধ্যায়ে আপাতত বিভিন্ন মানবিক ধর্মের দিকে নজর দেওয়া যাক।

একেশ্বরবাদী বা বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মে দেবতার উপাসনা করা হয়। মানবতাবাদী ধর্ম উপাসনা করে মানবতার, ঠিক করে বললে হোমো সেপিয়েন্সের। মানবতাবাদী বিশ্বাসে হোমো সেপিয়েন্স হলো সম্পূর্ণ প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা, অনন্য বৈশিষ্ট্যের একটি প্রাণী। মানবতাবাদীদের মতে হোমো সেপিয়েন্সের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যই হলো বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ ছাড়া এ মহাবিশ্ব অর্থহীন। হোমো সেপিয়েন্সের কল্যাণই বিশ্বের কল্যাণ। পৃথিবীর আর বাকি যা কিছু আছে সেসবের একমাত্র সার্থকতা হলো মানুষের উপকারে আসায়।

সব মানবতাবাদীই মানবতার উপাসনা করে বটে, কিন্তু এর সংজ্ঞাটা একেকজনের কাছে একেক রকম। 'মানবতা'র সঠিক সংজ্ঞা দিতে মানবতাবাদ তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক যেমন ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করতে বিভক্ত হয়েছে খ্রিষ্টানরা। বর্তমানে মানবতাবাদের প্রধান ধারা হলো উদারপন্থি মানবতাবাদ (Liberal humanism)। এখানে মানবতাকে মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়, তাই মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে পবিত্র। উদারমনারা বিশ্বাস করে, মানবতার গুণটা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক হোমো সেপিয়েন্সের মধ্যে বিদ্যমান। এই মানবতাবোধই জীবনকে অর্থপূর্ণ করে, এখান থেকেই মানুষ পায় সব নৈতিক নির্দেশনা। যখনই আমরা কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক

সংশয়ে পড়ি, তখন এই মানবতারই দ্বারস্থ হই। উদারনৈতিক মানবতাবাদের সর্বপ্রধান নীতি হলো মানুষের ভেতরের এই মনুষ্যত্বকে সব রকম ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এইসব নীতিকেই সামষ্টিকভাবে আমরা বলি 'মানবাধিকার'।

মানবতাবাদীরা যে শাস্তি হিসেবে নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী, তার কারণ এটাই। শুরুর দিকে আধুনিক ইউরোপে মনে করা হতো কেউ মানুষ হত্যা করলে তা মহাজাগতিক শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে। তাই সেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হত্যাকারীকে জনসমক্ষে নির্যাতন ও হত্যা করা হতো। শেকসপিয়র ও মলিয়েরের যুগে লন্ডন কিংবা প্যারিসের বাসিন্দাদের জন্য এসব নৃশংস মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্য রীতিমতো উপভোগ্য ছিল। আর আজকের ইউরোপে নরহত্যাকে দেখা হয় মানবতার ওপরে আঘাত হিসেবে, আর এর বিচার করতে হত্যাকারীকে হত্যা বা নির্যাতন না করে যথাসম্ভব 'মানবিক' উপায়ে শাস্তি দেওয়া হয়। এর মাধ্যমেই আহত মানবতাকে আবার সারিয়ে তোলা হয়। হত্যাকারীও মানুষ, তাই মানবতার পবিত্রতা রক্ষা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। বরং মানুষ হত্যা করে হত্যাকারী যে ভুল করেছে, হত্যাকারীকে হত্যা না করে সেই ভুল সংশোধন করা হয়।

উদারনৈতিক মানবতাবাদ মানুষকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। বরং ঈশ্বরের ব্যাপারে এখানে একেশ্বরবাদী ধারণাই প্রচলিত। উদারনীতিতে প্রত্যেক মানুষের পবিত্র ও স্বাধীন মানবিকতার এই ধারণাটা সরাসরি খ্রিষ্টধর্মের পবিত্র আত্মার ধারণা থেকে এসেছে। চিরস্থায়ী আত্মা ও একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বাদ দিলে 'সেপিয়েন্স কেন আর সব প্রাণী থেকে অন্যরকম' এ প্রশ্নের উত্তর দিতে মানবতাবাদীদের একটু সমস্যায় পড়তে হয়।

আরেকটা ধারা হলো সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ (Socialist Humanism)। সমাজতন্ত্রীরা 'মানবতা'কে সমগ্র সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখে। তাদের কাছে একজন মানুষ নয়, বরং গোটা হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির মানবিকতাই মুখ্য। উদারনৈতিক মানবতাবাদ

যেখানে একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ স্বাধীনতার কথা বলে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ দাবি করে সব মানুষের সমতা। সমাজতন্ত্রে মানুষে মানুষে বৈষম্য হলো মানবসমাজের জন্য সবচেয়ে বড়ো অন্যায়, কারণ এতে মনুষ্যত্বের চেয়ে মানুষের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য বেশি গুরুত্ব পায়। যেমন, কোনো সমাজে যদি ধনীরা গরিবদের চেয়ে বেশি সুবিধা পায়, তাহলে বলা যায় ওই সমাজে মনুষ্যত্বের চেয়ে সম্পদ বেশি মূল্যবান। অথচ মনুষ্যত্ব ধনী-গরিব সবার জন্যই সমান।

উদারনৈতিক মানবতাবাদের মতো সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের মূলেও আছে একেশ্বরবাদী চেতনা। ঈশ্বরের কাছে প্রতিটি আত্মাই সমান– এই ধারণাই পরিবর্তিত হয়ে এখানে হয়ে গেছে 'সব মানুষই সমান'। মানবতাবাদের যে ধারাটি এই ধারণা থেকে বের হয়ে এসেছে সেটা হলো বিবর্তনীয় মানবতাবাদ (Evolutionary Humanism)। এই ধারার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হলো নাৎসিরা। মানবতাবাদের অন্যান্য ধারায় মানবতাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, নাৎসিদের কাছে ব্যাপারটা তেমন নয়। মূল পার্থক্যটা হলো, নাৎসিদের চিন্তাধারায় বিবর্তন তত্ত্বের গভীর প্রভাব দেখা যায়। নাৎসিরা মানুষকে পরিবর্তনশীল প্রাণী প্রজাতি হিসেবেই দেখে। বিবর্তনের পথ ধরে এই প্রজাতিটি মানুষের চেয়ে উন্নত বা অনুন্নত প্রজাতিতে পরিণত হতেই পারে।

নাৎসিদের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির অবনতি রোধ করে বিবর্তনকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া। এজন্যই তারা বলত তাদের 'আর্য' জাতিই মানুষের সবচেয়ে উন্নত রূপ, আর এই জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হলে তার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। সেজন্য ইহুদি, জিপসি, সমকামী কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন যেসব নিম্নমানের হোমো সেপিয়েন্স আছে তাদেরকে আলাদা করে রাখতে হবে, অথবা নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। নাৎসিরা এর যে ব্যাখ্যা দেয় তা হলো এরকম, আদিম মানুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে একটা 'উন্নত' প্রজাতি হিসেবে হোমো সেপিয়েন্সের আবির্ভাব হয়। আর নিয়ান্ডার্থালের মতো 'অনুন্নত' প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরা সবাই একসময় একই জাতি ছিল, কিন্তু পরে বিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন পথে

এগিয়ে গেছে। এমনটা ভবিষ্যতে আবারও হতে পারে। নাৎসিদের মতে, হোমো সেপিয়েন্স ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছে, একেক জাতির বৈশিষ্ট্যও একেক রকম। এই সব জাতির মধ্যে আর্য জাতিই হলো সর্বোৎকৃষ্ট। সৌন্দর্য, যৌক্তিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতায় তারা অনন্য। তাই আরো উন্নত কোনো প্রজাতিতে বিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আর্যদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। অন্য সব জাতি, যেমন ইহুদি ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ– এরা হলো এ যুগের নিয়ান্ডার্থাল, যারা সব দিক থেকেই আর্যদের থেকে অনেক পিছিয়ে। যদি এসব মানুষ বংশবৃদ্ধির সুযোগ পায়, বিশেষ করে সেটা যদি আর্যদের সঙ্গে হয়, তাহলে সেটা পুরো মানবজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট করবে, হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিটিকে ঠেলে দেবে বিলুপ্তির দিকে।

জীববিজ্ঞানীরা নাৎসিদের এই জাতিতত্ত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৫-এর পরের অনেক জিনতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য সামান্যই, নাৎসিরা যা বলে তার তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু এর আগে, ১৯৩৩ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নাৎসিদের ধারণা ছিল অন্যরকম। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব, তাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা– এসব ধারণা তখনকার পশ্চিমা অভিজাত শ্রেণির মানুষের কাছে খুব স্বাভাবিক ছিল। নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রকাশিত অনেক গবেষণাপত্রে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' প্রমাণ করা হয়েছে, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, দক্ষতায় শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকান বা ভারতীয় মানুষের চেয়ে কত উন্নত। ওয়াশিংটন, লন্ডন ও ক্যানবেরার রাজনীতিকেরা শ্বেতাঙ্গদের বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মতো 'আর্য' দেশে চীন, এমনকি ইতালির মানুষদের সীমিত প্রবেশাধিকার সেটারই উদাহরণ।

মানবতাবাদী ধর্ম

উদারনৈতিক মানবতাবাদ	সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ	বিবর্তনীয় মানবতাবাদ
প্রকৃতিগতভাবেই হোমো সেপিয়েন্স আর সব প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের কল্যাণই পরম কল্যাণ।		
‘মানবতা’ একটি ব্যক্তিগত বিষয়, প্রত্যেক হোমো সেপিয়েন্সের মধ্যেই সেটা আছে।	‘মানবতা’ একটা সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য, তাই সেটা হলো হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির সব সদস্যের জন্য সমান।	‘মানবতা’ একটা পরিবর্তনশীল বিষয়, বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ আরো উন্নত বা অনুন্নত প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে।
মানবতাবাদের মূল কথা হলো প্রত্যেক হোমো সেপিয়েন্সের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা।	মানবতাবাদের মূল কথা হলো সব হোমো সেপিয়েন্সের সমতা নিশ্চিত করা।	মানবতাবাদের মূল কথা হলো হোমো সেপিয়েন্সের বিবর্তনকে অবনতির দিকে যেতে না দিয়ে একে উন্নততর এক প্রজাতিতে পরিণত করা।

এসব ধারণার পেছনে যে শুধু উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণারই অবদান আছে তা নয়। বরং এর পেছনে সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির অবদানই বেশি। সেদিক থেকে চিন্তা করলে হিটলার কেবল নিজের সর্বনাশই ডেকে আনেননি, বর্ণবাদী আদর্শেরও ক্ষতিসাধন করেছেন। হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার পর তাঁর শত্রুদের কাছে সব মানুষ ‘আমরা’ আর ‘ওরা’– এমন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। পরবর্তীতে, নাৎসিদের মতাদর্শের ভেতরের বর্ণবাদী চিন্তাধারার কারণেই সেটা পশ্চিমা বিশ্বে একটা প্রবল ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

তবে এ পরিবর্তন এক দিনে হয়নি। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার রাজনীতিতে জাতিগত প্রাধান্য ভালোভাবেই টিকে ছিল। ১৯৭৩ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে অশ্বেতাঙ্গ মানুষের পূর্ণ প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৯৬০ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মানুষেরা রাজনৈতিক সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না, কারণ তাদেরকে দেশের পূর্ণ নাগরিক হিসেবেই বিবেচনা করা হতো না।
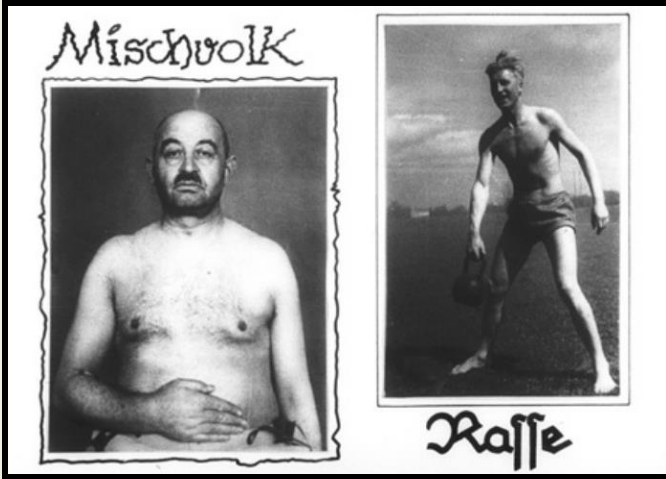
৩০। নাৎসিবাদের প্রচারণার জন্য আঁকা একটা পোস্টারে ডানে একজন 'বিশুদ্ধ আর্য' এবং বাঁয়ে একজন 'সংকর জাতের' মানুষের ছবি। মানবদেহের প্রতি নাৎসিদের মুগ্ধতা এবং 'নিচু জাতের' মানুষের দ্বারা তাদের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার ভয় এখানে স্পষ্ট

নাৎসিরা যে উদার মানবতাবাদ, মানবাধিকার ও সাম্যবাদের বিরোধী ছিল, তার কারণ এই নয় যে তারা মানবতাকে ঘৃণা করত। বরং তাদের চোখে মানবতা ছিল এক মহার্ঘ বস্তু, যা মানবজাতির বিপুল সম্ভাবনার আধার। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদের যুক্তি দেখিয়ে তারা দাবি করত, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অযোগ্যদের বাদ পড়া উচিত, শুধু যোগ্যরাই টিকে থাকবে আর বংশবিস্তার করবে। উদারনীতি ও সাম্যবাদ অনুসরণ করলে এই অযোগ্য মানুষেরা শুধু

টিকেই থাকবে না, যারা যোগ্য তাদের সমান সুযোগ-সুবিধাও পাবে। অযোগ্য মানুষেরাও যদি সমানভাবে বংশবিস্তার কওে, তাহলে অযোগ্যদের ভিড়ে যোগ্যরা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষ আরো অনুন্নত হতে হতে হয়তো একদিন বিলুপ্তই হয়ে যাবে।
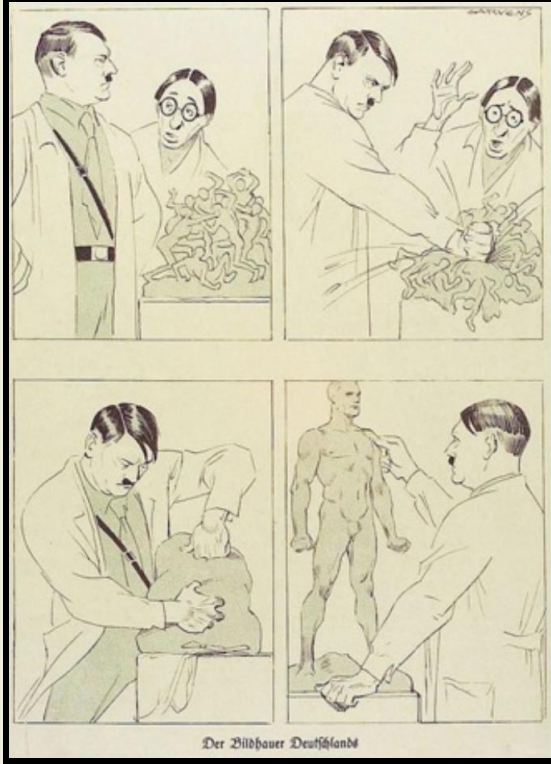
৩১। ১৯৩৩ সালের একটি নাৎসি কার্টুন। এখানে হিটলারকে একজন ভাস্কর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে কিনা অতিমানব তৈরি করছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে একজন চশমা পরা উদারনীতিতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীকে যে এই অতিমানব তৈরির প্রক্রিয়ার হিংস্রতা দেখে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে।

১৯৪২ সালের জার্মানির জীববিজ্ঞান বইয়ের 'প্রকৃতি ও মানুষ যে নিয়মে চলে' অধ্যায়ে বলা হতো, টিকে থাকার জন্য নিরন্তর

অনুশোচনাহীন সংগ্রামই প্রকৃতির সর্বোচ্চ নিয়ম। মাটির দখলের জন্য গাছের সংগ্রাম, কিংবা সঙ্গী পাওয়ার জন্য পোকামাকড়ের সংগ্রামকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে এসব বইয়ে বলা হতো :

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমাহীন কঠিন লড়াইই জীবন ধারণের একমাত্র পথ। এ লড়াই অযোগ্যদের নির্মূল করে, আর টিকিয়ে রাখার জন্য বেছে নেয় যোগ্যদের। এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় নেই, প্রতিটি জীব টিকে থাকার মাধ্যমে সেটাই প্রমাণ করে। এ লড়াইয়ে কোনো ক্ষমার অবকাশ নেই। যে-ই এ নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সে-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জীববিজ্ঞানের এই শিক্ষা কেবল উদ্ভিদ ও প্রাণী নয়, বরং আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই লড়াইই আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা জাগায়। জীবন মানেই যুদ্ধ– এ যুদ্ধে যে নামবে না, তার জন্য থাকবে অপরিসীম দুর্দশা।

এরপর থাকত *মেইন ক্যাম্ফ* (Mein Campf– হিটলারের আত্মজীবনী) থেকে একটা লাইন : 'যে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সে আসলে তার অস্তিত্বের কারণেরই বিরোধিতা করে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর নিজেকে ধ্বংস করে ফেলা একই কথা।'[৩]

এই খ্রিষ্টীয় তৃতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে এসে বিবর্তনীয় মানবতাবাদের ভবিষ্যৎ কী হবে ঠিকমতো আন্দাজ করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ৬০ বছর ধরে বিবর্তনের সঙ্গে মানবতাকে জড়ানো কিংবা জীববিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে হোমো সেপিয়েন্সের 'উন্নতি সাধনের' ধারণা প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু ইদানীং এই বিষয়টা আবার আলোচনায় উঠে আসছে। এখন কেউ 'নিম্নমানের' মানুষদের শেষ করে দেওয়ার কথা বলে না, বরং জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আরো উন্নত মানুষ সৃষ্টি করার কথা ভাবে।

এদিকে উদার মানবতাবাদ ও জীববিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কারগুলোর মধ্যেকার দূরত্বটা বেড়েই যাচ্ছে, সেটা আর উপেক্ষা করার মতো নেই এখন। আমাদের উদারনৈতিক রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থার মূলে যে নীতি আছে তা হলো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে পবিত্র মানবতাবোধ আছে তা অপরিবর্তনীয় ও অবিচ্ছেদ্য। এই

মানবতার জন্যই জগৎ অর্থময়। আমাদের সব নৈতিকতার উৎস এই মানবতা। আজকের এই বিশ্বাস আসলে খ্রিষ্টধর্মের 'সব মানুষই মুক্ত, চিরস্থায়ী আত্মার অধিকারী'– এই বিশ্বাসের পরিবর্তিত রূপ। অথচ গত ২০০ বছরের জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি এই বিশ্বাসকে অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করেও আত্মার অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। বরং দেখা গেছে যে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছা নয়, হরমোন, জিন ও নিউরনের সংযোগ– ঠিক শিম্পাঞ্জি, নেকড়ে কিংবা পিঁপড়ার মতোই। প্রশ্নটা হলো, জীববৈজ্ঞানিক সত্য আর তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইন এবং বিচারব্যবস্থার মধ্যকার এই যে কল্পিত উদারনৈতিক দেওয়াল তাকে মানুষ আর কতদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে?

অধ্যায় ১৩

সাফল্যের রহস্য

বাণিজ্য, সাম্রাজ্য ও ধর্মের বিস্তার বিভিন্ন মহাদেশের বিচ্ছিন্ন সেপিয়েন্সদেরকে একত্রিত করে একটি একীভূত মানবসমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তবে পৃথিবী জুড়ে সেপিয়েন্সের এই ছড়িয়ে পড়া এবং একত্র হওয়ার প্রক্রিয়াটা মোটেই সরল ছিল না, আর একেবারে নির্বিঘ্নেও সেটা সম্পন্ন হয়নি। যদিও মোটা দাগে দেখলে মনে হয়, অনেকগুলো ছোটো সংস্কৃতির রূপান্তরিত হয়ে কয়েকটা বড়ো সংস্কৃতিতে পরিণত হওয়া এবং অবশেষে কয়েকটি প্রধান সংস্কৃতি মিলেমিশে বিশ্বব্যাপী একটি একক মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা, এসবই ছিল সেপিয়েন্সের অনিবার্য নিয়তি।

সেপিয়েন্সের জন্য একটি বৈশ্বিক সমাজ গড়ে ওঠাটা অনিবার্য ছিল– এ কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আজ আমরা পৃথিবীটাকে যে রূপে দেখছি সেপিয়েন্সের জন্য অনিবার্য বৈশ্বিক সমাজের অবস্থা ঠিক সেরকমটাই হওয়ার কথা ছিল। পৃথিবীর আজকের সমাজব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থাগুলো কেমন হতে পারত সেটা আমরা চাইলেই কল্পনা করতে পারি। আমাদের প্রশ্ন জাগতেই পারে– দুনিয়া জুড়ে কেন আজ ইংরেজির জয়জয়কার, ডেনিশ ভাষার কেন নয়? কেন আজ পৃথিবীতে ২০০ কোটি খ্রিষ্টান আর ১২৫ কোটি মুসলিম? অথচ জরথুস্ত্রবাদ ও ম্যানিকিয়ান ধর্মের অনুসারী কেন মাত্র দেড় লাখ? আমরা যদি ১০ হাজার বছর পেছন থেকে আবার শুরু করতে পারতাম, তাহলে আবারও কি দ্বৈতবাদকে পেছনে ফেলে একেশ্বরবাদী ধর্ম পৃথিবীতে রাজত্ব করত?

যেহেতু হাতে-কলমে অতগুলো বছর পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর নেই, সে কারণে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হতো সেটাও নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য খেয়াল করলে এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

১। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে

ইতিহাসের পথের প্রতি মোড়ে মোড়ে থাকে অনেকগুলো বাঁক। অতীত থেকে একটি জানা পথে হেঁটে আমরা বর্তমানে পৌঁছাতে পারি। কিন্তু বর্তমান থেকে অগণিত অজানা পথ চলে গেছে ভবিষ্যতের দিকে। এই অগণিত পথের মধ্যে ইতিহাস সব সময় সহজ, মসৃণ, প্রায়-চেনা পথটাই বেছে নেবে, এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময়ই ইতিহাসের দিকপালেরা ইতিহাসকে টেনে নিয়ে যায় অপ্রত্যাশিত, অমসৃণ পথে।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দিকে রোমান সাম্রাজ্যে অনেকগুলো ধর্মের বিস্তারের সম্ভাবনা তৈরি হয়। রোমানরা সেসব সম্ভাবনা নাকচ করে তাদের পুরোনো, বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম নিয়েও থাকতে পারত। রোমানদের এর আগের শতাব্দীটা কেটেছে তিক্ত গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটিন সে কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত ভেবেছিলেন, পুরো সাম্রাজ্যের নানা রকম মানুষকে এক কাতারে আনতে হলে প্রয়োজন এমন কোনো ধর্ম, যার নীতিগুলো হবে সুনির্দিষ্ট। বেছে নেওয়ার মতো অনেক ধর্মই তাঁর সামনে ছিল। তিনি বেছে নিতে পারতেন ম্যানিকিয়ানিজম, বেছে নিতে পারতেন পারস্যের দেবতা মিথ্রাস কিংবা সিবিলির দেবী আইসিসকে, অথবা গ্রহণ করতে পারতেন জরথুস্ত্রবাদ বা ইহুদি ধর্ম, এমনকি বৌদ্ধধর্মকেও। এত কিছুর মধ্যেও তিনি কেন যিশুখ্রিষ্টের পথে হাঁটলেন? খ্রিষ্টধর্মে কি এমন কিছু ছিল, যার প্রতি সম্রাটের ব্যক্তিগত বিশেষ আগ্রহ ছিল? নাকি খ্রিষ্টধর্মের মাধ্যমে তাঁর কোনো উদ্দেশ্য সহজে পূরণ হতো? খ্রিষ্টধর্ম বেছে নেওয়ার পেছনে কি তাঁর ধর্মীয় কোনো অভিজ্ঞতার ভূমিকা ছিল? নাকি খ্রিষ্টধর্মের প্রসার দেখে তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা গ্রহণ করতে?

ইতিহাসবিদরা এমন অনেক রকম ধারণা করতে পারেন, কিন্তু সঠিক কারণটা বের করে আনতে পারেন না। খ্রিষ্টধর্ম কীভাবে রোমান সাম্রাজ্য দখল করল তার বিশদ বর্ণনা তাঁরা দিতে পারেন, কিন্তু ঠিক কী কারণে সেটা সম্ভব হলো তা বলতে পারেন না।

কোনো কিছু 'কীভাবে' হলো তার বর্ণনা দেওয়া, আর 'কেন' হলো তা ব্যাখ্যা করা– এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী? পার্থক্য হলো, 'কীভাবে'র উত্তর দিতে বিভিন্ন সময়ে ঘটা ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজালেই হয়। আর 'কেন'র উত্তরে সেই ঘটনাগুলোর মধ্যে কার্যকারণের সূত্র তৈরি করতে হয়।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিষ্টধর্মের উত্থানের মতো ঘটনাগুলোর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তাঁরা মানুষের ইতিহাসকে পরিবেশ, জীববিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে, ভূমধ্যসাগরীয় রোমান অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, বংশগতি ও অর্থনীতিই সেখানে একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য করে তোলে। তবে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদই এ ধরনের তত্ত্বের ব্যাপারে সন্দিহান। ইতিহাসের ব্যাপারটাই এমন– কোনো একটা সময়ের কথা যত বেশি জানা যায়, তার ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা দেওয়া ততটাই কঠিন হয়ে পড়ে। যারা ওই সময়ের ভাসা ভাসা জ্ঞান রাখে, তারা কী ঘটেছে তার ওপরে জোর দেয়, পরের ঘটনাগুলো দেখে কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আর যারা খুব ভালোভাবে জানে, তারা আরো কী কী ঘটতে পারত কিন্তু ঘটেনি, সেগুলোর ব্যাপারেও ভাবে।

সত্যি বলতে কি, যারা সেই সময়ের কথা সবচেয়ে ভালোভাবে জানত, মানে ওই সময়ে যারা বেঁচে ছিল, তারাই ছিল সবচেয়ে অন্ধকারে। সম্রাট কনস্ট্যানটিনের আমলে সাধারণ একজন রোমান নাগরিকের কাছে তাদের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ছিল ধোঁয়াশা। ইতিহাসের নিয়মই এই– পেছনে ফেলে আসা ঘটনাকে যতটা অবশ্যম্ভাবী মনে হয়, বর্তমান তার ধারেকাছেও যায় না। এখনকার সময়ের জন্যও কথাটা খাটে। আমরা কি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি? নাকি আরো খারাপ সময় সামনে আসছে? চীন কি সত্যিই একদিন সারা পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘোরাবে?

আমেরিকার আধিপত্য কি খর্ব হবে কোনো দিন? একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর মৌলবাদী আচরণ কি অচিরেই থামবে, নাকি আরো অনেক দিন পর্যন্ত চলবে? আমাদের সামনে কী আছে– বিরাট কোনো পরিবেশ বিপর্যয় নাকি প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ? আজ এসব প্রশ্নের প্রত্যেকটা উত্তরের পক্ষেই ভালো ভালো যুক্তি দেওয়া সম্ভব, কিন্তু কী হবে সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারবে না কেউ। অথচ আজ থেকে ১০ কি ২০ বছর পরে মানুষ যখন পেছনের কথা ভাববে, তখন তাদের মনে হবে, যা যা ঘটেছে ঠিক সেগুলোই তো হওয়ার কথা!

আবার অনেক সময় যেটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম সেটাই হয়। ৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে কনস্ট্যানটিন যখন রাজা হলেন, তখন পৃথিবীতে খ্রিষ্টধর্ম পালন করত অল্প কিছু মানুষ। তখন যদি কেউ বলত এই খ্রিষ্টধর্মই হতে যাচ্ছে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম, তাতে মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হতো জানতে হলে '২০৫০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ধর্ম হবে হিন্দুধর্ম'– এ কথাটা একটু প্রচার করে দেখতে পারেন। ১৯১৩-এর অক্টোবরে বলশেভিকরা ছিল রাশিয়ার একটা ছোটো দল। এই ছোটো দলটাই যে চার বছরের মধ্যে পুরো দেশটা দখল করবে– এ কথাটা ছিল অবিশ্বাস্য। ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের আরবের মরুবাসী মানুষ আটলান্টিকের তীর থেকে ভারত পর্যন্ত জিতে নেবে, এ কথা তো আরো অবিশ্বাস্য ছিল। বাইজানটাইন (Byzantine) সেনাবাহিনী যদি আরবদের প্রাথমিক আক্রমণ ঠেকিয়ে দিতে পারত, তাহলে ইসলাম ধর্মও আরবের অল্প কিছু মানুষের ধর্ম হয়েই থাকত। তখন আমাদের ইতিহাসবিদরাও মক্কার একজন মধ্যবয়সি বণিকের ওপর অবতীর্ণ ঐশ্বরিক বাণী কেন মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারল না– সেটা খুব সহজে ব্যাখ্যা করতেন।

এসবের মানে এই নয় যে, মানুষের সমাজে যে-কোনো সময় যে-কোনো কিছু ঘটা সম্ভব। বিভিন্ন ভৌগোলিক, জীববৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক কারণে পরিস্থিতির ওপর নানা রকম সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। আবার সেসব সীমাবদ্ধতার ভেতর থেকেই ইতিহাসের এমন সব পথ খুলে যায়, যাকে কোনোভাবেই কোনো নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না।

যারা ইতিহাসের চলার পথকে সুনির্দিষ্ট বা নিয়মতান্ত্রিক ভাবেন, এই মন্তব্য তাদেরকে হয়তো কিছুটা হতাশ করবে। ইতিহাসের গতিপথকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবার সুবিধা হলো, সেক্ষেত্রে পৃথিবীর আজকের অবস্থা ও প্রচলিত বিশ্বাসগুলোকে অতীতের ঘটনাগুলোর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখানো যায়। এই যে আজকে আমরা বিভিন্ন জাতি হয়ে বিভিন্ন দেশে বাস করি, পুঁজিবাদী কাঠামোর ওপর নির্ভর করে জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলি, মানবাধিকারের কথা বলি– এ সবকিছুকেই তখন প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভূত আমাদের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। ইতিহাসকে যদি আমরা নিয়মতান্ত্রিক বলে স্বীকার না করি, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ আর মানবাধিকারে পৃথিবীর এত মানুষের বিশ্বাস স্রেফ কাকতালীয় একটা ব্যাপার।

ইতিহাসকে কখনো নির্দিষ্ট একভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ ইতিহাস কোনো নিয়ম মেনে এগোয় না। একসঙ্গে এত বেশি ঘটনা ঘটে, আরেকটা ঘটনার ওপর অন্যান্য ঘটনার প্রভাব এত বেশি যে সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে দাঁড়ায়। কোনো একটা ঘটনার একটা ছোট্ট পরিবর্তন হলেই তার ফলাফল একসময় বিরাট হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, ইতিহাস হলো একটা দ্বিতীয় মাত্রার বিশৃঙ্খল সিস্টেম (Second Order Chaotic System)। বিশৃঙ্খল সিস্টেম দুরকম হতে পারে। প্রথম মাত্রার বিশৃঙ্খল সিস্টেমের ওপর ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো প্রভাব নেই। এর একটা উদাহরণ হলো আবহাওয়া। আবহাওয়া কেমন হবে সেটা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আমরা সেটার কম্পিউটার মডেল দাঁড় করাতে পারি, আর সেই মডেল আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলো নিয়ে হিসেব করে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই ভবিষ্যদ্বাণী আবহাওয়ার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না বা আবহাওয়া পালটে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করে না।

দ্বিতীয় মাত্রার বিশৃঙ্খলার সমস্যা হলো, সেটা নিয়ে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা হলে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পরবর্তী ঘটনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বাজার হলো এরকম সিস্টেম। আজ যদি এমন একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখা হয়, যেটা শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চয়তায়

আগামীকাল তেলের দাম কত হবে সেটা বলে দেবে, তাহলে কী হবে? ভবিষ্যদ্বাণী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে তেলের দাম পালটে যাবে, ফলে ওই ভবিষ্যদ্বাণীও ব্যর্থ হবে। ধরা যাক আজ প্রতি ড্রাম তেলের দাম ৯০ ডলার, আর আমাদের কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলল আগামীকাল সেটা ১০০ ডলার হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তেল ব্যবসায়ীরা তেল কিনতে ছুটবে, কারণ তারা জানে, আজ ৯০ ডলারে তেল কিনে কাল ১০০ ডলারে সেটা বেচা যাবে। তাহলে আর আগামীকাল নয়, আজই তেলের দাম ১০০ ডলার হয়ে যাবে। কাল কত হবে? কেউ জানে না সেটা।

রাজনীতিও আরেকটা দ্বিতীয় মাত্রার বিশৃঙ্খল সিস্টেম। অনেকেই ১৯৮৯ সালের সোভিয়েত বিপ্লব কিংবা ২০১১ সালের 'আরব বসন্ত' বিপ্লব কেন আগে থেকে আঁচ করা গেল না, সেজন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দায়ী করেন। কিন্তু সেটা অনুচিত। বিপ্লব তার সংজ্ঞানুযায়ীই অনুমানযোগ্য নয়। আগে থেকে কোনো বিপ্লবের অনুমান করা গেলে সে বিপ্লবের সম্ভাবনাই নাকচ হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন আগে থেকে এসব বিপ্লব সম্পর্কে অনুমান করা যায়নি? ধরুন, ২০১০ সালে কয়েকজন রাজনীতি বিশ্লেষক আর তুখোড় কম্পিউটার প্রোগ্রামার মিলে এমন একটা অ্যালগরিদম তৈরি করল, যেটা দিয়ে কবে কোথায় বিপ্লব হবে সেটা আগে থেকেই নিখুঁতভাবে জানা যাবে। তারপর তারা তাদের তৈরি প্রোগ্রামটা নিয়ে গেল রাষ্ট্রপতি হোসনি মোবারকের কাছে চড়া দামে বিক্রির আশায়। সেটা কিনে মোবারক যখন দেখবেন ২০১১ সালেই বিপ্লব আসন্ন, তখন কী করবেন তিনি? নিশ্চয়ই নাগরিকদের ওপর থেকে করের বোঝা কমিয়ে দেবেন, কোটি কোটি ডলার খরচ করবেন নানা দিকে, সঙ্গে তাঁর গোপন পুলিশ বাহিনীকেও তৈরি থাকতে বলবেন, যদি দরকার হয়। এরপর ২০১১ সাল আসবে, যাবে, কিন্তু বিপ্লব আর হবে না, কারণ বিপ্লব যাতে সংগঠিত না হয় সে ব্যবস্থা তো আগেই করা আছে। এরপর মোবারক সেই রাজনীতি বিশ্লেষক আর প্রোগ্রামারকে ডেকে টাকা ফেরত চাইবেন, কারণ প্রোগ্রামটা কাজ করেনি, তার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে। হয়তো সেই টাকা দিয়ে তিনি নতুন একটা প্রাসাদই বানিয়ে ফেলতে পারতেন। প্রোগ্রামারও

যুক্তি দেখাতে পারে, ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়েছে বলেই তো বিপ্লব হয়নি, কিন্তু মোবারক তা মানবেন কেন?

তাহলে ইতিহাস পড়ে কী লাভ? ইতিহাস তো পদার্থবিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতি নয় যে সবকিছু একেবারে গাণিতিক সূত্র মেনে চলবে। আসলে ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ জানা নয়, এর উদ্দেশ্য হলো আমাদের চিন্তাকে বিস্তৃত করা, এইটুকু বুঝতে পারা যে বর্তমানে যা হচ্ছে তা মোটেই পূর্বনির্ধারিত কিছু নয়। এর উদ্দেশ্য হলো এটা জেনে রাখা যে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা যা যা ভাবি, সম্ভাব্য ঘটনার বিস্তার তার চেয়েও অনেক বেশি। আমরা যখন ইউরোপীয়দের আফ্রিকা দখল করার কথা পড়ি, সেটা আমাদের জানায় যে এখানে কালো মানুষের ওপর সাদা মানুষের ছড়ি ঘোরানোটা কোনো অনিবার্য প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, সেটা অনেকগুলো সম্ভাব্য ঘটনার মধ্যে একটা মাত্র, এবং ঘটনাটা অন্যরকমও হতে পারত।

২। অন্ধ ঘুণপোকা

ইতিহাস কোন পথ ধরে এগোবে তার ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি না। কিন্তু ইতিহাস প্রসঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটা আমরা করতে পারি, তা হলো ইতিহাসের গতিপথ মানুষের ভালোমন্দের ধার ধারে না। ইতিহাস যে সব সময় মানুষের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক পথটাই বেছে নিয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। এমন কোনো প্রমাণ নেই যা দেখে আমরা বলতে পারি মানুষের জন্য কল্যাণকর সংস্কৃতিগুলোই টিকে থাকে আর অন্যগুলো হারিয়ে যায়। খ্রিষ্টধর্ম যে ম্যানিকিয়ানিজিমের চেয়ে ভালো– এ কথা জোর দিয়ে বলার মতো কোনো যুক্তি আমাদের হাতে নেই। পারস্যের সাসানিদ সাম্রাজ্যের চেয়ে আরব সাম্রাজ্য যে মানুষের বেশি উপকার করেছে– এ কথাও আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

ইতিহাস যে মানুষের জন্য কল্যাণের পথটাই বেছে নেয়– এ কথা আমরা বলতে পারি না, কারণ এই 'কল্যাণের' কোনো সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি নেই। 'ভালো'কে একেক সংস্কৃতিতে একেকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বিজয়ীরা সব সময় ভাবে তাদের

ধারণাটাই ঠিক। কিন্তু আমরা সেটা মেনে নেব কেন? খ্রিষ্টানরা মনে করে ম্যানিকিয়ানিজমের ওপর খ্রিষ্টধর্মের বিজয় মানবজাতির জন্য ভালো। কিন্তু আমরা যদি খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী না হই, তাহলে এ কথা মেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। একইভাবে মুসলমানরা মনে করে যে মুসলিম শাসনের কাছে সাসানিদ সাম্রাজ্যের পতনও মানুষের জন্য কল্যাণকর ঘটনা। কিন্তু যে মুসলিম নয়, তার কাছে এমনটা নাও মনে হতে পারে। খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম, দুটোর কোনোটাই যদি জয়ী না হতো, তাহলে আজ সেটাকেও নিশ্চয়ই মানুষের জন্য 'ভালো' হিসেবেই দেখা হতো।

অনেক বিশেষজ্ঞের কাছে সংস্কৃতি জিনিসটা একধরনের মানসিক পরজীবী সংক্রমণের মতো একটা ব্যাপার, নিজের অজান্তেই যার বাহক হিসেবে কাজ করে মানুষ নিজে। ভাইরাসের মতো জৈব পরজীবী তাদের বাহকের শরীরের ভেতরে বেঁচে থাকে। এরা এক বাহকের শরীর থেকে অন্য বাহকের শরীরে ছড়ায়, বাহকের শরীর থেকে পুষ্টি আহরণ করে বাহককে দুর্বল করে ফেলে, অনেক ক্ষেত্রে মেরেও ফেলে। ভাইরাসের শুধু নিজের চাহিদা পূরণ করা দরকার, এক শরীর থেকে অন্য শরীরে ছড়ানো দরকার, বাহক বেঁচে থাকল না মারা গেল সেটা তার দেখার বিষয় নয়। ঠিক একইভাবে সাংস্কৃতিক ধারণাগুলোও টিকে থাকে মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর। ভাইরাসের মতো এসব ধারণাও বিকাশ লাভ করে, এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এগুলোর প্রতি মানুষের একধরনের দুর্বলতা তৈরি হয় এবং অনেক সময় সংস্কৃতির কারণে মানুষ নিজের প্রাণ ত্যাগ করতেও দ্বিধা বোধ করে না। খ্রিষ্টানদের স্বর্গ আকাশে, কিংবা কমিউনিস্টদের স্বর্গ এই পৃথিবীতেই– এইরকম একটা সাংস্কৃতিক ধারণাকে লালন ও প্রচার করতে অনেক মানুষ তাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দেয়, অনেকে মৃত্যুবরণ করতেও পিছপা হয় না। ভাইরাসের মতোই মানুষ মরে গেলেও সাংস্কৃতিক ধারণাটা বেঁচে থাকে, আরো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। মার্ক্সবাদীদের মতে সংস্কৃতি হলো অন্য মানুষের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য কিছু মানুষের ষড়যন্ত্র, কিন্তু মানসিক পরজীবীর ধারণাটা ঠিক সেটা বলে না। এই ধারণা অনুযায়ী, সংস্কৃতি হলো ঘটনাচক্রে উদ্ভূত কিছু

মানসিক পরজীবী, যারা নিজের টিকে থাকার স্বার্থে আক্রান্ত মানুষকে ব্যবহার করে মাত্র।

এ ধরনের ব্যাখ্যাকে অনেক সময় বলা হয় ‘মিমতত্ত্ব’ (Memetics)। জীবের বিবর্তন যেমন হয় ‘জিন’ (Gene)-এর প্রতিলিপি তৈরির মাধ্যমে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির বিবর্তন হয় ‘মিম’ (Meme)-এর প্রতিলিপি তৈরির মাধ্যমে। এখানে জিন এবং মিম দুটোই তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক, একটা জৈবিক, অন্যটা সাংস্কৃতিক।[১] যেসব সংস্কৃতি তাদের মিমগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করতে ও ছড়িয়ে দিতে পারে, সেগুলোই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে সক্ষম হয়। কিন্তু এসব মিমের বাহক মানুষগুলোর পরিণতি কী হচ্ছে সেটা এখানে অবান্তর।

অনেক বিশেষজ্ঞই এই মিমতত্ত্বকে গোনায় ধরতে চান না। তাঁদের কাছে এটা হলো সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে জৈবিক প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখার একটা আনাড়ি প্রয়াস মাত্র। কিন্তু এঁদের অনেকেই আবার মিমতত্ত্বেরই এক জ্ঞাতিভাই ‘উত্তরাধুনিকতা’ (Postmodernism) তত্ত্বকে মানেন। মিমতত্ত্ব যেখানে মিমকে সংস্কৃতির গাঠনিক উপাদান হিসেবে ধরে নেয়, সেখানে উত্তরাধুনিকতা ডিসকোর্সকে (Discourse) সংস্কৃতির গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। এই যেমন উত্তরাধুনিক চিন্তাবিদদের মতে, জাতীয়তাবাদ হলো ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া একটি ‘মহামারি’– যার প্রভাবে এই দুই শতাব্দীতে পৃথিবী দেখেছে এতগুলো যুদ্ধ, অত্যাচার, ঘৃণা আর গণহত্যা। প্রথমে এক দেশের মানুষ এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়েছে, তারপর সেটা ছড়িয়ে গেছে আশপাশের দেশেও। এই ‘ভাইরাস’টা মানুষের জন্য উপকারী হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু সেটা নিজের উপকারই করেছে কেবল।

একই রকম যুক্তি সমাজবিজ্ঞানেও গেম থিওরির (Game Theory) একটা অংশ হিসেবে লক্ষ করা যায়। গেম থিওরি পুরো ব্যাপারটাকে অনেকজন খেলোয়াড়ের একটা খেলা হিসেবে দেখে। খেলায় খেলোয়াড়ের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ অন্য খেলোয়াড়ের জন্য ক্ষতিকর হলেও সেটাই খেলার নিয়ম হিসেবে থেকে যায় এবং সবাই সে নিয়মটাই অনুসরণ করে খেলায় জিতবার চেষ্টা করে।

অস্ত্রের প্রতিযোগিতা এর একটা ভালো উদাহরণ। এই প্রতিযোগিতায় নেমে অনেক প্রতিযোগীই সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, কিন্তু শেষমেশ ক্ষমতার লড়াইয়ে এগোতে পারে না কেউই। পাকিস্তান যখন তার বিমানবাহিনীর জন্য নতুন বিমান কেনে, ভারতও হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। আবার ভারত যখন পারমাণবিক বোমা বানায়, পাকিস্তানও সেদিকে এগোয়। পাকিস্তান তার নৌবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করলে ভারতও তার উচিত জবাব দেয়। এত কিছুর পরেও দেখা যায় ভারত আর পাকিস্তানের সামরিক শক্তির ভারসাম্যটা আগে যেমন ছিল পরেও তেমনই আছে, কিন্তু এর মাঝখান দিয়ে দুই দেশই খরচ করে ফেলেছে কোটি কোটি টাকা। যে টাকা তারা খরচ করতে পারত দেশের মানুষকে উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দিতে, তা খরচ হয়ে গেল অস্ত্র কিনতে। এই অপ্রতিরোধ্য অস্ত্রের প্রতিযোগিতা একটা ছোঁয়াচে রোগের মতোই এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে কোনো দেশেরই উপকার হচ্ছে না, কিন্তু প্রতিযোগিতাটা নিজে টিকে থাকছে, আরো বিস্তৃত হচ্ছে। ব্যাপারটা অনেকটা বিবর্তনের মতোই। একটা জিন নিজে টিকে থাকার জন্য সচেতনভাবে কিছুই করে না, অথচ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলাফল হিসেবে সেটা টিকে যায়। অস্ত্রের প্রতিযোগিতাও ঠিক তেমন। এর নিজে থেকে টিকে থাকবার কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত উপজাত হিসেবে এই প্রতিযোগিতা সমাজে টিকে থাকে।

গেম থিওরি, উত্তরাধুনিকতা বা মিমতত্ত্ব– যা দিয়েই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখনোই মানবকল্যাণ নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল সংস্কৃতিগুলোই যে হোমো সেপিয়েন্সের জন্য সবচেয়ে ভালো– সেটা ভাবার কোনোই কারণ নেই। বিবর্তনের মতো ইতিহাসও একজন ব্যক্তি মানুষের সুখ-সুবিধার কথা ভাবে না। আবার একজন মানুষের সেই পরিমাণ জ্ঞান-বুদ্ধি বা ক্ষমতা থাকে না, যা দিয়ে ইতিহাসকে সে নিজের সুবিধা অনুযায়ী চালিত করবে।

এভাবেই ইতিহাস এগিয়ে যায় তার নিজের পথে। কোনো রহস্যময় কারণে সে অনেকগুলো পথের মধ্যে একটা ধরে এগোয়, জানা যায় না। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইতিহাস এমন একটা পথ বেছে নিয়েছিল, যা পরবর্তীতে শুধু মানুষ নয়, সারা পৃথিবীর ভাগ্য পালটে

দেয়। এই ঘটনাকে আমরা বলি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের শুরু হয়েছিল বিশাল আফ্রো-এশীয় ভূখণ্ডের পশ্চিম কোণে, ইউরোপে। এর আগ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে ইউরোপের তেমন কোনো ভূমিকাই ছিল না। অথচ সেখান থেকেই কেন বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হলো? কেন চীন বা ভারতে সেটা হলো না? কেন সেটা খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি থেকে শুরু হলো? এর ২০০ বছর আগে, বা ৩০০ বছর পরে কেন নয়? উত্তর জানা নেই। গবেষকরা এর ডজন ডজন ব্যাখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু তার কোনোটাই বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না।

ইতিহাসের সামনে অসংখ্য সম্ভাবনা, এর মধ্যে অনেকগুলোকেই আমরা অনেকসময় উপলব্ধিও করতে পারি না। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবকে বাদ দিয়েও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা মানুষের ইতিহাস কল্পনা করা যেতে পারে। একইভাবে ভাবা যেতে পারে খ্রিষ্টধর্ম, রোমান সাম্রাজ্য অথবা স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার ছাড়া মানুষের অন্য কোনো সম্ভাব্য ইতিহাস।

চতুর্থ পর্ব

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

২৪। অ্যালামোগরডো, ১৬ জুলাই, ১৯৪৫, ভোর ৫টা ২৯ বেজে ৫৩ সেকেন্ড। প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ৮ সেকেন্ড পর। পারমাণবিক বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার বিস্ফোরণটি দেখার পর গীতা থেকে উক্তি করলেন : 'এবার আমি সাক্ষাৎ মৃত্যু, মহাবিশ্বের ধ্বংসকারী'

অধ্যায় ১৪

জানি না বলতে শেখা

ধরা যাক, আনুমানিক ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক রাতে একজন কৃষক ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁর ঘুম ভাঙল প্রায় ৫০০ বছর পর এক হট্টগোলে। কলম্বাসের সহযোগী নাবিকরা যখন নিনা, পিন্টা ও সান্তা মারিয়া নামে তিনটি জাহাজ ছাড়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন, তখনই এই হট্টগোলের সূত্রপাত। ঘুম থেকে উঠে তিনি পৃথিবীর যে রূপ দেখতেন, সেটা তার কাছে কিন্তু খুব বেশি অচেনা বলে মনে হতো না। এই সময়ের মধ্যে প্রযুক্তি, মানুষের আচার-আচরণ এবং রাজনৈতিক সীমারেখার বেশ কিছু পরিবর্তন হলেও আমাদের মধ্যযুগীয় কুম্ভকর্ণটির কাছে সেই পৃথিবীকে নিজের চেনা পৃথিবী বলেই মনে হতো। কিন্তু, কলম্বাসের জাহাজের কোনো নাবিক যদি এরকম লম্বা ঘুমে তলিয়ে যান এবং প্রায় ৫০০ বছর পরে একবিংশ শতকের একটি আইফোনের রিংটোন শুনে তার ঘুম ভাঙে, তবে পৃথিবীর যে রূপ তার সামনে উন্মোচিত হবে, সেটা তার কাছে শুধু আশ্চর্যজনকই নয়, সেই পৃথিবী তার কাছে কল্পনারও অতীত বলে মনে হবে। তিনি হয়তো নিজেকে নিজেই জিজ্ঞেস করবেন, ‘এটাই কি স্বর্গ? নাকি এরই নাম নরক?’

গত ৫০০ বছরে পৃথিবী দেখেছে মানুষের শক্তির অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর বিকাশ। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবী জুড়ে মোট ৫০ কোটি হোমো সেপিয়েন্স বসবাস করত। আজকের পৃথিবীতে ৭০০ কোটিরও বেশি হোমো সেপিয়েন্সের বাস। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে দুনিয়ার সব মানুষ মিলে এক বছরে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন

করত, আজকের দিনের ডলারের হিসেবে তার আনুমানিক মূল্যমান হবে ২৫ হাজার কোটি ডলার।[২] আজকের দুনিয়ায় এক বছরে মানুষের উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্যমান ৬০ লাখ কোটি ডলার।[৩] সেসময়, সমগ্র মানবজাতি একদিনে ১৩ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন= ১,০০,০০০ কোটি) ক্যালরি খাদ্যশক্তি হিসেবে গ্রহণ করত। আজকের পৃথিবীতে মানুষ প্রতিদিন ১ হাজার ৫০০ ট্রিলিয়ন ক্যালরি খাদ্যশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে।[৪] এখন আবার একবার পরিসংখ্যানগুলোর দিকে তাকান– এই ৫০০ বছরে মানুষের সংখ্যা হয়েছে ১৪ গুণ, উৎপাদন হয়েছে ২৪০ গুণ আর খাদ্যশক্তি গ্রহণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৫ গুণ।

ধরা যাক, আজকের দিনের একটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজকে কলম্বাসের আমলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটি গুঁড়িয়ে দিতে পারবে কলম্বাসের জাহাজ নিনা, পিন্টা ও সান্তা মারিয়াকে। তারপর নিজের গায়ে এতটুকু আঁচড় না লাগিয়ে একে একে অনায়াসে ডুবিয়ে দিতে পারবে সেকালের পৃথিবীর সব পরাশক্তির যুদ্ধজাহাজগুলোকে। সেসময় সারা পৃথিবীর বণিকদের সবগুলো মালবাহী জাহাজ যত পণ্য বহন করতে পারত, একালের পাঁচটি আধুনিক মালবাহী জাহাজ তা অনায়াসে বহন করতে পারবে।[৫] মধ্যযুগের সবগুলো লাইব্রেরিতে যতগুলো সাংকেতিক বই-পুস্তক এবং কাগজ বা চামড়ায় মোড়ানো পুথি ছিল তাতে লিপিবদ্ধ সব তথ্য ধারণ করতে পারবে আজকের দিনের আধুনিক একটি কম্পিউটার। প্রাক-আধুনিক যুগে সব রাজ্যের অর্থ একত্রিত করলে যা দাঁড়াত, আজকের একটি বৃহদায়তন আধুনিক ব্যাংক তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ সংরক্ষণ করে।[৬]

১৫০০ সালে, খুব অল্পসংখ্যক শহরেই ১ লাখের বেশি জনগণ বসবাস করত। বেশিরভাগ বাড়িঘর তৈরি হতো কাদা, কাঠ এবং খড় বা শুকনো ঘাস দিয়ে, সে সময় একটি তিনতলা দালানকেই আকাশচুম্বী ইমারত মনে করা হতো। রাস্তাগুলোতে লেগে থাকত গাড়ির চাকার দাগ, গ্রীষ্মকালে রাস্তা থাকত ধুলোয় ভরা আর

বর্ষাকালে কাদায় মাখামাখি। সেই রাস্তা ব্যবহার করেই পথচারী, ঘোড়া, ছাগল, মুরগি এবং অল্প কিছু গোরুর গাড়ি পথ চলত। শহর এলাকায় শব্দের অত্যাচার বলতে মানুষ এবং পশুপাখির গলার শব্দ এবং মাঝেমধ্যে হাতুড়ি ও করাতের আওয়াজকে বোঝানো হতো। সন্ধ্যার পর শহর জুড়ে নেমে আসত অন্ধকার, সেই অন্ধকারে কখনো হয়তো একটি মোমবাতি বা একটি মশালের আলো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকত। এরকম একজন শহরের অধিবাসী যদি আজকের দিনের আধুনিক টোকিও, নিউ ইয়র্ক বা মুম্বাই শহর দেখেন, তাহলে কেমন হবে তার অনুভূতি?

ষোড়শ শতকের আগে, কোনো মানুষই পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেননি। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল যখন ১৫২২ সালে পর্যটক ম্যাগেলানের জাহাজ বাহাত্তর হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে স্পেনে ফিরে এলো। এ প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল এবং ম্যাগেলানসহ অভিযানের অধিকাংশ নাবিককেই প্রাণ দিতে হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে জুলভার্ন তাঁর কল্পকাহিনিতে ফিলিয়াস ফগ নামে এক ব্রিটিশ অভিযাত্রীর কথা লেখেন, যিনি ৮০ দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকের দিনে মাঝারি উপার্জনের একজন মানুষ মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় খুব সহজে এবং নিরাপদে পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারেন।

১৫০০ সালে মানুষকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে ভূপৃষ্ঠেই। স্থলভাগে তখন তারা টাওয়ার বানাতে পারত, উঠতে পারত পাহাড়ে। কিন্তু, আকাশটা তখনো ছিল পাখি, পরি, দেবদেবী আর শয়তানের দখলে। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই মানুষ প্রথম চাঁদের বুকে পা রাখল। এটা কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনাই নয়, এটি মানুষের ইতিহাসের একটি বড়ো বিপ্লব এবং মানুষের এক মহাজাগতিক বিজয়। কারণ, এর আগের ৪০০ কোটি বছরে জীবজগতের কেউ চাঁদে পা অথবা শুঁড় রাখা তো দূরের কথা, পৃথিবীর পরিমণ্ডলের বাইরেই বের হতে পারেনি।

ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে, অণুজীবদের সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। অথচ জীবজগতের ৯৯.৯৯ শতাংশ সদস্যই হলো অণুজীব। এই না জানার কারণ এমন নয় যে, তাদের নিয়ে মানুষের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। প্রতিটি মানুষকেই সব সময় কোটি কোটি এককোষী জীবকে নিজের শরীরে বহন করতে হয়। তারা যে কেবল থাকার জন্য থাকে তা নয়। তাদের কেউ আমাদের সেরা বন্ধু, আবার কেউ-বা আমাদের বড়ো শত্রু। কেউ আমাদের খাবার পরিপাক আর অন্ত্র পরিষ্কার রাখার কাজ করে, কেউ আবার আমাদের অসুস্থ করে ফেলে, নিয়ে আসে মহামারি। ১৬৭৪ সালে আন্তন ভন লিউয়েনহুক (Anton Van Leeuwenhoek) তাঁর নিজের বাসায় তৈরি অণুবীক্ষণে একটি পানির বিন্দুর মধ্যে এরকম লাখ লাখ অণুজীবের এক অদেখা পৃথিবীর সন্ধান পেলেন। আর তারই ফলে মানুষ এই প্রথম অণুজীবকে নিজের চোখে দেখতে পেল। পরবর্তী ৩০০ বছরে মানুষের সঙ্গে এরকম অনেক ধরনের আণুবীক্ষণিক জীবের পরিচয় হয়েছে। যেসব অণুজীব নানা রকম ভয়ংকর সংক্রামক রোগের জন্য দায়ী তাদের অধিকাংশই মানুষের কাছে পরাস্ত হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের জন্য উপকারী অণুজীবগুলো লালনপালন করে মানুষ তাদের ব্যবহার করেছে ওষুধ তৈরির কাজে এবং শিল্পকারখানায়। আজকাল আমরা ওষুধ তৈরি, বায়োগ্যাস উৎপাদন এবং ক্ষতিকর পরজীবী দমনের জন্য দরকারি ব্যাকটেরিয়ার উৎপাদন শিখে গেছি।

কিন্তু, গত ৫০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাব বিস্তারকারী মুহূর্তের সূচনা হলো ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাইয়ে, সকাল ৫টা ২৯ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে। এই সময়েই আমেরিকার বিজ্ঞানীরা নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোগরডোতে (Alamogordo) প্রথম আণবিক বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটালেন। ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই মানুষ বুঝতে পারল, ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই মানুষ আর সীমাবদ্ধ নেই, ইতিহাসের ইতি টানবার শক্তিও তারা অর্জন করেছে।

যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালামোগরডোতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং মানুষের চাঁদে যাওয়া সম্ভব হলো তার নাম বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। এই সময়টাতে মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিনিয়োগ করার মাধ্যমে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে পেরেছে। এটাকে আমরা বিপ্লব বলছি কারণ ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্তও পৃথিবীর মানুষ স্বাস্থ্য, সমর ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার নতুন সম্ভাবনা বা অগ্রগতির ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। যদিও এর আগে রাষ্ট্র এবং ধনী পৃষ্ঠপোষকেরা শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন, তবে নতুন নতুন উদ্ভাবনের পরিবর্তে অর্জিত জ্ঞানকে ধরে রাখাই ছিল এসবের মূল উদ্দেশ্য। প্রাক্-আধুনিক যুগের একজন গড়পড়তা শাসক সামাজিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং আইনকানুনের বৈধতা প্রমাণের জন্য ধর্মযাজক, দার্শনিক এবং কবিদের পেছনে অর্থ ব্যয় করতেন। তারা নতুন ওষুধ, যুদ্ধের নিত্যনতুন অস্ত্র বা অর্থনীতিতে নতুন গতির সঞ্চার করবেন এরকম আশা শাসকের থাকত না।

বিগত ৫০০ বছরে মানুষ ক্রমাগত বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের সামর্থ্যকে আরো বাড়াতে পারবে। এই বিশ্বাস কেবল অন্ধ ধারণার ওপর গড়ে ওঠেনি বরং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষমতার প্রমাণ যতই বাড়তে লাগল, সরকার এবং ধনকুবেররা ততই এই ব্যাপারে বিনিয়োগে আগ্রহী হলেন। এইসব বিনিয়োগ ছাড়া আমরা কখনই হয়তো চাঁদে বিচরণ করতে, অণুজীব গবেষণা করতে বা পরমাণুকে আরো ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করতে পারতাম না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমেরিকান সরকার গত কয়েক দশকে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে। এইসব গবেষণায় অর্জিত জ্ঞানের ফলেই সম্ভব হয়েছে আমেরিকায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, যা আমেরিকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্প খরচে বিদ্যুতের জোগান দিচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারকে দিচ্ছে কর, সেই করের একটি অংশই

আবার বিনিয়োগ করা হচ্ছে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আরো গবেষণা করার জন্য।
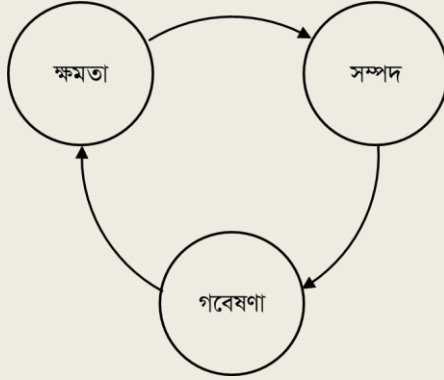
বিজ্ঞানভিত্তিক বিপ্লবের চক্র। শুধু গবেষণা দিয়ে বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে পারে না। এর জন্য দরকার হয় বিজ্ঞান, রাজনীতি আর অর্থনীতির সম্মিলিত উদ্যোগ। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো জোগান দেয় বিজ্ঞানের এগিয়ে চলার রসদ, যা ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা এগিয়ে নেওয়া মোটামুটি অসম্ভব। বিনিময়ে বিজ্ঞান দেয় নতুন ক্ষমতা আর শক্তি, যা ব্যবহৃত হয় নতুন সম্পদ তৈরিতে। এরই কিছু অংশ আবার বিনিয়োগ করা হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে।

গবেষণার মাধ্যমে যে আরো ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়– এই বিশ্বাস মানুষ পেল কোথা থেকে? কীভাবে বিজ্ঞান, রাজনীতি আর অর্থনীতি বাঁধা পড়ল এক সুতোয়? এই অধ্যায়ে আমরা বিজ্ঞানের ভূমিকাটুকু দেখব, তবে সেটা হবে এই প্রশ্নের আংশিক জবাব। পরের দুটো অধ্যায়ে আমরা এই ত্রিমুখী সম্পর্কটাকে দেখব আরো দুটো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে– ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদী অর্থনীতি।

জানতাম না তো!

সেই বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের সময় থেকেই মানুষ এই মহাবিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে আসছে। পৃথিবী কোন কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তা জানার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক সময় ও শ্রম

দিয়েছে। কিন্তু প্রাচীনকালের জ্ঞান অর্জনের এই প্রচেষ্টার থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের এই প্রক্রিয়া তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ভিন্ন–

ক) অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা। আধুনিক বিজ্ঞান ল্যাটিন শব্দ 'Ignoramus'-এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যার অর্থ– 'আমরা জানি না'। আধুনিক বিজ্ঞান ধরেই নেয়, আমরা সবকিছু জানি না। আরো সূক্ষ্মভাবে বললে বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞান এটাও স্বীকার করে আমরা আজকে যা জানি বলে মনে করছি, কাল আরো বেশি জ্ঞান অর্জনের ফলে আজকের জানা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। কোনো ধারণা, মতবাদ বা তত্ত্ব ঈশ্বরপ্রদত্ত নয় এবং বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।

খ) পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক বিশ্লেষণকে জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা। যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেয়, তাই তার লক্ষ্য থাকে অজানাকে জানার। জ্ঞান অর্জনের জন্য বিজ্ঞান তার চারপাশকে পর্যবেক্ষণ করে, তথ্য সংগ্রহ করে এবং গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে এই পর্যবেক্ষণকে তত্ত্বে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে।

গ) নতুন নতুন সক্ষমতা অর্জনের প্রবণতা। আধুনিক বিজ্ঞান কেবল তত্ত্ব তৈরি করেই সন্তুষ্ট থাকে না। এই তত্ত্বগুলোকে সে ব্যবহার করে নতুন নতুন ক্ষমতা অর্জনের কাজে এবং বিশেষভাবে বললে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজে।

বিজ্ঞানভিত্তিক বিপ্লব জ্ঞান অর্জনের বিপ্লব নয়। বরং এক কথায় একে বলা যায় অজ্ঞানতার আবিষ্কারের বিপ্লব। যে অভূতপূর্ব আবিষ্কারটি বিজ্ঞানভিত্তিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল সেটি হলো– আমরা মানুষেরা আমাদের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরই জানি না।

অন্যদিকে ইসলাম ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং কনফুসিয়ানিজমের মতো জ্ঞানের প্রাক্-আধুনিক ধারাগুলো ধরে নেয় যে, পৃথিবী সম্পর্কে যা-কিছু জানা গুরুত্বপূর্ণ ইতিমধ্যেই তা জানা হয়ে গেছে। অসংখ্য শক্তিধর দেবতা বা এক ও অদ্বিতীয় মহাশক্তিধর স্রষ্টা বা অতীতের জ্ঞানী ব্যক্তিদের লিখিত পুথি বা মুখে মুখে চলে

আসা গাথার মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত জ্ঞানভান্ডার। সাধারণ মরণশীল মানুষের কাজ কেবল এসব পবিত্র পুরাতন পুথি পড়ে, বুঝে এবং বহুকাল ধরে চলে আসা নিয়মকানুন মেনে জ্ঞান অর্জন করা। বাইবেল, কোরআন কিংবা বেদে বলা নেই– এমন কোনো গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান কোনো রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষেও যে আবিষ্কার করা সম্ভব– এ কথা কোনো ধর্মই মানতে চায় না।

জ্ঞানের প্রাচীন ধারাগুলো কেবল দুই ধরনের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছে। এক, একজন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় না-জানা-সম্পর্কিত অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা দূর করার জন্য তাকে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী কোনো মানুষের সহায়তা নিতে হতো। কেউই যা এখন পর্যন্ত জানে না, এমন কোনো কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টাই অর্থহীন। উদাহরণস্বরূপ, বিশ শতকের ইয়র্কশায়ারের একজন কৃষকের মনে যখন মানবজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগত, সে নিশ্চিতভাবেই ধরে নিত, কেবল খ্রিষ্টধর্মের মধ্যেই আছে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আর সেই উত্তর জানার জন্য সে শরণাপন্ন হতো স্থানীয় ধর্মযাজকের।

দুই, একটা পুরো গোষ্ঠীর কোনো অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা। শক্তিশালী দেবতারা বা অতীতের প্রাজ্ঞ মানুষেরা যেসব বিষয় সম্পর্কে এতকাল কিছুই বলেননি সেগুলো নিতান্তই গুরুত্বহীন বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, ইয়র্কশায়ারের সেই কৃষক যদি জানতে চাইত মাকড়সা কীভাবে তার জাল বোনে, সে সম্পর্কে ধর্মযাজককে জিগ্যেস করা ছিল নিতান্তই অর্থহীন। কারণ, খ্রিষ্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলিতে এ-সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। এর মানে এই নয় যে, খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে জ্ঞানের কোনো ঘাটতি আছে। বরং তাদের বিশ্বাস ছিল, মাকড়সার জাল বোনার কৌশল গুরুত্বহীন বলেই তা ধর্মগ্রন্থে নেই। ঈশ্বর নিশ্চয়ই ভালোভাবেই জানেন, মাকড়সা কীভাবে জাল বোনে। এই তথ্য যদি মানুষের উন্নতি বা মানবজাতিকে রক্ষার জন্য জরুরি হতো, শক্তিমান ঈশ্বর অবশ্যই এ-সংক্রান্ত বোধগম্য একটি ব্যাখ্যা বাইবেলে যুক্ত করতেন।

খ্রিষ্টধর্মে মাকড়সাসংক্রান্ত পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু মাকড়সা বিশেষজ্ঞ নামে যদি কিছু মধ্যযুগীয়

ইউরোপে থেকেও থাকে, সমাজের প্রান্তজন হয়েই তাকে থাকতে হয়েছে এবং তার গবেষণা এবং আবিষ্কার খ্রিষ্টধর্মের চিরকালীন রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন হিসেবেই থেকে গেছে। একজন বিশেষজ্ঞ মাকড়সা, প্রজাপতি বা গ্যালাপাগোস দ্বীপের পাখিদের সম্পর্কে যে তথ্যই আবিষ্কার করুক, তা ছিল সেকালের মানুষের দৃষ্টিতে নগণ্য জ্ঞান, সমাজের মূল স্রোত, রাজনীতি এবং অর্থনীতির সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন।

সত্যি কথা বলতে, সেকালে ব্যাপারগুলো ওপরের বর্ণনার মতো এত সহজ ছিল না। প্রত্যেক যুগেই, এমনকি ধর্ম এবং রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়ির যুগেও এমন কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা দাবি করতেন এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে যেসবের ব্যাপারে সমাজের সব মানুষই অজ্ঞ। এই ধরনের লোকগুলোকে হয় একঘরে করা হতো অথবা হত্যা করা হতো। কিংবা এরা নিজেরাই একটি নতুন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করতেন এবং দাবি করা শুরু করতেন, এই নতুন মতবাদেই মানুষের সব জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে। যেমন ইসলাম ধর্মমতে, আরবের মানুষেরা যখন অপরিসীম অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল, তেমন একটি সময়ে নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন হয়। তিনি যখন বললেন, তিনি পরিপূর্ণ সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, তার পর থেকে তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ‘সর্বশেষ নবি’ হিসেবে মেনে নেয়। সুতরাং তাঁর বক্তব্যের বাইরে নতুন করে সত্যের সন্ধান করার আর কী দরকার?

বর্তমানকালে জ্ঞানের ব্যাপারে বিজ্ঞানের ধারণা অনেকটাই ভিন্ন। বিজ্ঞান আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে আমাদের সামষ্টিক অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে নেয়। জীববিজ্ঞানী ডারউইন কখনো নিজেকে ‘সর্বশেষ জীববিজ্ঞানী’ বলে দাবি করেননি এবং ঘোষণা করেননি যে তিনি জীবজগতের সব রহস্যের চূড়ান্ত এবং চিরকালীন সমাধান করতে পেরেছেন। ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিস্তর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সত্ত্বেও, জীববিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে মস্তিষ্ক কীভাবে চেতনার জন্ম দেয়, সে ব্যাপারে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এখনো তাঁদের হাতে নেই। পদার্থবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, তাঁরা জানেন না কী কারণে মহাবিস্ফোরণ (Big

Bang) হয়েছিল বা কীভাবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে একীভূত করা যাবে।

এমনকি প্রায়ই এটা দেখা যায় যে, উদ্ভাবিত নতুন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আরেকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে নাকচ করে দিচ্ছে বা অকার্যকর প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হতে পারে কীভাবে একটি দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করতে হবে সে-সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে মতবিরোধ। যদিও প্রত্যেক অর্থনীতিবিদই দাবি করেন তাঁর মতবাদই সেরা, প্রত্যেক অর্থনৈতিক মন্দা, শেয়ারবাজারের ভরাডুবির পর তাঁদের এই অহংকার টলে ওঠে। এবং আজকের দিনে সাধারণভাবে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, অর্থনীতির তত্ত্বে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

এমনও অনেক উদাহরণ দেখা যায়, যেখানে একটি বিশেষ তত্ত্ব বিদ্যমান তথ্যগুলো দ্বারা এতটাই সমর্থিত যে, ওই বিষয়ের বিকল্প তত্ত্বগুলো হালে পানিই পায় না। সেক্ষেত্রে এই ধরনের তত্ত্বগুলোকে সত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার পরও এই ব্যাপারে সবাই একমত থাকেন যে, ভবিষ্যতে যদি এ বিষয়ে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়, যা বর্তমান তত্ত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তাহলে এই সত্য বলে মেনে নেওয়া তত্ত্বকে তৎক্ষণাৎ ভুল বলে স্বীকার করা হবে অথবা এর ত্রুটিগুলোকে শুধরে নেওয়া হবে। এ-সংক্রান্ত সবচেয়ে দুটি ভালো উদাহরণ হতে পারে টেকটোনিক প্লেট তত্ত্ব ও বিবর্তন তত্ত্ব।

অজ্ঞতা স্বীকার করে নেওয়ার এই সদিচ্ছা বিজ্ঞানকে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার চেয়ে গতিশীল, নমনীয় এবং কৌতূহলী করে গড়ে তুলেছে। পৃথিবীকে চেনা এবং নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে খুলে দিয়েছে এক নতুন দিগন্ত। কিন্তু অজ্ঞতার আবিষ্কার একটি ভয়ংকর সমস্যারও উদ্ভব ঘটিয়েছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যেটি নিয়ে ভাবনায় পড়তে হয়নি। বিজ্ঞানের সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে আমরা সবকিছু জানি না এবং আমরা যা জানি বলে মনে করি, সেগুলোও আংশিক জানা। যেসব সামষ্টিক মিথ অসংখ্য অচেনা মানুষকে একত্র করে আমাদেরকে বিশাল আকারের সমাজ, রাষ্ট্র,

গোষ্ঠী গঠনে সহায়তা করেছে সেইসব মিথও এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত। যদি কখনো প্রমাণিত হয় যে, এইসব মিথের সত্যতাও প্রশ্নের সম্মুখীন কিংবা ভুল, তখন আমরা কী করে আমাদের সমাজকে একসঙ্গে ধরে রাখব? আমাদের রাষ্ট্র, দেশ এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলোও কি তখন হুমকির মুখে পড়বে না?

সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ধরে রাখার সব আধুনিক প্রচেষ্টাকে তাই বাধ্য হয়েই দুটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটিকে অনুসরণ করতে হচ্ছে–

ক) বিজ্ঞানের সভ্যতার মূল কথা 'ভুলের সম্ভাবনা'কে অস্বীকার করে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে চূড়ান্ত এবং পরম সত্যরূপে ঘোষণা করুন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করছিল নাৎসি বাহিনী (যারা দাবি করেছিল যে জাতিতে জাতিতে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের ব্যাপারটি জীববিজ্ঞানেরই অনুসিদ্ধান্ত) এবং কমিউনিস্টরা (যারা দাবি করেছিল মার্কস ও লেলিন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর চূড়ান্ত সন্ধান পেয়েছেন, যার বিরুদ্ধে কোনো তর্কেরই অবকাশ নেই)।

খ) বিজ্ঞানকে একেবারেই দূরে সরিয়ে রাখুন এবং কোনো অবৈজ্ঞানিক চূড়ান্ত সত্যকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে জীবনযাপন করুন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী চলছে উদার মানবতাবাদ, যার ভিত্তিটি কাল্পনিক– প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও অধিকার। দুঃখজনকভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে চেনা মানবজাতির পরিচয়ের সঙ্গে এই ধারণার মিল খুবই সামান্য।

কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিজ্ঞানকেও কিন্তু তার গবেষণার পেছনের অর্থ বরাদ্দকে যুক্তিসংগত প্রমাণের জন্য ধর্মীয় এবং মতাদর্শগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে হয়!

অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে বর্তমান বিশ্বের সংস্কৃতি অন্য যে-কোনো সময়ের সংস্কৃতির চেয়ে বেশি উদার। আজকের বৃহদাকার মানবসমাজব্যবস্থা যে একসঙ্গে টিকে আছে তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সফলতায় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের প্রায় ধর্মসদৃশ বিশ্বাস যা পরম সত্য বা পরম ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের জায়গাকে কিছুটা হলেও প্রতিস্থাপিত করেছে।

বিজ্ঞানের মন্ত্র, বিজ্ঞানের বিধান

আধুনিক বিজ্ঞান অন্ধ বিশ্বাস বা গোঁড়ামির প্রভাবমুক্ত। কিন্তু তাকেও কিছু সাধারণ গবেষণাপদ্ধতির অধীনে চলতে হয়। এসবের মূলে রয়েছে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য সংগ্রহ এবং গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেসবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ইতিহাসের পুরোটা সময় জুড়েই মানুষ প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করলেও সেসব তথ্যের গুরুত্ব ছিল সীমাবদ্ধ। আপনার কাছে যদি সব প্রশ্নের উত্তরই থেকে থাকে, তাহলে অযথা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনি বাড়তি খরচ কেন করবেন? কিন্তু আধুনিক মানুষ যেহেতু স্বীকার করে নিল গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ই তারা জানে না, তাদের জন্য নতুন জ্ঞানের সন্ধান করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল। ফলে, পুরোনো জ্ঞানের অপূর্ণতাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেওয়াটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াল। পুরোনো ঐতিহ্যকে জানা ও তার চর্চার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যখন বর্তমানের পর্যবেক্ষণ পূর্বের প্রচলিত জ্ঞানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায় আমরা সেক্ষেত্রে বর্তমানের পর্যবেক্ষণকে প্রাধান্য দিই। অবশ্যই পদার্থবিজ্ঞানীর দূরবর্তী গ্যালাক্সির বর্ণালি বিশ্লেষণ, নৃতাত্ত্বিকের ব্রোঞ্জযুগের বিলুপ্ত কোনো নগরের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গবেষণা, সমাজবিজ্ঞানীর পুঁজিবাদের উদ্ভব নিয়ে পড়াশোনা অতীতের জ্ঞানের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে না। এসব গবেষণার শুরুই হয় পূর্বতন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কী বলে এবং লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা জানার মাধ্যমে। কিন্তু কলেজের প্রথম বছর থেকেই উঠতি পদার্থবিদ, নৃতত্ত্ববিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীকে শেখানো হয় যে তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে আইনস্টাইন, হেইনরিখ শিলম্যান ও ম্যাক্স ওয়েবারের জানার পরিধিকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

যদিও বেশি পর্যবেক্ষণ মানেই বেশি জ্ঞান নয়। এই মহাবিশ্বকে বোঝার জন্য আমাদের পর্যবেক্ষণগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে বোধগম্য তত্ত্বে রূপান্তর করতে হবে। পূর্বে জ্ঞানের শাখাগুলো

কাল্পনিক গল্পের ওপর ভিত্তি করে তাদের তত্ত্ব দাঁড় করাত। আধুনিক বিজ্ঞান সাহায্য নেয় গণিতের।

বাইবেল, কোরআন বা বেদ বা কনফুসিয়াসের বাণী ঘাঁটলে খুব সামান্যই সমীকরণ, লেখচিত্র বা গাণিতিক হিসাবনিকাশের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রাচীন পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থগুলো সমীকরণ নয় বরং বর্ণনার মাধ্যমেই পৃথিবীসংক্রান্ত সাধারণ নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ করেছিল। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, প্রাচীন ম্যানিকিয়ান ধর্মে বলা হচ্ছে, পৃথিবী হলো সুন্দর আর শয়তানের লড়াইয়ের এক যুদ্ধক্ষেত্র। শয়তানের শক্তি সৃষ্টি করেছে শরীরের আর সুন্দরের শক্তি সৃষ্টি করেছে আত্মা। মানুষ এই দুই শক্তির প্রভাবের মায়াজালে বন্দি এবং তার উচিত শয়তানের শক্তিকে অস্বীকার করে সুন্দরের শক্তির অনুসারী হওয়া। এত কিছু বলার পরেও এ ধর্মের ধর্মগুরু মানি (Mani) এমন কোনো গাণিতিক সূত্র দেননি, যার মাধ্যমে মানুষ হিসাব করে দেখতে পারে সে কত শতাংশ শয়তানকে অনুসরণ করছে আর কত শতাংশ সুন্দরকে অনুসরণ করছে। তিনি কখনো এরকম হিসাব বলেননি যে, ‘মানুষের ওপর ক্রিয়ারত বলের পরিমাণ তার আত্মার ত্বরণ এবং তার শরীরের ভরের ভাগফলের সমান’।

অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা কিন্তু ঠিক এই কাজটিই করার চেষ্টা করেন। ১৬৮৭ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর ‘ম্যাথমেটিক্যাল প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল ফিলোসফি’ বইটি প্রকাশ করেন। অনেকের মতেই এটি আধুনিককালের ইতিহাসে প্রকাশিত হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই। নিউটনের তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ছিল এটি মাত্র তিনটি গাণিতিক নিয়মের সাহায্যে গাছ থেকে পড়ন্ত আপেল থেকে শুরু করে আকাশ থেকে খসে পড়া তারা সহ মহাবিশ্বের সব বস্তুর গতিকে ব্যাখ্যা এবং অনুমান করতে পারত–

- **প্রথম সূত্র :** বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির এবং গতিশীল বস্তু সুষম গতিতে সরল পথে চলতে থাকে।
- **দ্বিতীয় সূত্র :** কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকেই ঘটে।

- **তৃতীয় সূত্র :** প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

এই সূত্রগুলো জানার পর থেকে একটি কামানের গোলা বা একটি গ্রহের গতিপথ হিসাব করতে মানুষকে কেবল বস্তুটির ভর, দিক, ত্বরণ এবং এর ওপর ক্রিয়াশীল বলের পরিমাণ হিসাব করতে হয়েছে। এরপর নিউটনের সমীকরণে এই রাশিগুলোর মান বসিয়ে সহজেই বস্তুটির ভবিষ্যৎ অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হলো। নিউটনের সূত্র কাজ করল জাদুর মতো। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে কিছু পদার্থবিজ্ঞানী যখন এমন কিছু বস্তুর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করলেন, যা নিউটনের সূত্র মেনে চলে না তখনই সূচনা হলো নিউটনের সূত্রকে ছাপিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের পরবর্তী বিপ্লবের, উদ্ভব হলো আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার।

নিউটন দেখালেন যে, প্রকৃতির নিয়মকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। তার বইয়ের কিছু কিছু অধ্যায়ের মূল লক্ষ্যই ছিল সুস্পষ্ট গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন করা। কিন্তু এরপর বিজ্ঞানীরা যখন জীববিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে নিউটনের মতো সমীকরণ আকারে প্রকাশ করতে গেলেন, তখন তারা খেয়াল করলেন যে এই বিষয়গুলোতে কিছু বাড়তি জটিলতা আছে, যার কারণে এগুলোকে ঠিক পদার্থবিজ্ঞানের মতো গাণিতিক সূত্র আকারে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর মানে এই নয় যে, তারা গণিতের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন। গত ২০০ বছরে গণিতের একটি নতুন শাখারই উদ্ভব হয়েছে, যেটি বাস্তবতার আরো জটিল কিছু দিককে গাণিতিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। গণিতের এই শাখার নাম হলো–পরিসংখ্যান।

১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে যাজকদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের ভাতা প্রদান করার লক্ষ্যে আলেকজান্ডার ওয়েবস্টার এবং রবার্ট ওয়ালেস নামে স্কটল্যান্ডের প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের দুজন যাজক একটি জীবনবিমা তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন, চার্চের যাজকগণ তাদের রোজগারের একটি অংশ একটি তহবিল গঠনের জন্য দান করবেন। কোনো যাজকের মৃত্যুর পর তার পরিবার নিয়মিত এই তহবিল থেকে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ পাবে। এটি

তাদেরকে তাদের বাকি জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে সাহায্য করবে। কিন্তু, যাজকেরা কী পরিমাণ অর্থ জমা রাখলে তাদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ তহবিল থেকে বরাদ্দ করা সম্ভব হবে তা জানার জন্য ওয়েবস্টার এবং ওয়ালেসের প্রতিবছর গড়ে কতজন যাজক মারা যান, গড়ে তাদের পরিবারের মোট কতজন সদস্য তারা রেখে যান এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের সদস্যরা গড়ে কত বছর বেঁচে থাকে– এসব ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট অনুমান করা জরুরি হয়ে পড়ল।

এখানে একটা ব্যাপার গুরুত্ব সহকারে লক্ষ করুন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই যাজকদ্বয় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করেননি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মশাস্ত্রের পূর্বতন বিশেষজ্ঞদের লিখে রাখা বাণীর মধ্যেও তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাননি। এমনকি তাঁরা আশ্রয় নেননি কোনো জটিল দার্শনিক তর্কের। সে সময়ের স্কটল্যান্ডের অধিবাসী হওয়ার দরুন তাঁরা ছিলেন বাস্তববাদী। সুতরাং, এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা আমন্ত্রণ জানালেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক কলিন ম্যাকলরিনকে। তাঁরা তিন জন মিলে মানুষের মৃত্যুর বয়স-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং এই তথ্য ব্যবহার করে তাঁরা অনুমান করার চেষ্টা করলেন প্রতিবছর গড়ে কতজন যাজক মারা যেতে পারেন।

তাঁদের এই কাজ আজকের দিনের পরিসংখ্যান এবং সম্ভাবনা তত্ত্বের বেশ কিছু বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এর মধ্যে একটি হলো জ্যাকব বার্নোলির 'ল অব লার্জ নাম্বারস'। বার্নোলি গণিতের ভাষায় দেখিয়েছেন যে, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সম্ভাব্যতা অনুমান করা কঠিন, তবে একই রকম অনেকগুলো ঘটনার গড় সম্ভাব্যতার অনুমান বেশ নিপুণভাবেই করা সম্ভব। অর্থাৎ আগামী বছর ওয়েবস্টার বা ওয়ালেস মারা যাবেন কি না এটা ম্যাকলরিনের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয় কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য থাকলে ম্যাকলরিন মোটামুটি নিখুঁতভাবে আগামী বছর স্কটল্যান্ডে মোট কতজন প্রেসবিটেরিয়ান যাজক মারা যেতে পারেন তা ওয়েবস্টার বা ওয়ালেসকে জানাতে পারবেন। সুখের বিষয় হলো, এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আগে থেকেই সংগ্রহ করা ছিল।

৫০ বছর আগে এডমন্ড হ্যালির প্রকাশ করা জীবন-মৃত্যুর খতিয়ান (Actuary Table) এ কাজে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। হ্যালি তাঁর প্রকাশিত হিসাবে জার্মানির ব্রেসলাউ শহরের ১ হাজার ২৩৮ জনের জন্ম এবং ১ হাজার ১৭৪ জনের মৃত্যুর খতিয়ান প্রকাশ করেন। হ্যালির টেবিলের সাহায্যেই জানা সম্ভব হয়েছিল যে, একটি নির্দিষ্ট বছরে ২০ বছর বয়স্ক একজন মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা ১/১০০, অন্যদিকে ৫০ বছর বয়স্ক একজন মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা ১/৩৯।

এইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে ওয়েবস্টার ও ওয়ালেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, গড়পড়তা যে-কোনো বছরে জীবিত স্কটিশ প্রেসবিটেরিয়ান যাজকের সংখ্যা হবে ৯৩০ এবং গড়ে প্রতিবছর ২৭ জন যাজকের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যাদের মধ্যে ১৮ জনের বিধবা স্ত্রী রেখে যাওয়ার সম্ভাবনা। এদের মধ্যে গড়ে পাঁচজনের বিধবা স্ত্রী থাকবে না কিন্তু এতিম সন্তান থাকবে এবং বিধবা স্ত্রীদের মধ্যে গড়ে দুজনের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান থাকবে, যাদের বয়স এখনো ১৬ বছরের সীমা অতিক্রম করেনি। তাঁরা এটাও হিসাব করে দেখলেন যে, বিধবা নারীরা স্বামীর মৃত্যুর পর কত বছর আরো বাঁচতে পারেন অথবা নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে তাদের আনুমানিক কত সময় লাগতে পারে (এই দুই ক্ষেত্রেই তারা ভাতা প্রাপ্তির আওতামুক্ত হবেন)। যেসব যাজকেরা তাদের প্রিয়জনের সুরক্ষার জন্য তহবিল গঠন করতে চান তাদেরকে কী পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে হবে, সেটা নির্ধারণ করতে এসব তথ্য ওয়েবস্টার ও ওয়ালেসকে সাহায্য করল। যাজকেরা যদি প্রতিবছর দুই পাউন্ড, ১২ শিলিং, দুই পেনি করে জমা রাখেন, তাহলে তিনি মোটামুটি নিশ্চিন্ত যে তার মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নী বছরে কমপক্ষে ১০ পাউন্ড করে পাবেন। তখনকার দিনের ১০ পাউন্ড মানে অনেক টাকা। কোনো যাজক যদি মনে করেন এই অর্থ তাঁর স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভরণপোষণেরর জন্য যথেষ্ট নয়, তিনি বছরে সর্বোচ্চ ৬ পাউন্ড, ১১ শিলিং, ৩ পেনি করে জমা রাখতে পারেন, যা নিশ্চিত করবে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী বছরে ২৫ পাউন্ডের মতো একটা বড়োসড়ো ভাতা পাবেন।

তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, ১৭৬৫ সাল নাগাদ বিধবা এবং নাবালক সন্তানদের আর্থিক সাহায্যের জন্য গঠন করা এই তহবিলের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৫৮ হাজার ৩৪৮ পাউন্ডে। তাদের এই গাণিতিক হিসাব বাস্তবের সঞ্চয়ের পরিমাণের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গিয়েছিল। ১৭৬৫ সালে এসে দেখা গেল তাদের তহবিলের প্রকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮ হাজার ৩৪৭ পাউন্ডে। অর্থাৎ, অনুমিত সঞ্চয়ের পরিমাণের সঙ্গে মাত্র এক পাউন্ডের হেরফের! এই হিসাব অতীতের হাবাক্কুক, জেরেমি বা সেন্ট জনের করা ভবিষ্যদ্বাণীর থেকে অনেক বেশি সঠিক ছিল। বর্তমানে, 'স্কটিশ উইডোজ' নামে পরিচিত ওয়েবস্টার এবং ওয়ালেসের তহবিল দুনিয়ার অন্যতম সেরা অবসর ভাতা এবং বিমা কোম্পানি।[৭]

পরবর্তীকালে দুজন যাজকের সম্ভাবনা তত্ত্ব নিয়ে এইসব হিসাবনিকাশ কেবল অ্যাকচুয়ারিয়াল (Actuarial) বিদ্যার ভিত্তি স্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, হয়ে উঠেছে অবসর ভাতা, বিমা-ব্যবসায় এবং জনসংখ্যাতত্ত্বের (আরেকজন উচ্চপদস্থ অ্যাংলো যাজক রবার্ট ম্যালথাস এই বিদ্যার প্রবক্তা) মূল প্রেরণা। একসময় আবার জনসংখ্যাতত্ত্বই হয়ে ওঠে সেই ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে চার্লস ডারউইন (যিনি একটি অ্যাংলো গির্জার যাজক প্রায় হয়েই গিয়েছিলেন) নির্মাণ করেন তাঁর বিখ্যাত 'বিবর্তন তত্ত্ব'। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জীবের জিনে রূপান্তরের (Mutation) মাধ্যমে কোন কোন প্রজাতির উদ্ভব ঘটবে তা অনুমানের জন্য যদিও কোনো গাণিতিক সমীকরণ নেই, কিন্তু জিনবিজ্ঞানীরা সম্ভাবনা তত্ত্ব ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীতে একটি নির্দিষ্ট জিনগত রূপান্তর ঘটার সম্ভাবনা কতটুকু তা হিসাব করতে পারেন। সম্ভাবনা তত্ত্বের এইসব ধারণা অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সামাজিক ও প্রকৃতি বিদ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি পদার্থবিজ্ঞানও নিউটনের পদার্থবিজ্ঞানের পুরোনো সূত্রগুলোকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় ব্যবহৃত সম্ভাবনা তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা আরো সুসংগত, অধিকতর সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছে।

শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসের খুব গভীরে না গেলেও এ কথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, নতুন এই গাণিতিক পদ্ধতির চর্চা আমাদের

অগ্রগতিতে কতটা ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাসের প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই গণিত ছিল জটিল, উচ্চস্তরের জ্ঞান যা কিনা শিক্ষিত লোকেদের পক্ষেও বোঝা অনেকসময় সম্ভব হতো না। মধ্যযুগের ইউরোপে যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ এবং অলংকারশাস্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থার ভিত, যেখানে সাধারণ হিসাবনিকাশ আর জ্যামিতি ছাড়া গণিতের অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। পরিসংখ্যান তখন সবার কাছেই অচেনা। সুতরাং, সেকালে জ্ঞানের সব শাখার প্রভু হিসেবে রাজত্ব করত ধর্মতত্ত্ব।

আজকের দিনে খুব কম ছাত্রই অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যুক্তিবিদ্যা হয়ে পড়েছে কেবল দর্শনের ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় আর ধর্মতত্ত্ব হয়ে পড়েছে সভা-সমিতির মঞ্চে বক্তৃতার বিষয়বস্তু। অন্যদিকে দিন দিন আরো বেশিসংখ্যক ছাত্র গণিতের অধ্যয়নের ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছে বা আরো বেশিসংখ্যক ছাত্রকে বাধ্য করা হচ্ছে গণিত অধ্যয়নের ব্যাপারে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চার ব্যাপারে তৈরি হয়েছে অপরিসীম আগ্রহ। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলতে এখানে গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা বিজ্ঞানের শাখাসমূহের কথা বলা হচ্ছে। এমনকি ভাষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের শাখাগুলো যাদেরকে একসময় মানবিক জ্ঞানের অংশ হিসেবে ধরা হতো, তাদেরও ক্রমাগত গণিতের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে এবং তারা নিজেদেরকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টায় ব্যস্ত। পরিসংখ্যানের কোর্স এখন কেবল পদার্থবিজ্ঞান আর জীববিজ্ঞানের জন্যই নয় বরং মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্যও বাধ্যতামূলক।

আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই সেখানকার মনোবিজ্ঞান বিভাগের সিলেবাসের প্রথম বাধ্যতামূলক কোর্সের নাম হলো– 'মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরিসংখ্যান ও পদ্ধতিগত মনোবিজ্ঞানের সূচনা'। দ্বিতীয় বর্ষের মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য আবশ্যিক কোর্স হলো– 'মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত পরিসংখ্যান পদ্ধতি'। মানুষের মনকে পরিপূর্ণরূপে বোঝার জন্য এবং তার মানসিক সুস্থতা বিধানের জন্য পরিসংখ্যান অধ্যয়ন জরুরি– কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, যিশু বা

মোহাম্মদকে এ ধরনের কোনো কথা বলা হলে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন।

জ্ঞানই শক্তি

বিজ্ঞানের গাণিতিক ভাষা আমরা সহজে বুঝতে পারি না এবং অনেক সময় এর মূল বক্তব্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বেশিরভাগ মানুষের কাছেই আধুনিক বিজ্ঞান বেশ দুর্বোধ্য। পৃথিবীর প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে কজনই-বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, কোষীয় জীববিজ্ঞান বা ম্যাক্রো-অর্থনীতি বোঝেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের যে অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস– তার প্রধান কারণ বিজ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা, নতুন সম্ভাবনার সন্ধান। একটি দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক কর্মকর্তা হয়তো নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে জানেন না, তবে নিউক্লিয়ার বোমার আগ্রাসী ভূমিকা কত ভয়ংকর হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ধারণা রাখেন।

১৬২০ সালে ফ্রান্সিস বেকন 'দি নিউ ইন্সট্রুমেন্ট' নামে এক বৈজ্ঞানিক ইশতেহার প্রকাশ করেন। এই ইশতেহারে তিনি বলেন, 'জ্ঞানই শক্তি'। কোনো জ্ঞান আমাদের নতুন শক্তিতে বলীয়ান করতে পারে কি না সেটাই জ্ঞানের প্রধান পরীক্ষা, জ্ঞানের বিষয়টি কতটুকু সত্য সেটা তার পরীক্ষার বিষয় নয়। বিজ্ঞানীরা সাধারণত ধরেই নেন যে, কোনো তত্ত্বই শতভাগ সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, সত্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়া জ্ঞানের জন্য তেমন জরুরি কোনো বিষয় নয়। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো তার উপযোগিতা। যে তত্ত্ব আমাদের নতুন কিছু করবার সক্ষমতা দান করে সেটাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

বিগত কয়েক শতকে, বিজ্ঞান আমাদেরকে অনেক নতুন সক্ষমতা দান করেছে। এর মধ্যে মৃত্যুর হার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অনুমান করার মতো বিষয়গুলো মানসিক সক্ষমতা। বিজ্ঞানের সুবাদে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে আমরা এর চেয়েও বেশি সক্ষমতা অর্জন করেছি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক এতটাই দৃঢ় যে অনেক সময়

এদেরকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল হয়ে পড়ে। এমনকি বর্তমানে আমরা অনেক সময় এভাবে ভাবি যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব নয়। যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে নতুন কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয় না, সে বৈজ্ঞানিক গবেষণার তেমন কোনো মূল্য নেই।

আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যকার এই সম্পর্কের ব্যাপারটি কিন্তু বেশ নতুন। ১৫০০ সালের পূর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা দুটি ক্ষেত্র। সপ্তদশ শতকের শুরুতে ফ্রান্সিস বেকন যখন এই দুটি ক্ষেত্রকে একত্রিত করলেন, তখন তা ছিল একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। সপ্তদশ শতক এবং অষ্টাদশ শতকে এই বন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যকার এই সম্পর্ক প্রকৃত পূর্ণতা পায় ঊনবিংশ শতকে। ১৮০০ সালেও কোনো শাসক একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের জন্য কিংবা একজন ধনকুবের ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না।

অবশ্য এ নিয়মের যে ব্যতিক্রম ছিল না এমন দাবি আমি করছি না। একজন মাঝারি মানের ঐতিহাসিক অতীতের ঘটনাগুলোর আপাতকারণ অনুসন্ধান করতে পারেন। কিন্তু, সত্যিকারের ভালো একজন ঐতিহাসিক এই আপাতকারণগুলোর আড়ালে লুকানো মূল কারণটাও দেখতে পান। মোটা দাগে দেখলে বেশিরভাগ প্রাক-আধুনিক যুগের শাসক ও ব্যবসায়ীরা নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে মহাবিশ্বের প্রকৃতি জানার জন্য সম্পদ বিনিয়োগ করেননি এবং সে সময়ের চিন্তাবিদ বা গবেষকরাও তাদের চিন্তা বা গবেষণাকে কোনো যন্ত্রের প্রযুক্তিতে পরিণত করার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। সেকালের শাসকেরা সেইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে বিনিয়োগ করতেন, যাদের লক্ষ্য ছিল আবহমানকাল ধরে চলে আসা জ্ঞানকে লালন করা, ছড়িয়ে দেওয়া এবং রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা পালন করা।

সে সময়েও নানা জায়গায় মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। তবে সেসবের বেশিরভাগই ছিল অশিক্ষিত, দক্ষ কারিগরের অসংখ্যবার চেষ্টার ফসল, কোনো উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতের পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক গবেষণার অর্জন নয়। যারা গোরুর গাড়ি

বানাতেন তারা বছরের পর বছর ধরে একই পদ্ধতিতে, একই উপাদান ব্যবহার করে গোরুর গাড়ি বানাতেন। গোরুর গাড়ির নতুন মডেল উদ্ভাবনের জন্য তাদের বার্ষিক লাভের একটা অংশ তারা গবেষণা কাজে বরাদ্দ করতেন না। মাঝে মাঝে গাড়ির নকশায় পরিবর্তন আসত কিন্তু এসবের মূলে ছিল স্থানীয় কারিগরদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা যাদের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি থাকা তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রেই তারা ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন।

সরকারি ও বেসরকারি সব খাতের জন্যই এই একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। আধুনিক রাষ্ট্র তার রাষ্ট্র নীতি, জ্বালানি খাত, স্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিজ্ঞানীদের শরণাপন্ন হন। প্রাচীন রাষ্ট্রগুলোতে এমনটা হতো না। এই দুই সময়ের মধ্যকার পার্থক্যটা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয় যুদ্ধাস্ত্রের দিকে নজর দিলে। যখন বিদায়ি প্রেসিডেন্ট ডুয়াইট আইসেনহাওয়ার ১৯৬১ সালে শিল্প ও সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তির ব্যাপারে সবকে সতর্ক করেন তখন আসলে একটি ব্যাপার তিনি তার কথায় উহ্য রেখে যান। তার উচিত ছিল সবকে শিল্প, সেনাবাহিনী ও বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান শক্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া। কারণ, বর্তমানের যুদ্ধগুলো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফসল। সারা পৃথিবীর সব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার অধিকাংশই পরিচালনা ও অর্থায়ন করে কোনো-না-কোনো সেনাবাহিনী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন দুই পক্ষের অন্তহীন ধ্বংস আর হত্যার ক্ষেত্রে পরিণত হলো, তখন দুই পক্ষই এ অচলাবস্থা নিরসন করে নিজেদের দেশকে বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞানীদের শরণাপন্ন হলেন। এই ডাকে সাড়া দিলেন বিজ্ঞানী নামের সাদা পোশাকের মানুষগুলি আর তাদের ল্যাবরেটরি থেকে একের পর এক বেরোতে লাগল চমকে দেওয়ার মতো অগণিত অস্ত্র– যুদ্ধবাজ বিমান, বিষাক্ত গ্যাস, ট্যাংক, ডুবোজাহাজ, তাক লাগানো মেশিনগান, কামান, রাইফেল, বোমা আরো কত কী!

৩৩। উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত জার্মান ভি-২ রকেট। এটা শত্রুশিবিরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি সত্যি, কিন্তু এটা জার্মানদের একটা প্রযুক্তির জাদুর আশায় বাঁচিয়ে রেখেছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজ্ঞানের প্রভাব ছিল আরো ব্যাপক। ১৯৪৪ সালের শেষদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পতন একরকম নিশ্চিত হয়ে পড়ে। এর এক বছর আগেই ইতালিতে জার্মানদের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনির পতন ঘটে এবং তারা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মিত্রবাহিনীর ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং সোভিয়েত সৈন্যরা যখন জার্মানিকে একরকম কোণঠাসা করে ফেলেছে, তখনো জার্মান সেনারা আত্মসমর্পণ না করে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জার্মান সৈন্য ও সাধারণ নাগরিকদের এই বিশ্বাস ছিল যে সবকিছু এখনো শেষ হয়ে যায়নি, শেষ মুহূর্তে হলেও তাদের বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীরা ভি-২ রকেট বা জেটচালিত যুদ্ধবিমানের মতো এমন কিছু মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করে ফেলবে, যা পাশার দান পুরোপুরি উলটে দেবে এবং শেষমেশ জার্মানরাই যুদ্ধে জয়ী হবে।

এদিকে জার্মান বিজ্ঞানীরা যখন রকেট আর যুদ্ধবিমান তৈরিতে ব্যস্ত, ততক্ষণে আমেরিকা ম্যানহাটন প্রকল্পের আওতায় বানাতে শুরু করেছে আণবিক বোমা। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের শুরুর দিকে

যখন ম্যানহাটন প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলো, ততদিনে জার্মানরা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে। বিরুদ্ধশক্তিগুলোর মধ্যে একমাত্র জাপানই তখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকান সেনাবাহিনী জাপান অধিকৃত কিছু ভূখণ্ড দখলের সিদ্ধান্ত নিল। জাপানিরা প্রাণ দিয়ে হলেও এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। জাপানিদের গৃহীত পদক্ষেপ, আত্মঘাতী বোমা হামলা (Kamikaze) সবার সামনে তাদের এই সংকল্পের দৃঢ়তা তুলে ধরল। আমেরিকার সেনাপ্রধানরা তাদের রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস ট্রুম্যানকে জানালেন, এভাবে চললে জাপান দখলের এই অভিযানে লাখ লাখ আমেরিকান সৈন্যকে প্রাণ দিতে হতে পারে এবং এই প্রক্রিয়া হয়তো সমস্ত যুদ্ধটাকেই ১৯৪৬ সাল অব্দি দীর্ঘায়িত করবে। ট্রুম্যান এই সমস্যা সমাধানে তাদের নতুন উদ্ভাবিত বোমা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। দুই সপ্তাহে জাপানে মাত্র দুটো আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হলো, আত্মসমর্পণে বাধ্য হলো প্রতিরোধে দৃঢ়সংকল্প জাপান। আর সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধেরও ঘটল ইতি।

অবশ্য বিজ্ঞান কেবল আক্রমণের হাতিয়ারই তৈরি করে না, আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে অনেক আমেরিকানই মনে করেন যে, সন্ত্রাসবাদের প্রকৃত সমাধান আছে তথ্যপ্রযুক্তির কাছে, রাজনীতির পথে নয়। তাদের বিশ্বাস, ন্যানোটেকনোলজির পেছনে আরো কয়েক লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা গেলেই তাদের তৈরি খুদে বায়োনিক গোয়েন্দা উড়ে যাবে আফগানদের গুহায়, ইয়েমেনের ইহুদিদের ধ্বংসাবশেষে বা উত্তর আফ্রিকার যাযাবরদের তাঁবুতে। আর সেটা করা গেলে ওসামা বিন লাদেনের উত্তরসূরিদের এক কাপ চা বানানোর খবর পর্যন্ত ল্যাংলিতে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তরে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে দেবে সেসব মাছিসদৃশ খুদে গোয়েন্দার দল। কিংবা মস্তিষ্কের গবেষণার পেছনে আরো লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করুন, প্রতি বিমানবন্দরে থাকবে সব মানুষের মস্তিষ্ক স্ক্যান করার এফএমআরআই (FMRI) যন্ত্র, যা নিমিষেই বলে দেবে কোন মানুষটি তার মাথার ভেতর ধ্বংসাত্মক কোন পরিকল্পনা আঁটছে বা

কোন মানুষটি রেগে আছে। তাদের এইসব বিশ্বাস বা ধারণাগুলো কি আদৌ সমাধান করতে পারবে মানুষের সমস্যার? কে জানে! উড়ন্ত বায়োনিক গোয়েন্দামাছি বা মস্তিষ্কের চিন্তা পড়তে পারা যন্ত্র আবিষ্কার করা কি আদতে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে? মনে হয় না। কিন্তু এসব মনে হওয়া বা না হওয়ায় আসলেই কিছু যায় আসে না, কারণ আপনি যখন এই লাইনগুলো পড়ছেন, তখনই হয়তো আমেরিকার নিরাপত্তা অধিদপ্তর ন্যানোটেকনোলজি এবং মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করার ল্যাবরেটরিতে এসব ধারণা এবং আরো নতুন অনেক ধারণা নিয়ে কাজ করার জন্য কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন।

আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ট্যাংক থেকে শুরু করে আণবিক বোমা কিংবা বায়োনিক খুদে গোয়েন্দা, সামরিক কাজে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের এই প্রবণতা কিন্তু খুব বেশিদিনের পুরোনো নয়। ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্তও বেশিরভাগ সামরিক বিপ্লবগুলোরই কারণ ছিল গোষ্ঠী সম্পর্কের পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তির উন্মেষ নয়। সে সময়, যখন দুটো অচেনা সভ্যতার মানুষ প্রথমবারের মতো একে অপরের সাক্ষাৎ পেত, তখন তাদের মধ্যে প্রযুক্তিগত তারতম্য মাঝেমধ্যে কিছু পার্থক্য গড়ে দিত। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও খুব কমসংখ্যক মানুষই প্রযুক্তিগত তারতম্য বাড়ানো বা কমানো নিয়ে সচেতনভাবে চিন্তা করেছে। সেকালের অধিকাংশ সাম্রাজ্যই কোনো জাদুকরি প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি, শাসকেরাও তাই প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাতেন না। উন্নত তির বা তরবারির কল্যাণে আরবরা সাসানিড সাম্রাজ্য জয় করেনি, সেলজুকরা (Seljuk) কোনো অর্থেই প্রযুক্তিগতভাবে বাইজেনটাইনদের (Byzantine) থেকে এগিয়ে ছিল না এবং মোঙ্গলরা কোনো শক্তিশালী নতুন অস্ত্রের জোরে চীনা সাম্রাজ্য অধিকার করেনি। বরং এসব ক্ষেত্রেই বিজয়ী দলের থেকে বিজিতরাই সমর এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রযুক্তিতে এগিয়ে ছিল।

এক্ষেত্রে রোমান সেনাবাহিনী একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। সে সময়ে রোমান সেনাবাহিনী প্রযুক্তিগত দিক থেকে কার্থেজ, মেসেডোনিয়া বা সেলুসিড সাম্রাজ্যের চেয়ে কোনো অংশে উন্নত না হলেও তারাই ছিল পৃথিবী সেরা। দক্ষ সাংগঠনিক শক্তি, ইস্পাতদৃঢ়

নিয়মনিষ্ঠা এবং বিশাল জনশক্তিই ছিল তাদের সেরা হয়ে উঠবার প্রধান নিয়ামক। প্রযুক্তির উন্নতির জন্য রোমান সেনাবাহিনী কখনো গবেষণা এবং উদ্ভাবন অধিদপ্তর গড়ে তোলেনি। শেষের প্রায় ১০০ বছর জুড়ে তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের প্রকৃতি মোটামুটি একই রকম ছিল। সেনানায়ক সিপিও আমিলিনাস, যার নেতৃত্বাধীন বাহিনী খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে কার্থেজ সাম্রাজ্যকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এবং পরাজিত করেছিলন নুমানশিয়ানদের (Numantian), তিনি যদি কোনো জাদুমন্ত্রবলে ৫০০ বছর পর কনস্টানটিন দি গ্রেট-এর রাজত্বে এসে উদয় হন, তবে তার বাহিনীর একটা ভালো রকম সম্ভাবনা থাকবে কনস্টানটিনের বাহিনীকে পরাজিত করার। এখন চিন্তা করে দেখুন মাত্র কয়েক শতাব্দী আগের নেপোলিয়ানের মতো একজন বিখ্যাত সেনানায়ক যদি হুট করে আজকের দুনিয়ায় এসে আবির্ভূত হন এবং তার সংঘবদ্ধ বাহিনী নিয়ে এ যুগের কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তবে তার ফলাফল কী হতে পারে। নেপোলিয়ানের রণকৌশল অসাধারণ এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সবাই নিখুঁত, পেশাদার যোদ্ধা, কিন্তু আজকের দিনের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের কাছে তাদের রণকৌশল হয়ে পড়বে নিতান্তই অর্থহীন ও অকেজো।

প্রাচীন রোমের কথাই বলুন, অথবা সেকালের চীনের কথা– বেশিরভাগ সমরনায়ক এবং দার্শনিকের কেউই নতুন নতুন অস্ত্রের উদ্ভাবনকে তাদের অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করতেন না। চীনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সামরিক আবিষ্কার ছিল বারুদ। ডাওইস্ট (Daoist) আলকেমিস্ট যাঁরা মানুষের অমরত্বের সমাধান নিয়ে কাজ করতেন, এই আবিষ্কার ছিল তাঁদের এক আকস্মিক দুর্ঘটনার ফসল। কেউ ভাবতেই পারেন, বারুদ আবিষ্কারই চীনকে দুনিয়ার ওপর প্রভুত্ব স্থাপনে সহায়তা করেছে। কিন্তু মজার কথা হলো, চাইনিজরা মূলত আতশবাজি বানানোর কাজেই তাদের উদ্ভাবিত এই বারুদ ব্যবহার করত। এমনকি চীনের বিখ্যাত সং সাম্রাজ্য যখন মোঙ্গলদের আক্রমণের মুখে পড়ল, তখনো চীনের সম্রাট কোনো বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির লক্ষ্যে 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট'-এর আদলে কোনো মধ্যযুগীয় প্রকল্প শুরু করেননি। বারুদ আবিষ্কারের প্রায় ৬০০ বছর পর,

পঞ্চদশ শতকে এসে আফ্রো-এশিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে বারুদ যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণের প্রধান নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হলো। বারুদের এই ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে মানুষের এত সময় লাগল কেন? কারণ, তখনকার রাজা, পণ্ডিত বা ব্যবসায়ীদের কেউই ভাবতেন না যে নতুন সামরিক প্রযুক্তি তাদের নিরাপত্তার কাজে লাগতে পারে বা তাদেরকে আরো ধন সম্পদের অধিকারী করে তুলতে পারে।

পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকের দিকে এসে এ অবস্থায় পরিবর্তন শুরু হলেও নতুন নতুন অস্ত্র তৈরির গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহী হতে শাসকদের আরো দুই শতাব্দী লেগে গেছে। ততদিন পর্যন্ত প্রযুক্তির চেয়ে সৈন্য এবং মালামাল সরবরাহের প্রক্রিয়া এবং রণকৌশলই যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। নেপোলিয়ানের যে দক্ষ সেনাবাহিনী অস্টারলিৎজ (১৮০৫) এ ইউরোপীয় শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তাদের অস্ত্র ছিল মোটামুটি ষোড়শ লুইয়ের সেনাবাহিনীর সমমানের। নেপোলিয়ান নিজে একজন যুদ্ধবাজ সমরনায়ক হলেও, বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকেরা উড়ন্ত যান, সাবমেরিন বা রকেট তৈরির ব্যাপারে বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাতে তিনি এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখাননি।

পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব এবং শিল্পবিপ্লবের পরেই কেবল বিজ্ঞান, শিল্প ও সামরিক প্রযুক্তি একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করেছে। তাদের সবার এক রাস্তায় চলার এই সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছে পৃথিবীর প্রচলিত রূপ।

একটা নতুন কিছু করো

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের আগ পর্যন্ত মানুষের বেশিরভাগ সংস্কৃতি পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিল না। তারা ভাবত, অতীত সবচেয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত, বর্তমান অতীতেরই প্রতিচ্ছবি অথবা বর্তমান অতীতের ক্ষয়িষ্ণু রূপ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা নিয়মগুলোকে কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমেই অতীতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব এবং

মানুষের বুদ্ধির কাজ হলো দৈনন্দিন জীবনে এই ধারণাটির গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা। এটা ধরেই নেওয়া হতো যে, পৃথিবীর মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান জানা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মোহাম্মদ, যিশু, বুদ্ধ বা কনফুসিয়াসের মতো সর্বজ্ঞ মহাপুরুষরাই যখন দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দারিদ্র্য ও যুদ্ধ দূর করতে পারেননি, তখন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কী হতে পারে!

অনেক ধর্মই এমন বিশ্বাস করত যে, একদিন কোনো মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন এবং পৃথিবীর বুক থেকে সব যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এমনকি সব জরা-মৃত্যু দূর করবেন। মানুষ নিজেই নতুন জ্ঞান এবং আবিষ্কারের দ্বারা এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে– এরকম ধারণা কেবল হাস্যকর নির্বুদ্ধিতাই নয় বরং অর্বাচীন আত্মাভিমানের নামান্তর। বাবেলের টাওয়ার, ইকারাসের গল্প, গোলেম-এর কাহিনি এবং আরো অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনি মানুষকে এই শিক্ষা দিয়েছিল যে, কোনো ব্যাপারেই সীমা লঙ্ঘন করার চেষ্টা পরিণামে মানুষের জন্য ব্যর্থতা আর দুর্ভোগই ডেকে আনে।

আধুনিক যুগের সংস্কৃতি 'অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসই আমরা এখনো জানি না'– এ কথা যখন স্বীকার করে নিল এবং এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে যখন যুক্ত হলো 'বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষকে নতুন নতুন শক্তির সন্ধান দিতে পারে'– এই ধারণা, তখন মানুষ ক্রমাগত পরিবর্তন ও অগ্রগতির ধারণায় আস্থা স্থাপন করল। বিজ্ঞান যখন একের পর এক নানা অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করতে শুরু করল, মানুষের মনে এমন ধারণা জন্মাল যে নতুন জ্ঞান আহরণের মাধ্যমেই মানবজাতির যে-কোনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বার্ধক্য এমনকি মৃত্যুও মানুষের অপরিহার্য নিয়তি নয়। সেগুলো মানুষের অজ্ঞানতারই ফসল মাত্র।

৩৪। দেবতার হাত থেকে বজ্র কেড়ে নিচ্ছেন বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন

এ ব্যাপারে বজ্রপাতসংক্রান্ত উদাহরণটি বেশ জনপ্রিয়। অনেক সভ্যতাই বিশ্বাস করত, বজ্রপাত হলো পাপী লোকদের শায়েস্তা করার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসা দেবতার হাতুড়ি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকা পরীক্ষাটি করলেন। আকাশের বজ্রপাতের মধ্যে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করলেন আকাশের বজ্রপাতে বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নেই। বিজ্ঞানী ফ্রাংকলিনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিদ্যুৎশক্তি সম্পর্কে তার জ্ঞান তাকে সাহায্য করল আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামিয়ে আনতে, দেবতার হাত থেকে তার শাস্তির হাতুড়ি কেড়ে নিতে।

এ প্রসঙ্গে দারিদ্র্যের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক সভ্যতাই দারিদ্র্যকে তাদের ভুলত্রুটি ভরা সমাজের একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবেই বিবেচনা করে এসেছে। নিউ টেস্টামেন্ট যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার কিছুক্ষণ আগে একজন নারী তাকে ৩০০ দিনেরিয়াস সমমূল্যের দামি তেল মালিশ করে দিচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে যিশুর অনুসারীরা আর্তনাদ করে তাকে এত দামি তেল যিশুর গায়ে মালিশ না করে এই পরিমাণ অর্থ গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে

বললেন। যিশু তার অনুসারীদের শান্ত করলেন এবং রমণীকে বললেন, 'তুমি সাহায্য করার জন্য গরিবদের সব সময়ই তোমার আশপাশে পাবে কিন্তু আমার সেবা করার এই তোমার শেষ সুযোগ' (মার্ক ১৪:৭)। আজকের দিনে, যিশুর এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করবে এমন লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। দারিদ্র্যকে বর্তমানে একটি কৌশলগত সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়, যার সমাধান অসম্ভব নয়। বর্তমানকালের সবারই সাধারণ বিশ্বাস হলো কৃষি, অর্থনীতি, চিকিৎসা এবং সমাজবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উদ্ভাবনগুলোকে কাজে লাগিয়ে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা গেলে অবশ্যই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এমনকি, পৃথিবীর অনেক অংশই বর্তমানে দারিদ্র্যের চূড়ান্ত অমানবিক রূপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। মানুষের ইতিহাসে আমরা সমাজে দুই ধরনের দারিদ্র্য দেখতে পাই। একটি সামাজিক দারিদ্র্য, যেখানে কিছু ব্যক্তি অন্য সব ব্যক্তিকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। দুই, জৈবিক দারিদ্র্য, যেখানে পরিমিত খাদ্য আর বাসস্থানের অভাবে কিছু মানুষ মৃত্যুঝুঁকিতে থাকে। সামাজিক দারিদ্র্য দূর করা সম্ভবত কখনোই সম্ভব হবে না, তবে পৃথিবীর অনেক দেশেই জৈবিক দারিদ্র্যের বিষয়টি এখন ইতিহাস।

অথচ নিকট অতীতের ইতিহাস দেখলে আমরা বুঝতে পারব বেশিরভাগ মানুষই তখন দারিদ্র্যসীমার খুব কাছাকাছি বাস করত। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করলে একজন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরির সংস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই, হিসেবের একটু গরমিল বা কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্ভোগ মানুষকে ঠেলে দিত অনিবার্য অনাহারের দিকে। এসব দুর্যোগ তাই প্রায়ই জনপদ জুড়ে জন্ম দিত দুর্ভিক্ষের, যার পরিণাম লাখ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু। আজকের দিনে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষেরই বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা আছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষ বিমা করার মাধ্যমে তার অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ-আপদ মোকাবিলা করতে পারে, সরকারি এবং অসংখ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা, বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। কোনো অঞ্চলে দুর্যোগ দেখা দিলে সারা পৃথিবীর মানুষ

সেই দুর্যোগসৃষ্ট মানবেতর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পৃথিবী জুড়ে মানুষ আজও নানা রকম প্রতিকূলতা, বঞ্চনা আর দারিদ্র্যজনিত অসুস্থতার শিকার হয়, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকাতেই মানুষ আজ অনাহারে মারা যায় না। এমনকি, পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে মানুষ আজ খাদ্যের অভাবের কারণে নয় বরং মাত্রাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়ছে।

গিলগামেশ প্রকল্প

এখন পর্যন্ত যে সমস্যাগুলোর সমাধান মানুষের সাধ্যের অতীতই থেকে গেছে, সেগুলোর মধ্যে হতাশা, কৌতূহল আর গুরুত্বের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে যে সমস্যাটি, সেটি হলো 'মৃত্যু'। আধুনিক যুগের শেষভাগের আগ পর্যন্ত বেশিরভাগ ধর্ম এবং মতবাদ 'মৃত্যু'কে মানবজীবনের এক অনিবার্য নিয়তি হিসেবেই বিবেচনা করেছে। এমনকি, অনেক ধর্মবিশ্বাস মৃত্যুকেই একটি অর্থপূর্ণ জীবনের প্রধানতম উপাদান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। অমর মানুষের একটি সমাজে ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম বা প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের অস্তিত্বের কথা একবার ভেবে দেখুন। এই ধর্মবিশ্বাসগুলো মানুষকে শিখিয়েছে মৃত্যুকে অস্বীকার করার চেষ্টা না করে বা চিরকাল পৃথিবীতে বসবাসের স্বপ্ন না দেখে মানুষের উচিত সঠিক কাজের মাধ্যমে নিজেকে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা মৃত্যুকে অর্থপূর্ণ আর মহিমান্বিত করে তোলার চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন, মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়ার কথা তারা ভাবতেও পারেননি।

মৃত্যুসংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে প্রাচীন সুমেরের গিলগামেশের কাহিনি। এই কাহিনির নায়ক ছিলেন উরুক রাজ্যের রাজা গিলগামেশ (King Gilgamesh of Uruk)। গিলগামেশ ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান পুরুষ, যিনি যুদ্ধে যে-কাউকে অনায়াসে পরাস্ত করতে পারতেন। একদিন গিলগামেশের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ইনকিদু মারা গেলেন। শোকে স্তব্ধ হয়ে গিলগামেশ অনেকদিন ইনকিদুর লাশের

পাশে বসে থাকলেন। একদিন ইনকিদুর লাশের নাসারন্ধ্র দিয়ে কিলবিল করে একটি পোকা বের হয়ে এলো। এই দৃশ্য দেখে গিলগামেশ প্রচণ্ড ভয় আর হতাশায় কুঁকড়ে গেলেন এবং ঠিক করলেন তিনি মৃত্যুকে জয় করবেন। অনন্তজীবন লাভ করার জন্য তিনি যে করেই হোক একটা উপায় বের করবেন। এই লক্ষ্যে গিলগামেশ যাত্রা শুরু করলেন– চষে ফেললেন সমস্ত পৃথিবী, শিকার করলেন সিংহ, লড়াই করলেন ভয়ংকর কাঁকড়াবিছে-মানবের সঙ্গে, পৌঁছে গেলেন পাতালপুরীতে। সেখানে গিয়ে তিনি পাথর দৈত্য উরশানবি আর মৃত্যুনদী পারাপারের মাঝির সঙ্গে লড়াই করে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করলেন এবং খোঁজ পেলেন প্রাচীনতম বন্যার শেষ উত্তরজীবী উটনাপিশটিমের। কিন্তু, এত কিছু করেও শেষমেশ গিলগামেশের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তিনি শূন্য হাতে, আগের মতোই মরণশীল বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু এতদিনে তিনি নতুন একটি বিষয় জেনেছেন– ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেন, তখন মৃত্যুকে তার জীবনের অনিবার্য নিয়তি হিসেবেই নির্দিষ্ট করে দেন, মানুষের উচিত এই অনিবার্য নিয়তির কথা মাথায় রেখেই সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে শেখা।

পরিবর্তনের পথের অনুসারীরা এরকম হার মেনে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত পোষণ করতে নারাজ। বিজ্ঞানের অনুসারীদের কাছে, মৃত্যু কোনো অনিবার্য পরিণতি নয় বরং একটি কৌশলগত সমস্যা। বিধাতা মৃত্যুকে নিয়তি হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বলেই মানুষ মরে না, বরং মানুষ মরে হৃদ্‌রোগ, ক্যানসার, জীবাণুসংক্রমণের মতো নানা রকম শারীরিক কৌশলগত সমস্যার কারণে। আর প্রতিটি কৌশলগত সমস্যারই একটি কৌশলগত সমাধান সম্ভব। যদি হৃদ্‌যন্ত্র সঠিকভাবে তার ক্রিয়াকর্ম না করতে পারে তবে পেসমেকার দিয়ে তার উদ্দীপনা বাড়ানো যেতে পারে বা হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। যদি শরীরে ক্যানসার-আক্রান্ত কোষ ছড়িয়ে পড়ে তবে ওষুধ প্রয়োগে বা তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বেড়ে গেলে, অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা যেতে পারে। এ কথা সত্যি, আমরা এখনো মৃত্যুর সব রকম কৌশলগত সমস্যার

সমাধান জানি না। কিন্তু আমরা ক্রমাগত সেসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের সেরা মেধাবীরা মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে তোলার কাজে ব্যস্ত নন। বরং তাঁরা রোগব্যাধি ও বার্ধক্যের শারীরিক, হরমোনগত এবং জিনগত কারণ অনুসন্ধানে নিয়োজিত। প্রতিনিয়ত তাঁরা আবিষ্কার করে চলেছেন নতুন নতুন ওষুধ, বৈপ্লবিক চিকিৎসাপদ্ধতি এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য কৃত্রিম অঙ্গ, যা আমাদের আয়ু বাড়াতে সহায়তা করছে। হয়তো, এই নিরলস প্রচেষ্টাই একদিন মানুষকে 'মৃত্যু'রূপী এই দৈত্যকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম করবে।

কিছুদিন আগেও আপনি বিজ্ঞানী বা অন্য কাউকে এ ব্যাপারে এরকম স্পষ্ট করে বলতে শোনেননি– 'মৃত্যুকে জয় করা? বললেই হলো! সে এখনো অ-নে-ক দূরের পথ! আমরা সবেমাত্র ক্যানসার, যক্ষা আর আলঝেইমার রোগের চিকিৎসা করার চেষ্টা করছি।' আজকে মানুষ মৃত্যুকে জয় করার বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চায় না এ কারণে যে, লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাদের এখনো অনেক দেরি। অনর্থক প্রত্যাশার চাপ তৈরি করে কী লাভ? আমরা এখন এমন একটা অবস্থায় আছি যখন মৃত্যু নিয়ে আমরা স্পষ্টভাবে মন্তব্য করতে পারি। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সেরা প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য হলো মানুষকে অনন্তজীবনের সন্ধান দেওয়া। যদিও মৃত্যুকে জয় করা এখনো অনেক অনেক দূরের পথ, কিন্তু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু উন্নতি করেছি, কয়েক শতক আগেও যা ছিল কল্পনার অতীত। ১১৯৯ সালে ইংল্যান্ডের সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ড (King Richard the Lionheart) একটি তির দ্বারা তাঁর কাধে আঘাত পান। এটি এখনকার ঘটনা হলে আমরা বলতাম উনি কাঁধে সামান্য চোট পেয়েছেন। কিন্তু সেই ১১৯৯ সালে অ্যান্টিবায়োটিকসের উদ্ভাবন না হওয়ায় এবং ক্ষতস্থান জীবাণুমুক্ত রাখার কোনো কার্যকর পদ্ধতি না থাকায় রাজার কাঁধের এই সামান্য চোটে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটল এবং বাসা বাঁধল গ্যাংগ্রিন। বিশ শতকের ইউরোপে শরীরে গ্র্যাংগ্রিনের বিস্তার এড়ানোর একটাই কার্যকর উপায় ছিল, সেটা হলো– আক্রান্ত স্থান কেটে শরীর থেকে বাদ দেওয়া। এক্ষেত্রে সংক্রমণটা যেহেতু কাঁধে, তাই আক্রান্ত অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়ার

কোনো উপায় থাকল না। রাজার সারা শরীরে গ্যাংগ্রিন ছড়িয়ে পড়ল এবং কেউ তাকে কোনো সাহায্য করতে পারল না। দুই সপ্তাহ পর নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে রাজার মৃত্যু হলো।

এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বের সেরা চিকিৎসকরা আক্রান্ত কোষকলার পচন প্রতিরোধ বা পচন বন্ধ করার কোনো কার্যকর উপায় জানতেন না। যুদ্ধে সৈন্যরা হাতে বা পায়ে সামান্য আঘাত পেলেই গ্যাংগ্রিনের আশঙ্কায় ডাক্তাররা নিয়মিতই আক্রান্ত পা বা হাত কেটে ফেলতেন। এই অঙ্গছেদন এবং দাঁত তুলে ফেলার মতো সেকালের প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা প্রক্রিয়াগুলো করা হতো কোনোরকম চেতনানাশক ছাড়াই। ইথার, ক্লোরোফর্ম ও মরফিনের মতো প্রথম দিককার চেতনানাশকগুলো পশ্চিমা চিকিৎসাশাস্ত্রে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের আগে আক্রান্ত সেনার অঙ্গছেদনের সময় চার জন সৈন্যকে তার হাত-পা শক্ত করে ধরে রাখতে হতো। ওয়াটারলু যুদ্ধের (১৮১৫) পরদিন সকালে যুদ্ধাহত সেনাদের সেবা দেওয়া হাসপাতালগুলোর আশপাশে আক্রান্ত সৈন্যদের কেটে ফেলা হাত ও পায়ের স্তূপ দেখা গেছে। সেকালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া কাঠমিস্ত্রি বা কসাইদেরকে প্রায়ই সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসেবা শাখায় পাঠানো হতো। কারণ, তখন ছুরি ও করাতের ব্যবহার জানাই ছিল অস্ত্রোপচার করার মূল যোগ্যতা।

ওয়াটারলু যুদ্ধের মাত্র ২০০ বছরের মধ্যেই এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যেসব অসুখ এবং জখম আগে আমাদের অবধারিত মৃত্যু ডেকে আনত, আজ ওষুধ, ইনজেকশন আর সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সহজেই আমরা এসব থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারি। এগুলো আমাদেরকে প্রতিদিনের নানা রকম ব্যাথা-বেদনা ও অসুস্থতা থেকেও রক্ষা করে, যেগুলোকে আগে মানুষ তাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবেই মেনে নিত। পুরো বিশ্বে গড় আয়ু ২৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ বছর, বর্তমানে বিশ্বের মানুষের গড় আয়ু ৬৭ বছর। উন্নত দেশে এই গড় আয়ুর মান প্রায় ৮০ বছর।[৮]

সবচেয়ে বেশি কমেছে শিশুমৃত্যুর হার। বিশ শতক পর্যন্ত, কৃষিপ্রধান সমাজগুলোতে এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ শিশু

পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করত। ডিপথেরিয়া, হাম ও গুটিবসন্ত ছিল শিশুদের জন্য সবচেয়ে প্রাণঘাতী রোগ। সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডে প্রতি হাজার জন সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে ১৫০ জনই তাদের বয়স এক বছর পূরণ হওয়ার আগেই মারা যেত, বয়স ১৫ পূরণ হওয়ার আগেই মারা যেত এক-তৃতীয়াংশ শিশু।[৯] আজকের দিনে হাজার জন শিশুর মধ্যে মাত্র পাঁচ জন এক বছর বয়সের আগেই মারা যায়, ১৫ বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যায় হাজারে মাত্র সাতজন।[১০]

এসব সংখ্যা আর পরিসংখ্যান সরিয়ে আমরা যদি কিছু গল্প বলি তাহলে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে আরেকটু স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে রাজা প্রথম এডওয়ার্ড (১২৩৭-১৩০৭) এবং তাঁর স্ত্রী রানি ইলিনরের (১২৪১-৯০) পরিবার একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। মধ্যযুগের ইউরোপে একজন শিশু যতটা যত্ন আর পরিচর্যা পেতে পারে তাঁদের সন্তানরা তার সবই পেয়েছে। তাঁরা বাস করত প্রাসাদে, তাদের ছিল খাদ্যের প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত শীতপোশাক, ঘর গরম রাখবার ফায়ারপ্লেস, পরিষ্কার পানীয় জলের জোগান এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত ছিল একগাদা দাস-দাসী ও চিকিৎসক। নিচে আমরা রানি ইলিনরের ১২৫৫ থেকে ১২৮৪ সাল পর্যন্ত জন্ম দেওয়া ১৬ জন সন্তানের ব্যাপারে জানব–

১। নামহীন কন্যাসন্তান, ১২৫৫ সালে জন্ম, জন্মের সময়ই মারা যান।

২। কন্যা ক্যাথরিন, সম্ভবত এক বছর বা তিন বছর বয়সে মারা যান।

৩। কন্যা জোয়ান, ছয় মাস বয়সে মারা যান।

৪। পুত্র জন, পাঁচ বছর বয়সে মারা যান।

৫। পুত্র হেনরি, ছয় বছর বয়সে মারা যান।

৬। কন্যা ইলিনর, ২৯ বছরে মারা যান।

৭। নামহীন কন্যা, পাঁচ মাস বয়সেই মারা যান।

৮। কন্যা জোয়ান, ৩৫ বছর বয়সে মারা যান।

৯। পুত্র আলফনসো, ১০ বছর বয়সে মারা যান।

১০। কন্যা মার্গারেট, ৫৮ বছর বয়সে মারা যান।

১১। কন্যা বারেঞ্জেরিয়া, দুই বছর বয়সে মারা যান।

১২। নামহীন কন্যা, জন্মের পরপরই মারা যান।

১৩। কন্যা ম্যারি, ৫৩ বছর বয়সে মারা যান।

১৪। নামহীন পুত্র, জন্মের পরপরই মারা যান।

১৫। কন্যা এলিজাবেথ, ৩৪ বছর বয়সে মারা যান।

১৬। পুত্র এডওয়ার্ড।

পুত্র সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এডওয়ার্ডই কেবল শৈশবের ভয়ংকর বছরগুলো পার হয়ে আসতে পেরেছেন এবং পিতার মৃত্যুর পর তিনিই দ্বিতীয় রাজা এডওয়ার্ড হিসাবে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, ব্রিটেনের রানি হিসেবে এলিনরের প্রধান কর্তব্য ছিল রাজার পুরুষ উত্তরাধিকারীর জন্ম দেওয়া, আর সেই কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে তাকে চেষ্টা করতে হয়েছে ১৬ বার।। রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের মা নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু রমণী ছিলেন। এডওয়ার্ডের স্ত্রী ফ্রান্সের ইসাবেলা অতটা ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারেননি। ৪৩ বছর বয়সি রাজাকে তিনি হত্যা করেন।[১১]

যতদূর জানা যায়, ইলিনর ও প্রথম এডওয়ার্ড স্বাস্থ্যবান দম্পতি ছিলেন এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে কোনো জন্মগত অসুস্থতা ছিল না। তা সত্ত্বেও, ১৬ জন সন্তানের মধ্যে ১০ জনই, অর্থাৎ প্রায় ৬২ শতাংশেরই মৃত্যু ঘটে শৈশবে। মাত্র ছয় জন ১১ বছরের বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল এবং এদের মধ্যে মাত্র তিন জন, অর্থাৎ কেবল ১৮ শতাংশের বয়স ৪০-এর কোঠা অতিক্রম করতে পেরেছে। জন্ম দেওয়া এই সন্তানগুলো বাদেও সম্ভবত ইলিনর আরো কয়েকবার গর্ভবতী হয়েছিলেন, গর্ভেই সেসব সন্তানের মৃত্যু হয়। গড়ে এডওয়ার্ড এবং ইলিনর প্রতি তিন বছর পর পর একে একে তাদের ১০ জন সন্তানকে হারিয়েছেন। আজকের দিনের একজন দম্পতির পক্ষে সন্তানদের এরকম মৃত্যুর স্রোত কল্পনা করাও কঠিন।

এখন প্রশ্ন, গিলগামেশের অভিযান, অর্থাৎ অমরত্বের পথে মানুষের যাত্রা সফল হতে আর কত দেরি? ১০০ বছর? ৫০০ বছর? হাজার বছর? যদি আমরা খতিয়ে দেখি ১৯০০ সালে আমরা মানবদেহ সম্পর্কে কত কম জানতাম, আর মাত্র এক শতকে আমরা মানবদেহ সম্পর্কে কত নতুন কিছু জানতে পেরেছি, সেটা হয়তো

আমাদের অমরত্বের ব্যাপারে কিছুটা হলেও আশাবাদী করে তুলতে পারে। সাম্প্রতিক কালে জিনবিজ্ঞানীরা সিনরহাবডিটিস এলিগেনস (Caenorhabditis Elegans) নামক কেঁচোজাতীয় পোকার কাঙ্ক্ষিত আয়ু প্রায় দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ১২ মানুষের ক্ষেত্রেও কি তারা তেমনটা করতে সক্ষম হবেন? ন্যানোপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা লাখ লাখ খুদে রোবটের সমন্বয়ে একটি বায়োনিক রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা তৈরি নিয়ে কাজ করছেন, যেই রোবটগুলো আমাদের শরীরে বসবাস করবে, বন্ধ হয়ে যাওয়া রক্তনালিগুলোকে সচল করবে, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করবে, ক্যানসার কোষ ধ্বংস করবে, এমনকি বুড়িয়ে যাওয়ার পদ্ধতিকেও উলটো পথে চালিত করবে।[১৩] কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ কিছু মানুষ 'অজর' হতে পারবে ('অমর' নয়, কারণ তারা দুর্ঘটনায় মারা যেতেই পারে, কোনো জরাব্যাধি তাদের আক্রান্ত করবে না, কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে তারা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবেন)।

গিলগামেশের অমরত্বের এই অভিযাত্রা সফল হোক আর না-ই হোক, ঐতিহাসিক দিক থেকে একটা চমৎকার পরিবর্তনের সূচনা কিন্তু হয়ে গেছে। অধিকাংশ উত্তর-আধুনিক ধর্ম ও ধ্যানধারণা মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের জীবনের হিসাবনিকাশ ছাড়াই গড়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতকের আগ পর্যন্ত ধর্ম ও দর্শন, মৃত্যু এবং তার পরের ঘটনাকেই অর্থপূর্ণ জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, নারীবাদের মতো অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু হওয়া ধর্ম এবং দর্শনগুলো পরজন্মের প্রতি কোনো আগ্রহ না দেখিয়েই বেড়ে উঠেছে। মৃত্যুর পর একজন কমিউনিস্টের জীবনে কী ঘটে? কী ঘটে একজন পুঁজিবাদীর জীবনে? একজন নারীবাদীর পরজন্মই বা কেমন? মার্কস, অ্যাডাম স্মিথ বা সিমন দ্য বুভেয়ারের গ্রন্থে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। আধুনিক দর্শনগুলোর মধ্যে একমাত্র জাতীয়তাবাদই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জাতির অসহায় এবং কাব্যময় মুহূর্তগুলোতে জাতীয়তাবাদ প্রতিশ্রুতি দেয় জাতির সম্মান রক্ষায় যে প্রাণ উৎসর্গ করবে, সমগ্র জাতির স্মৃতিতে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু মৃত্যুকেন্দ্রিক হলেও এই প্রতিশ্রুতি এতটাই ঠুনকো যে অনেক

সময় অনেক কট্টর জাতীয়তাবাদীও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, মৃত্যুর পর জাতির সমস্ত মানুষের স্মৃতিতে ঠাঁই করে নিয়ে তার লাভটা কোথায়।

বিজ্ঞানের রক্ষক পিতা

আমরা এখন যন্ত্রের যুগে বাস করছি। অনেকেই বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর। আমরা কেবল বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেব এবং তারা নিয়ে আসবে ধুলোকাদার পৃথিবীতে স্বর্গের সুষমা। কিন্তু বিজ্ঞান নামক প্রতিষ্ঠানটি মানুষের চেয়ে বড়ো কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সত্তার ওপর ভর করে গড়ে ওঠেনি। সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানগুলোর মতোই, সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতিগুলোই এর প্রকৃতি গড়ে তুলেছে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বড়ো অঙ্কের খরচ। মানুষের রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা বুঝতে চান যে বিজ্ঞানী তার নিদেনপক্ষে দরকার একটি গবেষণাগার, টেস্টটিউব, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এ ছাড়া গবেষণা সহকারী, বিদ্যুতের মিস্ত্রি, জলের পাইপের মিস্ত্রি, পরিচ্ছন্নতাকর্মী এসব তো আছেই। একজন অর্থনীতিবিদ যিনি একটি বাজারের ঋণের প্রকৃতি অনুধাবন করতে চান, তার অবশ্যই দরকার কম্পিউটার, বাজার-সম্পর্কিত অনেক তথ্য এবং দরকার জটিল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম। একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ যিনি প্রাচীনকালের শিকারি-সংগ্রাহকের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চান, তাঁকে বহু দূরে যাত্রা করতে হবে, খনন করতে হবে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং পুরোনো জীবাশ্ম ও জিনিসপত্রের বয়স নির্ধারণ করতে হবে। এসব কিছুর জন্যই অর্থের প্রয়োজন।

গত ৫০০ বছরে বিজ্ঞান যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করতে পেরেছে তার মূল কারণ হলো বিভিন্ন দেশের সরকার, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও দাতা সংস্থার বিজ্ঞানের গবেষণায় বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের সদিচ্ছা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে, পৃথিবীর মানচিত্র নির্মাণে এবং প্রাণিজগতের সুনির্দিষ্ট বিন্যাস

করার ব্যাপারে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, গ্যালিলিও গ্যালিলি, ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও চার্লস ডারউইন ততটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কোনো একজন বিশেষ প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর যদি জন্ম নাও হতো, অন্য সময়ে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তার সমকক্ষ মেধার একজন কেউ হয়তো জন্ম নিতেন। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের জোগান না দিলে, কোনো মেধাবীই সেটার অভাব পূরণ করতে পারতেন না। উদাহরণস্বরূপ, যদি ডারউইনের জন্ম না হতো, তাহলে বিবর্তনবাদ আবিষ্কারক হিসেবে আমরা হয়তো আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসকে কৃতিত্ব দিতাম। কারণ, তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদ আবিষ্কারের কয়েক বছর পর নিজে স্বাধীনভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলো যদি ভূগোল, প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য যথেষ্ট অর্থের বরাদ্দ না করত, তাহলে ডারউইন বা ওয়ালেস বিবর্তনের তত্ত্ব দাঁড় করানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষণলব্ধ তথ্য পেতেন না। খুব সম্ভবত, এসব তথ্য না থাকলে বিবর্তনসংক্রান্ত কোনো তত্ত্ব আবিষ্কারের কোনো চেষ্টা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

এই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কী উদ্দেশ্যে সরকারের কোষাগার আর ব্যবসায়ের তহবিল থেকে গবেষণাগার আর বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়ে যায়? প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে, অনেকেই বোকার মতো শুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চায় বিশ্বাস করে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস, সরকার ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কোনো স্বার্থ ছাড়াই মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে এই অর্থ বরাদ্দ করেন, যাতে বিজ্ঞানীরা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে গবেষণা করতে পারেন। কিন্তু, বিজ্ঞানের অর্থায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ধ্যানধারণার সঙ্গে ভীষণ রকম সাংঘর্ষিক।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা ধর্মীয় লক্ষ্য পূরণ করবে– এই আশায় বেশিরভাগ গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ষোড়শ শতকে রাজা এবং ব্যাংকারগণ নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের অভিযানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বিনিয়োগ করেছে কিন্তু মনোবিজ্ঞানের গবেষণার পেছনে একটা পয়সাও খরচ করেনি। কারণ, রাজা ও ব্যাংকারদের ধারণা ছিল, ভূগোলসংক্রান্ত নতুন জ্ঞান তাঁদের নতুন ভূখণ্ড দখল এবং নতুন

ব্যাবসায়িক কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করবে, অন্যদিকে একটি শিশুর মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারের পেছনে তাঁরা কোনো মুনাফার সম্ভাবনা দেখতে পাননি।

১৯৪০-এর দশকে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার জলজ প্রত্নতত্ত্বের চেয়ে নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা গবেষণায় বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা নিয়ে বেশি বেশি গবেষণা হলে তা তাদেরকে নতুন নিউক্লিয়ার অস্ত্র, বোমা বানাতে সহায়তা করবে, কিন্তু পানির নিচের প্রত্নতত্ত্ব তাদের যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে তেমন সাহায্য করবে না। বিজ্ঞানীরা অনেক সময়েই অর্থের জোগানদাতাদের এইসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন না; অনেক বিজ্ঞানীই বিজ্ঞানের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল থেকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যান। বিজ্ঞানের লক্ষ্য কী হবে, তা খুব কম ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করার সুযোগ পান।

যদি আমরা কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়া বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিনিয়োগ করতেও চাইতাম, তা বাস্তবে করা সম্ভবপর হতো না। তার প্রধান কারণ, আমাদের সম্পদের পরিমাণ সীমিত। একজন সংসদ সদস্যকে জাতীয় বিজ্ঞান সমিতির প্রাথমিক গবেষণা কাজের জন্য কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিন, তিনি সংগত কারণেই জিগ্যেস করবেন, এর চেয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বা একটি ডুবতে বসা কারখানার কর রেয়াতের কাজে এই অর্থ ব্যয় করলে তা কি বেশি কার্যকর হবে না? সীমিত সম্পদের বণ্টনের জন্য সব সময় আমাদের যে প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হয় তা হলো– ‘কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?’ এবং ‘কোন কাজটি কল্যাণকর?’ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় নয়। বিজ্ঞান দুনিয়াতে কী কী আছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়, কোন জিনিসটি কীভাবে কাজ করে তা জানায় এবং ভবিষ্যতের পৃথিবী কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা দেয়। সংজ্ঞানুযায়ীই, ভবিষ্যতের পৃথিবী কেমন হওয়া উচিত এই প্রশ্নটি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। ধর্ম ও দর্শনগুলোই কেবল এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে।

এখন, ধরা যাক, একই রকম পেশাদারি যোগ্যতাসম্পন্ন, একই বিভাগের জীববিজ্ঞানের দুজন অধ্যাপক তাঁদের বর্তমান গবেষণা বাবদ ১ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য আবেদন করেছেন। অধ্যাপক স্লাগহর্ন চান গোরুর একটি অসুখ নিয়ে গবেষণা করতে যে অসুখের কারণে গোরুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ১০ শতাংশ কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে অধ্যাপক স্প্রাউট বাছুরকে গোরু থেকে আলাদা করা হলে গোরু মানসিক অবসাদে ভোগে কি না তা নিয়ে গবেষণা করতে চান। অর্থের পরিমাণ যদি সীমিত হয় এবং দুটো প্রকল্পে অর্থায়ন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ না থাকে, তাহলে কোন প্রকল্পে অর্থায়ন করা উচিত?

এই প্রশ্নের কোনো বৈজ্ঞানিক উত্তর নেই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নের নানা রকম উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে। আজকের দুনিয়ার অবস্থা চিন্তা করলে প্রফেসর স্লাগহর্নের প্রকল্পে অর্থায়ন হওয়ার সুযোগ বেশি। এই কারণে নয় যে, শারীরিক অসুখ নিয়ে গবেষণা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণার চেয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক, বরং এ কারণে যে, প্রথম গবেষণা থেকে দুগ্ধ শিল্পের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিতীয় গবেষণা থেকে বেশি।

আবার ঘটনাটি যদি একটি হিন্দু সমাজে হয়, যেখানে গোরু একটি পবিত্র প্রাণী বা এমন কোনো সমাজে যেখানকার মানুষজন প্রাণীদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার, সেখানে অধ্যাপক স্প্রাউটের প্রজেক্টে অর্থায়ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যখন তিনি এমন এক সমাজে বাস করছেন যেখানে গোরুর দুধের ব্যাবসায়িক মূল্য এবং মানুষের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অন্য কোনো প্রাণীর মানসিক স্বাস্থ্যের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তখন তাকে এসব কথা মাথায় রেখেই তার গবেষণার প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তার প্রস্তাবনায় লিখতে পারেন– 'মানসিক হতাশা গাভির দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আমরা যদি গাভির মানসিক অবস্থা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা হয়তো এমন কিছু ওষুধ তৈরি করতে পারব, যা তাদেরকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করবে এবং ফলস্বরূপ ১০ শতাংশ

পর্যন্ত দুধের উৎপাদন বাড়বে। আমার ধারণা, পৃথিবীতে গাভির মানসিক ওষুধের বার্ষিক চাহিদা ২৫০ মিলিয়ন ডলার।'

বিজ্ঞান তার নিজের জন্য প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ কী তা নির্ধারণে অক্ষম। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কোন কাজে লাগানো হবে তার কোনো ধারণাও বিজ্ঞানের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেমন– বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এটা নির্ণয় করা কঠিন যে, জিন বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মানুষের কোন কাজে লাগতে পারে। এই জ্ঞান কি আমরা ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার করব, নাকি এই জ্ঞান প্রয়োগ করে বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন সুপারম্যানের জাতি তৈরি করব, নাকি এই জ্ঞান কাজে লাগাব বড়ো ওলানবিশিষ্ট গাভি উৎপাদনে? এ কথা স্পষ্ট যে একটি গণতান্ত্রিক সরকার, সমাজতান্ত্রিক সরকার, স্বৈরতান্ত্রিক সরকার বা একটি পুঁজিবাদী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এই একই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বিভিন্নভাবে তাদের নিজেদের সুবিধার অনুকূলে ব্যবহার করবে। এর কোনো ব্যবহারকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যটির চেয়ে ভালো বা খারাপ বলা যায় না।

সংক্ষেপে বলা যায়, কোন ধর্মীয় বা দর্শনের সহায়তাতেই কেবল বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটে। একটি নির্দিষ্ট মতবাদই কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে জড়িত অর্থায়নের ন্যায্যতা প্রমাণ করে। বিনিময়ে, সেই মতাদর্শ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গতিপথকে প্রভাবিত করে এবং সেই আবিষ্কার কী কাজে লাগবে তা নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং, মানুষ অন্য কোনো জায়গায় না গিয়ে কেন অ্যালামোগরডো বা চাঁদে গেল তা সঠিকভাবে বুঝতে গেলে কেবল পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী আর সমাজবিজ্ঞানীদের অর্জনের কথা জানলেই চলবে না। জানতে হবে সেসব মতাদর্শ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সম্পর্কে যারা পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানকে গড়েছে, নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাদের চলার পথ।

এই শক্তিগুলোর মধ্যে দুটো শক্তির দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার– সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদ। অনেকের মতে, বিজ্ঞান, সাম্রাজ্য এবং পুঁজির চক্রই গত ৫০০ বছর ধরে ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব। প্রথমে আমরা

দেখব বিজ্ঞান ও সাম্রাজ্য এই দুই শক্তি কীভাবে এক মোহনায় এসে মিলিত হলো, তারপর আমরা জানব এই দুজন কীভাবে পুঁজির অর্থের বিশাল বড়শিতে আটকে গেল।

অধ্যায় ১৫

বিজ্ঞান আর সাম্রাজ্যবাদের গাঁটছড়া

পৃথিবী থেকে সূর্য কত দূরে? অনেক জ্যোতির্বিদকে গলদঘর্ম করে ছেড়েছে এই প্রশ্নটা। বিশেষ করে কোপার্নিকাস যখন বললেন পৃথিবী নয়, সূর্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্র, তখন থেকে আরো বেশি করে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে সবাই। অনেক জ্যোতির্বিদ আর গণিতবিদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই দূরত্ব মাপার চেষ্টা করেছেন, আর তাঁদের উত্তরও এসেছে বিভিন্ন রকম। শেষমেশ আঠারো শতকের মাঝামাঝির দিকে একটা নির্ভরযোগ্য উপায় পাওয়া গেল। কয়েক বছর পরপর শুক্র গ্রহ পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যের জায়গাটা অতিক্রম করে। এই পথটুকু পার হতে শুক্র গ্রহের কতটুকু সময় লাগে সেটা পৃথিবীর একেক জায়গায় বসে মাপলে একেক রকম হয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কারণেই এই ভিন্নতা। এই সময়টুকুই যদি দু-তিনটা মহাদেশ থেকে মাপা যায়, তাহলেই একটু ত্রিকোণমিতি কাজে লাগিয়ে পৃথিবী আর সূর্যের দূরত্বটা নির্ভুলভাবে জানা যায়।

জ্যোতির্বিদরা আগে থেকেই জানতেন যে শুক্র গ্রহ ১৭৬১ আর ১৭৬৯ সালে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখান দিয়ে যাবে। তাই আগেভাগেই ইউরোপ থেকে চারদিকে পর্যবেক্ষণ দল পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ১৭৬১ সালে সাইবেরিয়া, উত্তর আমেরিকা, মাদাগাস্কার আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ঘটনাটা দেখা গেল। এরপর ১৭৬৯ সালে ইউরোপের বিজ্ঞানী সমাজ এই পরীক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল। এবার লোক পাঠানো হলো কানাডার উত্তরে আর ক্যালিফোর্নিয়ায় (তখন সেখানে ঘন জঙ্গল)। তবে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির (The Royal Society of London for the

Improvement of Natural Knowledge) কাছে সেটা যথেষ্ট মনে হলো না। তারা বলল, একেবারে নির্ভুল ফলাফল পেতে হলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে কাউকে যেতেই হবে।

রয়্যাল সোসাইটি সিদ্ধান্ত নিল তখনকার ডাকসাইটে জ্যোতির্বিদ চার্লস গ্রিনকে তাহিতি দ্বীপে পাঠানোর। প্রচুর অর্থ ও শ্রমসাপেক্ষ অভিযান। রয়্যাল সোসাইটি ভাবল, কেবল একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য এত কষ্ট, এত খরচ? তার চেয়ে একই অভিযানে আরো কিছু কাজ সেরে ফেলা যাক। ফলে চার্লস গ্রিনের সঙ্গে যুক্ত হলো বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আরো আট জন বৈজ্ঞানিক। দলের নেতা হিসেবে ছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোসেফ ব্যাংকস আর ড্যানিয়েল সোল্যান্ডার। সঙ্গে গেল নতুন জায়গা, মানুষ আর পশুপাখির ছবি আঁকার জন্য শিল্পীরা। আর এই পুরো অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ নাবিক ও ভূগোলবিদ ক্যাপ্টেন জেমস কুক।

এই নৌবহর ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করে ১৭৬৮ সালে। তারপর ১৭৬৯ সালে তাহিতিতে শুক্র গ্রহ পর্যবেক্ষণের পর প্রশান্ত মহাসাগরের আরো কয়েকটা দ্বীপ ঘুরে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ঘুরে আবার ইংল্যান্ডে ফেরে ১৭৭১ সালে। সঙ্গে নিয়ে আসে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও নৃতত্ত্বের প্রচুর নতুন জ্ঞান। এই নতুন জ্ঞানই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সেটা প্রশান্ত মহাসাগর নিয়ে মানুষের কল্পনায় আরেকটু রং চড়ায়, আবার অন্যদিকে পরের প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের দেয় নতুন অনুপ্রেরণা।

ক্যাপ্টেন কুকের অভিযানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটা বড়ো উপকার হয়। তখনকার দিনে প্রায় অর্ধেক মানুষই বেঁচে ফিরতে পারবে না– এমনটা জেনেই এসব দূরপাল্লার অভিযান শুরু হতো। না, কোনো দ্বীপের হিংস্র মানুষ, শত্রুদের যুদ্ধজাহাজ বা ঘরের টান– এসব কিছুই না, নাবিকদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ছিল স্কার্ভি (Scurvy) নামক এক রহস্যময় রোগ। এ রোগে আক্রান্ত মানুষ কেমন যেন হতাশ আর বিষণ্ন হয়ে পড়ে, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এরপর আস্তে আস্তে দাঁত পড়ে যায়, শরীরের নানা জায়গায় ঘা হতে থাকে, তারপর জ্বরাক্রান্ত ফ্যাকাশে শরীরের বিভিন্ন

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে হারাতে রোগী মারা যায়। ধারণা করা হয়, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রায় ২০ লাখ নাবিকের প্রাণ গেছে এই স্কার্ভিতে। এই রোগের কারণ কেউ জানত না, প্রতিকার তো নয়ই। অবশেষে আশার আলো দেখা যায় ১৭৪৭ সালে। সে বছর ব্রিটিশ চিকিৎসক জেমস লিন্ড স্কার্ভি-আক্রান্ত নাবিকদের ওপর একটা পরীক্ষা চালান। সে পরীক্ষায় রোগীদের কয়েকটা দলে ভাগ করে একেক দলের ওপর একেক রকমের ওষুধের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত যে দলের রোগীরা টিকে গেল, দেখা গেল তাদের খাওয়ানো হয়েছে লেবুজাতীয় ফল। স্কার্ভির ওষুধ হিসেবে লেবুর কার্যকারিতার কথা লোকমুখে শোনা যেত। সেই লেবু-খাওয়া রোগীরা বেশ দ্রুতই সেরে ওঠে। লিন্ড জানতেন না লেবুর ঠিক কোন উপাদানটা স্কার্ভি সারায়, যদিও আমরা এখন জানি জিনিসটা হলো ভিটামিন সি। তখনকার দিনে দীর্ঘ যাত্রায় জাহাজে খাবার হিসেবে নেওয়া হতো বিস্কুট আর শুকনো মাংস। ফল আর সবজি বলতে কিছুই নেওয়া হতো না জাহাজে, যার ফলে নাবিকদের শরীরে দেখা যেত ভিটামিন সি-এর অভাব।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী লিন্ডের পর্যবেক্ষণ না মানলেও জেমস কুক মেনেছিলেন ঠিকই। লিন্ডের পর্যবেক্ষণ ঠিক কি না, সেটা প্রমাণের দায়িত্ব তুলে নেন তিনি। তাঁর নৌবহরে তিনি খাবার হিসেবে প্রচুর পরিমাণে সয়ারক্রট (Sauerkraut– গাঁজানো বাঁধাকপি কুচি, অনেকটা আচারের মতো) নিয়ে যান। আর নাবিকদের নির্দেশ দিয়ে রাখেন কখনো ডাঙায় নামলেই বেশি করে ফল আর সবজি খেয়ে নিতে। সেই অভিযানে একজন নাবিকও স্কার্ভিতে মারা যায়নি। এরপর থেকে সব জাহাজে খাবারের ধরন পালটে যায়। ক্যাপ্টেন কুকের পথ অনুসরণ করায় বেঁচে যায় অন্য অগণিত নাবিক ও যাত্রীর প্রাণ।[১]

তবে এটাই সব নয়, ক্যাপ্টেন কুকের এই অভিযানের একটা অন্ধকার দিকও আছে। কুক শুধু একজন দক্ষ নাবিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তাও। রয়্যাল সোসাইটি এই অভিযানে টাকা দিলেও জাহাজ কিন্তু দিয়েছিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীই। সেই অভিযানে নাবিক ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ছিল ৮৫

জন সশস্ত্র নৌসেনা, আর জাহাজে ছিল প্রচুর কামান-বন্দুক আর গোলাবারুদ। এই অভিযানে পাওয়া ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্যের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব যতটা ছিল, রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব তার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। স্কার্ভির কার্যকর চিকিৎসা আবিষ্কার হওয়াতে ওই সব দূর সাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ আরো দৃঢ় হলো। এরপর তারা আরো দূরে, একেবারে পৃথিবীর উলটো দিকেও সেনাবাহিনী পাঠাতে শুরু করল। কুক নিজেই তাঁর 'আবিষ্কৃত' অনেকগুলো দ্বীপ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এনেছেন, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অস্ট্রেলিয়া। কুকের অভিযানের মাধ্যমেই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আর তাসমানিয়ার দখল প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর আস্তে আস্তে ইউরোপের মানুষ সেখানে উপনিবেশ তৈরি করে আর সেখানকার আদি অধিবাসী ও তাদের সংস্কৃতিকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়।[২]

এই অভিযানের ১০০ বছরের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের প্রায় সবটুকু চাষযোগ্য মাটি দখলদার ইউরোপীয় মানুষদের হাতে চলে যায়। সেখানকার আদিবাসীদের ৯০ শতাংশই প্রাণ হারায়, আর বাকিরা সেই বর্ণবিদ্বেষী সমাজে কোনোমতে টিকে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠী আর নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের যে ক্ষতি সে সময় হয়েছে, সেটা তারা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

তবে তাসমানিয়ার আদিবাসীদের পরিণতি হয় সবচেয়ে করুণ। ওই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাতে ১০ হাজার বছর ধরে যারা টিকে ছিল, কুকের অভিযানের মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে তাদের একেবারে শেষ মানুষটাও মারা যায়। ইউরোপীয় দখলদাররা প্রথমে দ্বীপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশটা দখল করে সেখান থেকে আদিবাসীদের তাড়িয়ে দেয়। আদিবাসীদেরকে পশুর মতোই শিকার করত তারা। তারপর শেষ কিছু মানুষকে কোণঠাসা করে আটকে রাখা হয় বন্দিশিবিরে। সেখানে তাদেরকে 'সভ্য মানুষ' বানানোর চেষ্টা করা হয়। সেখানে ধর্মপ্রচারকেরা তাদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেয়, তাদেরকে লেখাপড়া শেখানো হয়, সেলাই করা আর চাষবাসের মতো 'কাজের কাজ' শেখানোরও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তারা সে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ধীরে

ধীরে সেই শেষ কজন আদিবাসী বিষণ্ন মানুষ জীবনের প্রতি সব রকম আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, এমনকি সন্তান নেওয়াও বন্ধ করে দেয়। এই সভ্য জগতের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ আর প্রগতির হাত থেকে বাঁচতে একমাত্র খোলা পথটাই তারা বেছে নেয়– মৃত্যু।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এই মানুষগুলোকে মৃত্যুর পরেও শান্তি দেয়নি। তাসমানিয়ার সর্বশেষ আদিবাসীদের মৃতদেহগুলোও চলে যায় নৃতাত্ত্বিক আর জাদুঘরের লোকদের কাছে। সেসব দেহ কাটাছেঁড়া করে, দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আর ওজন মেপে সেসব তথ্য দিয়ে ভারী ভারী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখা হয়। তারপর তাদের কঙ্কালগুলোর জায়গা হয় বিভিন্ন জাদুঘরে আর প্রদর্শনীতে। শেষমেশ ১৯৭৬ সালে তাসমানিয়ার জাদুঘর সর্বশেষ জীবিত আদিবাসী ট্রুগানিনির (Truganini) কঙ্কাল মৃত্যুর ১০০ বছর পর সমাহিত করে। তার চামড়া ও চুলের কিছু নমুনা ব্রিটেনের শৈল্য চিকিৎসা কলেজে (The English Royal College of Surgeons) ২০০২ সাল পর্যন্ত ছিল।

কুকের অভিযানকে আসলে কী বলা যায়? সেনা-প্রতিরক্ষা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অভিযান? নাকি কয়েকজন বিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে সামরিক অভিযান? প্রশ্নটা আধাগ্লাস পানি দেখিয়ে গ্লাসটা অর্ধেক ভরা না অর্ধেক খালি জানতে চাওয়ার মতোই। দুটোই ঠিক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ– এ দুটো আসলে অবিচ্ছেদ্য। একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করা যায় না। ক্যাপ্টেন জেমস কুক কিংবা উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোসেফ ব্যাংকস– দুজনের কেউই পারেননি। ট্রুগানিনিও নয়।

কেন ইউরোপ?

এই যে উত্তর আটলান্টিকের একটা দ্বীপের কিছু মানুষ গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণের একটা বড়ো দ্বীপ দখল করে নিল– এটা মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটা। কুকের অভিযানের খুব বেশি আগের কথা না, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আর পশ্চিম ইউরোপ ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে দূরের একটা বৈশিষ্ট্যহীন এলাকা। আর ইউরোপের ইতিহাসের শুরুর দিককার যে

পরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্যের কথা আমরা বলি, সে সাম্রাজ্যও নিজের সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সব সম্পদই ছিল উত্তর আফ্রিকা, বলকান আর মধ্যপ্রাচ্য থেকে লুট করে আনা। রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের অবস্থা ছিল খুবই করুণ– অনেকটা আমরা যে বুনো পশ্চিমের কথা বলি, তেমন। কিছু খনি আর দাস ছাড়া সে অঞ্চল আর কিছুই দিতে পারেনি রোমান সভ্যতাকে। আর উত্তর ইউরোপ ছিল একটা বিরানভূমি, জয় করে নেওয়ার মতো কিছুই ছিল না সেখানে।
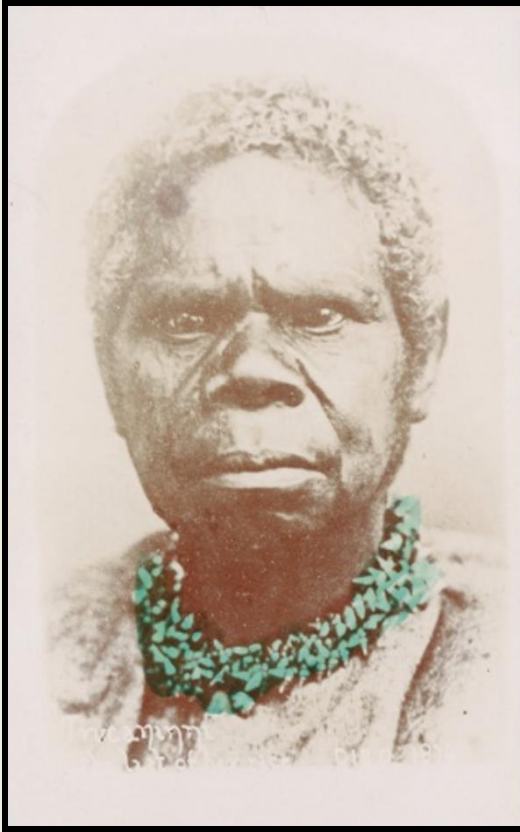
৩৫। তাসমানিয়ার সর্বশেষ আদিবাসী মানুষ ট্রুগানিনি

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এসে ইউরোপ সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ১৫০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যকার সময়টাতে ইউরোপ বলতে গেলে বাইরের পৃথিবীর মালিক বনে গেল। দুই আমেরিকা মহাদেশ আর মহাসাগরগুলোর ওপর তখন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। তার পরও, শক্তির তুলনায় ইউরোপ এশিয়ার ধারেকাছেও ছিল না। ইউরোপ দুই আমেরিকা আর সাগরগুলো দখল করতে পেরেছিল, কারণ এশিয়ার মানুষ ওগুলো দখল করার কোনো চেষ্টাই করেনি। আধুনিক যুগের শুরুর দিকে ভূমধ্যসাগরে অটোমান সাম্রাজ্য, পারস্যে সাফাভিদ সাম্রাজ্য, ভারতে মোগল সাম্রাজ্য আর চীনে মিং আর চিং সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ চলছিল। এদের প্রত্যেকটাই যার যার সীমানা বাড়িয়ে যাচ্ছিল। ১৭৭৫ সালে সারা পৃথিবীর সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শতকরা ৮০ ভাগই হতো এশিয়ায়। শুধু ভারত আর চীনে যে পরিমাণ সম্পদের উৎপাদন হতো সেটাই ছিল পুরো পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ। এর তুলনায় ইউরোপের অর্থনীতি ছিল নস্যি।[৩]

অথচ ১৭৫০ থেকে ১৮৫০– এই ১০০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর ক্ষমতার কেন্দ্র সরে গেল ইউরোপে। এই সময়ে ইউরোপের মানুষ একের পর এক যুদ্ধে এশিয়ার পরাশক্তিগুলোকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেছে। এশিয়ার অনেকখানি এলাকা চলে গেল ইউরোপের দখলে। ১৯০০ সালের মধ্যেই ইউরোপ পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমি আর অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫০-এর মধ্যে দেখা গেল, পশ্চিম ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্র মিলে পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদ উৎপাদন করছে। ওদিকে চীনের উৎপাদন কমতে কমতে ৫ শতাংশে এসে ঠেকল।[৪] ইউরোপের অধীনে পৃথিবীর ক্ষমতার বণ্টন আর সংস্কৃতি আমূল বদলে গেল। আজকের পৃথিবীতেই তো আমরা দেখতে পাই, প্রায় সব মানুষই ইউরোপীয়দের মতো পোশাক পরে, তাদের মতো চিন্তা করে। আজকের যে মানুষদের কথায় প্রবল ইউরোপবিদ্বেষ প্রকাশ পায়, দেখা যায় তারাও পৃথিবীটাকে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখে। রাজনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সামরিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে বর্তমান অবস্থায় এনেছে ইউরোপ। নানা দেশের

সংগীতে ইউরোপীয় সুরের প্রভাব লক্ষণীয়। আর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে যেসব ভাষা এখন চলছে তার সবই তো ইউরোপের। এই যে চীনের অর্থনীতি আজ বিরাট আকার নিচ্ছে, হয়তো আগামী দিনের পৃথিবীটা তাদেরই হবে, কিন্তু সে অর্থনীতির উৎপাদন থেকে অর্থায়ন– সবকিছু গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় মডেলেই।

ইউরেশিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্বল অংশটার মানুষ কীভাবে পুরো পৃথিবীর দখল নিয়ে নিল? এর জন্য সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিতে হবে ইউরোপের বিজ্ঞানীদেরকেই। স্বীকার না করে উপায় নেই, ১৮৫০-এর পর থেকে ইউরোপের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির পেছনে আছে তাদের সামরিক দক্ষতা, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশ এবং অবশ্যই তাদের প্রযুক্তির উন্নয়ন। আজকের যুগে সব দেশই প্রযুক্তির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোযোগ দিচ্ছে। এসব গবেষণার প্রায় সবটাই চলছে নতুন অস্ত্র তৈরি করতে, নতুন নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করতে কিংবা সাম্রাজ্যবাদের হাতকে আরো শক্তিশালী করার নতুন কোনো কৌশল সৃষ্টি করতে। আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে যখন ইউরোপের মানুষের যুদ্ধ চলছিল, তখন তারা একটা কথা প্রায়ই বলত, 'শত্রু যেদিক থেকেই আসুক, আমাদের আছে মেশিনগান, ওদের তো সেটা নেই।' বেসামরিক প্রযুক্তির উন্নতিও তখন কম হয়নি। সৈন্যদের খাওয়ানোর জন্য খাবার টিনে ভরা শুরু হলো, সৈন্যদের যাতায়াতের জন্য রেললাইন বসল, বড়ো বড়ো জাহাজ ভাসল সাগরে, আহত সৈন্যদের জন্য উন্নত চিকিৎসা আর ওষুধ আবিষ্কার হলো। আফ্রিকা দখল করার পেছনে এসবের অবদান কিন্তু মেশিনগানের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

১৮৫০ সালের আগে যুদ্ধ-শিল্প-বিজ্ঞান– এই তিন দিকের কোনোটাতেই মানুষ খুব একটা উন্নতি করতে পারেনি। উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা মানুষ তখনো নিতে পারেনি, তাই ইউরোপ, আফ্রিকা আর এশিয়ার মধ্যে শক্তির পার্থক্য খুব বেশি ছিল না। আবার ১৭৭০ সালের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, ক্যাপ্টের কুক সামরিক শক্তিতে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু একই রকম শক্তি নিয়েও তখনকার চীন সাম্রাজ্যের ক্যাপ্টেন ওয়ান ঝেংসি কিংবা অটোমান সাম্রাজ্যের ক্যাপ্টেন হুসেন পাশা কেন অস্ট্রেলিয়া

দখল করেননি? তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, ১৭৭০ সালে যে ইউরোপ প্রযুক্তির দিক থেকে মুসলিম, ভারতীয় বা চৈনিক সভ্যতার কাছাকাছি ছিল, পরের ১০০ বছরের মধ্যেই তারা এতটা এগোল কীভাবে?

যুদ্ধ-শিল্প-বিজ্ঞানের এই যৌথ বিকাশ ভারতে না হয়ে ইউরোপেই কেন হলো? ব্রিটেন এগিয়ে যাওয়ার পরপরই ফ্রান্স, জার্মানি আর যুক্তরাষ্ট্রও এগোতে শুরু করল, চীন পিছিয়ে থাকল কেন? যখন রাশিয়া, ইতালি আর অস্ট্রিয়া শক্তির পার্থক্যটা কমিয়ে আনছিল, তখন ইরান, মিশর আর অটোমান সাম্রাজ্য কোথায় ছিল? শিল্পবিপ্লবের প্রথম ধাপে যেসব প্রযুক্তি এসেছিল সেগুলো তো খুব জটিল ছিল না, তাহলে চৈনিক বা অটোমান প্রকৌশলীরা বাষ্প ইঞ্জিন, মেশিনগান আর রেলগাড়ির মতো কিছু আবিষ্কার করতে পারল না কেন?

বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক রেলপথ চালু হয় ব্রিটেনে, ১৮৩০ সালে। ১৮৫০ সালের মধ্যে পশ্চিমা দেশগুলো প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার রেললাইনে ছেয়ে গেল, অথচ এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার মোট রেললাইনের দৈর্ঘ্য ছিল বড়োজোর ৪ হাজার কিলোমিটার। ১৮৮০ নাগাদ পশ্চিমের মোট রেললাইন হলো সাড়ে ৩ লাখ কিলোমিটার, আর বাকি পৃথিবীতে ৩৫ হাজার কিলোমিটার। এর বেশিরভাগই ছিল ভারতে, আর সেটাও ব্রিটিশদেরই তৈরি।[৫] চীনে প্রথম রেললাইন বসে ১৮৭৬ সালে। মাত্র ২৫ কিলোমিটার লম্বা, এবং ইউরোপীয়দের দ্বারাই তৈরি। অবশ্য পরের বছরই চীন সরকার সেটা নষ্ট করে ফেলে। ১৮৮০ সালে চীনে রেলপথ বলতে কিছু ছিলই না। ইরানের প্রথম রেলপথ তৈরি হয় তেহরান আর সেখান থেকে কিলোমিটার দশেক দূরের একটা শহরের মধ্যে। সেটা ১৮৮৮ সালের কথা। এটাও তৈরি করেছিল বেলজিয়ামের একটা প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালে ব্রিটেনের চেয়ে আকারে সাত গুণ বড়ো দেশ ইরানের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র আড়াই হাজার কিলোমিটার।

চীন আর ইরানের মানুষের বাষ্প ইঞ্জিন তৈরি করার মতো প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছিল না, তা কিন্তু নয়। অন্তত ব্রিটিশদেরটা দেখে তৈরি করা যেত, অথবা তাদের কাছ থেকে কিনেও তো আনা যেত।

কিন্তু এভাবে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশ সমাজের যেসব মূল্যবোধ, মিথ, বিচারব্যবস্থা বা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভূমিকা রেখেছে, চীন বা ইরানে তখন সেগুলো ছিল না। এগুলো তো আর অন্যেরটা দেখে তৈরি করা যায় না। ফ্রান্স আর যুক্তরাষ্ট্র তাল মিলিয়ে এগোতে পেরেছে, কারণ তাদের সমাজ কাঠামো ব্রিটিশদের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। চীন আর ইরান সেটা পারেনি, কারণ তাদের সমাজের বিকাশ হয়েছে অন্যরকমভাবে।

এই কারণ দেখিয়ে ১৫০০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত সময়টাকে অনেকটা বোঝা যায়। এই সাড়ে ৩০০ বছরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক বা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে ইউরোপ এশিয়ার চেয়ে খুব বেশি এগিয়ে না থাকলেও সম্ভাবনাটা তৈরি হয়েছে তখনই। এর ফলাফলটা হঠাৎ করে দেখা গেছে ১৮৫০ এর পরে। ১৭৫০ সালের ইউরোপ, চীন আর মুসলিম বিশ্বকে সমশক্তিসম্পন্ন মনে হলেও আসলে তা নয়। ধরুন, দুজন মিস্ত্রি দুটো টাওয়ার বানাচ্ছে। একজন বানাচ্ছে কাঠ আর মাটি দিয়ে, অন্যজন ইস্পাত আর কংক্রিট দিয়ে। শুরুতে দেখা যাবে দুজনেরই কাজ সমানভাবে এগোচ্ছে। কিন্তু একটা সময়ে এসে প্রথম মিস্ত্রি কাজ থামাতে বাধ্য হবে, কারণ বড়ো টাওয়ার তৈরির ক্ষমতা মাটি আর কাঠের নেই। অথচ দ্বিতীয় মিস্ত্রির কাজ এগিয়ে যাবে তরতর করে।

কীসের জোরে ইউরোপ একেবারে শুরুতেই বাকি পৃথিবীর দখল নিয়ে নিল? যে সম্ভাবনাটা প্রথমে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, সেটা কী ছিল? এই প্রশ্নের দুরকম উত্তর পাওয়া যায়– একটা হলো আধুনিক বিজ্ঞান, অন্যটা পুঁজিবাদ। ইউরোপীয়দের চিন্তা আর আচরণে বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ পড়েছে এই অগ্রগতি শুরু হওয়ার অনেক আগে। তাই যখন তাদের হাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি আসা শুরু হলো, সেগুলোকে কাজে লাগাতে তাদের সময় লেগেছে অনেক কম। ইউরোপীয় সাম্রাজ্য যে একুশ শতকের পৃথিবীর বিজ্ঞান আর পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেটা মোটেই কাকতালীয় ব্যাপার নয়। সেই দুনিয়াজোড়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্য আজ নেই, কিন্তু বিজ্ঞান আর পুঁজিবাদের বিস্তার কিন্তু থেমে নেই। পুঁজিবাদের ব্যাপারে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে, আপাতত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ

আর আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্কটা আরেকটু ভালোভাবে দেখা যাক।

জয়ের তাড়না

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের হাত ধরেই। হ্যাঁ, এর মধ্যে গ্রিস, চীন, ভারত আর মুসলিমদের প্রচুর অবদান আছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান তার বর্তমান অবস্থায় এসেছে স্পেন, পর্তুগাল, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া আর নেদারল্যান্ডের সাম্রাজ্য-বিস্তারের মাধ্যমেই। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের শুরুর দিকে চৈনিক, ভারতীয়, মুসলিম, আমেরিকান আর পলিনেশীয়দের সবাই অনেক কাজ করেছে। অ্যাডাম স্মিথ আর কার্ল মার্কস– দুজনেই মুসলিম অর্থনীতিবিদদের লেখা পড়েছেন। আমেরিকার আদিবাসী চিকিৎসকদের চিকিৎসাপদ্ধতি অনেক ইংরেজি বইয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। পলিনেশীয়দের সংগৃহীত অনেক তথ্য পশ্চিমা নৃতত্ত্বের বইয়ে পাওয়া যায়। এতদিন ধরে যারা সারা পৃথিবীর সংগৃহীত জ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা তৈরি করল তারাই বিংশ শতকের মাঝামাঝির দিকে পুরো পৃথিবী শাসন করতে লাগল। বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীও বেরিয়ে এলেন তাদের মধ্য থেকেই। প্রাচ্যে আর মুসলিম বিশ্বেও জ্ঞানী মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু ১৫০০ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এসব এলাকা থেকে এমন কিছু আবিষ্কার হয়নি, যা পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের কিংবা জীববিজ্ঞানে ডারউইনের অবদানের ধারে কাছে যেতে পারে।

এখান থেকে কেউ যেন না ভাবে যে ইউরোপীয়রা জন্মগতভাবেই বিজ্ঞানমনস্ক বা তাদের জিনের ভেতরেই এটা আছে। আবার এমনও নয় যে তারাই চিরকাল বিজ্ঞানের হাল ধরে থাকবে। ইসলাম ধর্ম যেমন শুরু হয়েছিল আরবদের মধ্যে কিন্তু পরে তুর্কি আর পারসিকদের হাতে চলে গেছে, ঠিক তেমনি বিজ্ঞানের শুরুটা ইউরোপে জোরেশোরে হলেও আজ সেটা সব জাতির মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে।

আধুনিক বিজ্ঞান আর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনটা তৈরি হলো কীভাবে? ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে প্রযুক্তি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আধুনিক যুগের শুরুতে ততটা ছিল না। কিন্তু নতুন নতুন গাছপালা খুঁজে বেড়ানো একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর নতুন নতুন দেশ খুঁজে বেড়ানো একজন নাবিকের চিন্তাধারা ছিল একই রকম। 'ওখানে কী আছে আমি এখনো জানি না'– এই কথাটায় তারা দুজনেই যার যার জায়গা থেকে একমত। তাই নতুন একটা জায়গায় যাওয়ার তাড়নাটা কারো মধ্যে কম ছিল না। নতুন কিছু জানার এই আগ্রহই আস্তে আস্তে পুরো পৃথিবীটাকে তাদের অধীনে এনে দিল।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসের অন্য সব সাম্রাজ্যবাদ থেকে আলাদা। এর আগে যারা সাম্রাজ্যবিস্তার করেছে তারা ধরেই নিত তারা পৃথিবীটাকে পুরো জেনে ফেলেছে। তারা কেবল নিজেদের মতাদর্শ অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আরবরা কিন্তু অজানাকে জানার আশায় মিশর, স্পেন বা ভারত জয় করেনি। রোমান, মোঙ্গল আর অ্যাজটেকরা নতুন জায়গা জয় করেছে শুধু ক্ষমতা আর সম্পদের জন্য। কিন্তু ইউরোপের মানুষ দূর দূরান্তে যাত্রা করেছে শুধু নতুন জায়গা খুঁজতে নয়, অজানাকে জানার জন্যও।

এমন চিন্তাধারা শুধু জেমস কুকের একারই নয়, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় আর পর্তুগিজ নাবিকদের মধ্যেও ছিল। পর্তুগিজ রাজপুত্র হেনরি (Prince Henry the Navigator) আর নাবিক ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার তীর ধরে যাত্রায় অনেক দ্বীপ আর উপকূল জয় করেছেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা 'আবিষ্কার' করার পরপরই সেখানে স্পেনের রাজার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান নতুন একটা পথ আবিষ্কার করে ফিলিপিন্সে পৌঁছে সেখানে স্পেনীয় উপনিবেশ তৈরি করেন।

এরপর যত দিন গেল, ততই জ্ঞানার্জনের অভিযান আর জয়ের অভিযান আরো বেশি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। অষ্টাদশ আর ঊনবিংশ শতকে ইউরোপ থেকে যতগুলো সামরিক অভিযান শুরু হয়েছে তার প্রায় প্রতিটাতেই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নেওয়া হতো। যুদ্ধ করার জন্য নয়, নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন যখন মিশর আক্রমণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ১৬৫ জন

পণ্ডিতও ছিলেন। সেই পণ্ডিতদের হাত ধরেই শুরু হলো 'মিশরবিদ্যা' (Egyptology) নামক জ্ঞানের এক নতুন ধারা। ধর্ম, ভাষাবিজ্ঞান আর উদ্ভিদবিদ্যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তাঁরা।

১৮৩১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল, ফকল্যান্ড ও গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের মানচিত্র তৈরি করতে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজ এইচএমএস বিগল রওনা হয়। যুদ্ধের আগাম প্রস্তুতির জন্য ওখানে কোথায় কী আছে জানা দরকার ছিল। সে জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন শৌখিন বিজ্ঞানী। তিনি সঙ্গে করে একজন ভূগোলবিদকে নিয়ে যেতে চাইলেন, নতুন যেসব ভূখণ্ড সামনে আসতে পারে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখার জন্য। কয়েকজন ভূগোলবিদ তাঁর আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার পর তিনি গিয়ে ধরলেন ক্যামব্রিজ থেকে পাস করা এক ২২ বছরের যুবককে। যুবকের নাম চার্লস ডারউইন। ডারউইন গির্জার পাদরি হওয়ার জন্য পড়াশোনা করলেও বাইবেলের চেয়ে ভূতত্ত্বেই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। ক্যাপ্টেনের আমন্ত্রণে রাজি হলেন ডারউইন, এর পরেরটুকু তো ইতিহাস। জাহাজের ক্যাপ্টেন যখন সমুদ্রের মানচিত্র তৈরি করছিলেন, তখন ডারউইন তাঁর নিজের জোগাড় করা তথ্য-উপাত্ত নিয়ে নতুন তত্ত্ব দাঁড় করাচ্ছিলেন, পরবর্তীতে যা বিবর্তনতত্ত্ব নামে পরিচিত হয়।

১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নিল আর্মস্ট্রং আর বাজ অলড্রিন চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। এই চন্দ্রাভিযানের কয়েক মাস আগে থেকেই অ্যাপোলো ১১-এর যাত্রীরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমের এক মরুভূমিতে। সেখানে তখন কিছু আদিবাসীর বসবাস ছিল। ওখানকার এক বাসিন্দার সঙ্গে নভোচারীদের কিছু কথাবার্তা হয়েছিল বলে শোনা যায়।

একদিন প্রশিক্ষণের সময় নভোচারীদের সঙ্গে এক আদিবাসী বৃদ্ধের দেখা হয়। বৃদ্ধ নভোচারীদের কাছে জানতে চাইলেন তাঁরা ওখানে কী করছেন। উত্তরে তাঁরা বললেন কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা চাঁদে যাবেন। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাঁদেরকে একটা কাজ করে দিতে অনুরোধ করলেন।

'কী কাজ?' জানতে চাইলেন নভোচারীরা।

‘আমাদের গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে দেবতারা চাঁদে থাকেন। তাই ভাবছি আপনাদের দিয়ে তাঁদের কাছে একটা বার্তা পাঠানো যায় কি না।’

‘বলুন, কী আপনার বার্তা?’

বৃদ্ধ তাঁর নিজের ভাষায় কিছু একটা বলে সেটা নভোচারীদের দিয়ে কয়েকবার বলিয়ে নিশ্চিত করলেন যে তাঁদের সেটা মুখস্থ হয়েছে।

‘এর অর্থ কী?’ জানতে চাইলেন একজন।

‘সেটা তো বলা যাবে না। এটা আমাদের গোপন ভাষা, শুধু আমরা জানি আর দেবতারা জানেন।’

নভোচারীরা ক্যাম্পে ফিরে ওই অনেক খুঁজে ওই ভাষা বুঝতে পারে এমন একজনকে খুঁজে বের করলেন। তাকে বৃদ্ধের শিখিয়ে দেওয়া কথাটা অনুবাদ করে দিতে বললে লোকটা হাসতে শুরু করে। হাসি থামলে লোকটা তাঁদের কথাটা বুঝিয়ে দেয়। এত কষ্ট করে তাঁরা যে কথাটা মুখস্থ করে এসেছেন, তার অর্থ হলো, ‘এরা যা বলছে তার একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না, এরা আসলে তোমাদের দেশ দখল করতে এসেছে।’

ফাঁকা মানচিত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে আঁকা মানচিত্র দেখলে এই ‘আবিষ্কার এবং জয়’ করার ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা যায়। এই আধুনিক যুগ আসার অনেক আগে থেকেই পৃথিবীর নানা জায়গার মানুষ মানচিত্র এঁকেছে। তবে তাদের কেউই পুরো পৃথিবীর কোথায় কী আছে জানত না। আফ্রো-এশিয়া এলাকার মানুষ আমেরিকার কথা জানত না, আমেরিকার মানুষ আফ্রো-এশিয়া অঞ্চলের কথা জানত না। তাই তাদের মানচিত্রের অজানা অংশটুকু হয় থাকতই না, নয়তো সেখানে কাল্পনিক কোনো কিছুর ছবি আঁকা থাকত। মানচিত্রে কোনো জায়গা ফাঁকা থাকত না। তাই সেটা দেখে মনে হতো পৃথিবীর কোথায় কী আছে সবটাই তাদের জানা।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মানুষেরা যেসব মানচিত্র এঁকেছিল সেগুলোতে অনেক ফাঁকা জায়গা দেখা যেত। এর

মধ্যে একদিকে যেমন তাদের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারাও ফুটে ওঠে। এসব মানচিত্রের ফাঁকা জায়গাগুলো প্রমাণ করে, ইউরোপীয়রা পৃথিবীর সবটুকু তখনো দেখেনি।

১৮৯২ সালে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস তখন স্পেন থেকে পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার জন্য পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। তিনি তখনো পুরোনো অসম্পূর্ণ মানচিত্রকেই ঠিক জানতেন। সেই মানচিত্র অনুযায়ী তিনি হিসাব করে বের করলেন, জাপান স্পেন থেকে প্রায় ৭ হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে। কিন্তু আসলে দূরত্বটা ২০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি, আর মাঝখানে রয়েছে একটা বিরাট ভূখণ্ড যেটার কথা তখনো কেউ জানত না। ১৪৯২-এর ১২ অক্টোবর দুপুর ২টার দিকে কলম্বাসের নৌবহর সেই ভূখণ্ডে পৌঁছায়। বহরের 'পিন্টা' নামের জাহাজের মাস্তুল থেকে নাবিক হুয়ান রদ্রিগেজ বার্মেজো একটা দ্বীপ দেখে 'ডাঙা! ডাঙা!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। সেই দ্বীপটাকে আজ আমরা বাহামা নামে জানি।

কলম্বাসের ধারণা ছিল ওটা পূর্ব এশিয়ার কোনো দ্বীপ। তিনি ওই দ্বীপের মানুষদের বললেন 'ইন্ডিয়ান', কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল জায়গাটা হচ্ছে 'ইন্ডিজ'– যাকে আমরা এখন ইস্ট ইন্ডিজ বা ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ বলি। কলম্বাস তাঁর বাকি জীবন এই ভুলের মধ্যেই কাটিয়েছেন। তিনি যে একেবারে নতুন একটা মহাদেশ খুঁজে পেয়েছেন সেটা তাঁর বা তাঁর সময়ের লোকেদের মাথাতেই আসেনি। হাজার হাজার বছর ধরে চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, এমনকি ধর্মগ্রন্থগুলোও শুধু ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকার কথাই বলে এসেছে। বাইবেল কি আর অর্ধেকটা পৃথিবীর কথা বেমালুম বাদ দিয়ে দিতে পারে? ধরুন ১৯৬৯ সালে চাঁদের দিকে পাঠানো অ্যাপোলো ১১ গিয়ে নামল পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরে চলা অন্য একটা উপগ্রহে যেটা কেউ এতদিন দেখেইনি। তারা কি বুঝতে পারত যে ওটা চাঁদ নয়? মধ্যযুগের মানুষ কলম্বাসের ধারণা ছিল পৃথিবীর সবটাই তাঁর চেনা, যদিও তিনি নিজেই একটা আস্ত অজানা মহাদেশ আবিষ্কার করে বসে আছেন!

ইতালির নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci) ১৪৯৯ থেকে ১৫০৪ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার আমেরিকা

অভিযানে যান। ১৫০২ আর ১৫০৪ সালে এসব অভিযান নিয়ে ইউরোপে প্রকাশিত দুটি লেখায় ভেসপুচির কথা বলা হয়। সেখানে বলা হয়, কলম্বাস যে নতুন দেশটা আবিষ্কার করেছেন সেটা পূর্ব এশিয়া তো নয়ই, বরং সেটা নতুন একটা মহাদেশ যার কথা তখনকার কোনো ভূগোলবিদ জানতেন না, কোনো ধর্মগ্রন্থেও নেই। এই লেখায় প্রভাবিত হয়ে ১৫০৭ সালে প্রসিদ্ধ মানচিত্র-আঁকিয়ে মার্টিন ওয়াল্ডসিমুলার (Martin Waldseemüller) পৃথিবীর একটা নতুন মানচিত্র আঁকেন। ইউরোপ থেকে পশ্চিমে গেলে মানুষ যেখানে পৌঁছায়, ওয়াল্ডসিমুলারের মানচিত্রে প্রথমবারের মতো সেটাকে একটা আলাদা মহাদেশ হিসেবে দেখানো হয়। এখন মানচিত্রে যেহেতু জায়গাটা দেখানো হয়েছে, তখন তার একটা নাম তো দেওয়া লাগে। ওয়াল্ডসিমুলার জানতেন যে জায়গাটা আমেরিগো ভেসপুচির আবিষ্কার, তাই তিনি জায়গাটার নাম দিয়ে দিলেন 'আমেরিকা'। তাঁর সেই মানচিত্র সারা পৃথিবীতে অনেক জনপ্রিয়তা পায়, অন্যান্য মানচিত্র-আঁকিয়েরা সেটা থেকেই আরো মানচিত্র আঁকে। তাই নতুন মহাদেশের আমেরিকা নামটাই টিকে গেল। পৃথিবীর ভূখণ্ডের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ, সাত মহাদেশের মধ্যে দুটোর নামকরণ হলো এমন একজন স্বল্প-পরিচিত ইতালীয় নাবিকের নামে, যার মধ্যে 'জানি না' বলার মতো সাহসটুকু ছিল।

৩৬। ১৪৫৯ সালে ইউরোপীয়দের আঁকা পৃথিবীর মানচিত্র (ওপরে বাঁ দিকে ইউরোপ)। মানচিত্রে কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই, এমনকি যেসব জায়গার কথা তারা জানতই না, সেসবও (যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা)

আমেরিকা আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে একদিকে ইউরোপীয়রা বুঝতে পারল পুরোনো জ্ঞানের চেয়ে নতুন পর্যবেক্ষণ বেশি জরুরি, অন্যদিকে এই নতুন দেশটাকে ভালো করে জানার প্রবল ইচ্ছা জাগল তাদের মধ্যে। নতুন পাওয়া এই জায়গাটাকে যদি দখলে রাখতে হয়, তাহলে সেই জায়গাটার সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য জোগাড় করা দরকার। সেখানকার ভূতত্ত্ব, জলবায়ু, গাছপালা, জীবজন্তু, সেখানকার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস– সব। খ্রিষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ, ভূগোলের পুরোনো বই আর মানুষের মুখে মুখে শোনা গল্প– সব সেখানে অচল।

এর পর থেকে ইউরোপে শুধু ভূগোলবিদ নয়, বিজ্ঞানের সব শাখার মানুষই তাদের আঁকা মানচিত্রের অজানা অংশটা ফাঁকা রাখতে শুরু করে। তাদের জ্ঞান যে সম্পূর্ণ নয়, তাদের জানার বাইরেও যে

আরো কিছু থাকতে পারে– সেটা তারা স্বীকার করে নিতে শুরু করল।

সেই সময় থেকেই মানচিত্রের ফাঁকা জায়গাগুলো ইউরোপের মানুষকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে। এই ফাঁকা মানচিত্র পূরণ করার জন্য ইউরোপ থেকে নৌবহর গেল আফ্রিকায়, প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগরে, আর সারা পৃথিবীতে নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করল। তারাই প্রথম বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্য তৈরি করে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে শুরু করে। ইউরোপীয় মানুষের এইসব সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ফলেই সারা পৃথিবীর নানা জায়গার বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীগুলো মিলে একটা মানবজাতিতে পরিণত হলো, আর সেখান থেকেই বদলে গেল পৃথিবীর ইতিহাস।
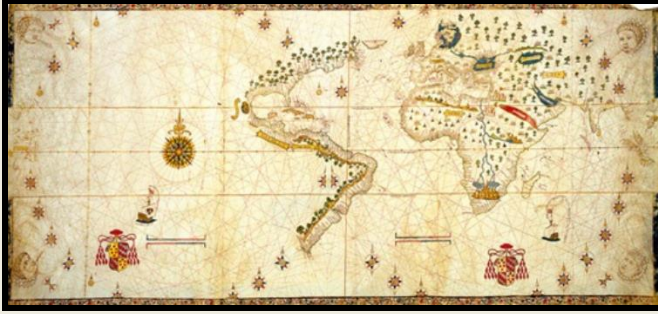
৩৭। ১৫২৫ সালের সালভিয়াতির বিশ্ব মানচিত্র। ১৮৫৯ সালের মানচিত্রেও অনেক দেশ আর দ্বীপের তথ্য ছিল, কিন্তু এখানে বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা। আমেরিকার উপকূল ধরে দক্ষিণে একটু এগোলেই আর কিছু নেই। এই মানচিত্র দেখে সামান্যতম কৌতূহলী মানুষটাও জানতে চাইবে, 'ওখানে কী আছে?' কিন্তু তার কোনো উত্তর নেই। জানার একটাই উপায়– নিজে গিয়ে দেখে আসা

ইউরোপীয়দের এই নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে গিয়ে সেটা দখল করে আসার পদ্ধতিটা আমাদের এত পরিচিত যে সেটাকে আমাদের অস্বাভাবিক বলে মনেই হয় না। কিন্তু এরকম ঘটনা এর আগে কখনোই ঘটেনি। এত দূরে দূরে গিয়ে দেশ দখল করাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আসলে ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ নিজের এলাকার যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে দূরের দেশ জয়

করার কথা তাদের মাথায়ই আসেনি। বেশিরভাগ বড়ো সাম্রাজ্যই কেবল তাদের আশপাশের এলাকাগুলো দখল করে করে বড়ো হয়েছে। এইজন্য রোমানরা রোমকে রক্ষা করার জন্য ইত্রুরিয়া (Etruria) দখল করে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০-৩০০), তারপর ইত্রুরিয়াকে বাঁচাতে দখল করে পো উপত্যকা (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০), তারপর সেটাকে বাঁচানোর জন্য প্রোভেন্স (খ্রিষ্টপূর্ব ১২০), প্রোভেন্সকে বাঁচাতে গল (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০) আর গলকে রক্ষা করতে তারা ব্রিটেন দখল করে (৫০ খ্রিষ্টাব্দ)। এভাবে রোম থেকে লন্ডন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবিস্তার করতে তাদের সময় লাগে ৪০০ বছর। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০ সালে কোনো রোমান ভাবেনি যে জাহাজে করে সোজা ব্রিটেন গিয়ে জায়গাটা দখল করে ফেলা যায়।

অনেক সময় অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্রাট দূরের দেশ জয় করতে যেতেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হতো পুরোপুরি বাণিজ্যিক কিংবা শুধুই জায়গা দখল করা। সম্রাট মহান আলেকজান্ডার কিন্তু নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি, জোরপূর্বক পারস্যের শাসনক্ষমতা দখল করেছেন কেবল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পূর্বসূরি প্রাচীন অ্যাথেন্স ও কার্থেজ (Athens and Carthage), কিংবা মধ্যযুগের ইন্দোনেশিয়া এলাকার মাজাপাহিতের (Majapahit) ইতিহাসে দেখা যায়, এই তিনটা সমুদ্রভিত্তিক সাম্রাজ্যের মানুষেরা কখনো অচেনা সমুদ্রের দিকে যেত না। তারা আশপাশের এলাকায় যেটুকু অভিযান চালিয়েছে সেটা পরবর্তী সময়ে ইউরোপ যা করেছে তার তুলনায় কিছুই নয়।

অনেক ইতিহাসবিদ বলেন, চীনের মিং সাম্রাজ্য থেকে অ্যাডমিরাল ঝেং হে (Zheng He) যেসব অভিযান চালিয়েছিলেন সেগুলো ইউরোপীয়দের অভিযানগুলোকেও ম্লান করে দিতে পারে। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ সালের মধ্যে ঝেং সাতটা বিশাল নৌবহর নিয়ে ভারত মহাসাগরের অনেক দূর পর্যন্ত যান। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বহরে প্রায় ৩০০ জাহাজ ছিল, আর তাতে মানুষ ছিল ৩০ হাজারের মতো।[৭] অনেক জায়গা ঘুরেছিল সেসব জাহাজ– ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর আর পূর্ব আফ্রিকা। সেসব জাহাজ নোঙর ফেলেছিল হেজাজ (Hejaz) বন্দরের প্রধান প্রবেশপথ জেদ্দায় (Jedda) আর কেনিয়ার উপকূলের মালিন্দিতে (Malindi)। এদিকে কলম্বাসের ১৪৯২ সালের অভিযানে ছিল তিনটা

ছোটো জাহাজ আর তাতে ১২০ জন মানুষ। ঝেং-এর বহরের তুলনায় সেটা অনেকটা একদল ড্রাগনের সামনে তিনটা মশার মতো।[৮]

কিন্তু এর চেয়েও বড়ো একটা পার্থক্য ছিল। ঝেং কেবল সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরেছেন, দেশ দখল করার কোনো চেষ্টাই করেননি। তা ছাড়া তাঁর অভিযানের পেছনে কোনো রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কারণও ছিল না। অভিযান চলাকালে ১৪৩০-এ যখন চীনের শাসক বদলায়, তখন নতুন রাজা এসেই ঝেং-এর অভিযান বাতিল করে দেন। অভিযান ভেস্তে গেলে মানুষেরা নানা দিকে চলে যায়, আর তাদের জোগাড় করা বিপুল পরিমাণ তথ্যও হারিয়ে যায়। অত বড়ো নৌবহর চীনের কোনো বন্দর থেকে আর কখনো বের হয়নি। এর পরে যত রাজা বসেছেন চীনের সিংহাসনে, তাঁদের কেউই আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি।

ঝেং হের অভিযান দেখে বোঝা যায়, তাক লাগানোর মতো প্রযুক্তি কেবল ইউরোপীয়দের একারই ছিল না। কিন্তু তাদের নতুন জায়গা আবিষ্কার আর জয় করার যে অদম্য স্পৃহা ছিল সেটাই তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। রোমানদের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তারা কখনো ভারত কিংবা স্ক্যান্ডিনেভিয়া দখল করতে যায়নি। পারস্যের মানুষও যায়নি স্পেন বা মাদাগাস্কার দখল করতে। চীনের শাসকেরা সবচেয়ে কাছের দেশ জাপানের দিকেও হাত বাড়ায়নি। কিন্তু সেটা তো অস্বাভাবিক কিছু না। অস্বাভাবিক এটাই যে ইউরোপের মানুষকে দূরের অজানা সব দেশে যাওয়ার নেশায় পেয়ে বসেছিল। তাই তারা সম্পূর্ণ অজানা কোনো দেশে, অচেনা মানুষ আর রীতিনীতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বলত, ‘আজ থেকে এটা আমার রাজার দেশ!’

বাইরের আক্রমণ

১৫১৭ সালের দিকে ক্যারিবিয়ান সাগরে একটা কানাঘুষা শুরু হলো– মেক্সিকোর মাঝামাঝি জায়গায় নাকি একটা শক্তিশালী রাজ্য আছে। ক্যারিবিয়ান সাগরে বিচরণরত স্প্যানিশ দখলদারদের কানেও গেল কথাটা।
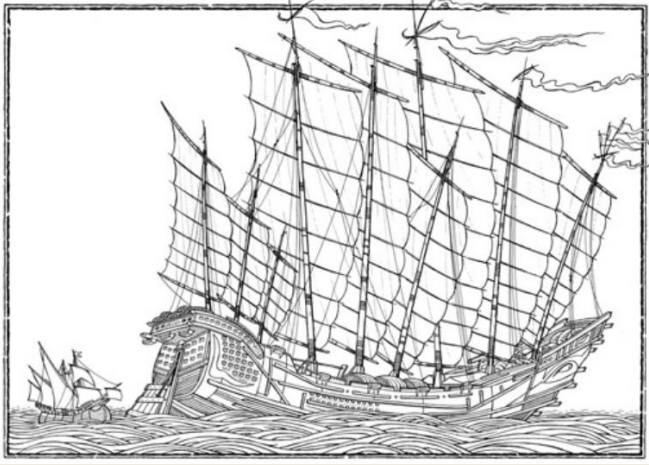
৩৮। ঝেং হে আর কলম্বাসের জাহাজ

এর বছর চারেকের মধ্যেই দেখা গেল, অ্যাজটেকদের (Aztec) রাজধানীটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অ্যাজটেক সাম্রাজ্য হয়ে গেল অতীতের কথা, সেই জায়গায় হার্নান কর্টেজের (Hernán Cortés) প্রতিষ্ঠিত স্প্যানিশ রাজ্যটাই হয়ে গেল বর্তমান।

রাজ্যটা জয় করে স্প্যানিশরা নিজেরদের পিঠটা একটু চাপড়ে দিতেও সময় নষ্ট করেনি। এখান থেকেই তারা সব দিকে 'আবিষ্কার ও জয়ের' অভিযান শুরু করে। মধ্য আমেরিকায় এতদিন যারা ছিল, অর্থাৎ অ্যাজটেক, টোলটেক (Toltecs) বা মায়ারা (Maya)– তারা কেউ জানতোই না যে তাদের দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ আমেরিকা বলে কিছু একটা আছে, সেদিকে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ২ হাজার বছর ধরে ওই জায়গাতে তাদের বাস, অথচ তাদের কেউ দক্ষিণ দিকে পা বাড়ায়নি। এদিকে স্প্যানিশদের মেক্সিকো জয়ের মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই ফ্রান্সিসকো পিজারো (Francisco Pizarro) ইনকা সভ্যতা (Inca Empire) আবিষ্কার করে ফেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইনকা সভ্যতা ১৫৩২ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়।

এই অ্যাজটেক আর ইনকারা যদি নিজেদের দেশ ছেড়ে একটু বাইরে বের হতো, যদি জানতে পারত স্প্যানিশরা তাদের উত্তরের

এলাকাটা কীভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে, তাহলে হয়তো আজ ইতিহাস অন্যরকম হতো। হয়তো তারা স্প্যানিশদের আক্রমণটা ঠেকিয়েও দিতে পারত। কলম্বাস প্রথম আমেরিকা যান ১৪৯২ সালে। আর হার্নান কর্টেজ মেক্সিকো যান ১৫১৯-এ। এই সময়ের মধ্যে স্প্যানিশরা ক্যারিবীয় সাগরের অধিকাংশ দ্বীপ দখল করে নেয়। ওইসব দ্বীপে থাকা আদিবাসীদের জন্য জীবনটা নরক হয়ে উঠেছিল। দখলদার লোভী মানুষেরা তাদের জোর করে খনি আর খেতখামারে কাজ করতে বাধ্য করে। কেউ সামান্যতম প্রতিবাদ করলেই তাকে খুন করে ফেলা হতো। এই প্রচণ্ড পরিশ্রম, অত্যাচার আর বাইরের নাবিকদের সঙ্গে আসা নানা রকম রোগের কারণে সেসব জায়গার অধিকাংশ আদিবাসী মানুষই মারা যায়। ২০ বছরের মধ্যে ওখানকার আদিবাসী মানুষেরা একেবারে শেষ হয়ে যায়। তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে স্প্যানিশরা আফ্রিকা থেকে দাস আনতে শুরু করে।

এই গণহত্যা কিন্তু চলছিল অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের একেবারে দোরগোড়ায়। অথচ কর্টেজ অ্যাজটেক রাজ্যের পূর্ব উপকূলে হাজির হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সেটা টেরই পায়নি। আজকাল মাঝেমধ্যে যেসব ভিনগ্রহের প্রাণীর আগমনের গল্প শোনা যায়, অ্যাজটেকদের কাছে স্প্যানিশদের আগমনটা ছিল অনেকটা সেরকম। অ্যাজটেকরা বিশ্বাস করত তারা পুরো পৃথিবীটা দেখে ফেলেছে, আর তাদের রাজ্যটাই হলো সম্পূর্ণ পৃথিবী, এর বাইরে আর কিছু নেই। আজ আমরা যে জায়গাটাকে ভেরা ক্রুজ (Vera Cruz) বলি, কর্টেজ সেইখানে এসে হাজির হলে অ্যাজটেকরা প্রথম বাইরের মানুষ দেখে।

কী করতে হবে এটাই অ্যাজটেকরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। এই নতুন আসা মানুষগুলো তাদের ভীষণ বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। এরা সবাই মানুষের মতোই দেখতে, অথচ এদের গায়ের রং সাদা। সবার মুখে প্রচুর গোঁফদাড়ি। কারো কারো চুলের রং আবার সোনালি। আর প্রত্যেকের গায়ে ভয়াবহ দুর্গন্ধ। তখন স্প্যানিশদের চেয়ে অ্যাজটেকদের অবস্থা অনেক স্বাস্থ্যকর ছিল। প্রথম প্রথম স্প্যানিশরা যেখানেই যেত, আদিবাসীরা তাদের সঙ্গে ধূপ জ্বালিয়ে নিয়ে যেত। সেটা দেখে স্প্যানিশরা ভাবত তাদের দেবতা ভেবে

সম্মান দেখানো হচ্ছে। কিন্তু পরে অ্যাজটেকদের কিছু লেখা থেকে জানা যায়, তারা আসলে এটা করত দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য।

ম্যাপ ৭। স্প্যানিশ জয়যত্রার সময়ে অ্যাজটেক আর ইনকা সাম্রাজ্য

এই বহিরাগতদের ব্যবহার্য সামগ্রী ছিল আরো বিচিত্র। তারা যেসব জাহাজে চড়ে এসেছিল, অ্যাজটেকরা অত বড়ো জাহাজ দেখেইনি কোনো দিন। তারা বড়ো বড়ো দ্রুতগামী জন্তুর পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াত। তাদের হাতের ধাতব লাঠিগুলো থেকে বজ্র বের হতো। তাদের হাতে ছিল লম্বা লম্বা তরবারি আর গায়ে ছিল কঠিন সব বর্ম। আজটেকদের কাঠের তলোয়ার আর পাথরের বর্শা তাতে আঁচড়ও কাটতে পারত না।

অ্যাজটেকদের কেউ কেউ ভাবত এরা বোধহয় দেবতা। আবার কেউ বলত দেবতা নয়, এরা শয়তান, ভূত কিংবা জাদুকর। স্প্যানিশদের নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ না করে তারা বরং আপসে যাওয়ার চেষ্টা করল। তারা ভেবেছিল, কর্টেজের দলে আছে

বড়োজোর সাড়ে ৫০০ লোক। এই লাখ লাখ মানুষের দেশে এরা আর কীই-বা এমন করবে?

কর্টেজও অ্যাজটেকদের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না, কিন্তু তাঁর দল অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। অ্যাজটেকরা এইসব বাইরে থেকে আসা অদ্ভুতদর্শন দুর্গন্ধময় মানুষদের দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু স্প্যানিশরা ঠিকই জানত যে সারা পৃথিবীতে আরো নানা জাতের মানুষ আছে। আর নতুন জায়গায় গিয়ে সেখানকার মানুষকে মেরেকেটে জায়গাটা দখল করে নেওয়ার অভিজ্ঞতায় তো তাদের ধারেকাছেও কেউ ছিল না। বিজ্ঞানীদের মতো এইসব হানাদার বাহিনীও নতুন কোনো জায়গায় যেতে একটুও ভয় পেত না।

কর্টেজ যখন ১৫১৯ সালের জুলাইয়ে মেক্সিকো যান, কর্তব্যস্থির করতে তাঁর সময় লাগেনি একটুও। আজকালকার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে যেমন দেখা যায়, বিচিত্র কোনো নভোযান থেকে ভিনগ্রহবাসীরা নেমে এসে বলে, 'আমরা কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। আমাদেরকে তোমাদের নেতার কাছে নিয়ে চলো।' কর্টেজের আগমনও ছিল ঠিক তেমন। তিনি ওখানকার লোকদের বললেন, তিনি স্পেনের রাজার দূত, সম্রাট দ্বিতীয় মন্টেজুমার (Montezuma II) সঙ্গে দেখা করতে চান। (একেবারে নির্লজ্জ মিথ্যে কথা। কর্টেজের অভিযান কোনো রাজার নির্দেশে ছিল না। স্পেনের তখনকার রাজা অ্যাজটেকদের তো দূরের কথা, কর্টেজকেও চিনতেন না।) এরপর কর্টেজকে পথপ্রদর্শক, খাবার আর সৈন্যপ্রহরা– সবই দেওয়া হলো। তিনি নিশ্চিন্তে চলে গেলেন অ্যাজটেকদের রাজধানী টেনোকটিটলানে (Tenochtitlan)।

অ্যাজটেকরা এই নবাগতদের যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে রাজধানী পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সম্রাট মন্টেজুমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিল। সেই সাক্ষাতের এক পর্যায়ে কর্টেজের ইশারায় তার সহযোগীরা সম্রাটের দেহরক্ষীদের হত্যা করে। তাদের ইস্পাতের অস্ত্রের সামনে কাঠ আর পাথরের অস্ত্রধারী সৈনিকেরা কিছুই করতে পারেনি। ফলে খুব সহজেই অতিথি জিম্মি করে ফেলল গৃহকর্তাকে।

অবশ্য কর্টেজের অবস্থাও তখন বেশ নাজুক। সম্রাটকে তিনি জিম্মি করেছেন বটে, কিন্তু চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে আছে হাজার

হাজার শত্রুসৈন্য আর লাখ লাখ বিক্ষুব্ধ জনতা। আর এই অজানা-অচেনা দেশে তাঁর সম্বল মাত্র কয়েক শ মানুষ। সবচেয়ে কাছের স্প্যানিশ উপনিবেশও কিউবাতে, দেড় হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে।

কর্টেজ মন্টেজুমাকে তাঁর প্রাসাদেই বন্দি করে রাখেন, দেখে মনে হয় সম্রাট সম্রাটের মতোই আছেন, আর এই 'স্প্যানিশ দূত' আছেন তাঁর অতিথি হয়ে। অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের সব ক্ষমতার মূলে ছিলেন সম্রাট, এই পরিস্থিতিতে সেটা বেশ নড়বড়ে হয়ে গেল। মন্টেজুমা সম্রাটের মতোই কাজ করতে লাগলেন, আর সমাজের অভিজাত লোকেরাও তাঁর অনুগত হয়েই রইল। এর অর্থ হলো, তাদের আনুগত্যটা আসলে কর্টেজের প্রতিও ছিল। এই অবস্থা চলল কয়েক মাস। এই সময়ে কর্টেজ মন্টেজুমা আর তাঁর কর্মচারীদের জেরা করে অনেক কিছু জানলেন, কয়েকজনকে অ্যাজটেকদের ভাষা শিখিয়ে দোভাষী বানিয়ে ফেললেন আর অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের কোথায় কী আছে সেটা আরো ভালো করে জানতে চারদিকে লোক পাঠালেন।

একসময় অ্যাজটেকদের অভিজাত সমাজ বিদ্রোহ করে, মন্টেজুমা আর কর্টেজ দুজনের বিরুদ্ধেই। তারা একজন নতুন সম্রাট নির্বাচন করে, আর স্প্যানিশদের টেনোকটিটলান থেকে হটিয়ে দেয়। কিন্তু ততদিনে শাসনব্যবস্থায় ফাটল ধরে গেছে। কর্টেজ সেটারই সুযোগ নিলেন। তিনি অ্যাজটেকদের ভেতরে বিভেদ তৈরি করতে থাকেন। তিনি রাজ্যের অনেক প্রজাকেই দলে ভিড়িয়ে ফেলেন। এখানেই তারা একটা বড়ো ভুল করে বসে। প্রজাদের অনেকেই শাসকদের অপছন্দ করত, কিন্তু ক্যারিবীয় দ্বীপগুলোতে স্প্যানিশরা এর আগে কী করে এসেছে সেই খবর তো তারা রাখত না। তাই তাদের অনেকেই ভাবল, স্প্যানিশদের সাহায্য নিয়ে এবার তারা অ্যাজটেক শাসন থেকে মুক্তি পাবে। ফাঁকতালে স্প্যানিশরাও যে দেশটা দখল করে ফেলতে পারে– এটা তাদের মাথায়ই আসেনি। তারা ভেবেছিল কর্টেজের তো লোকজন বেশি নেই, তারা যদি পরে উলটোপালটা কিছু করেও বসে, তাহলেও তাদের সহজেই শায়েস্তা করে ফেলা যাবে। এই বিদ্রোহী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে কর্টেজ পেয়ে

গেলেন একটা বিরাট সেনাবাহিনী। সেই বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কর্টেজ টেনোকটিটলান শহরটা দখল করে নিলেন।

এর মধ্যে প্রচুর স্প্যানিশ সৈন্য আর দখলদার মানুষ মেক্সিকোতে এসে পড়ে– কেউ কিউবা থেকে, আবার কেউ সেই স্পেন থেকেই। লোকজন যখন ব্যাপারটা ধরতে পারল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেই কর্টেজের ভেরা ক্রুজে আগমনের দিন থেকে ১০০ বছরের মধ্যেই সেখানকার আদি জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯০ শতাংশই শেষ হয়ে গেল। এর প্রধান কারণ ছিল স্প্যানিশদের সঙ্গে আসা নতুন কিছু রোগব্যাধি। আর যারা টিকে ছিল, তাদের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। এর চেয়ে অ্যাজটেক শাসনের সময়েই তারা আরো ভালোভাবে বেঁচে ছিল।

কর্টেজের মেক্সিকো যাওয়ার ১০ বছর পর পিজারো ইনকা সাম্রাজ্যে পৌঁছান। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল কর্টেজের চেয়েও কম– মাত্র ১৬৮ জন। কিন্তু তাতে কী, পিজারোর সঙ্গে ছিল আগের সব অভিযানের অর্জিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা। ওদিকে ইনকারা অ্যাজটেকদের পরিণতির কথা কিছুই জানত না। পিজারো পুরোপুরি কর্টেজের দেখানো পথেই চললেন। প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন স্পেনের দূত হিসেবে, সম্রাট আটাহুয়ালপাকে (Atahualpa) আমন্ত্রণ জানালেন, তারপর তাঁকে আটকে রাখলেন। তারপর পিজারো সেই ভঙ্গুর সাম্রাজ্যের কিছু মানুষকে দলে ভেড়ালেন, তারপর পুরো দেশটাই দখল করে নিলেন। অথচ ইনকারা যদি একটুও অ্যাজটেকদের খবর রাখত, তাহলে কিছুতেই তারা নিজেদের ভাগ্য পিজারোর হাতে সঁপে দিত না।

শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার মনোভাবের জন্যই আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের এই চড়া মূল্য দিতে হলো। এশিয়ার যত বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য ছিল– অটোমান, সাফাভিদ, মোগল আর চীন– সবাই দ্রুতই জানতে পারে যে ইউরোপের মানুষ অনেক বড়ো বড়ো আবিষ্কার করে ফেলছে। তার পরও তারা সেসবে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। তখনো তারা ভাবত, এশিয়াই পৃথিবীর সবকিছু। আমেরিকা মহাদেশ বা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের দখল নিতে তারা ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায়নি। ইউরোপের পুঁচকে

দেশ স্কটল্যান্ড আর ডেনমার্কের মানুষও আমেরিকায় দু-একটা অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু এশিয়ার বড়ো বড়ো তিনটা সাম্রাজ্যের একটাও ওদিকে যায়নি– আবিষ্কার করতেও না, দখল করতেও না। ইউরোপের বাইরে আমেরিকায় প্রথম সামরিক অভিযানটা শুরু করে জাপান। ১৯৪২ সালের জুনে জাপানের একটা নৌবহর আলাস্কার উপকূলের দুটো ছোটো ছোটো দ্বীপ কিস্কা আর আতু (Kiska and Attu) দখল করে। সে অভিযানে তারা বন্দি করে ১০ জন আমেরিকান সেনা আরেকটা কুকুরকে। ওখানেই শেষ– আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের দিকে জাপান আর এগোয়নি।

অটোমান আর চীন যে অনেক দূরবর্তী রাজ্য ছিল, কিংবা প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক আর সামরিক দিকে থেকে তারা পিছিয়ে ছিল– এমন কিন্তু নয়। ১৪২০-এর দিকে ঝেং হে যে পরিমাণ সম্পদ নিয়ে চীন থেকে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন সেটা দিয়ে আমেরিকায়ও পৌঁছানো যেত। কিন্তু সেই ইচ্ছাটুকুই তাদের ছিল না। ১৬০২ সালের আগে চীনের মানচিত্রগুলোতে আমেরিকার নামগন্ধও ছিল না। আর প্রথম যে চীনা মানচিত্রে আমেরিকা দেখা যায়, সেটাও এঁকেছিল ওখানকার ইউরোপীয় মিশনারিরা।

৩০০ বছর ধরে ইউরোপের মানুষ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে আর প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে গেছে। সেখানে বলার মতো যেসব রেষারেষি হতো, সেগুলো হতো ইউরোপের দুটো দেশের মধ্যেই। এতদিন ধরে ইউরোপ যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তার ভরসাতেই তারা এরপর এশিয়ার সাম্রাজ্যগুলোকে একে একে জয় করে নিজেরা ভাগাভাগি করে নেয়। অটোমান, পারস্য, ভারত আর চীন সাম্রাজ্যের মানুষ সেদিকে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে গিয়ে বুঝতে পারে, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর দিকে এসে ইউরোপের বাইরের মানুষ পুরো পৃথিবী সম্পর্কে জানতে শুরু করে। পৃথিবীব্যাপী ইউরোপের আধিপত্য খর্ব হওয়ার এটা অন্যতম প্রধান কারণ। এর ফলেই আলজেরিয়ার স্বাধীনতাযুদ্ধে (১৯৫৪-১৯৬২) আলজেরিয়ার গেরিলারা সংখ্যায়, প্রযুক্তিতে আর অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে থাকার

কারণে ফরাসি সৈন্যদের হারিয়ে দেয়। তাদের জয়ের কারণ ছিল অন্যান্য উপনিবেশবিরোধীদের সমর্থন আর গণমাধ্যমে নিজেদেরকে তুলে ধরা। এমনকি ফ্রান্সের মানুষও তাদের সমর্থন দেয়। উত্তর ভিয়েতনামের মতো ছোটো একটা দেশেও বিরাট দেশ আমেরিকার পরাজয়ের কারণও ছিল এটাই– নিজেদের দেশের সংগ্রামটাকে পুরো পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা। সম্রাট মন্টেজুমাও যদি স্পেনের মানুষকে তাঁদের কথা জানাতে পারতেন আর ফ্রান্স, পর্তুগাল কিংবা অটোমান সাম্রাজ্যের সমর্থন আদায় করতে পারতেন, ইতিহাস হয়তো আজ অন্যভাবে লেখা হতো।

বিরল মাকড়সা, হারানো লিপি

আধুনিক বিজ্ঞান আর আধুনিক সাম্রাজ্য– দুটোর পেছনেই আছে একই রকম চিন্তাধারা, জানার সীমানার বাইরে কোথায় কী আছে সেটা জানার অদম্য তাড়না। তাই এ দুটোর সম্পর্ক এত গভীর। শুধু তাড়নাটুকুই নয়, দুটোর কাজের পদ্ধতিও একই রকম। আধুনিক ইউরোপীয়দের জন্য সাম্রাজ্য তৈরি করাটা অনেকটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মতো, আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণাও একেকটা রাষ্ট্রীয় প্রকল্প।

মুসলিমরা যখন ভারত দখল করে, তাদের সঙ্গে কোনো পুরাতত্ত্ববিদ এসে ভারতের ইতিহাস জানতে চায়নি, কোনো নৃতত্ত্ববিদ এসে সেখানকার সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করেনি, নতুন জায়গার মাটির গুণাগুণ দেখতে আসেনি কোনো ভূতত্ত্ববিদ, কিংবা ভারতের জীবজন্তুগুলো কাছে থেকে দেখার জন্য কোনো প্রাণিবিজ্ঞানীও আসেনি। অথচ ব্রিটিশরা যখন ভারত দখল করে, তখন তাদের সঙ্গে এদের প্রত্যেকেই এসেছিল। ১৮০২ সালের ২ এপ্রিলে সারা ভারতব্যাপী জরিপ শুরু হয়। এই জরিপ চলেছিল ৬০ বছর ধরে। হাজার হাজার দেশি শ্রমিক আর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে তারা সমগ্র ভারতের নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করে। এমনকি এভারেস্টসহ হিমালয়ের প্রত্যেকটা পর্বতের উচ্চতাও তারা নির্ণয় করে ফেলে। ব্রিটিশরা ভারতের সামরিক শক্তি আর সোনার খনির খোঁজে যে আগ্রহ নিয়ে সারা ভারত চষে বেড়িয়েছে, ঠিক সমান আগ্রহ নিয়ে

তারা খুঁজে বেড়িয়েছে বিরল প্রজাতির মাকড়সার খবর জানতে, প্রজাপতির তালিকা বানাতে, ভারতের বিলুপ্ত হওয়া ভাষাগুলোর মূল খুঁজতে আর মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার হারানো নিদর্শন বের করতে।

গাঙ্গেয় উপত্যকার মানবসভ্যতার অন্যতম প্রধান শহর ছিল মহেঞ্জোদারো (Mohenjo-daro)। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তৈরি হওয়া এই শহর ১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশদের আগে যারা ভারত শাসন করেছে– মৌর্য, গুপ্ত, দিল্লির সুলতান, এমনকি পরাক্রমশালী মোগল– কেউই সেসব ধ্বংসস্তূপের দিকে ফিরেও তাকায়নি। ওদিকে ১৯২২ সালের এক জরিপে ব্রিটিশরা সেটা খুঁজে পায়, তারপর ব্রিটিশদেরই একটা দল মাটি খুঁড়ে বের করে আনে ভারতীয় সভ্যতার এই প্রাচীনতম নিদর্শনটি। অথচ ভারতীয়রাই এ কাজে কোনোরকম আগ্রহ দেখায়নি।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ব্রিটিশদের কৌতূহলের আরেকটা উদাহরণ হলো তাদের কুনিফর্ম (Cuneiform) লিপির অর্থোদ্ধার। মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ৩ হাজার বছর ধরে এই লিখনপদ্ধতি চলেছে, কিন্তু এই ভাষা পড়তে পারার মতো সর্বশেষ মানুষটিও মারা যায় খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। এর পর থেকে ওই এলাকার মানুষেরা নানান জায়গায় এই লেখা দেখেছে– বড়ো বড়ো সৌধে, প্রস্তরফলকে কিংবা ভাঙা কোনো মাটির পাত্রের গায়ে। কিন্তু এইসব বিচিত্র চিহ্নের মধ্য দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষেরা যে কী বলতে চেয়েছে, তা তাদের কেউ পড়তে পারেনি, বা বলা ভালো পড়ে দেখার চেষ্টাই করেনি। ১৬১৮ সালে এইসব লেখা ব্রিটিশদের নজরে আসে। পারস্যে থাকা স্প্যানিশ দূত যখন পার্সিপোলিসের (Persepolis) প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান, তখন এই চিহ্নগুলো তাঁর চোখে পড়ে। এগুলোর অর্থ কী, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে পেলেন না তিনি। এই খবর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কানে গেলে তাঁরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁরা ১৬৫৭ সালে পার্সিপোলিসের কুনিফর্ম লিপির একটা লেখা প্রকাশ করেন। এরপর আরো অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়, কিন্তু ২০০ বছর ধরে পশ্চিমা পণ্ডিতেরা অনেক চেষ্টা করেও সেগুলোর অর্থ বের করতে ব্যর্থ হন।

১৮৩০-এর দশকে পারস্যের শাহকে তাঁর সৈন্যদের ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণ দিতে হেনরি রলিনসন (Henry Rawlinson) নামক এক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা আসেন। অবসর সময়ে তিনি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি কয়েকজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে জাগরোস (Zagros) পর্বতশ্রেণি দেখতে যান। সেখানেই তিনি দেখেন বেহিস্তুনের বিরাট শিলালিপি (Behistun Inscription)। ১৫ মিটার লম্বা আর ২৫ মিটার চওড়া এই প্রস্তরফলকটি ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে রাজা প্রথম দারিউসের (Darius I) নির্দেশে এক উঁচু পাহাড়ের একপাশে খোদাই করা হয়। ওটাতে কুনিফর্ম লিপিতে তিন ভাষার লেখা ছিল– প্রাচীন পারসিক ভাষা, এলামাইট (Elamite) আর ব্যাবিলনীয় ভাষা। ওখানকার সব মানুষই ওটার কথা জানত, কিন্তু কেউই ওটা পড়তে পারত না। রলিনসন বুঝলেন, ওই লেখাটার পাঠোদ্ধার করতে পারলে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যত লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবগুলোই বোঝা যাবে। একটা হারানো জগতের দরজা খুলে দিতে পারে এই লেখাটা।

কাজের প্রথম ধাপ ছিল ওই লেখাটার হুবহু অনুলিপি তৈরি করে ইউরোপে পাঠানো। রলিনসন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে কাজটা করেন। এ কাজে স্থানীয় কয়েকজন লোকও তাঁকে সাহায্য করে। একটা কুর্দি ছেলে সবচেয়ে ওপরের সবচেয়ে দুর্গম জায়গার লেখাটা লিখে নিয়ে আসে। ১৮৪৭ সালে এই কাজ শেষ হয়। পুরো লেখাটার একটা নিখুঁত অনুলিপি পাঠানো হয় ইউরোপে।

এটুকু করেই রলিনসন কিন্তু বসে থাকেননি। সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য তো ছিলই, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি এই লেখার জন্য নিয়মিত সময় দিতেন। বিভিন্নভাবে তিনি এই লেখার অর্থ বের করার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাচীন পারসিক লিপির অর্থ বের করতে সমর্থ হন। প্রাচীন পারসিক লিপি আধুনিক লিপির খুব কাছাকাছি, রলিনসনও সেটা জানতেন, তাই এই পদ্ধতিটাই ছিল সবচেয়ে সহজ। লেখার একটা অংশের অর্থ জেনে যাওয়ার কারণে এলামাইট আর ব্যাবিলিনীয় লিপির অর্থ বের করার উপায় পেয়ে গেলেন তিনি। সেই হারানো জগতের দরজা শেষমেশ খুলল। সে দরজার ওপাশ থেকে সুমেরীয় বাজারের

হাঁকডাক, রাজা-রাজড়াদের আদেশ-নির্দেশ, রাজকর্মচারীদের তর্কবিতর্ক– সব একেক করে সামনে এসে হাজির হলো। রলিনসন কিন্তু বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন রাজকর্মচারী। অথচ তাঁরই কৌতূহল ও চেষ্টার কারণে প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের অনেক অজানা তথ্য পৃথিবীর মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল।

এরকম আরেক রাজকর্মচারী পণ্ডিত ছিলেন উইলিয়াম জোনস (William Jones)। ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতে আসার পর থেকে তিনি বাংলার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে কমর্রত ছিলেন। ভারত তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে আসার ছয় মাসের মধ্যে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাটির কাজ ছিল এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস আর সমাজব্যবস্থা নিয়ে পড়াশোনা করা। মাত্র দুই বছরের মধ্যে জোনস সংস্কৃত ভাষার ওপর তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো প্রকাশ করেন। এটাকেই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Comparative Linguistics)-এর সূচনা বলা যায়।

জোনস তাঁর লেখায় প্রাচীন ভারতের পবিত্র ভাষা-সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার কিছু বিস্ময়কর মিল তুলে ধরেন। সংস্কৃতে ‘মা’কে বলা হয় ‘মাতা’, ল্যাটিন ভাষায় সেটা ‘মাতের’ (Mater) আর প্রাচীন কেল্টিক ভাষায় ‘মাথির’ (Mathir)| এসব মিল থেকে জোনস ধারণা করেন যে পৃথিবীতে প্রচলিত সবগুলো ভাষারই উদ্ভব হয়েছে অধুনালুপ্ত একটা ভাষা থেকে। পরবর্তীকালে এই ভাষাগুলোকে একসঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমষ্টি নাম দেওয়া হয়।

জোনস যে এরকম একটা বড়োসড়ো ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন, এটাই কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান নয়। বরং দুটো ভাষার তুলনা করতে তিনি যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতেন, সেগুলো পরবর্তী সময়ে ভাষা গবেষণায় সারা পৃথিবীর ভাষাবিদদের অনেক সাহায্য করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে বিকাশ লাভ করেছে ভাষাবিজ্ঞান। ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করত যে ঠিকমতো সাম্রাজ্য চালাতে হলে প্রজাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুব ভালোভাবে জানতে হবে। ভারতে আসা ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কলকাতা কলেজে তিন বছর ধরে পড়াশোনা করতে

হতো। সেখানে তাঁরা ইংরেজ আইনের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম আইন শিখতেন, গ্রিক আর ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত, উর্দু আর ফারসি শিখতেন, গণিত, অর্থনীতি আর ভূগোলের সঙ্গে শিখতেন তামিল, বাংলা আর ভারতীয় রীতিনীতি। ভারতীয় ভাষাগুলোর ব্যাকরণ শেখার জন্যও এই ভাষাশিক্ষা অনেক কাজে লাগত।

এই উইলিয়াম জোনস আর হেনরি রলিনসনের মতো মানুষদের কাজের জন্যই ইউরোপের শাসকেরা তাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে খুব ভালোভাবে জানতে পেরেছিল। অনেক ব্যাপারে তারা আগের শাসক, এমনকি স্থানীয় মানুষের থেকেও বেশি জানত। জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সুফল তারা পেয়েছিল। এই জ্ঞান না থাকলে অল্প কিছু ব্রিটিশের পক্ষে কোটি কোটি মানুষের ভারতকে ২০০ বছর ধরে শাসন করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। ঊনবিংশ শতকের পুরোটা আর বিংশ শতকের শুরুর দিক জুড়ে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৫ হাজারেরও কম। সৈন্য ছিল ৪০ থেকে ৭০ হাজার, আর ব্যবসায়ী, পরিদর্শক আর তাদের স্ত্রী ও সন্তান মিলে ছিল এক লাখের মতো। আর এই মানুষগুলোই শাসন করেছে ভারতের প্রায় ৩০ কোটি মানুষকে।[৯]

ইউরোপীয় সাম্রাজ্য যে শুধু শাসনের সুবিধার জন্যই ভাষাবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল আর ইতিহাস গবেষণায় টাকা ঢেলেছে, তা কিন্তু নয়। বরং এইসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাদের সাম্রাজ্য-বিস্তারের পেছনে আদর্শগত সমর্থন দিত। আধুনিক ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করত, নতুন জ্ঞান অর্জন করাটা সব সময়ই ভালো কাজ। এই সাম্রাজ্য থেকে যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্ঞান আসছে, এটাই ছিল তাদের প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। আজও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ইতিহাসে দেখা যায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির পেছনে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পরোক্ষ হলেও অবদান আছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের করুণ পরিণতির কথা নেই, কিন্তু জেমস কুক আর জোসেফ ব্যাংকসের প্রশস্তি আছে ঠিকই।

এ ছাড়াও, সব সময় বাস্তবে না হলেও অন্তত কাগজে-কলমে দেখানো যায়, সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে আসা নতুন জ্ঞান নতুন

প্রজাদের মধ্যে ‘প্রগতি’ সঞ্চার করেছিল। এই প্রজারা পেয়েছে উন্নত শিক্ষা ও চিকিৎসা, দেশে রেললাইন বসেছে, খাল খনন করা হয়েছে, সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সাম্রাজ্যবাদী মানুষেরা অনেক সময় এটাও দাবি করে যে, তাদের এই সাম্রাজ্যবিস্তার শুধু দখল করা আর নিজেদের লাভের জন্য নয়, বরং ইউরোপের বাইরের মানুষকে অগ্রগতি এনে দেওয়ার এক নিঃস্বার্থ অভিযান। এ নিয়ে রাডইয়ার্ড কিপলিংয়ের (Rudzard Kipling) একটা কবিতা আছে ‘সাদা মানুষের বোঝা’ (The White Man’s burden) নামে–

> Take up the White Man’s burden–
> Send forth the best ye breed–
> Go bind your sons to exile
> To serve your captives’ need;
> To wait in heavy harness,
> On fluttered folk and wild–
> Your new-caught, sullen peoples,
> Half-devil and half-child.

বাস্তবতা কিন্তু অন্য কথা বলে। ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল বাংলা। ১৭৬৪ সালে ব্রিটিশরা বাংলা দখল করে। বাংলার এই নতুন শাসকেরা লুটপাট ছাড়া আর তেমন কোনো দিকেই মনোযোগ দেয়নি। তারা এমন একটা অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ কওে, যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে এখানে দুর্ভিক্ষ লেগে যায় (The Great Bengal Famine)।

১৭৬৯-এ শুরু হওয়া এই দুর্ভিক্ষ ১৭৭০-এ চরমে পৌঁছায়, চলতে থাকে ১৭৭৩ পর্যন্ত। এই কয়েক বছরে বাংলার প্রায় ১ কোটি মানুষ মারা যায়, যা ছিল বাংলার সম্পূর্ণ জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ।[১০]

এই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শোষণ ও অত্যাচার কিংবা মহিমান্বিত ‘সাদা মানুষের বোঝা’– যেটাই বলা হোক, কোনোটাই পুরোপুরি মেলে না। আসলে ইউরোপের মানুষ এত বেশি জায়গা দখল করেছে যে তাদের সম্পর্কে যে যা-ই বলুক তা কিছুটা হলেও খাটে। কেউ যদি বলতে চায় এই সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীতে কেবল অত্যাচার, অবিচার আর মৃত্যুই ছড়িয়ে দিয়েছে, তাহলে তাদের সমস্ত

অপরাধের বিবরণ দিয়ে মোটা মোটা বইয়ের পাতা ভরিয়ে ফেলা যাবে। আবার কেউ যদি বলে এই সাম্রাজ্য-বিস্তারের কারণেই তাদের প্রজারা উন্নত চিকিৎসা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপদ জীবন পেয়েছে, তাহলে সেটা নিয়েও অনেক অনেক বই লিখে ফেলা যায়। বিজ্ঞানকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পেরে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই ক্ষমতা দিয়ে তারা পৃথিবীকে এতটাই বদলে দিয়েছে যে তাদেরকে সরাসরি ভালো কিংবা খারাপ কোনোটাই বলার উপায় নেই। আজকের পৃথিবীকে আমরা যেভাবে জানি আর যেসব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার বিচার করি– তার সবকিছু এই সাম্রাজ্য অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানকে যে সব সময় ভালো কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে তা কিন্তু নয়। অনেক জীববিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ, এমনকি ভাষাবিদও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ইউরোপীয়রাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জাতের মানুষ, তাই তারা যদি বাকি পৃথিবী শাসন করে তাহলে সেটা ভুল কিছু নয়। উইলিয়াম জোনস যখন বললেন সব ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারই উৎপত্তি হয়েছে কোনো একটা প্রাচীন ভাষা থেকে, তখন এ বিষয়ের অনেক বিজ্ঞানীই সেই ভাষাভাষী মানুষের ব্যাপারে উৎসাহী হন। তাঁরা দেখলেন প্রাচীন সংস্কৃতে কথা বলা মানুষেরা মধ্য এশিয়া থেকে এসে তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে ভারত আক্রমণ করে। এই মানুষেরা নিজেদেরকে বলত 'আর্য' (Arya)। আবার প্রাচীন ফারসি ভাষাভাষী লোকেরাও নিজেদের বলত 'আইরিয়া' (Airiia)। এসব দেখে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ধারণা করলেন, যে প্রাথমিক ভাষা থেকে এই দুটো প্রাচীন ভাষার (এবং সঙ্গে গ্রিক, ল্যাটিন, গথিক আর কেল্টিক ভাষারও) উৎপত্তি হয়েছে, সেই ভাষায় যারা কথা বলত, তারাই নিশ্চয়ই আর্য। এমন কি হতে পারে, যে সেই আর্যদের হাত ধরেই তৈরি হয়েছে ভারতীয়, পারস্য, গ্রিক আর রোমান সভ্যতা?

এরপর ব্রিটিশ, ফরাসি ও জার্মান বিশেষজ্ঞরা এই ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে মিলিয়ে নতুন একটা তত্ত্ব দিলেন। তাঁরা বললেন, আর্যরা শুধু একটা বিশেষ ভাষায় কথা বলা জনগোষ্ঠী নয়, আর্য হলো সম্পূর্ণ আলাদা একটা জাতি। তাও যে-সে

জাতি নয়, মানুষের মধ্যে সেরা জাতি। এই লম্বা, হালকা রঙের চুল ও নীল চোখের পরিশ্রমী ও যুক্তিবাদী মানুষেরা পৃথিবীর উত্তর দিক থেকে এসে সারা পৃথিবীতে সভ্যতার সূচনা করে দিয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হলো, ভারত আর পারস্যে যে আর্যরা গিয়েছিল, তারা সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে যায় আর তাদের সঙ্গেই সন্তানের জন্ম দেয়। তাই পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্য থেকে আর্যদের ফরসা গায়ের রং, সোনালি চুল, যুক্তিবাদী ও পরিশ্রমী স্বভাব– সবই হারিয়ে যায়। তাই ভারত ও পারস্যের সভ্যতাও বেশি এগোতে পারেনি। অন্যদিকে ইউরোপে আর্যরা তাদের জাতিগত বিশুদ্ধতা ধরে রাখতে পেরেছিল বলেই তারা একদিন পুরো পৃথিবী করায়ত্ত করতে পেরেছে। তারাই এই পৃথিবীর যোগ্য শাসক, আর অন্যান্য নিচু জাতের মানুষের সঙ্গে না মিশলে তারা এই শ্রেষ্ঠত্ব ধরেও রাখতে পারবে।

এই ধরনের জাতিবিদ্বেষী তত্ত্ব কয়েক দশক ধরে অনেক প্রতাপের সঙ্গে টিকে ছিল। বিজ্ঞানী আর রাজনীতিবিদ– উভয়েই এই তত্ত্বকে সাদরে গ্রহণ করে। তবে এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম চলতেই থাকে। তবে এর মধ্যেই এই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিটা 'জাতি' থেকে সরে যায় 'সংস্কৃতি'র দিকে। আজকের দিনে দেখা যায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের আলোচনায় শারীরিক পার্থক্যের চেয়ে সাংস্কৃতিক পার্থক্যটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এখন আর কেউ বলে না, 'এটা ওদের রক্তে মিশে আছে', বরং বলে 'ওদের সংস্কৃতিই এরকম'।

এসব কারণেই ইউরোপের যে ডানপন্থি দলগুলো মুসলিমদের অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে, তারাও তাদের কথায় জাতিবিদ্বেষের সুর যেন না থাকে সেই চেষ্টা করে। ফরাসি রাজনীতিবিদ মেরিন লা পেনকে (Marine le Pen) যদি কখনো টেলিভিশন বক্তৃতায় বলতে শোনা যায়, 'আমরা চাই না আরব-বিশ্বের এসব নিচু জাতের মানুষ এখানে এসে আমাদের আর্য রক্তকে কলুষিত করুক।' তাহলে তাঁর বক্তৃতালেখকদের তাড়িয়ে দিতে একটুও সময় লাগবে না। তাই ইউরোপের রাজনৈতিক দলগুলো বলে, ইউরোপে বিকশিত হওয়া পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো গণতান্ত্রিক চেতনা, পরমতসহিষ্ণুতা ও লিঙ্গবৈষম্যহীনতা। ওদিকে মধ্যপ্রাচ্যের

সংস্কৃতিতে আছে একদলীয় শাসন, ধর্মীয় উগ্রতা আর নারীদের অবমাননা। তাই তাদের সংস্কৃতি ইউরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তা ছাড়া মুসলিম প্রবাসীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতেও অনিচ্ছুক কিংবা অনেক ক্ষেত্রে অপারগ। তাই ইউরোপের গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার্থে এবং অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা কমাতে মুসলিমদের ইউরোপে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়।

এই যুক্তির সমর্থনে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় বিভিন্ন সভ্যতার বিরোধ ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য তুলে ধরা হয়। সব ইতিহাসবিদ ও নৃতাত্ত্বিক অবশ্য এই যুক্তিগুলো মানেন না। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা যত সহজে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শারীরিক পার্থক্যকে নগণ্য বলে জাতিবিদ্বেষকে উড়িয়ে দিতে পারেন, সাংস্কৃতিক পার্থক্যের বেলায় সমাজবিজ্ঞানীরা কিন্তু এত সহজে সেটা পারেন না। সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য যদি সামান্যই হতো, তাহলে যুগ যুগ ধরে ইতিহাসবিদ আর নৃতাত্ত্বিকেরা সেটা নিয়ে এত পড়াশোনাই-বা করছে কেন?

ইউরোপের সাম্রাজ্য-বিস্তারে বিজ্ঞানীরা বাস্তব জ্ঞান, আদর্শগত ন্যায্যতা আর প্রযুক্তিগত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ইউরোপ পৃথিবী দখল করতে পারত কি না সেটা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। আর এই দিগ্‌বিজয়ী সাম্রাজ্যও তাঁদেরকে দিয়েছে তথ্য, নিরাপত্তা, নতুন নতুন জ্ঞানের ভান্ডার আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। সাম্রাজ্যের সাহায্য ছাড়া আজকের বিজ্ঞানও এই অবস্থায় কোনোভাবেই আসতে পারত না। বিজ্ঞানের খুব কম শাখাই আছে, যা এই সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় বেড়ে ওঠেনি।

তবে এটুকুই সব নয়। বিজ্ঞান তার বিকাশের জন্য সাম্রাজ্য ছাড়াও আরো অনেক জায়গা থেকেই সাহায্য পেয়েছে। আর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের উত্থান আর প্রসারের পেছনে বিজ্ঞান ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ই ছিল। বিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যবাদের এই হঠাৎ বেড়ে ওঠার পেছনে আরো একটা শক্তি কাজ করেছে। সেটা হলো পুঁজিবাদ। ব্যবসায়ীরা যদি টাকার পেছনে না ছুটত, তাহলে কলম্বাসও আমেরিকায় পৌঁছাতেন না, জেমস কুকও অস্ট্রেলিয়ায়

যেতেন না, আর নিল আর্মস্ট্রংয়েরও কখনো চাঁদের মাটিতে পা রাখা হতো না।

অধ্যায় ১৬

পুঁজিবাদের দর্শন

সাম্রাজ্য তৈরি আর বিজ্ঞানের বিকাশের পেছনে টাকার বড়ো রকমের ভূমিকা ছিল ঠিকই। কিন্তু টাকাই কি এই দুটো কাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল?

ইতিহাসে অর্থনীতির আসল ভূমিকাটা চট করে বুঝে ওঠা যায় না। টাকা যুগে যুগে সাম্রাজ্য তৈরি আর ধ্বংস করেছে, নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে, শিল্পকারখানার চাকা ঘুরিয়েছে, আবার লাখ লাখ মানুষকে বানিয়েছে দাস, শত শত প্রাণী আর উদ্ভিদকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে এই টাকাই। সেসব নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বই লিখে ফেলা যায়। অথচ মাত্র একটা শব্দে এর পুরোটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়– 'বৃদ্ধি'। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অবস্থা ভালোমন্দ যা-ই হোক না কেন, অর্থনীতির বৃদ্ধি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকে না। সে সামনে যা পায় সেটাই গ্রাস করে, আর সঙ্গে সঙ্গেই আরো বড়ো হয়ে যায় চোখের পলকে।

ইতিহাসের শুরুর বেশিরভাগ সময় জুড়েই অর্থনীতি মোটামুটি স্থবির ছিল। হ্যাঁ, পৃথিবীর মোট উৎপাদন বেড়েছে বটে, কিন্তু সেটা হয়েছে মানুষের নতুন নতুন জায়গায় যাওয়া আর নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য। মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ বাড়েনি। কিন্তু এই আধুনিক যুগে এসেই পরিস্থিতি পালটে গেল। ১৫০০ সালে পৃথিবীর সব পণ্য ও সেবা মিলিয়ে মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ২৫ হাজার কোটি ডলারের মতো। আর আজকে সেটা প্রায় ৬০ লাখ কোটি ডলার! তার চেয়ে বড়ো কথা, ১৫০০ সালে মাথাপিছু উৎপাদনের মূল্য ছিল বছরে গড়ে ৫৫০ ডলার, আর আজকের দিনে সব নারী-পুরুষ-শিশু

মিলে গড় বার্ষিক মাথাপিছু উৎপাদন ৮৮০০ ডলার হয়ে গেছে![১] এই বিপুল বৃদ্ধির কারণটা কী?

অর্থনীতি বড়োই বাজে রকমের জটিল বিষয়। তার মধ্যেও আসুন একটা সহজ উদাহরণ দেখি।

ধরুন, ক্যালিফোর্নিয়ার এল ডোরাডোর তুখোড় পুঁজিপতি স্যামুয়েল গ্রিডি একদিন একটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেন।

একই শহরের উঠতি ঠিকাদার এ এ স্টোন তার প্রথম বড়ো কাজটা শেষ করে হাতে পেলেন নগদ লাখ দশেক ডলার। সেটা নিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন গ্রিডির ব্যাংকে জমা করে দিতে। এখন ব্যাংকের পুঁজির পরিমাণ হয়ে গেল ১০ লাখ ডলার।

এদিকে শহরের একজন ঝানু রাঁধুনি জেন ম্যাকডোনাট খেয়াল করলেন যে, শহরে ভালো কোনো বেকারি নেই, কাজেই এই সুযোগ একটা নতুন ব্যবসায় শুরু করার। কিন্তু সেটা করার মতো টাকা তাঁর কাছে নেই। কাজেই তিনিও গেলেন ব্যাংকে, গিয়ে গ্রিডিকে বোঝালেন যে এই বেকারিটা হবে টাকা খাটানোর মোক্ষম জায়গা। বুঝিয়েসুঝিয়ে তিনি ১০ লাখ ডলার ধার নেওয়ার ব্যবস্থাও করে ফেললেন। ব্যাংকের হিসাবের খাতায় তার নামের পাশে যোগ হলো ১০ লাখ ডলার।

এখন বেকারি তৈরি করে দেওয়ার জন্য ম্যাকডোনাট গিয়ে ধরলেন ঠিকাদার স্টোনকে। এই কাজ বাবদ স্টোন চাইলেন ১০ লাখ ডলার।

ম্যাকডোনাট স্টোনকে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ লাখ ডলারের একটা চেক ধরিয়ে দিলেন। স্টোন সেটা জমা করলেন নিজের অ্যাকাউন্টে।

তাহলে ব্যাংকে স্টোনের অ্যাকাউন্টে এখন কত আছে? ঠিক ধরেছেন, ২০ লাখ ডলার।

কিন্তু ব্যাংকের সিন্দুকে নগদ ডলার আছে কত? ১০ লাখ!

এখানেই শেষ নয়। দুমাস পর স্টোন ম্যাকডোনাটকে জানালেন, এদিক-সেদিক দিয়ে খরচ বেড়ে গিয়ে এখন আর ১০ লাখ ডলারে বেকারিটা তৈরি করা যাচ্ছে না, পুরোটা শেষ করতে মোট খরচ ২০

লাখ ডলারে দাঁড়াবে। ম্যাকডোনাট এতে খুশি না হলেও, কাজ তো আর মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া যায় না, তাই তিনি আবার গেলেন ব্যাংকে, গিয়ে গ্রিডিকে বুঝিয়ে আরো ১০ লাখ ডলার ধার করে আনলেন নিজের অ্যাকাউন্টে। তারপর সেটা পাঠিয়ে দিলেন স্টোনের অ্যাকাউন্টে।

তাহলে এখন স্টোনের অ্যাকাউন্টে কত জমল? ৩০ লাখ।

কিন্তু ব্যাংকে আছে কত? ব্যাংক কিন্তু সেই শুরু থেকেই মাত্র ১০ লাখ ডলার নিয়ে বসে আছে।

আমেরিকার বর্তমান আইন অনুযায়ী ব্যাংকটা এই কাজ আরো সাতবার করতে পারে, অর্থাৎ স্টোনের অ্যাকাউন্টের অঙ্কটা ১ কোটিতে গিয়েও ঠেকতে পারে, যদিও ব্যাংকের সিন্দুকে সেই ১০ লাখই সম্বল। একটা ব্যাংক তার কাছে থাকা প্রতি ডলারের বিপরীতে ১০ ডলার পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে। তার মানে হলো এখনকার দিনে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যত টাকা দেখা যায় তার ৯০ শতাংশই আসলে কাগজের নোট কিংবা ধাতব মুদ্রার আকারে নেই।[২] আজ যে-কোনো একটা বড়ো ব্যাংকের সব গ্রাহক যদি একই সঙ্গে যার যার অ্যাকাউন্টের সব টাকা তুলে নিতে চায়, সেই ব্যাংক কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে বসবে (যদি না সরকারি সাহায্য মেলে)।

পুরো ব্যাপারটাকে কি একটা বিরাট ধোঁকাবাজি মনে হচ্ছে? তাই যদি হয়, তাহলে বর্তমান পৃথিবীর সম্পূর্ণ অর্থনীতিই একটা বিশাল ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আসলে এটা ধোঁকাবাজি নয়, বরং মানুষের কল্পনাশক্তির একটা চরম নিদর্শন। আমরা অনাগত ভবিষ্যতের ওপর ভরসা রাখি, আর সেই ভরসার ভিত্তিতেই ব্যাংকগুলো টিকে থাকে, অর্থনীতি এগিয়ে যায়। পৃথিবীর প্রায় সবটুকু টাকাপয়সার গোড়ায় আছে এই বিশ্বাস।

ওপরের গল্পে স্টোনের অ্যাকাউন্টের টাকা আর ব্যাংকের সম্পদের পার্থক্যটাই হলো ম্যাকডোনাটের টাকা। এই টাকাটা গ্রিডি পুঁজি হিসেবে খাটিয়েছেন আরো টাকা তৈরির আশায়। বেকারি থেকে একটা রুটিও তৈরি হয়নি এখনো, অথচ গ্রিডি আর ম্যাকডোনাট দুজনেই আশা করছেন যে বছরখানেকের মধ্যেই এই বেকারি থেকে

অনেক রুটি, কেক আর বিস্কুট তৈরি হবে, সেগুলো বিক্রি করে আসবে লাভের টাকা। সেই টাকা দিয়ে ম্যাকডোনাট তার ঋণ সুদসহ শোধ করে দিতে পারবেন। তখন যদি স্টোন তার অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা তুলে নিতে চান, গ্রিডিও সেটা দিতে পারবেন। তার মানে সবকিছুই হচ্ছে একটা কাল্পনিক ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস রেখে। ব্যাংক মালিক আর বেকারি মালিক বিশ্বাস করে, একদিন বেকারিটা ঠিকমতো চলবে; আর ঠিকাদার বিশ্বাস কওে, একদিন ব্যাংকে টাকা আসবে।

আমরা আগেই দেখেছি, টাকার যে-কোনো কিছুতে পরিণত হওয়ার একটা বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে, আবার যে-কোনো কিছুকে অন্য যে-কোনো কিছুতে পরিণত করার ক্ষমতাও আছে। তবে আগে এই ক্ষমতাও সীমিত ছিল। তখন টাকা আর টাকার বিনিময়ে পাওয়া সবকিছু 'বর্তমানেই' আটকে ছিল। তাই নতুন নতুন ব্যবসায় শুরু করাটা খুব সহজ হতো না, আর অর্থনীতির বৃদ্ধির গতিও ছিল অনেক ধীর।

বেকারির কথাটাই ভাবুন। ম্যাকডোনাট কি নিজের টাকায়, বা নিজের কোনো সম্পদ দিয়ে বেকারিটা তৈরি করতে পারতেন? পারতেন না। বর্তমানে তার বেকারি তৈরির স্বপ্ন আছে, কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করার মতো টাকা নেই। রুটি আর কেক বিক্রি করতে না পারলে তার হাতে টাকা আসবেও না। টাকা না থাকলে কোনো ঠিকাদার তাকে বেকারি তৈরি করেও দেবে না।

কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ এই চক্রে আটকা পড়ে ছিল। তাই অর্থনীতিও এগোচ্ছিল ধীরে। এখান থেকে বেরোবার পথ মানুষ আবিষ্কার করেছে এই আধুনিক যুগে এসে, ভবিষ্যতে বিশ্বাস রেখে কাজ করার এই নতুন পদ্ধতি তৈরি করে। এখন মানুষ কাল্পনিক পণ্যে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ যে জিনিসটা বর্তমানে নেই, সেটাও তারা 'ক্রেডিট' নামক ধার করা টাকা দিয়ে কেনে। ক্রেডিটের মাধ্যমে মানুষ ভবিষ্যৎ বিক্রি করে বর্তমানকে সাজায়। এর গোড়ায় আছে একটাই বিশ্বাস– ভবিষ্যতে আমরা যে সম্পদের মালিক হব সেটা আমাদের বর্তমান সম্পদের চেয়ে ঢের বেশি। সেই ভবিষ্যতে অর্জিত

সম্পদ খরচ করে বর্তমানের পণ্য কেনার এই সুযোগটাই দারুণ সব সম্ভাবনা তৈরি করল।

তাহলে ক্রেডিটের মতো এই চমৎকার জিনিসের কথা মানুষ আরো আগে ভাবেনি কেন? ভেবেছে তো বটেই। ক্রেডিটের কাছাকাছি কিছু-না-কিছু সেই প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা থেকে শুরু করে আমাদের জানা প্রায় সব সভ্যতাতেই ছিল। কিন্তু তখনকার মানুষ সেটাকে কাজে লাগাতে পারেনি। কারণ ভবিষ্যৎ যে বর্তমানের চেয়ে ভালো হবে– এই বিশ্বাসটা তাদের মধ্যে এত জোরালো ছিল না। সাধারণত তারা ভাবত অতীতের দিনগুলোই ভালো ছিল, আর ভবিষ্যৎ বর্তমানের চেয়ে খুব একটা ভালো হবে না। অর্থনীতির ভাষায় বলতে গেলে, তারা ভাবত, তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট, সেটা কমলেও কমতে পারে, কিন্তু বেড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই ১০ বছর পরে তাদের ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, এমনকি পৃথিবীর মোট সম্পদের উৎপাদন যে আরো বাড়তে পারে, এটা তারা চিন্তাই করতে পারত না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সব যোগ-বিয়োগের ফল হতো শূন্য। হ্যাঁ, একটা বেকারি হয়তো অনেক লাভ করতে পারে, কিন্তু সেজন্য পাশের বেকারিটাকেই হয়তো লোকসান গুনতে হবে। ভেনিস শহরের উন্নতি করতে গেলে দেখা যাবে জেনোয়া পথে বসে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডের সম্পদ বাড়াতে গেলে হয়তো ফ্রান্স থেকেই লুট করে আনতে হবে। একটা কেককে যেভাবেই কাটা হোক না কেন, সেই টুকরোগুলো জোড়া দিলে কি আর সেটা ওই কেকটার চেয়ে বড়ো হতে পারে?

এই কারণেই অনেক সমাজে বেশি টাকার মালিক হওয়াটাকে পাপের কাজ হিসেবে দেখা হতো। যিশুখ্রিষ্ট তো বলেছেনই, ‘ধনী মানুষের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে সুঁইয়ের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে উটের চলে যাওয়া সহজ।’ (ম্যাথিউ ১৯:২৪)। একটা কেক কেটে কেউ যদি বড়ো টুকরোটা নিয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই সে অন্য কারো ভাগেরটুকুও নিয়ে যাচ্ছে। এইজন্যই ধনী মানুষেরা তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করে পাপক্ষালন করত।
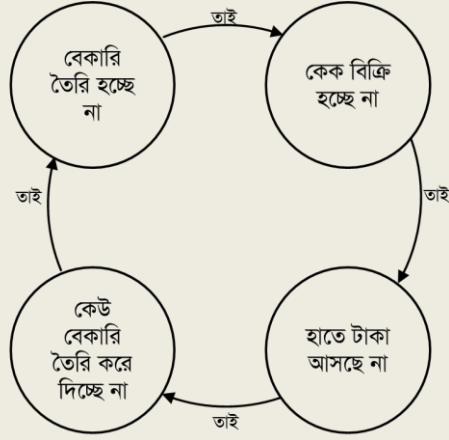
উদ্যোক্তার দোটানা

কেকটার আকার যদি না বাড়ে, তাহলে আসলে ক্রেডিটের ব্যাপারটাই আর থাকে না। আজকের কেকের আকার আর আগামীকালের কেকের আকারের পার্থক্যটাই হলো ক্রেডিট। কেকের আকার যদি না বাড়ে, তাহলে ক্রেডিট আসবে কোত্থেকে? সেক্ষেত্রে অন্য কারো ভাগেরটা দখল করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সেখানে ঝুঁকি আছে। এজন্যই আগেকার দিনে টাকা ধার নেওয়াটা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। ধার নিতে পারলেও সেই টাকার অঙ্কটা হতো অনেক কম, পাওয়া যেত অল্প সময়ের জন্য, আর ফেরত দেওয়ার সময় দিতে হতো চড়া সুদ। তাই নতুন ব্যবসায় শুরু করাটা তখন এত সহজ ছিল না। রাজারাও নতুন একটা প্রাসাদ বানানোর আগে, কিংবা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রজাদের ওপর কর বাড়িয়ে দিয়ে টাকা জোগাড় করতেন।

রাজাদের জন্য এটা তেমন কোনো সমস্যাই ছিল না (যদি প্রজারা খেপে না যায়), কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য এটা ছিল অনেক বড়ো বাধা। যার চোখে একটা নতুন বেকারি তৈরির স্বপ্ন ছিল, তাকে হয়তো টাকার জন্য অন্য কারো রান্নাঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে হতো।

এই পরিস্থিতিটা সবার জন্যই খারাপ। ক্রেডিট সীমিত বলে মানুষ নতুন ব্যবসায় শুরু করতে পারছে না। তাই অর্থনীতির উন্নতিও থেমে যাচ্ছে। আবার অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে না বলে মানুষ আশা হারাচ্ছে, যারা পুঁজির মালিক তারাও ক্রেডিট বাড়াচ্ছে না। সমস্যাগুলো নিজেরাই নিজেদের জিইয়ে রাখে।

আধুনিক অর্থনীতির জাদুচক্র
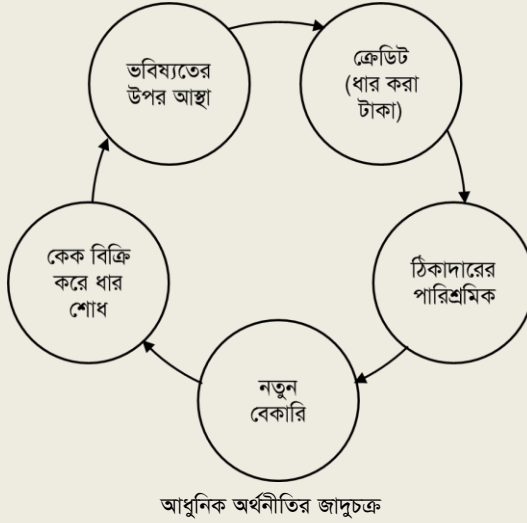
কেকটা বড়ো হচ্ছে

এরকম একটা সময়ে বিজ্ঞানের জগতে ঘটল বিপ্লব, শুরু হলো প্রগতির যুগ। এই প্রগতির ধারণার মূলে যে চিন্তা ছিল সেটা এরকম, যদি আমরা আজ আমাদের অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিই আর আমাদের সম্পদ গবেষণার কাজে লাগাই, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বর্তমানের চেয়ে আরো ভালো হবে। খুব দ্রুতই এর অর্থনীতিতে এর প্রভাব দেখা গেল। যারা এই প্রগতির ধারণায় বিশ্বাস করে, দেখা গেল তারা এটাও বিশ্বাস করে যে বিভিন্ন ভৌগোলিক আবিষ্কার, প্রযুক্তির উদ্ভাবন আর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন আমাদের উৎপাদন ও

সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। ভারত মহাসাগরের ব্যবসায় পুরোপুরি চালু রেখেই পাশাপাশি এবার আটলান্টিক মহাসাগরেও নতুন নতুন ব্যবসায়ের পথ তৈরি হলো। আগের সব সম্পদের উৎপাদন ঠিক রেখেই নতুন সম্পদের উৎপাদন শুরু হলো। এই যেমন কোনো বেকারি কেক তৈরি শুরু করলে তাতে অন্য কোনো বেকারির রুটি তৈরিতে ভাটা পড়ল না। বরং তাতে মানুষের খাবারে বৈচিত্র্য এল, মানুষ আরো বেশি খেতে শুরু করল। কারো সম্পদ কেড়ে না নিয়েও যে কেউ আরো ধনী হতে পারে, সেটা এবার দেখা গেল। একটু আগে যে কেক ভাগাভাগির কথা হচ্ছিল, সেই কেকটা এবার দিনে দিনে আরো বড়ো হতে লাগল। তাই অন্য কারো ভাগ থেকে না নিয়েও আরো বড়ো টুকরো পাওয়া সম্ভব হলো।

গত ৫০০ বছরে এই প্রগতির কারণেই মানুষের ভবিষ্যতের ওপর আস্থা আরো বেড়েছে। এই আস্থার কারণে বেড়েছে ক্রেডিটের পরিমাণ, তার ফলে এসেছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, আর সেই অগ্রগতিই ভবিষ্যতের ওপর আস্থা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে, ফলে আরো ক্রেডিট তৈরি হচ্ছে। এটা একদিনে হয়নি। শুরুতে অনেক উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে এলেও এখন সেটা অনেকটাই মসৃণ হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে আজ ক্রেডিটের ছড়াছড়ি। তাই এখন সরকার, বড়ো বড়ো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, এমনকি সাধারণ মানুষেরাও অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদে বড়ো অঙ্কের ঋণ নিতে পারে।
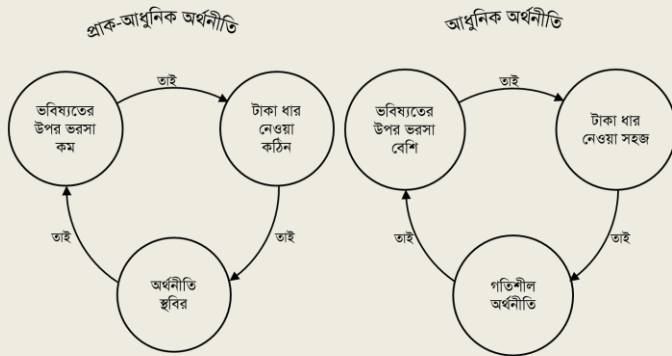
সংক্ষেপে পৃথিবীর অর্থনীতির ইতিহাস

সম্পদের পরিমাণ যে দিনে দিনে বাড়ছে– এই ধারণাটাই অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। ১৭৭৬ সালে স্কটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ 'The Wealth of Nations' নামে একটা যুগান্তকারী বই লেখেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অর্থনীতিতে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই সম্ভবত আর লেখা হয়নি। সে বইয়ের প্রথম খণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্মিথ একেবারে নতুন কিছু যুক্তি হাজির করেন। তিনি বলেন, যখন একজন জমিদার, অথবা কোনো তাঁতি, কিংবা মুচি তার নিজের পরিবারের চাহিদার চেয়েও বেশি টাকা আয় করে, তখন সে ওই অতিরিক্ত টাকা দিয়ে সহকারী নিয়োগ করে আরো বেশি টাকা আয় করতে পারে। যত বেশি টাকা আয় হবে, তত বেশি সহকারী ওই কাজে নিযুক্ত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো পেশাজীবীর ব্যক্তিগত লাভ যত বেশি হবে, সমাজের মোট সম্পদ ও উন্নয়নও ততই বাড়বে।

আমাদের কাছে এই জিনিসটা খুবই সাদামাটা মনে হবে, 'যুগান্তকারী' তো কোনোভাবেই না। এর কারণ হলো, আমরা বাস করি একটা পুঁজিবাদী পৃথিবীতে, যেটা কিনা ইতিমধ্যেই স্মিথের কথা অনুযায়ী চলছে। স্মিথের এই কথাগুলোই ঘুরেফিরে নানাভাবে আমরা প্রতিদিন চোখের সামনে দেখতে পাই, তাই এটাকে আর বিশেষ কিছু বলে মনে হয় না। অথচ 'ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করে, ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়িয়ে সমাজের সমন্বিত সমৃদ্ধি অর্জন করা'– এই ধারণাটা শুধু অর্থনৈতিক নয়, মানুষের নৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও একটা ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। স্মিথ বলেন যে, লোভ জিনিসটা আসলে খারাপ নয়। আমি ধনী হলে আসলে আমার একার নয়, সবারই কোনো-না-কোনোভাবে উপকার হয়। অর্থাৎ স্বার্থপরতার মধ্যেই আছে পরার্থপরতা।

স্মিথ মানুষকে শেখালেন এক নতুন অর্থনীতি, যেখানে সবারই লাভ হয়, ঠকে না কেউই। আমার লাভ মানে তোমারও লাভ। মানে শুধু আমি যে কেকের বড়ো টুকরোটা পাব তা-ই নয়, আমি বেশি পেলে তোমার টুকরোটাও বড়ো হবে। আমি অভাবে থাকলে তোমার অভাবও যাবে না, কারণ তোমার তৈরি জিনিসটা তখন আমি কিনতে পারব না। আমি ধনী হলেই কেবল তোমার তৈরি জিনিস আমার

কাছে বেচে তুমিও ধনী হতে পারবে। সম্পদ আর নৈতিকতার মধ্যেকার দ্বন্দ্বটাকে স্মিথ একেবারে উড়িয়ে দিলেন। বলা যায় স্বর্গের যে দরজাটা ধনীদের জন্য এতদিন বন্ধ ছিল, স্মিথ সেটা খুলে দিলেন। এখন ধনী হওয়াটাই নৈতিক। স্মিথের ভাষ্যমতে, মানুষ অন্যের সম্পদ কেড়ে নিয়ে ধনী হয় না, বরং নিজে ধনী হতে গিয়ে সবার মোট সম্পদের পরিমাণটাই আরো বাড়িয়ে দেয়। তাতে সবারই লাভ। তাই এখন ধনীরা আর পাপী নয়, বরং তারাই সমাজের সবচেয়ে বড়ো হিতাকাঙ্ক্ষী, কারণ তারাই অর্থনীতিকে সচল রেখে সবার উপকার করে।

অবশ্য এর সবটাই নির্ভর করে ধনীদের কাজের ওপর। সম্পদের মালিকেরা যদি তাদের লাভের টাকা ফেলে না রেখে সেটা নতুন কিছু তৈরি করতে বা আরো শ্রমিক নিয়োগ করতে কাজে লাগায়, তাহলেই শুধু এটা সম্ভব। বেশি লাভ হলে সেই অতিরিক্ত টাকা সিন্দুকে ফেলে রাখলে কদিন পরপর সেটা গুনে দেখা ছাড়া আর কোনো কাজেই আসবে না। বরং সেই টাকাকে আরো বেশি উৎপাদনের জন্য খরচ করতে হবে। এটাই স্মিথের প্রস্তাবিত অর্থনীতির মূলমন্ত্র। আধুনিক পুঁজিবাদের মূল কথা এটাই– লাভের টাকা উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে, তাতে আরো বেশি লাভ হবে, সেই টাকাও আবার বিনিয়োগ করতে হবে, তাতে আরো লাভ আসবে– এভাবে চলতেই থাকবে, থেমে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বিনিয়োগ নানাভাবে করা যায়। কারখানাটাকে আরো একটু বড়ো করা যায়, গবেষণা করা যায়, নতুন কোনো পণ্যও বানানো যায়। এই সবকিছুই বিনিয়োগ, কোনো-না-কোনোভাবে উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। তাই পুঁজিবাদের প্রথম ও প্রধান নীতিই হলো– লাভের টাকাকে আরো বেশি উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে।

এই কারণেই পুঁজিবাদকে 'পুঁজিবাদ' বলা হয়, কারণ এখানে 'পুঁজি' আর 'সম্পদ'– এ দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। পুঁজি হলো টাকা, মালামাল বা যে-কোনো সম্পদ যা উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে সম্পদ হলো মাটির নিচে পুঁতে রাখা টাকার বান্ডিল, যা কোনো কিছু উৎপাদনের কাজে লাগে না। যে

ফারাও অনেক টাকা খরচ করে একটা বিশাল পিরামিড বানিয়েছে সে পুঁজিবাদী নয়। যে জলদস্যু স্প্যানিশ নৌবহর লুট করে পাওয়া কাঁড়ি কাঁড়ি সোনার মোহর কোনো ক্যারিবিয়ান দ্বীপের বালিতে পুঁতে রেখেছে, সেও পুঁজিবাদী নয়। পুঁজিবাদী হলো সেই শ্রমিক, যে তার প্রতি মাসের যৎসামান্য বেতন থেকে কিছু টাকা শেয়ারবাজারে খাটায়।

'লাভের টাকা উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে হবে'– এই ধারণাটা আমাদের কাছে খুব সাধারণ মনে হলেও একসময় মানুষের কাছে এটা অস্বাভাবিক ছিল। এই আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার আগেও মানুষ মনে করত মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমবেশি একই রকম। কাজেই উৎপাদন যদি আর না-ই বাড়ে, তবে আরো বেশি বিনিয়োগ করে কী হবে? তাই মধ্যযুগের অভিজাত শ্রেণির মানুষের মধ্যে দান আর ভোগ– এ দুটো ব্যাপার খুব বেশি দেখা যেত। তাদের লাভের টাকা খরচ হতো নানা রকম প্রতিযোগিতায়, যুদ্ধে, পান-ভোজনে আর ভোগবিলাসে, নয়তো খরচ হতো গরিবকে কিংবা ধর্মীয় কাজে দান করে। খুব কম মানুষই লাভের টাকা দিয়ে চাষবাস বা নতুন কোনো ব্যবসায়ের কথা ভাবত।

অথচ বর্তমানে সেই অভিজাতদের জায়গাটা নিয়েছে পুঁজিপতিরা। এই পুঁজিবাদী সমাজে আগেকার সেই সামন্ত কিংবা জমিদারদের গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিদের। আজকের পুঁজিপতিরা মধ্যযুগের সেই অভিজাতদের চেয়ে অনেক বেশি ধনী, কিন্তু তারা ভোগ করে অনেক কম। এইসব মানুষ তাদের আয়ের খুব অল্প অংশই অনুৎপাদনশীল কাজে খরচ করে।
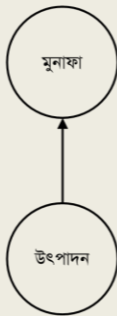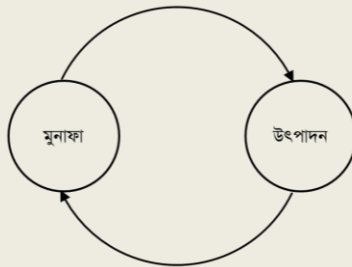
মধ্যযুগে অভিজাত মানুষেরা সোনা আর রেশমের সুতোয় বোনা কাপড় পরত, বড়ো বড়ো ভোজসভা, উৎসব আর প্রতিযোগিতায় অনেকটা সময় দিত। অথচ আজকের দিনের কোনো প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাকেও দেখা যায় সুট নামের ইউনিফর্ম পরতে, আর কাজের বাইরে দেওয়ার মতো সময় তাদের নেই বললেই চলে। একজন পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীর সারা দিন কাটে মিটিংয়ে মিটিংয়ে, আর কীভাবে নতুন নতুন জায়গায় বিনিয়োগ করা যায়, শেয়ারের দাম বাড়ল না কমল সেই চিন্তা করে করে। হ্যাঁ, তার সুটটা অনেক দামি কাপড়ের হতে পারে, তার চলাচলের জন্য নিজের একটা বিমানও থাকতে পারে– কিন্তু তার পরেও, তার বিনিয়োগের তুলনায় ভোগের পরিমাণটা নগণ্য।

শুধু যে দামি সুট পরা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই বিনিয়োগ কওে, তা নয়। সাধারণ মানুষ অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও একই রকম চিন্তা করে। এজন্যই খাবার টেবিলের আড্ডাতেও প্রায়ই উঠে আসে জমানো টাকা দিয়ে শেয়ার কিনলে ভালো হবে নাকি জমি কিনলে, এই ধরনের বিষয়। সরকারও করের টাকা এমনভাবে খরচ করতে চায়, যেন ভবিষ্যতে আরো বেশি কর আদায় করা যায়। এই যেমন, সরকার যদি নতুন একটা সমুদ্রবন্দর বানায়, তাহলে সেটা দিয়ে আরো বেশি পণ্য রপ্তানি হবে, তাতে পণ্য উৎপাদনকারীর আয় বাড়বে, সেখান থেকে সরকার আরো বেশি আয়কর পাবে। আবার

কোনো সরকার হয়তো শিক্ষাখাতে বেশি বিনিয়োগ করে, যাতে শিক্ষিত মানুষেরা আরো ভালো ভালো কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে আর সেখান থেকে আরো বেশি কর পাওয়া যায়।

পুঁজিবাদের শুরুটা হয়েছিল বইয়ের পাতা থেকে। টাকা জিনিসটা কীভাবে কাজ করে আর লাভের টাকা বিনিয়োগ করলে অর্থনীতি কীভাবে দ্রুত এগোয়– সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল এই তত্ত্ব। কিন্তু পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত স্রেফ একটা তত্ত্ব হয়ে বইয়ের পাতায় আটকে থাকেনি। এটা এখন আমাদের জীবনধারায় মিশে গেছে। মানুষের আচরণ কেমন হবে, শিশুদের কী শেখাতে হবে, কীভাবে চিন্তা করতে হবে– সবকিছুতেই পুঁজিবাদের ছায়া। পুঁজিবাদের মূল কথা হলো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই হলো আসল সমৃদ্ধি। এমনকি সুবিচার, স্বাধীনতা, এমনকি মানুষের সুখে থাকাও নির্ভর করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর। একজন ঘোর পুঁজিবাদী মানুষের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, জিম্বাবুয়ে কিংবা আফগানিস্তানে ন্যায়বিচার আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে কী করা দরকার, তাহলে সম্ভবত তার কাছে থেকে 'একটা স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ' সম্পর্কে একটা ছোটোখাটো বক্তৃতা শুনে আসতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পেছনেও এই পুঁজিবাদ নামক 'ধর্মের' অনেকটা প্রভাব আছে। সাধারণত বৈজ্ঞানিক গবেষণার পেছনে টাকা ঢালে সরকার অথবা কোনো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। যখন কোনো পুঁজিবাদী সরকার বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কোনো একটা গবেষণা প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে যায়, তখন তাদের মাথায় প্রথম যে প্রশ্নটা আসে সেটা হলো, 'এখানে বিনিয়োগ করে কি উৎপাদন বাড়বে? কোনো লাভ হবে? এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি কতটুকু হবে?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে সে গবেষণা আর এগোয় না। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে কোনোভাবেই পুঁজিবাদকে বাদ দেওয়া যায় না।

আবার উলটোটাও সত্যি। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে পুঁজিবাদের ইতিহাস লেখাও অসম্ভব। পুঁজিবাদ বিশ্বাস করে যে অর্থনীতির বৃদ্ধি চলতেই থাকবে, থামবে না কখনো। কিন্তু এই বিশ্বাস ধরে রাখতে হলে তো সামনে কি আছে সেটা জানতে হবে। একটা নেকড়ের পাল যদি

মনে করে ভেড়ার সংখ্যা সব সময় বাড়তেই থাকবে– তাহলে সেটা হবে স্রেফ বোকামি। মানবসমাজের অর্থনীতি অনেক বছর ধরে দুর্বার গতিতে বেড়ে চলেছে এবং এখনো বেড়ে চলছে– এর পেছনে একচেটিয়া কৃতিত্ব বিজ্ঞানীদের ও তাঁদের সব আবিষ্কারের। আমেরিকা আবিষ্কার, অন্তর্দহন (Internal Combustion) ইঞ্জিন আবিষ্কার কিংবা উন্নত প্রজাতির গবাদিপশু আবিষ্কার– এসব নিত্যনতুন আবিষ্কারই অর্থনীতির বিকাশের পেছনে ভূমিকা রেখে চলেছে। সরকার আর ব্যাংক কাগজে টাকা ছাপে বটে, কিন্তু সেই টাকাকে মূল্যবান করে তোলে বিজ্ঞানীরাই।

বেশ কয়েক বছর ধরেই সরকার আর ব্যাংকগুলো টাকা ছেপে কূল পাচ্ছে না। বর্তমান সংকটময় অবস্থায় অর্থনীতির অগ্রগতি থেমে যেতে পারে, এই ভয়ে ক্রেডিটের নামে তৈরি হচ্ছে কোটি কোটি ডলার, ইউরো আর ইয়েন। অর্থনীতি ফুলেফেঁপে উঠছে একটা বিরাট বুদ্‌বুদের মতো, যেটা যে-কোনো সময় ফেটে যেতে পারে জেনেও মানুষেরা সেটাকে আরো ফুলিয়ে তুলছে। তার পরও মানুষ আশা করছে যে পৃথিবীর বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ আর প্রকৌশলীরা আরো নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে বৃদ্ধিটা অব্যাহত রাখবে, অর্থনীতির বুদ্‌বুদটাকে ফেটে যেতে দেবে না। এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণাই সবার ভরসা। জৈবপ্রকৌশল বা ন্যানো-প্রকৌশলের মতো বিষয়ে এখনো নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। সেটা সম্ভব হলে ২০০৮ থেকে আগাম তৈরি হওয়া কোটি কোটি টাকা সার্থক হবে। আর যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় সামনের দিনগুলো হবে অনেক কঠিন।

কলম্বাসের টাকা চাই

পুঁজিবাদ শুধু বিজ্ঞানের বিকাশেই নয়, ইউরোপের সাম্রাজ্য-বিস্তারের পেছনেও একটা বিরাট ভূমিকা রেখেছে। পুঁজিবাদে ক্রেডিটের ধারণাটাও এসেছে তখন থেকেই। না, ক্রেডিট জিনিসটা আধুনিক ইউরোপের আবিষ্কার নয়। প্রায় সব কৃষিভিত্তিক সমাজেই ক্রেডিটের ধারণা ছিল আরো আগে থেকেই, আর এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের সম্পর্কটাও বেশ ঘনিষ্ঠ।

এখানে মনে রাখা দরকার, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্তও এশিয়া ছিল পৃথিবীর অর্থনৈতিক কেন্দ্র। চীন, মধ্যপ্রাচ্য বা ভারতের তুলনায় ইউরোপের পুঁজির পরিমাণ ছিল খুবই কম।

তবে চীন, ভারত আর মুসলিম বিশ্বের তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় ক্রেডিট জিনিসটা খুব বেশি গুরুত্ব বহন করত না। ইস্তাম্বুল, ইস্পাহান, দিল্লি আর বেইজিংয়ের ব্যবসায়ী ও ব্যাংক-মালিকদের মধ্যে পুঁজিবাদী চিন্তা কিছুটা থাকলেও রাজা আর সেনাপতিরা সেটা পছন্দ করত না। ইউরোপের বাইরে বেশিরভাগ সাম্রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হয় নুরহাচি বা নাদির শাহের মতো দখলদার মানুষের হাতে অথবা চিং আর অটোমান সাম্রাজ্যের মতো রাজা-রাজড়াদের হাতে। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে টাকাপয়সা দরকার হতো সেটা আদায় করা হতো খাজনা আদায় করে অথবা লুট করে (যদিও এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য ছিল সামান্যই)। যেহেতু নগদেই সব কাজ হতো, তাই ক্রেডিট, ঋণ, সুদ, বিনিয়োগ– এসব নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যথা ছিল না।

অন্যদিকে ইউরোপের অবস্থা ছিল ঠিক এর বিপরীত। ব্যবসায়ী আর ব্যাংকাররা ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসার আগে থেকেই সেখানকার রাজা আর সেনাপতিদের চিন্তাধারা ছিল ব্যবসায়ীদের মতো। ইউরোপীয়দের বিশ্বজোড়া অভিযানের খরচ জোগানোর ক্ষেত্রে প্রজাদের খাজনার চেয়ে ক্রেডিটের ভূমিকাই বেশি ছিল। পুঁজিবাদী মানুষেরা বেশি লাভের আশায় ক্রমে এসব অভিযানে আগ্রহী হয়েছে। এই হ্যাট-কোট পরা ব্যবসায়ীদের তৈরি সাম্রাজ্যই কিন্তু একদিন রেশমি রাজপোশাক আর ধাতব বর্মধারী মানুষের সাম্রাজ্য দখল করে নিয়েছে। অভিযানের পেছনে টাকা ঢালার ব্যাপারে ইউরোপীয়রা অনেক বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। খাজনা কেউই দিতে চায় না, অথচ বিনিয়োগে আপত্তি নেই কারো।

১৪৮৪ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস ইউরোপ থেকে পশ্চিম দিক দিয়ে পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার নতুন পথ খুঁজতে যাবেন বলে আর্থিক সাহায্য চাইলেন পর্তুগালের রাজার কাছে। সে তো যেমন তেমন অভিযান নয়, জাহাজ বানাতে হবে, অনেক দিনের রসদ নিতে হবে, নাবিক আর সৈনিকদের বেতন দিতে হবে– অনেক টাকার ব্যাপার।

আবার এতগুলো টাকার বিনিময়ে যে অভিযানটা সফল হবে, তার বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। কাজেই রাজা সোজা না করে দিলেন।

আজকের দিনে নতুন উদ্যোক্তারা যা করে, কলম্বাস ঠিক তাই করলেন। তিনি একে একে আবেদন জানালেন ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড আর পর্তুগালের ধনী লোকদের কাছে। কেউই রাজি হলো না। শেষমেশ তিনি গেলেন স্পেনের নতুন রাজা ফার্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলার কাছে। একা গেলেন না, গেলেন তদবির করার জন্য কয়েকজন ঝানু লোককে সঙ্গে নিয়ে। তাদের সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত রানি ইসাবেলার কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস মিলল। আজ তো সবাই জানে, ইসাবেলা কী দারুণ বিনিয়োগটা করেছিলেন সে সময়। কলম্বাসের অভিযানের পর স্প্যানিয়ার্ডরা আমেরিকা দখল করে নেয়। সেখানে তারা সোনা আর রুপার খনি খুঁজে পেল, পাশাপাশি চিনি আর তামাকের ব্যাপক উৎপাদন শুরু করল। আর তাতেই স্পেনের রাজা, ব্যাংকার আর ব্যবসায়ীদের সম্পদ ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করল।

এর শ-খানেক বছর পর ইউরোপের ব্যাংকার আর রাজবংশীয়রা এসব অভিযানে বিনিয়োগ করা আরো বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকা থেকে আনা সম্পদ তো তাদের কাছে ছিলই। শুধু টাকাপয়সাই নয়, এই ধরনের অভিযানের ওপর তাদের আস্থাও বেড়েছিল অনেকখানি। এইভাবেই শুরু হলো সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদের লাভের চক্র– টাকা দিয়ে নতুন নতুন অভিযান শুরু হচ্ছে, তাতে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কৃত হচ্ছে, সেসব জায়গায় উপনিবেশ তৈরি হচ্ছে, উপনিবেশ থেকে আরো টাকা আসছে, তাতে মানুষের ভরসা বাড়ছে, তাই বিনিয়োগও বাড়ছে। নুরহাচি (Nurhaci) আর নাদির শাহের (Nader Shah) অভিযান কয়েক হাজার কিলোমিটার গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, অথচ এসব পুঁজিবাদী অভিযান দিনে দিনে আরো গতি পেয়েছে।

তার পরও, এসব অভিযানে অনেক রকম ঝুঁকিও ছিল, তাই বিনিয়োগও অনেকটা সীমিত ছিল। এরকম অনেক অভিযান খালি হাতে ফিরে এসেছে। ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিম দিকে মেরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এশিয়ায় যাওয়ার পথ খুঁজতে অনেক টাকা নষ্ট করেছে।

এর মধ্যে অনেক অভিযান আর ফেরেইনি। হিমশৈলের ধাক্কায়, সামুদ্রিক ঝড়ে অথবা জলদস্যুদের হাতে অনেক জাহাজ হারিয়েছে তারা। বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়াতে আর ঝুঁকির পরিমাণ কমাতে তখন ইউরোপীয়রা যৌথ মূলধনি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান (Limited Liability Joint-stock Company) তৈরি করে। এর পরের অভিযানগুলোতে একজন মানুষের পরিবর্তে এরকম প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ করতে শুরু করে। তাতে অনেকজন মানুষ মিলে টাকা দেয়, তাই জনপ্রতি ঝুঁকির পরিমাণ অনেক কমে যায়। তবে ঝুঁকি সীমিত হলেও লাভ কিন্তু সীমিত নয়। অনেক সময় সামান্য বিনিয়োগে শুরু হওয়া অভিযান থেকেই আসত লাখ লাখ টাকা।

এভাবে কয়েক দশকের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপে বেশ মজবুত একটা অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড়িয়ে গেল। সেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই বিনিয়োগের জন্য অনেক টাকা জোগাড় করার ব্যবস্থা হলো। সেই টাকা সরকারি কিংবা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যেত। অভিযান পরিচালনার জন্য রাজ্যের চেয়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি সফলতার পরিচয় দিয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে স্পেন আর নেদারল্যান্ডের রেষারেষির মধ্যে। স্পেন তখন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ, তার এলাকাও বিশাল। ইউরোপের অনেকখানি, উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট এলাকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আর এশিয়া ও আফ্রিকার উপকূলের অনেক জায়গা স্পেনের দখলে। প্রতিবছর আমেরিকা আর এশিয়ার প্রচুর সম্পদ নিয়ে সেভিয়া (Seville) আর কাদিজ (Cadiz) বন্দরে ফিরত স্প্যানিশ নৌবহর। নেদারল্যান্ড তখন স্পেনের এক কোনায় পড়ে থাকা একটা সম্পদহীন ছোটো জলা এলাকা।

ডাচদের বেশিরভাগই ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট। ১৫৬৮ সালে তারা স্প্যানিশ ক্যাথলিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ডন কুইক্সোট (Don Quixote) যেমন উইন্ডমিলের সঙ্গে লড়তে গেছিলেন, শুরুতে ডাচ বিদ্রোহীদের অবস্থা ছিল ঠিক তেমনি। অথচ আশি বছরের মধ্যে তারা স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা তো আদায় করেছেই, তার ওপর সমুদ্রে স্প্যানিশ ও তাদের মিত্র পর্তুগিজদের

চেয়েও বেশি অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। নিজেদের একটা সাম্রাজ্য তৈরি করে তারা ইউরোপের সবচেয়ে ধনী রাজ্যে পরিণত হয়।

ডাচদের এই সাফল্যের মূলে আছে সেই ক্রেডিট। ডাচদের মধ্যে যারা সাধারণ নাগরিক, যুদ্ধে যাদের কোনো আগ্রহই নেই, তারাই স্প্যানিশদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য ভাড়াটে সৈনিক জোগাড় করল। ওদিকে সমুদ্রেও তারা নামিয়ে দিল বড়ো বড়ো যুদ্ধজাহাজ। ভাড়াটে সৈন্য আর যুদ্ধজাহাজের পেছনে অনেক টাকা খরচ হলো, কিন্তু সেটা জোগাড় করতে তাদের কোনো সমস্যাই হয়নি। কারণ সে সময়ে স্পেনের রাজার চেয়ে দেশের অর্থব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা বেশি ছিল। বিনিয়োগকারীরা ডাচদের সৈন্য সংগ্রহ ও জাহাজ তৈরিতে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। ডাচদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বাণিজ্যপথগুলো থেকে লাভ হচ্ছিল ভালোই। সেই লাভের টাকা দিয়ে ডাচরা তাদের ঋণ শোধ করে দিল, ফলে বিনিয়োগকারীরাও আরো বিনিয়োগ করার ভরসা পেল। আমস্টারডাম ইউরোপের অন্যতম প্রধান সমুদ্রবন্দর তো বটেই, তার সঙ্গে ইউরোপের অর্থনৈতিক কেন্দ্রেও পরিণত হলো।

এখন প্রশ্ন হলো, ডাচরা কীভাবে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আস্থা অর্জন করল? প্রথমত, তারা সময়মতো সম্পূর্ণ ঋণ শোধ করতে কখনো ভুল করত না। তাই বিনিয়োগকারীরাও আরো টাকা দিতে দ্বিধা করত না। দ্বিতীয় কারণ হলো, সে দেশের বিচারব্যবস্থা ছিল স্বাধীন, আর সেটা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তাও দিত। এই নিশ্চয়তা না থাকলে ব্যবসায় করতে গিয়ে পুঁজি হারানোর ঝুঁকি থাকে। তাই দেশের আইনও বিনিয়োগের জন্য সহায়ক ছিল।

ধরুন, জার্মানির এক বিরাট পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর দুই ছেলে। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন শহরে তাঁর ব্যবসায়ের শাখা খোলার একটা দারুণ সম্ভাবনা দেখলেন। তিনি তাঁর দুই ছেলেকেই মূলধন হিসেবে ১০ হাজারটা করে সোনার মোহর দিয়ে বড়ো ছেলেকে পাঠালেন আমস্টারডামে, আর ছোটোটিকে পাঠিয়ে দিলেন মাদ্রিদে। সে সময়ে স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছে, ছোটো ছেলে গিয়েই স্পেনের রাজাকে সৈন্য জোগাড় করার জন্য তার সব টাকা ধার দিয়ে দিল। আর বড়ো ছেলে তার টাকাগুলো ধার দিল এক ডাচ ব্যবসায়ীকে। সেই ব্যবসায়ী ম্যানহাটন নামের একটা ঝোপেঝাড়ে ঢাকা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে কিছু জমি কিনতে চান, কারণ হাডসন নদীপথে

ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু হলেই ওই দ্বীপে জমির দাম হুহু করে বেড়ে যাবে। দুই ভাইই আশা করছে এক বছরের মধ্যে ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবে।

বছর গেল। ডাচ ব্যবসায়ী তাঁর কেনা জমি বেচে দিয়ে প্রচুর লাভ করলেন। কথামতো ধার শোধ করলেন, সুদসহ। বড়ো ছেলের সাফল্যে বাবাও খুশি হলেন। এদিকে ছোটো ছেলে পড়ল বিপদে। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে স্পেনের রাজা বেশ সুবিধাজনক অবস্থানেই আছেন, কিন্তু এর মধ্যে তিনি আবার নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়েছেন তুর্কিদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে ধার শোধ করার চেয়ে নতুন যুদ্ধ সামাল দেওয়া বেশি দরকার। ছোটো ছেলে রাজাকে চিঠি দিচ্ছে, দরবারের একে ওকে দিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু রাজার সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। কাজেই ধার দেওয়া টাকার সুদ তো দূরের কথা, ছোটো ছেলে এখন আসলটাও হারিয়ে বসে আছে। স্বাভাবিকভাবেই বাবাও অসন্তুষ্ট।

এদিকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে স্পেনের রাজা আবারও ছোটো ছেলের কাছে একই অঙ্কের টাকা দাবি করে বসলেন। তার কাছে তখন একটা টাকাও নেই। উপায় নেই, তাই সে অনেক বুঝিয়ে টাকা চেয়ে বাবাকে একটা চিঠি দিল। হাজার হলেও ছোটো ছেলের আবদার, বাবাও ফেলতে পারলেন না। কাজেই আরো ১০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা স্পেনের রাজকোষের ভেতরে কোথায় যে হারিয়ে গেল, তার হদিস আর পাওয়া গেল না। ওদিকে আমস্টারডামের অবস্থা পুরো উলটো। বড়ো ছেলে সেখানে একের পর এক ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিচ্ছে আর সময়মতো ফেরতও পাচ্ছে পুরোপুরি। তবে সুসময় তো আর চিরদিন থাকে না, তাই একবার ঘটল অঘটন। এক ফরাসি ব্যবসায়ী ভাবল কাঠের জুতো সামনে খুব চলবে, তাই সে বড়ো ছেলের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে প্যারিসে একটা জুতোর দোকান দিল। কিন্তু কপাল খারাপ, তার দোকানের জুতো বিক্রিই হলো না। কাজেই সে জানিয়ে দিল তার পক্ষে ধার শোধ করা সম্ভব নয়।

সব শুনে বাবা এবার ভীষণ খেপে গেলেন। দুই ছেলেকেই পরামর্শ দিলেন আইনের আশ্রয় নিতে। তারপর ছোটো ছেলে মাদ্রিদে মামলা করল স্পেনের রাজার বিরুদ্ধে, আর বড়ো ছেলে আমস্টারডামে মামলা করল প্যারিসের জুতোওয়ালার বিরুদ্ধে।

স্পেনের আদালত আবার রাজার কথায়ই ওঠে-বসে। কিন্তু নেদারল্যান্ডের আদালত দেশের সরকারেরই আলাদা শাখা, সেখানে রাজপরিবারের জন্য কোনো বাড়তি খাতির নেই। কাজেই ছোটো ছেলের মামলা মাদ্রিদের আদালতে পাত্তাই পেল না, ওদিকে আমস্টারডামের আদালত ধার শোধ করার জন্য জুতোওয়ালার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ফেলল। সবকিছু দেখে ছেলেদের বাবাও বুঝলেন, ব্যবসায় করতে হলে সেটা ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই করা উচিত, রাজাদের সঙ্গে নয়। আর করলেও সেটা মাদ্রিদের চেয়ে আমস্টারডামে করাটাই সংগত।

ছোটো ছেলের বিপদ শুধু বাড়ছেই। স্পেনের রাজার আরো টাকা দরকার, আর কোথায় টাকা পাওয়া যাবে সেটাও এতদিনে বুঝে ফেলেছেন। এবার তিনি গুপ্তচরবৃত্তির সাজানো অভিযোগ চাপিয়ে দিলেন ছোটো ছেলের ওপর, সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিলেন যে খুব তাড়াতাড়ি ২০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এনে দিতে না পারলে বাকি জীবনটা তাকে কারাগারেই কাটাতে হবে।

বাবারও শিক্ষা হয়ে গেছে। তিনি টাকা দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনলেন, আর প্রতিজ্ঞা করলেন, স্পেনে আর নয়। এরপর তিনি মাদ্রিদের ব্যবসায় গুটিয়ে ছোটো ছেলেকে পাঠালেন রটারডামে। হল্যান্ডেই দুই জায়গায় ব্যবসায় করার বুদ্ধিটা খারাপ নয়। শোনা যাচ্ছে, স্পেনের ব্যবসায়ীরাও নাকি তাদের টাকা স্পেনের বাইরে পাচার করে দিচ্ছে। তারাও বুঝে গেছে কোথায় ব্যবসায় করা লাভজনক আর নিরাপদ।

এভাবেই একসময় স্পেনের রাজা বিনিয়োগকারীদের আস্থা হারালেন, আর ডাচ ব্যবসায়ীরা আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। ডাচদের সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছে এই ব্যবসায়ীরাই। স্পেনের রাজা যখন ব্যক্তিগত স্বাথর্রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায্যভাবে খাজনা আদায় করে প্রজাদের বিরাগভাজন হচ্ছেন, তখন ডাচ ব্যবসায়ীরা টাকা ধার নিয়ে আর ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বিক্রি করে সাম্রাজ্য-বিস্তারে সাহায্য করছে। স্পেনের সরকারকে টাকা দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, যেসব সতর্ক ব্যবসায়ী ডাচ সরকারকে টাকা দেওয়ার আগেও দুবার ভাবত, তারাও ডাচ ব্যবসায়ীদের টাকা দিয়েছে নির্দ্বিধায়।

যৌথ মূলধনি ব্যবসায়ের শুরু তখন থেকেই। কোনো কোম্পানির সামনে বেশি লাভ করার সুযোগ দেখা গেলে মানুষ সেই কোম্পানির শেয়ার কিনতে শুরু করে, একটু বেশি দামে হলেও। আবার কোম্পানির লোকসানের সম্ভাবনা দেখা গেলে কম দামে শেয়ার বিক্রিও করে দেয়। এই শেয়ার কেনাবেচার সুবিধার্থে ইউরোপের বেশিরভাগ বড়ো শহরে স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সবচেয়ে বিখ্যাত ডাচ যৌথ মূলধনি কোম্পানি Vereenigde Oostindische Compagnie, সংক্ষেপে ভিওসি (VOC) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬০২ সালে, ঠিক যখন ডাচরা একটু একটু করে স্প্যানিশ শাসন থেকে বেরিয়ে আসছে। ভিওসি শেয়ার বিক্রির টাকায় জাহাজ বানিয়ে এশিয়ায় পাঠাত আর চীন, ভারত আর ইন্দোনেশিয়া থেকে মালামাল আনত। প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি বা জলদস্যুদের মোকাবিলা করার জন্যও তারা টাকা দিত। এমনকি ইন্দোনেশিয়া জয় করার অভিযানের খরচও দিয়েছে এই কোম্পানি।

ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দ্বীপপুঞ্জ। এর হাজার হাজার দ্বীপ সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই শত শত রাজা, সুলতান আর দলের শাসন দেখে এসেছে। ১৬০৩ সালে যখন ভিওসির ব্যবসায়ীরা প্রথমবার ওখানে যায়, তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই ব্যবসায়। কিন্তু দিনে দিনে ব্যবসায় ও ব্যবসায়ের অংশীদারদের স্বার্থেই তাদের নানা রকম সংঘাতে জড়াতে হয়েছে। স্থানীয় ক্ষমতাবানদের বাড়তি কর আদায়ের বিরুদ্ধে কিংবা অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নানাভাবে লড়তে হয়েছে ভিওসিকে। এসব বিরোধের জন্যই একদিন ভিওসির বাণিজ্যিক জাহাজে দেখা গেল কামান। তারা ইউরোপ, জাপান, ভারত আর ইন্দোনেশিয়া থেকে সৈনিক জোগাড় করল, নানা জায়গায় দুর্গ বানাল, এমনকি রীতিমতো সামনাসামনি যুদ্ধও করতে শুরু করল। একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের এমন কর্মকাণ্ড দেখে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু সে সময়ে বেসরকারি কোম্পানির যুদ্ধের আয়োজন করাটা বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। একটা বেসরকারি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান একটা আস্ত সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলছে– এটা সারা পৃথিবীতেই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

ভিওসির সৈন্যরা একটার পর একটা দ্বীপ দখল করতে করতে ইন্দোনেশিয়ার একটা বড়ো অংশকেই নিজেদের উপনিবেশ বানিয়ে ফেলে। প্রায় ২০০ বছর ধরে তারা ইন্দোনেশিয়া শাসন করেছে। ১৮০০ সালে ডাচরা ইন্দোনেশিয়া দখল করে পরের দেড় শ বছর ধরে শাসন করে। এই একবিংশ শতাব্দীতে করপোরেট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে– এমন কথা আমরা প্রায়ই শুনি। অথচ স্বার্থের জন্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলো যে কতদূর যেতে পারে তার নমুনা এর আগের শতাব্দীগুলোতে খুব ভালোভাবেই দেখা গেছে।

ভিওসি যখন ভারত মহাসাগরে তাদের 'বাণিজ্য' চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আটলান্টিকে একই কাজ করছিল ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোম্পানি বা ডব্লিউআইসি। হাডসন নদীতে নিজেদের দখল ধরে রাখার জন্য তারা ওই নদীর মুখেই একটা দ্বীপে 'নিউ আমস্টারডাম' নামের উপনিবেশ তৈরি করে। ইন্ডিয়ানরা মাঝেমধ্যেই সেখানে আক্রমণ করত। আর ব্রিটিশদের আক্রমণ ছিল নিয়মিত ঘটনা। ১৬৬৪ সালে ব্রিটিশরা জায়গাটা দখল করে নিয়ে তার নাম দেয় 'নিউ ইয়র্ক'। আক্রমণ ঠেকাতে ডব্লিউআইসির লোকেরা যে দেওয়াল তুলেছিল, আজ তার ওপর দিয়ে তৈরি রাস্তাকে সবাই 'ওয়াল স্ট্রিট' নামে চেনে।

নিজেদের আধিপত্যের আত্মপ্রসাদে আর এইসব যুদ্ধ চালাতে গিয়েই একসময় ডাচরা নিউ ইয়র্কের দখল হারায়, হারায় ইউরোপের অর্থনৈতিক কেন্দ্রের জায়গাটাও। সেই শূন্যস্থান পূরণ করার প্রতিযোগিতায় নামে ফ্রান্স আর ব্রিটেন। শুরুতে ফ্রান্সই এগিয়ে ছিল। ফ্রান্স দেশটা আকারে ব্রিটেনের চেয়ে বড়ো, তার মানুষ আর সম্পদও ছিল বেশি। সেনাবাহিনীও ছিল দক্ষ। তার পরও ইউরোপের অর্থনীতিতে ফ্রান্সের চেয়ে ব্রিটেনই এগিয়ে ছিল। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের সবচেয়ে বড়ো যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় সেটা মিসিসিপি বাবল (Mississippi Bubble) নামে পরিচিত। সেই সময়ে ফ্রান্সের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। আর তখনই ব্রিটেনের অর্থনীতি মানুষের আস্থা অর্জন করে। ঠিক তখনই একটা যৌথ মূলধনি কোম্পানির হাতে তৈরি হচ্ছে একটা সাম্রাজ্য।

১৭১৭ সালে ফ্রান্সের মিসিসিপি কোম্পানি মিসিসিপির অববাহিকায় উপনিবেশ তৈরির জন্য যাত্রা করে। নিউ অরলিয়ন্স শহরটা সে সময়েই তৈরি হয়। এই বিরাট পরিকল্পনা সফল করতে প্রচুর টাকা দরকার। ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের দরবারে মিসিসিপি কোম্পানির ভালো জানাশোনা ছিল। তারা তখন প্যারিস স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে শুরু করে। কোম্পানির পরিচালক জন ল ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর। রাজা তাঁকে অর্থায়ন-নিয়ন্ত্রকের পদও দেন (যেটা আজকের দিনের অর্থমন্ত্রীর পদের সমতুল্য)। ১৭১৭ সালে মিসিসিপির আশপাশে কুমির ভরা জলা জায়গা ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু তা নিয়ে মিসিসিপি কোম্পানি মানুষকে অঢেল সম্পদ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখায়। সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে ফ্রান্সের ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি আর অভিজাতরা প্রচুর বিনিয়োগ করে। মিসিসিপি কোম্পানির শেয়ারের দাম অনেক বেড়ে যায়। শুরুতে একেকটা শেয়ারের দাম ছিল ৫০০ লিভ্রা (পাউন্ড)। ১৭১৯-এর অগাস্টের ১ তারিখে এর দাম ছিল ২ হাজার ৭৫০ লিভ্রা, আর ৩০ তারিখে সেটাই হয়ে গেল ৪ হাজার ১০০ লিভ্রা। সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে এর দাম ৫ হাজার আর ডিসেম্বরের ২ তারিখে ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেল। সারা প্যারিসে সাড়া পড়ে গেল। মানুষেরা তাদের সবকিছু বিক্রি করে না হয় ধার নিয়ে ছুটল মিসিসিপির শেয়ার কিনতে। রাতারাতি ধনী হওয়ার নেশায় পেল সবাইকে।

৩৯। ম্যানহাটন দ্বীপের শেষ প্রান্তে নিউ আমস্টারডাম, ১৬৬০ সাল। এখানকার প্রতিরক্ষা দেওয়ালের ওপরেই তৈরি হয়েছে আজকের ওয়াল স্ট্রিট

কিছুদিনের মধ্যেই নেশা কেটে গিয়ে এলো আতঙ্ক। অনেকেই টের পেল, শেয়ারের এই উচ্চমূল্য আসলে অস্থায়ী আর অবাস্তব। তারা বুঝতে পারল দাম বেশি থাকতে থাকতেই শেয়ার বেচে দেওয়া উচিত। সবাই শেয়ার বিক্রি শুরু করতেই বাজারে শেয়ারের জোগান বাড়ার কারণে দাম কমে গেল। দাম পড়ে যেতে দেখে বাকিরাও যার যার শেয়ার তাড়াতাড়ি বেচে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কাজেই শেয়ারের দামে ধস নামে। শেয়ারের দাম স্থিতিশীল করতে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংক– বলা বাহুল্য, গভনর্র জন লয়ের নির্দেশে– মিসিসিপির শেয়ার কিনে নিতে থাকে। কিন্তু সব শেয়ার তো আর কিনে ফেলা সম্ভব নয়, ব্যাংকের টাকাও তো ফুরিয়ে যাবে। এই অবস্থায় দেশের অর্থায়ন-নিয়ন্ত্রক, অর্থাৎ সেই জন ল, বাকি শেয়ার কেনার জন্য নতুন টাকা ছাপানোর নির্দেশ দিলেন। এর ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা হয়ে গেল একটা বুদ্‌বুদের মতো। সবাই মিলে আগেপিছে না ভেবে ফুঁ দিয়ে (টাকা ঢেলে) সেটাকে ফুলিয়ে তুলেছে, কিন্তু ফুলতে ফুলতে বুদ্‌বুদটা যখন ফেটেই গেল, তখন সবাই নিঃস্ব, কারো আর কিছু করার নেই। নতুন টাকা ছেপেও শেষরক্ষা হলো

না। মিসিসিপি শেয়ারের দাম ১০ হাজার থেকে ১ হাজার হয়ে গেল, তারপর আরো কমতে কমতে একেবারে শূন্যে এসে ঠেকল। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর রাষ্ট্রীয় কোষাগার ভরা কেবল মিসিসিপির শেয়ারে, একটা টাকাও নেই। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের গায়ে আঁচড়ও লাগল না, তারা পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে তাদের শেয়ার বেচে দিয়েছে আগেই। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সর্বনাশ হয়ে গেল। অনেকে আত্মহত্যাও করেছিল তখন।

এই মিসিসিপি বাবল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক ধসগুলোর মধ্যে একটা। ফ্রান্স এই সংকট পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি আর কখনোই। মিসিসিপি কোম্পানি শেয়ারের দাম বাড়ানো আর মানুষের মধ্যে শেয়ার কেনার উন্মাদনা সৃষ্টি করতে যেভাবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েছিল তাতে দেশের মানুষ ফরাসি ব্যাংক ব্যবস্থা আর রাজার অর্থনৈতিক জ্ঞানের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ফলে পঞ্চদশ লুইয়ের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানোটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশদের কাছে ফরাসিদের পিছিয়ে পড়ার কারণ এটাই। ব্রিটিশরা খুব সহজে আর অল্প সুদে টাকা ধার নিতে পারত। ওদিকে ফ্রান্সে ঋণ নেওয়া আরো কঠিন হয়ে গেল, আর সুদের হারও বেড়ে গেল। সারা দেশের টাকার সংকট ঠেকাতে ফ্রান্সের রাজাকে চড়া সুদে অনেক টাকা ধার নিতে হলো। ১৭৮০ সালে নতুন রাজা ষোড়শ লুই সিংহাসনে বসেই দেখলেন দেশের বাজেটের অর্ধেক টাকা চলে যাচ্ছে শুধু ধার নেওয়া টাকার সুদ দিতে। রাজকোষ দেউলিয়া হতে বেশি বাকি নেই। এই সমস্যার সমাধান খুঁজতেই ১৭৮৯ সালে রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেড় শ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো আইনসভার সম্মেলন ডাকলেন। ফরাসি বিপ্লবের শুরুটা সেখান থেকেই হয়।

এভাবেই পৃথিবীতে যখন ফরাসি সাম্রাজ্যের পতন হচ্ছে, ঠিক তখনই দুর্বার গতিতে বিস্তৃত হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ডাচ সাম্রাজ্যের মতোই তাদের সাম্রাজ্যও তৈরি হয়েছে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের কিছু ব্যক্তি মালিকানাধীন যৌথ মূলধনি কোম্পানির হাতে। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে উত্তর আমেরিকায় তাদের প্রথম উপনিবেশ তৈরি করেছিল লন্ডন কোম্পানি, প্লিমাউথ কোম্পানি, ডরচেস্টার কোম্পানি আর ম্যাসাচুসেটস কোম্পানির মতো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

ব্রিটিশ রাজ্য কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করেনি, করেছে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী। তাদের সাফল্য ভিওসির চেয়েও বেশি। লন্ডনের লিডেনহল স্ট্রিটের প্রধান কার্যালয় থেকে তারা ১০০ বছর ধরে এই বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করেছে। ভারতে তাদের সেনাবাহিনীতে সাড়ে ৩ লাখ সৈন্য ছিল, এত সৈন্য খোদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও ছিল না। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির সৈন্যসমেত এই বিপুল ভূখণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। নেপোলিয়ন ব্রিটিশদের 'দোকানদারের জাত' বলে ঠাট্টা করতেন। অথচ এই দোকানদারের জাত নেপোলিয়নকে তো পরাজিত করেছেই, আর পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের মালিকও ছিল কিন্তু এই ব্রিটিশরাই।

পুঁজির নামে

এই যে ইন্দোনেশিয়ার ডাচ সাম্রাজ্যের বা ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া– এখানেই কিন্তু শেষ নয়, বরং এর পর থেকে সাম্রাজ্য ও পুঁজিবাদের সম্পর্কটা আরো দৃঢ় হয়েছে। উনিশ শতকে দেখা গেল, যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলোর আর দেশ দখল করে শাসন করার দরকার নেই, বরং কোম্পানির ম্যানেজার আর শেয়ারমালিকরাই লন্ডন, আমস্টারডাম আর প্যারিসে বসে ক্ষমতার কলকাঠি নাড়ছে। আর সাম্রাজ্যই তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করছে। এজন্যই মার্কসের মতো লোকেরা বলে গেছেন, পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার আস্তে আস্তে একটা পুঁজিবাদী ট্রেড ইউনিয়ন হয়ে যাচ্ছে।

সরকার কীভাবে টাকার পেছনে ছোটে তার সবচেয়ে বিশ্রী উদাহরণ হলো ১৮৪০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে হওয়া ব্রিটেন ও চীনের প্রথম আফিমের যুদ্ধ। উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়াও অনেক ব্রিটিশ লোক চীনে আফিমসহ বিভিন্ন রকম মাদক পাচার করে প্রচুর টাকা কামিয়েছিল। এতে চীনের লাখ লাখ লোক আফিমে আসক্ত হয়ে গোটা দেশটাকেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। ১৮৩০-এর দশকের শেষে চীনের সরকার আইন করে মাদক পাচার নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ব্রিটিশরা সে আইন না মেনে তাদের

কাজ চালিয়ে যায়। তখন চীনা কর্তৃপক্ষ এসব মাদকের চালান বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে ফেলতে শুরু করে। মাদক ব্যবসায়ীদের আবার ব্রিটেনের মন্ত্রী আর সংসদ সদস্যদের সঙ্গে ভালো জানাশোনা ছিল। তাদের অনেকে আবার নিজেরাও এসব ব্যবসায়ীদের মাদক মজুত করে রাখতেন, কাজেই তারা সহজেই এই ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করে ফেললেন।

১৮৪০ সালে ব্রিটেন 'মুক্ত বাণিজ্যের' নামে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধটা ছিল পুরোপুরি একতরফা। অতি-আত্মবিশ্বাসী চীনা সেনাবাহিনী ব্রিটিশদের রণতরি, ভারী কামান, রকেট আর রাইফেলের সামনে দাঁড়াতেই পারল না। শেষে তারা ব্রিটিশ মাদক ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বাধা দেবে না আর চীনা পুলিশের হাতে নষ্ট হওয়া মালামালের ক্ষতিপূরণ দেবে– এই শর্তে শান্তিচুক্তি করে। শুধু তা-ই নয়, ব্রিটিশরা এরপর হংকংয়েও মাদক ব্যবসায়ের সুযোগ দাবি করে এবং তা আদায়ও করে। এই হংকং মাদক চোরাচালানের নিরাপদ ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত হংকং ব্রিটিশদের হাতে ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে চীনের প্রায় ৪ কোটি মানুষ (মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের এক ভাগ) আফিমে আসক্ত ছিল।[৩]

মিশরও এই ব্রিটিশ পুঁজিবাদকে সমীহ করে চলেছে। উনিশ শতকে ফরাসি ও ব্রিটিশ বিয়োগকারীরা মিশরের শাসকদের অনেক বড়ো অঙ্কের টাকা ঋণ দিতেন– প্রথমত সুয়েজ খাল খননের খরচ জোগাতে, আর এর পরে সেখানে অল্প লাভজনক শিল্পের প্রসারের জন্য। এতে মিশরের ঋণের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল। কাজেই ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীরা মিশরের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে শুরু করল। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে ১৮৮১ সালে মিশরের জাতীয়তাবাদী মানুষ প্রতিবাদ শুরু করে। তারা সব রকম বৈদেশিক ঋণ বাতিলের ঘোষণা দেয়। রানি ভিক্টোরিয়া অবশ্য এতে খুশি হতে পারেননি। বছর খানেক পরেই তিনি মিশরে স্থল ও নৌসেনা মোতায়েন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত মিশর ব্রিটিশদের দখলেই ছিল।

পুঁজিপতিদের স্বার্থে সংঘটিত যুদ্ধের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। আসলে এখানে যুদ্ধও আফিমের মতোই একটি পণ্য। ১৮২১ সালে গ্রিকরা অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ব্রিটেনের

রোমান্টিক ও স্বাধীনচেতা মানুষদের কাছ থেকে এই বিপ্লব প্রচুর সমর্থন পায়। ব্রিটিশ কবি লর্ড বায়রন তো নিজেই গ্রিসে চলে গিয়েছিলেন লড়াইয়ে যোগ দিতে। পুঁজিপতিরাও এখানে একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। তারা বিদ্রোহী নেতাদের অনুরোধ করে লন্ডনের স্টক এক্সচেঞ্জে নিজেদের বন্ড চালু করতে। শর্ত ছিল গ্রিকরা স্বাধীন হলে এসব বন্ডের দাম সুদসহ শোধ করবে। বিনিয়োগকারীরা লাভের আশায় অথবা গ্রিকদের সমর্থন দিতে এসব বন্ড কিনত। এসব বন্ডের দাম আবার যুদ্ধে গ্রিকদের অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠত-নামত। শেষে তুর্কিরা যখন যুদ্ধে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে চলে গেল, তখন বন্ডমালিকদের চোয়াল ঝুলে পড়তে লাগল। যেহেতু ব্যবসায়ীদের স্বার্থই ব্রিটিশদের জাতীয় স্বার্থ, কাজেই ১৮২৭ সালে ব্রিটিশদের একটি নৌবহর নাভারিনোর যুদ্ধে (Battle of Navarino) অটোমানদের একটা নৌবহর ডুবিয়ে দিল। অনেক শতাব্দী ধরে পরাধীন থাকার পর অবশেষে গ্রিস স্বাধীন হলো। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় এমনই এক বিরাট ঋণের বোঝা চাপল যে সেটা শোধ করার আর কোনো উপায় রইল না। এরপর দশকের পর দশক ধরে গ্রিসের অর্থনীতি ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাতে জিম্মি হয়ে রইল।

পুঁজিবাদ আর রাজনীতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে পুঁজিবাজারে। কোথাও নতুন তেলের খনি পাওয়া গেছে, অথবা কেউ নতুন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করেছে– এ ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাবক যেমন আছে, তেমনি কোথাও সরকার পরিবর্তন হচ্ছে কিংবা কোন দেশ নতুন বৈদেশিক নীতি তৈরি করছে– এ ধরনের রাজনৈতিক বিষয়গুলোও পুঁজিবাজারে সরাসরি প্রভাব ফেলছে। নাভারিনোর যুদ্ধের পর অনেক ব্রিটিশ পুঁজিপতিই বিদেশে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। কারণ তারা এখন জানে, কেউ যদি টাকা ধার নিয়ে ঠিকমতো শোধ না করে, তবে তাকে শায়েস্তা করার জন্য রানির সৈন্যবাহিনী তো আছেই!

এই জন্যই আজকের দিনে একটা দেশের সম্পদের পরিমাণের চেয়ে তার ক্রেডিট রেটিং অর্থনৈতিকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেডিট রেটিং হলো টাকা ধার নিলে সেটা শোধ করার সম্ভাবনার পরিমাপ। কোনো দেশের ক্রেডিট রেটিং নির্ধারণ করার জন্য বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক

তথ্য-উপাত্তের পাশাপাশি সে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি সাংস্কৃতিক অবস্থাও আমলে নেওয়া হয়। একটা দেশে যদি স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় থাকে, সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকে আর বিচারব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সে দেশ তেলের ওপরে ভাসলেও তার ক্রেডিট রেটিং কম হবে। এর ফলে সে দেশ ওই তেল ব্যবহার করে পুঁজি তৈরি করতে পারবে না, সেটা দরিদ্র দেশ হয়েই থাকবে। অন্যদিকে যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ নেই কিন্তু শান্তি আছে, সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা আর উন্মুক্ত সরকার ব্যবস্থা (যেখানে সরকারের ক্ষমতা আইন, শাসন ও বিচারব্যবস্থার মধ্যে বিভক্ত থাকে) আছে, সে দেশের ক্রেডিট রেটিং বেশি হবে। ক্রেডিট রেটিং বেশি হওয়ার কারণে সেখানে বেশি বিনিয়োগ হবে, ফলে সহজে আরো বেশি পুঁজি তৈরি হবে। সেটাকে কাজে লাগিয়ে সেখানে শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতিও বেশি হবে।

মুক্তবাজারের ভূত

পুঁজিবাদ আর রাজনীতি এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে এই দুটোর সম্পর্ক নিয়ে অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ আর আমজনতা– কারো মধ্যেই বিতর্কের শেষ নেই। ঘোর পুঁজিবাদীরা বলেন পুঁজিবাদ রাজনীতিকে প্রভাবিত করতেই পারে, তাতে সমস্যা নেই, কিন্তু রাজনীতি যেন পুঁজিবাজারে প্রভাব না ফেলে। কারণ সরকার যখন বাজারে হস্তক্ষেপ করে, তখন রাজনৈতিক প্রভাবে মানুষ বিনিয়োগে ভুল করে আর তাতে অর্থনীতির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ধরুন, সরকার ভোট বাড়ানোর জন্য শিল্পপতিদের ওপর বেশি কর চাপিয়ে দিয়ে বেকারদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিল। তাতে পুঁজিপতিরা নাখোশ হবে। কারণ তাদের মতে, শিল্পপতিদের যদি কর একটু কম দিতে হয়, তাহলে তারা আরো বেশি বিনিয়োগ করতে পারবে, ফলে আরো বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

এদিক থেকে দেখলে সর্বোত্তম অর্থনৈতিক কাঠামোতে রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত, কর কমিয়ে দেওয়া উচিত, সরকারের নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব কমানো উচিত আর বাজারকে নিজ গতিতে চলতে দেওয়া উচিত। বিনিয়োগকারীরা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত না হয়ে

সর্বোচ্চ লাভের খাতে তাদের টাকা বিনিয়োগ করবে। ফলে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যাবে। তাতে মালিক ও শ্রমিক সবারই সুবিধা। অর্থাৎ অর্থনীতিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ যত কম হয় তত ভালো। এই মুক্তবাজার নীতিই আজকের দিনে পুঁজিবাদের সবচেয়ে চেনা রূপ। মুক্তবাজার-সমর্থকরা দেশের বাইরে সামরিক অভিযান আর দেশের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড– এ দুটোকেই একই রকম অপছন্দ করে। সরকারের প্রতি তাদের পরামর্শ অনেকটা বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মতোই– 'কিচ্ছু করার দরকার নেই, সব যেভাবে চলছে চলতে দাও।'

তবে একটু তলিয়ে দেখলে মুক্তবাজারে বিশ্বাস করা অনেকটা সান্তা ক্লজে বিশ্বাস করার মতোই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আসলে কোনো বাজারের পক্ষেই রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আজকের অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো ভবিষ্যতের ওপর মানুষের আস্থা। এই সম্পদও কিন্তু চুরি কিংবা জালিয়াতির ঊর্ধ্বে নয়। বাজার কখনো জালিয়াতি, চুরি বা সন্ত্রাসের হাত থেকে সম্পদ বাঁচানোর দায়িত্ব নেয় না। সেটা কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোর কাজের মধ্যেই পড়ে। সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করাটা সরকারেরই দায়িত্ব। সরকার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, এর ফলে পুঁজি আর বিনিয়োগ কমে যায় আর অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। ১৭১৯ সালের মিসিসিপি বাবল থেকে পাওয়া মূল শিক্ষা কিন্তু এটাই। এই শিক্ষা যে নিতে পারেনি তার জন্য আছে ২০০৭ সালের যুক্তরাষ্ট্রের হাউজিং বাবল (US Housing Bubble)।

পুঁজিবাদের নরক

নিয়ন্ত্রণহীন মুক্তবাজারকে ভয় পাওয়ার আরো কারণ আছে। অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন লাভের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে আরো শ্রমিক নিয়োগ করা যায়, আর লোভ জিনিসটা সবার জন্যই ভালো– এতে উৎপাদন আর কর্মসংস্থান দুই-ই বাড়ে।

এখন একজন শিল্পপতি যদি শ্রমিকদের বেতন কম দিয়ে আর অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়ে উৎপাদন বাড়াতে চায়? এক্ষেত্রে

মুক্তবাজার অর্থনীতিই শ্রমিকদের রক্ষা করবে। শ্রমিকরা যদি অতিরিক্ত কাজ করেও কম বেতন পায়, তাহলে ভালো শ্রমিকরা আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে যাবে, প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পপতিদের কারখানায় কাজ খুঁজে নেবে। ফলে স্বেচ্ছাচারী শিল্পপতি দক্ষ শ্রমিক হারাবে। কাজেই তাকে হয় নিজের আচরণ ঠিক করতে হবে নয়তো কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবে তার নিজের লোভই তাকে শ্রমিকদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে বাধ্য করবে।

তত্ত্ব হিসাবে এসব শুনতে ভালোই লাগে, কিন্তু বাস্তব অন্যরকম। যে বাজার পুরোপুরি মুক্ত, অর্থাৎ যেখানে কোনো রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে একজন অসৎ শিল্পপতি একচেটিয়া ব্যবসায় কিংবা শ্রমিকদের শোষণ করতেই পারে। কোনো একটা প্রতিষ্ঠান যদি দেশের কোনো শিল্পের সব কারখানা দখল করে নেয়, অথবা যদি সব কারখানা মালিকরা চক্রান্ত করে একসঙ্গে শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে দেয়, তাহলে শ্রমিকদেরও আর যাওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না।

শুধু তা-ই নয়, একজন লোভী মালিক তার শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতেও বাধ্য করতে পারে। মধ্যযুগের শেষ দিকে ক্রীতদাস-প্রথা কী তা খ্রিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপের লোকে জানতই না। আর আধুনিক যুগের শুরুতে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এসেছে আটলান্টিক সাগরের দাস-ব্যবসায়। এর জন্য কিন্তু কোনো স্বৈরাচারী শাসক বা বর্ণবিদ্বেষ দায়ী নয়, দায়ী অনিয়ন্ত্রিত বাজার।

আমেরিকা জয় করার পর ইউরোপীয়রা সোনা ও রুপার খনির সন্ধান পায়, আর চিনি, তামাক ও তুলার খামার তৈরি করে। এগুলো ছিল তাদের উৎপাদন ও রপ্তানির প্রধান ক্ষেত্র। চিনির কারখানাগুলো ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগে ইউরোপে চিনি ছিল এক দুর্লভ বস্তু। মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রচুর দামে চিনি আমদানি করা হতো। বিভিন্ন মহার্ঘ খাবারে কিংবা সাপের তেলের ওষুধে 'গোপন উপকরণ' হিসেবেই সেটা ব্যবহার করা হতো। আমেরিকায় চিনিকল তৈরির পর থেকে ইউরোপে চিনির সরবরাহ বাড়তে থাকে। ফলে চিনির দাম দ্রুত কমতে শুরু করে আর ইউরোপের মানুষের মিষ্টি খাবারের প্রতি

আকর্ষণও বাড়তে থাকে। রাঁধুনিরাও নানা রকম মিষ্টি খাবার ও পানীয় তৈরি করতে শুরু করে। সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডের একজন মানুষের বার্ষিক চিনির চাহিদা ছিল শূন্যের কাছাকাছি। অথচ ঊনবিংশ শতকের শুরুতে সেটা হয়ে গেল আট কেজির কাছাকাছি।

আখের চাষ ও তা থেকে চিনি তৈরি করাটা খুবই শ্রমসাধ্য কাজ। আমেরিকার ক্রান্তীয় এলাকার গরম আবহাওয়ায় ম্যালেরিয়া হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে কেউই চাইত না। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের হাতে তৈরি জিনিস জনসাধারণের হাতে কম দামে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু বাজারে চাহিদা প্রচুর। সবকিছু দেখে, লাভের আশায় আর অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য লোভী মালিকেরা চিনি উৎপাদনের কাজে ক্রীতদাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল।

ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে প্রায় ১ কোটি ক্রীতদাস আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের ৭০ শতাংশই কাজ করত চিনিকলে। সেখানে ক্রীতদাসদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ। তারা বেশি দিন বাঁচতও না। আফ্রিকার ভেতর থেকে আমেরিকার উপকূল পর্যন্ত যাওয়ার পথে নানা যুদ্ধবিগ্রহে মারাও পড়ত অনেকে। ইউরোপের মানুষের চায়ে চিনির জোগান দিতে আর চিনিকল মালিকদের পকেটে টাকা আনতে এভাবেই শেষ হয়ে গেছে অসংখ্য ক্রীতদাসের জীবন।

এই ক্রীতদাস-ব্যবসায় কিন্তু কোনো দেশ বা সরকার চালায়নি। এর কারণ সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। চাহিদা ও জোগানের সব সূত্র মেনে মুক্তবাজারের নীতিতে এই বাণিজ্য চলেছে। দাস-ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো আমস্টারডাম, লন্ডন আর প্যারিসের স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার বিক্রি করত। ইউরোপের মধ্যবিত্তরা এসব শেয়ার কিনত। শেয়ার বিক্রি করে পাওয়া টাকায় দাস-ব্যবসায়ীরা জাহাজ কিনত, নাবিক ও সৈনিক জোগাড় করে যেত আফ্রিকায় আর সেখান থেকে দাস কিনে আমেরিকায় পাঠাত। আমেরিকার নানান খেতখামারে সেই দাসদের বিক্রি করে তারা কিনে নিয়ে আসত চিনি, কোকো, কফি, তামাক, তুলা ও রাম। সেসব নিয়ে ইউরোপে ফিরে ভালো দামে চিনি আর তুলা বিক্রি করে আবার চলে যেত আফ্রিকায়, আরেক দফা ব্যবসায়ের জন্য। এই ব্যবস্থায় শেয়ারমালিকরাও খুশি। পুরো

অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে বছরে প্রায় ৬ শতাংশ লাভে চলেছে এই দাস-ব্যবসায়। আজকের দিনেও যে-কোনো বাণিজ্য-বিশেষজ্ঞ একে অত্যন্ত লাভজনক বলে স্বীকার করে নেবেন নির্দ্বিধায়।

এটাই হলো মুক্তবাজার অর্থনীতির সমস্যা। ব্যবসায়ে সৎপথে লাভ হচ্ছে কি না, বা লাভের টাকা সুষমভাবে সবার মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে কি না– তার কোনো নিশ্চয়তা কেউ দেয় না। বরং উলটোটাই হয়– আরো বেশি উৎপাদন ও লাভের নেশা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, কোনো বাধা-বিপত্তি সে আর মানতে চায় না। অগ্রগতির পথ থেকে যখন নৈতিক বাধাটুকু সরে যায়, তখন বিপর্যয় ঘটতে আর দেরি হয় না। কোনো কোনো ধর্ম, যেমন খ্রিষ্টধর্ম বা নাৎসিবাদ কেবল ঘৃণার কারণে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে। আর পুঁজিবাদ লাখ লাখ মানুষ মেরেছে লোভ আর নির্লিপ্ততা দিয়ে। আটলান্টিকের দাস-ব্যবসায়ের পেছনে কোনো বর্ণবিদ্বেষ নেই। যেসব মানুষ এই ব্যবসায়ের শেয়ার কিনেছে, যারা বিক্রি করেছে, আর যারা এই ব্যবসায় চালিয়েছে– আফ্রিকার মানুষদের নিয়ে তাদের কেউ কখনো ভাবেইনি। ভাবেনি চিনিকলের মালিকরাও। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কারখানা থেকে দূরে থাকত, সেখান থেকে লাভ-ক্ষতির হিসাব দেখেই তারা খুশি।

ক্রীতদাস-ব্যবসায় ছাড়াও আরো উদাহরণ আছে। আগের অধ্যায়ে যে বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে, তার কারণটাও এমনই। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে ১ কোটি বাঙালির জীবনের চেয়ে ব্যাবসায়িক লাভটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওদিকে ইন্দোনেশিয়ায় ভিওসির অভিযানের জন্য টাকা দিয়েছে যারা, তারাও সাংসারিক মানুষই ছিল– তাদের পরিবার ছিল, সন্তান ছিল, তারা দান-খয়রাত করত, গান শুনত, শিল্পের কদর বুঝত। অথচ জাভা, সুমাত্রা ও মালাক্কার নিপীড়িত মানুষদের জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতি তাদের ছিল না। বর্তমান অর্থনীতির এই অগ্রগতির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে অগণিত অপরাধ ও শোষণের ইতিহাস।

উনিশ শতকের পুঁজিবাদও তেমন কোনো মানবিকতার পরিচয় দেয়নি। ইউরোপ জুড়ে শিল্পবিপ্লবের সময়ে ব্যাংকার আর শিল্পপতিদের পকেট ফুলেফেঁপে উঠেছে, কিন্তু লাখ লাখ শ্রমিকের

জীবনে এনে দিয়েছে অন্তহীন ভোগান্তি। ইউরোপের উপনিবেশগুলোর অবস্থা ছিল আরো খারাপ। ১৮৭৬ সালে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড একটা বেসরকারি মানবকল্যাণ সংস্থা তৈরি করেন। সেই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মধ্য আফ্রিকা আবিষ্কার ও কঙ্গো নদীপথে দাস-ব্যবসায় প্রতিরোধ। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল সেখানে রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় আর হাসপাতাল বানিয়ে ওখানকার মানুষের জীবনমান উন্নত করা। ১৮৮৫ সালে ইউরোপের কিছু দেশ ওই সংগঠনকে কঙ্গো নদীর অববাহিকায় ২৩ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকা দান করে। আকারে সেই এলাকাটা বেলজিয়ামের প্রায় ৭৫ গুণ। তখন থেকে সেই এলাকাটাকেই আমরা কঙ্গো নামক দেশ হিসেবে জানি। তবে এত বড়ো একটা পরিবর্তনের আগে কেউ সেখানকার ২-৩ কোটি অধিবাসীর মতামত জানতে চায়নি একবারও।

এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই মানবকল্যাণ সংস্থাটা একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, যার উদ্দেশ্য যথারীতি প্রবৃদ্ধি আর মুনাফা অর্জন। স্কুল আর হাসপাতাল মাথায় উঠল, কঙ্গো নদীর দুই তীর ভরে গেল খনি আর খামারে। সেসবের মালিকেরা অবশ্যই বেলজিয়ামের লোক। তারা স্থানীয় মানুষদের শোষণের কোনো কমতি রাখেনি। এসবের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল ওখানকার রাবারশিল্প। তখন রাবারের প্রয়োজনীয়তা হুহু করে বাড়ছে, আর কঙ্গোর আয়ের প্রধান উৎস ছিল রাবার রপ্তানি। রাবারচাষিদের কাছে অনেক বেশি রাবার দাবি করা হতো। সে দাবি পূরণ করতে না পারলে এই 'অলসতার' জন্য তাদের দেওয়া হতো নির্মম শাস্তি। তাদের হাত কেটে ফেলা হতো। অনেক সময় পুরো একটা গ্রামের সব মানুষকে হত্যা করা হতো। ধারণা করা হয়, ১৮৮৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে কম করে হলেও ৬০ লাখ মানুষের প্রাণ গেছে শুধু এই রাবারের জন্য, যা কিনা কঙ্গোর মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ)। কোনো কোনো সমীক্ষা অনুযায়ী এই সংখ্যাটা ১ কোটিও হতে পারে।[৪]

১৯০৮ সালের পর, বিশেষ করে ১৯৪৫-এর পরে পুঁজিবাদের লোভ একটু সংযত হলো, এর পেছনে অবশ্য কমিউনিজমের অবদান কম নয়। তাই বলে সাম্য কিন্তু আসেনি। ১৫০০ সালের তুলনায়

২০১৪ সালে পৃথিবীর সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু এখনো সেটা এত অসমভাবে বণ্টিত যে আফ্রিকার কৃষক আর ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকেরা আজও দিন শেষে তাদের ৫০০ বছর আগের পূর্বসূরিদের চেয়েও কম মজুরি নিয়ে ঘরে ফেরে। কৃষিবিপ্লব যেমন মানবজাতির জন্য একটা বিরাট ধোঁকা ছিল, এই অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঠিক তা-ই। পৃথিবীতে মানুষ বাড়ছে, সঙ্গে প্রসারিত হচ্ছে অর্থনীতিও, কিন্তু তার মধ্যেও অসংখ্য মানুষের জীবন চাপা পড়ে আছে অভাব ও ক্ষুধার কালো ছায়ায়।

এই অভিযোগের বিপরীতে পুঁজিবাদ দুটো যুক্তি দেখাতে পারে। প্রথমটা হলো, একটা পুঁজিবাদী পৃথিবী শাসন করতে পারবে কেবল পুঁজিবাদী মানুষই। এর বিপরীত ধারা কমিউনিজমের ব্যর্থতার পরিমাণ এত বেশি যে সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা মনে হয় কেউই করবে না। ৮৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মানুষেরা যদি কৃষিবিপ্লবের বিপক্ষে অবস্থান নিত, তা হলেও যেমন আর ফেরার পথ ছিল না, ঠিক তেমনি হাজারটা দোষ নিয়েও আজ পুঁজিবাদ টিকে থাকবে, কারণ এখানেও ফেরার পথ বন্ধ।

আর দ্বিতীয় যুক্তিটা হলো, পুঁজিবাদের সুফল পেতে হলে আমাদের আরো ধৈর্য ধরতে হবে। পুঁজিবাদ যে স্বর্গের স্বপ্ন দেখায়, সেখানে পৌঁছাতে আমাদের আরেকটু বাকি। হ্যাঁ, ভুল অনেক হয়েছে। কিন্তু ভুল থেকে তো শিক্ষাও হয়েছে। এভাবেই আমাদের সম্পদ আরেকটু বাড়বে, সবাই আরো বেশি সম্পদের মালিক হবে। বৈষম্যটুকু হয়তো পুরোপুরি দূর হবে না, কিন্তু তাতেও মানুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট পাবে– এমনকি কঙ্গোর মানুষও।

আশার আলো একেবারে নিভে যায়নি এখনো। কিছু কিছু বিষয়, যেমন গড় আয়ু, শিশু মৃত্যুহার, খাবারের সরবরাহ– এসব দিয়ে বিচার করলে ২০১৪ সালের গড়পড়তা একজন মানুষের জীবনের মান ১৯১৪ সালের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণের পরেও।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এভাবে কি অনন্তকাল চলতেই থাকবে? সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে কাঁচামাল ও শক্তি লাগে– কিন্তু দুটোই তো

সীমিত। আজ হোক বা ১০০ বছর পরেই হোক, একদিন কি এ দুটোই শেষ হয়ে যাবে না? তখন কী করবে মানুষ?

অধ্যায় ১৭

শিল্পের রথ

আধুনিক যুগের অর্থনীতি বিকাশ লাভের পেছনে দুটো উপাদানের অবদান অনস্বীকার্য। একটা হলো, ভবিষ্যতের ওপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস, আর আরেকটা হলো পুঁজিপতিদের নতুন নতুন পণ্যের উৎপাদনে ক্রমাগত বিনিয়োগ। কিন্তু অর্থনীতির বিকাশে কেবল এই দুটি উপাদানই যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আরো প্রয়োজন শক্তির জোগান এবং কাঁচামাল। এসবের পরিমাণ সীমিত। যখন এই দুটো উপাদানের জোগান ফুরিয়ে আসবে, সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো তখন মুখ থুবড়ে পড়বে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কাঁচামাল ও শক্তির এই সীমাবদ্ধতার ব্যাপারটি কাগুজে তত্ত্ব মাত্র। বিগত কয়েক শতকে মানুষের শক্তি এবং কাঁচামালের ব্যবহার আগের তুলনায় বহু গুণ বেড়েছে এবং তা সত্ত্বেও বিস্ময়করভাবে মানুষের ব্যবহারোপযোগী শক্তির পরিমাণ কমে যাওয়ার বদলে উলটো বেড়েছে। যখনই এই দুই উপাদানের যে-কোনো একটির অভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে, তখনই বিনিয়োগকারীরা সেই সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণায় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছেন। এইসব বিনিয়োগ কেবল কাঁচামাল এবং শক্তিকে সাশ্রয়ীভাবে ব্যবহারের কৌশলই উদ্ভাবন করেনি, সন্ধান দিয়েছে শক্তি এবং কাঁচামালের সম্পূর্ণ নতুন উৎসের।

পরিবহণশিল্পের কথাই ধরুন। বিগত ৩০০ বছরে মানুষ পশুবাহিত মালগাড়ি, এক চাকার ঠেলাগাড়ি থেকে শুরু করে ট্রেন, মোটরগাড়ি, শব্দের চেয়ে দ্রুতগতির বিমান, মহাকাশযান ইত্যাদি নানা ধরনের কোটি কোটি সংখ্যক যানবাহন তৈরি করেছে। এত

বিপুলসংখ্যক যানবাহন তৈরির ফলে পরিবহণশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও কাঁচামালের ঘাটতি তৈরি হওয়ার কথা এবং পরিবহণশিল্পের সঙ্গে জড়িতদের তলানিতে পড়ে থাকা কাঁচামাল নিয়ে কাড়াকাড়ি করার কথা। বাস্তব অবস্থা কিন্তু এর পুরোপুরি বিপরীত। যেখানে ১৭০০ সালে পরিবহণশিল্পকে উৎপাদনের জন্য প্রধানত কাঠ এবং লোহার ওপর নির্ভর করতে হতো, আজকে তাদের জন্য আছে প্লাস্টিক, রাবার, অ্যালুমিনিয়াম এবং টাইটেনিয়ামের মতো নতুন উদ্ভাবিত অনেক কাঁচামালের পর্যাপ্ত জোগান, যেসবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষদের কোনো ধারণাই ছিল না। ১৭০০ সালে যেখানে অধিকাংশ গাড়ি তৈরি হতো ছুতার আর কামারের পেশিশক্তিকে অবলম্বন করে, সেখানে আজ পেট্রোলিয়াম-চালিত ইঞ্জিন আর পারমাণবিক শক্তিতে টয়োটা এবং বোয়িং নামের বড়ো বড়ো যানবাহন তৈরির কারখানাগুলো চালিত হচ্ছে। প্রায় একই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছোঁয়া আমরা আজকাল শিল্পের অন্যান্য খাতেও দেখতে পাই। এই বিপ্লবের নাম শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লবের হাজার হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ জানত, কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শক্তির উৎসকে ব্যবহার করতে হয়। তারা কাঠ পুড়িয়ে উৎপন্ন তাপে লোহা গলাত, বাড়িঘর গরম রাখত আর পিঠা তৈরি করত। পালতোলা জাহাজ বাতাসের শক্তি ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াত আর পানিচালিত কলে নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে মাড়াই করা হতো ধান। তা সত্ত্বেও এই প্রত্যেক উৎসের ব্যবহারের কিছু সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা ছিল। গাছের জোগান সব জায়গায় পাওয়া যেত না, দরকার পড়লেই বায়ুকল চালানোর জন্য বাতাস বইত না এবং কেবল নদীর কাছাকাছি বসবাস করলেই নদীর স্রোতকে কাজে লাগানো সম্ভব হতো।

তার চেয়েও বড়ো সমস্যা যেটা ছিল তা হলো, মানুষ একধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করতে পারত না। তারা বাতাস এবং স্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পালতোলা জাহাজ চালাতে বা কলে মাড়াই করতে পারত, কিন্তু তারা এসব দিয়ে পানি গরম করতে কিংবা লোহা গলাতে পারত না। একইভাবে, তারা কাঠ পুড়িয়ে উৎপন্ন তাপ ব্যবহার করে মাড়াইকলের চাকা ঘুরাতে পারত না। সেকালে,

শক্তির রূপান্তর করতে পারে, এমন একটি যন্ত্রের কথাই কেবল মানুষ জানত, তা হলো শরীর। পরিপাক নামক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য নামক জৈব জ্বালানি গ্রহণ করত এবং পেশি নড়াচড়ার মাধ্যমে নতুন উপায়ে সে শক্তি ব্যবহার করত। নর, নারী এবং অন্যান্য প্রাণী নানা ধরনের শস্য এবং মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত, সেসব থেকে পাওয়া শর্করা এবং চর্বি পুড়িয়ে তারা রিকশা চালাত বা লাঙল ঠেলত।

যেহেতু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরই ছিল শক্তি রূপান্তরের একমাত্র অবলম্বন, সে কারণে পেশিশক্তিই ছিল মানুষের সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। মানুষের পেশি ঠেলাগাড়ি আর বাড়ি বানাত, গোরুর পেশি মাঠে চালাত লাঙল আর ঘোড়ার পেশি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মালামাল পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হতো। জৈবিক পেশিশক্তিচালিত এসব যন্ত্রের একটিই শক্তি আহরণের উৎস ছিল– সেটি হলো গাছপালা। গাছপালা আবার শক্তির জন্য নির্ভরশীল ছিল সূর্যের ওপর। সালোকসংশ্লেষণ নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করত এবং তাকে রূপান্তরিত করত ফল, মূল, বীজ ইত্যাদি নানা জৈব উপাদানে। সুতরাং, এ পর্যন্ত মানুষ যা কিছু করেছে তার পেছনের শক্তির মূল জোগানদাতা ছিল সূর্য, গাছ যার আলো গ্রহণ করেছে এবং গাছ থেকে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী তা গ্রহণ করে তাকে পেশিশক্তিতে পরিণত করেছে।

সুতরাং, এতদিন মানুষের ইতিহাস নির্ভরশীল ছিল দুটো প্রধান চক্রের ওপর– গাছপালার বেড়ে ওঠার চক্র আর সূর্যের আলোর চক্র (দিন বা রাত, গ্রীষ্ম কিংবা শীত)। কোনো অঞ্চলে যখন সূর্যের আলো কম, খেতে শস্য এখনো পেকে ওঠেনি, সেখানে তখন মানুষের শক্তি থাকত কম। ফাঁকা থাকত গোলা, কর সংগ্রহকারী পাইক-পেয়াদারও করার কিছু থাকত না, সৈন্যদের পক্ষে যুদ্ধ জয় করতে যাওয়া সম্ভব হতো না আর রাজারাও তখন তাঁবু টানিয়ে শান্তিতে ঝিমোতেন। আবার সূর্য যখন পূর্ণ তেজে জ্বলে উঠত, ফসলের খেত ভরে উঠত পাকা ফসলে, কৃষকেরা তখন ফসল কাটতে আর গোলায় ফসল জমানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। কর সংগ্রহকারী পাইক-পেয়াদারা কর সংগ্রহে হন্যে হয়ে উঠত। সৈন্যদের

পেশির জোর আর তলোয়ারের ধার যেত বেড়ে। রাজামশাই আয়োজন করতেন বড়ো বড়ো সভার এবং সিদ্ধান্ত নিতেন রাজ্যের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে। সবারই চালিকাশক্তি ছিল ভুট্টা, ধান ও আলুর মধ্যে জমে থাকা সৌরশক্তি।

হেঁশেলে লুকিয়ে থাকা মানিক

হাজার হাজার বছর ধরে শক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি দিনরাত মানুষের হাতের কাছেই ঘুরঘুর করেছে। কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে, কেউ সেটা খেয়াল করে দেখেনি। একজন গৃহিণী বা চাকর যতবার চায়ের জন্য কেটলিতে পানি ফুটিয়েছে বা আলু সিদ্ধ করার জন্য হাঁড়িতে পানি চড়িয়ে উনুনে রেখেছে, ততবার এই আবিষ্কার মানুষের চোখে চোখ রেখে মুখ টিপে হেসেছে। পানি যখনই ফুটতে শুরু করেছে, কেটলি বা হাঁড়ির ঢাকনা ঠিক একটু পরেই লাফিয়ে উঠেছে। তাপ রূপান্তরিত হয়েছে বস্তুকে নাড়িয়ে দেওয়ার শক্তিতে। কিন্তু, পানি ফোটার পর সময়মতো কেটলি বা হাঁড়ির ঢাকনা না সরানো হলে বারবার ঢাকনার লাফিয়ে ওঠা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। তাই, কেউ এই বিষয়টাকে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

উনবিংশ শতকে বারুদ আবিষ্কারের পরপরই তাপকে বস্তুর নড়াচড়া বা সরণে রূপান্তর করার একটি প্রক্রিয়ার আংশিক উদ্ভাবন হয়। প্রথম প্রথম কামানের গোলায় বারুদ ব্যবহারের চিন্তাটাই এত আজগুবি ছিল যে মানুষ শত শত বছর ধরে কেবল আতশবাজি তৈরির কাজেই বারুদ ব্যবহার করে এসেছে। পরবর্তীতে, সম্ভবত যেদিন বারুদ গুঁড়ো করতে গিয়ে হামানদিস্তা থেকে পেষণীটা ছুটে বেরিয়ে গেল, সেদিনই তৈরি হলো প্রথম বন্দুক; আর সেদিন থেকেই জন্ম হলো বন্দুকের। বারুদের আবিষ্কার এবং সত্যিকারের যুদ্ধাস্ত্রে তার ব্যবহার হতে প্রায় ৬০০ বছর লেগে গেল।

এত কিছুর পরেও, সে সময় তাপকে সরণে পরিণত করার ধারণাটি এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে, তাপ ব্যবহার করে বস্তু সরানোর প্রথম যন্ত্রটি তৈরি করতে মানুষের আরো ৩০০ বছর লেগে

গেছে। প্রায় ৩০০ বছর পর এই নতুন প্রযুক্তি জন্ম নিল ব্রিটেনের কয়লাখনিতে। সে সময়, জনসংখ্যা বাড়ার দরুন বর্ধিত জনগণের আবাস আর চাষের জমির জন্য ব্রিটেনের বনভূমি উজাড় হতে শুরু করেছে। ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে জ্বালানি কাঠের জোগান। মানুষ কাঠের বদলে খনিজ কয়লাকে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তখনকার ব্রিটেনে অনেক কয়লাখনিই ছিল জলমগ্ন এলাকায়। বন্যার কারণে এসব কয়লাখনির নিচের স্তরগুলো থেকে কয়লা উত্তোলন করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ল। সবার কাছেই তাই এ সমস্যার আশু সমাধান জরুরি হয়ে পড়ল। অবশেষে, আনুমানিক ১৭০০ সালের দিকে এক নতুন, অচেনা শব্দের গুঞ্জনে ব্রিটেনের কয়লাখনিগুলো সচকিত হয়ে উঠল। সেই গুঞ্জন– একসময় হয়ে উঠল শিল্পবিপ্লবের অগ্রদূত। প্রথমে মৃদু, তারপর কয়েক দশকে ক্রমশই উচ্চগ্রামে উঠতে লাগল সেই শব্দ, ছড়িয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীকে সে তার বিপুল শব্দের চিৎকারে ভরিয়ে তুলল। এই শব্দ ছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিনের।

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অনেক রকমফের থাকলেও তাদের সবারই মূলনীতি এক। আপনি কয়লা বা কাঠের মতো কোনো একটি জ্বালানি পোড়াবেন, তা দিয়ে পানি ফোটানো হবে আর তার ফলে তৈরি হবে বাষ্প। বাষ্প যখন গরম হয়ে প্রসারিত হবে তখন এটি পিস্টনকে ঠেলে দেবে। পিস্টনের নড়াচড়ার ফলে এর সঙ্গে সংযুক্ত কোনো জিনিসও নড়াচড়া করতে শুরু করবে। ব্যস, তাপশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল! অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনের কয়লাখনিতে পিস্টনগুলো একটি পানি সেচ করার পাম্পের সঙ্গে যুক্ত থাকত যেগুলো খনির তলদেশ থেকে পানি নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হতো। প্রথম দিককার ইঞ্জিনগুলোতে অনেক বেশি জ্বালানির অপচয় হতো। একগাদা কয়লা পুড়িয়ে নামমাত্র পানি নিষ্কাশন করা যেত। কিন্তু, এর ফলেই কয়লাখনির কয়লা উত্তোলন হয়ে যেত অনেক সহজ আর পোড়ানোর জন্য কয়লারও অভাব থাকত না। সুতরাং, সেসব অপচয় নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না।

পরবর্তী দশকগুলোতে ব্রিটিশ উদ্যোক্তাগণ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের দক্ষতা অনেকখানি বাড়িয়ে তুললেন এবং কয়লাখনির গণ্ডি থেকে

তুলে এনে তা দিয়ে শুরু করলেন সুতা তৈরি আর কাপড় বোনার কাজ। আর এর ফলে আমূল পালটে গেল বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনপদ্ধতি এবং আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে কম খরচে এবং বেশি পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন সম্ভবপর হলো। চোখের নিমেষে তাবৎ পৃথিবীর উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে উঠল ব্রিটেন। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, কয়লাখনি পেরিয়ে বস্ত্রশিল্পে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার মানুষের একটি বিশাল মানসিক সীমাবদ্ধতার দেওয়াল ভেঙে দিল। যদি কয়লা পুড়িয়ে তাঁত কারখানার চাকা সচল রাখা যায়, তবে তা দিয়ে গাড়ির চাকাও তো ঘোরানো যেতে পারে!

১৮২৫ সালে খনির কয়লাভর্তি বগিওয়ালা একটি ট্রেনের সঙ্গে একজন ব্রিটিশ প্রকৌশলী একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন জুড়ে দিলেন। এই ইঞ্জিন লোহার তৈরি একটি রেললাইনের ওপর দিয়ে বগিগুলোকে কয়লাখনি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের এক বন্দরে পৌঁছে দিল। এটিই ছিল ইতিহাসের প্রথম বাষ্পচালিত যান। এর পরের হিসাব আরো সহজ, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যদি কয়লাভর্তি বগি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, তবে অন্যান্য জিনিস কেন নয়? আর তাতে মানুষই-বা চড়তে পারবে না কেন? ১৮৩০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মানুষ বহন করার জন্য লিভারপুল থেকে ম্যানচেস্টার পর্যন্ত প্রথম বাণিজ্যিক রেললাইন চালু হলো। যে বাষ্পের শক্তি কয়লাখনির পানি নিষ্কাশন আর তাঁতকল চালাতে ব্যবহৃত হতো, সেই একই শক্তি ব্যবহার করেই চলতে শুরু করল এই ট্রেন। পরবর্তী ২০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ব্রিটেনে ১০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের রেললাইন জুড়ে রেলগাড়ি চলতে শুরু করল।

এইসব ঘটনা থেকে মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে, যন্ত্র ব্যবহার করে একরকম শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। উপযুক্ত যন্ত্র থাকলে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে, যে-কোনো ধরনের শক্তিকে আমরা অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ যখন জানল যে, পরমাণুর মধ্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে, তৎক্ষণাৎ তার মনে চিন্তা জন্মাল, কীভাবে পরমাণুর এই শক্তিকে অবমুক্ত করা যায় এবং তা দিয়ে বিদ্যুৎ, যুদ্ধের সাবমেরিন বা নগর-ধ্বংসকারী পারমাণবিক বোমা বানানো যায়। চীনাদের বারুদ আবিষ্কার এবং তা ব্যবহার করে বানানো কামান

দিয়ে তুর্কিদের কনস্টানটিনোপলের দেওয়াল ধ্বংস করার মধ্যবর্তী সময় ছিল ৬০০ বছর। অথচ আইনস্টাইনের ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করার গাণিতিক সূত্র E=mc2 আবিষ্কার আর পারমাণবিক বোমা দিয়ে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া বা বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র গজিয়ে ওঠার মধ্যবর্তী সময় ছিল মাত্র ৪০ বছর!

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল অন্তর্দহ (Internal Combustion) ইঞ্জিনের আবিষ্কার, যেটি এক প্রজন্মের কিছুটা বেশি সময়ের মধ্যেই পরিবহণব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে এবং পেট্রোলিয়াম পরিণত হয় তরল রাজনৈতিক শক্তিতে। এর হাজার বছর আগে থেকেই পানিরোধী ঘরের ছাদ তৈরিতে বা গাড়ির চাকার পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসেবে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু, গত ১০০ বছরের আগে পেট্রোলিয়ামের অন্য কোনো সম্ভাবনার কথা কারো মাথায়ই আসেনি। সে সময় তেলের মালিকানা লাভের জন্য যুদ্ধ ও রক্তস্রোত বইয়ে দেওয়ার মতো ধারণাই ছিল হাস্যকর। হ্যাঁ, রাজ্য, সোনাদানা, মরিচ কিংবা দাস অধিকার করার জন্য যুদ্ধ হতেই পারে, কিন্তু তেলের জন্য যুদ্ধ, অসম্ভব!

বিদ্যুতের গল্প আরো বেশি রোমাঞ্চকর। ২০০ বছর আগেও অর্থনীতিতে বিদ্যুতের কোনো অবদানই ছিল না। কিছু গোপন বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর সস্তা জাদুর খেলা দেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এর ব্যবহার। কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন বিদ্যুৎকে পরিণত করল জাদুর প্রদীপের দৈত্যে। আজকে আমাদের এক তুড়িতে বিদ্যুৎ ছাপিয়ে ফেলে বই, সেলাই করে কাপড়, তরতাজা রাখে শাকসবজি, জমিয়ে তোলে আইসক্রিম, রান্না করে খাবার আর মৃত্যুদণ্ড দেয় অপরাধীদের, লিপিবদ্ধ করে আমাদের ভাবনা-চিন্তা আর ফ্রেমে বন্দি করে আমাদের হাসি-কান্না, রাতকে জাগিয়ে তোলে দিনের আলোয় আর টিভির অগণিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেয় বিনোদনের খোরাক। বিদ্যুৎ কীভাবে এগুলো করে সেটা খুব কম লোকই জানে, অথচ বিদ্যুৎ ছাড়া জীবনের কথা কেউ আজ কল্পনাও করতে পারে না।

শক্তির সাগর

একবারে শিকড় থেকে চিন্তা করলে, শিল্পবিপ্লব আসলে শক্তির রূপান্তরের বিপ্লব। এটা বারবার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, মানুষের ব্যবহারযোগ্য শক্তির জোগান সীমাহীন। আরো সঠিকভাবে বললে, শক্তির পরিমাণকে একমাত্র সীমাবদ্ধ করে তুলতে পারে মানুষের অজ্ঞতা। কয়েক দশক পরপরই আমরা শক্তির নতুন একটি উৎসের সন্ধান পাই এবং মানুষের ব্যবহারযোগ্য শক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে।

তাহলে, দুনিয়া জুড়ে এত মানুষ শক্তির ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভীত কেন? কেন তারা জীবাশ্ম জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে দুনিয়াজুড়ে আসন্ন মহাবিপর্যয় সম্পর্কে বারবার আমাদের সতর্ক করেন? এটা তো নিশ্চিত পৃথিবীতে শক্তির কোনো অভাব নেই। আমাদের প্রধান সমস্যা হলো সে শক্তিকে আহরণ করা এবং আমাদের প্রয়োজন অনুসারে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব। গোটা দুনিয়ায় যে পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানির জোগান আছে, সূর্য একদিনে বিনামূল্যে তার বহুগুণ শক্তি আমাদের দিয়ে থাকে। সূর্যের মোট শক্তির মাত্র সামান্য একটা অংশ পৃথিবীতে আসে। এই সামান্য অংশটুকুরই বার্ষিক পরিমাণ ৩,৭৬৬,৮০০ এক্সাজুল (১ এক্সাজুল = $১০^{১৮}$ জুল)।[২] পৃথিবীর সব গাছপালা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদনের জন্য এর মধ্যে মাত্র ৩ হাজার এক্সাজুল শক্তি ব্যবহার করে।[৩] মানুষ এক বছরে সব কর্মকাণ্ড এবং শিল্পকারখানায় মোট খরচ করে ৫০০ এক্সাজুল, যা ৯০ মিনিটে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসা সৌরশক্তির সমান।[৪] এসব তো গেল কেবল সৌরশক্তির কথা। সূর্য ছাড়াও পারমাণবিক শক্তি ও অভিকর্ষের মতো শক্তিগুলো আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। এর মধ্যে চাঁদের পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণের কারণে সাগরে সৃষ্ট জোয়ার থেকে অভিকর্ষ শক্তির ধারণা সহজেই বোঝা যায়।

শিল্পবিপ্লবের আগে মানুষের শক্তির বাজার পুরোপুরি গাছপালার ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং, মানুষকে দুনিয়াব্যাপী ৩ হাজার এক্সাজুল শক্তি গ্রহণকারী উৎস গাছপালার কাছাকাছি বসবাস করতে

হতো, গাছপালা তার গ্রহণকৃত শক্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ মানুষের গ্রহণোপযোগী খাদ্যে রূপান্তর করে ফেরত দিত। গাছের এই রূপান্তর করে দেওয়া শক্তির পরিমাণ ছিল সীমিত। শিল্পবিপ্লবের সময় আমরা বুঝতে পারলাম, আমরা আসলে অনেকগুলো শক্তির সাগরের ওপর বসবাস করছি, যাদের প্রতিটি উৎসের কোটি কোটি এক্সাজুল শক্তি দেওয়ার সক্ষমতা আছে। আমাদের কেবল সেসব শক্তি উত্তোলন বা সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে।

যথাযথ উপায়ে শক্তি সংগ্রহ ও রূপান্তর সম্পর্কে জানার চেষ্টা অর্থনীতিকে শ্লথ করে দেওয়া আরেকটি সমস্যা সমাধান করতে মানুষকে সাহায্য করল। সেটি হলো– কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা। মানুষ যত কম খরচে বেশি পরিমাণ শক্তি আহরণ করা শিখতে লাগল, ততই মানুষের নতুন নতুন কাঁচামাল সংগ্রহ (উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সাইবেরিয়ার পতিত জমি থেকে লোহা উত্তোলনের কথা) এবং দূরদূরান্ত থেকে কাঁচামাল পরিবহণের (যেমন একটি ব্রিটিশ পোশাক কারখানায় অস্ট্রেলীয় উলের সরবরাহ) সক্ষমতা বাড়তে লাগল। একই সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানুষকে প্লাস্টিকের মতো সম্পূর্ণ নতুন কাঁচামাল উদ্ভাবন এবং সিলিকন, অ্যালুমিনিয়ামের মতো অচেনা কাঁচামাল আবিষ্কার করতে সহায়তা করল।

বিজ্ঞানীরা ১৮২০ সালের দিকে এসে অ্যালুমিনিয়ামের সন্ধান পান। কিন্তু, আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন ছিল কষ্টসাধ্য এবং প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। কয়েক দশক যাবৎ অ্যালুমিনিয়াম ছিল সোনার চেয়ে দামি ধাতু। ১৮৬০ সালের দিকে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান, তার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত অতিথিদেরকে অ্যালুমিনিয়ামের থালাবাসনে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। এর থেকে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদার অতিথিরা পেতেন সোনার ছুরি এবং কাঁটাচামচ দিয়ে ভোজনের সুযোগ।[৫] ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এসে কিছু রসায়নবিদ অনেক কম খরচে বিপুল পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের উপায় বের করেন এবং বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৩ কোটি টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ান যদি জানতেন তাঁর উত্তরসূরিরা আজ অ্যালুমিনিয়ামে বানানো মোড়ক দিয়ে স্যান্ডউইচ মুড়ে রাখে এবং খাওয়া শেষে অ্যালুমিনিয়ামের

মোড়কটিকে আবর্জনার বাক্সে ফেলে দেয়, নিশ্চয়ই বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত।

দুই হাজার বছর আগে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের অধিবাসীরা ত্বকের শুষ্কতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাতে শুধু জলপাইয়ের তেল মালিশ করতেন। আজ, তারা শুষ্কতা প্রতিরোধের জন্য হ্যান্ডক্রিমের টিউবের ঢাকনা খোলেন। আমি স্থানীয় একটি দোকান থেকে যে সাধারণ হ্যান্ডক্রিমটি কিনেছি, তার উপাদানগুলো নিম্নরূপ–

ঈরিশ্রুত পানি, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন, ক্যাপ্রিলিক/ ক্যাপ্রিকটিগ্লাইসেরাইড, প্রোপাইলিন গ্লাইকল, আইসোপ্রোপাইল মাইরিস্টেট, পানাক্স জিনসেং শেকড়ের নির্যাস, সুগন্ধি, সিটাইল অ্যালকোহল, ট্রাইথানোলামাইন, ডাইমেটিকোন, বিয়ারবেরি পাতার নির্যাস, ম্যাগনেসিয়াম অ্যাসকোবাইল ফসফেট, ইমিডাজলিডিনল ইউরিয়া, মিথাইল প্যারাবেন, ক্যামফর, প্রোপাইল প্যারাবেন, হাউড্রক্সিআইসোহেক্সাইল ৩-সাইক্লোহেক্সেন কার্বোক্সাল্ডিহাইড, হাইড্রোক্সাইল-সাইট্রোনেলাল, লিনালুল, বিউটাইল ফেনাইল মিথাইল প্রোপলোনাল, সাইট্রোনেলোল, লিমোনিন, জেরানিয়ল।

এর বেশিরভাগই উপাদানই উদ্ভাবিত অথবা আবিষ্কৃত হয়েছে গত দুই শতকের মধ্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি অবরোধের শিকার হয় এবং তাদের কাঁচামাল-শূন্যতা দেখা দেয়। বিশেষ করে সংকট তৈরি হয় বারুদ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সল্টপিটারের (Saltpetre)| সল্টপিটার প্রধান জোগান ছিল চিলি আর ভারতে, জার্মানির নাগালের বাইরে। সল্টপিটার বিকল্প রাসায়নিক ছিল অ্যামোনিয়া, কিন্তু তখন অ্যামোনিয়ার উৎপাদন ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। জার্মানদের জন্য সুখের খবর এই যে, ১৯০৮ সালে ফ্রিটজ হ্যাবার নামের একজন ইহুদি জার্মান আক্ষরিক অর্থেই বাতাস থেকে অ্যামোনিয়া তৈরির একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন জার্মানরা হ্যাবারের আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে বাতাসকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে যুদ্ধাস্ত্রের উৎপাদন শুরু করল। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, হ্যাবারের আবিষ্কার না থাকলে জার্মানি ১৯১৮ সালের অনেক আগেই

আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো। হ্যাবারের এই আবিষ্কার (যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব) তাঁকে এনে দেয় নোবেল পুরস্কার। অবশ্য তাঁকে শান্তিতে নোবেল দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে রসায়নে।

খাঁচায় বন্দি জীবন

শিল্পবিপ্লব এনে দিয়েছে ব্যয়সাশ্রয়ী শক্তি ও কাঁচামালের প্রাচুর্য। ফলে অস্বাভাবিক গতিতে বেড়েছে উৎপাদন। উৎপাদনের এই বিস্ফোরক গতির পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় কৃষিক্ষেত্রে। এমনিতে শিল্পবিপ্লবের কথা চিন্তা করলেই আমাদের চোখে ভাসে কালো ধোঁয়া ওঠা চিমনিসমতে একটি শহরের ছবি বা মাটির তলদেশের কয়লাখনিতে খননকাজে লিপ্ত ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত শ্রমিকদের ছবি। কিন্তু, এ সবকিছুর পরেও শিল্পবিপ্লব প্রধানত দ্বিতীয় কৃষিবিপ্লব।

গত ২০০ বছরে শিল্পজাত উপকরণ কৃষিকাজের প্রধান অবলম্বনে পরিণত হয়েছে। ট্রাক্টরের মতো যন্ত্রগুলো এককালের অসম্ভব অথবা পেশিশক্তির ওপরে একান্ত নির্ভরশীল কাজগুলো সহজে করতে সহায়তা করছে। কৃত্রিম সার, কীটনাশক, নতুন নতুন হরমোন আর ওষুধের গুণে মাঠের ফসল আর গবাদিপশুর উৎপাদন দুটোই বেড়ে গেছে। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, জাহাজ আর বিমান উৎপাদিত পণ্য মাসের পর মাস সংরক্ষণ করতে, সুলভে এবং দ্রুত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পরিবহণ করতে সাহায্য করছে। ফলে, একজন ইউরোপিয়ানের রাতের খাবারের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে আর্জেন্টিনার তাজা গোমাংস কিংবা জাপানে তৈরি সুশি।

উদ্ভিদ ও প্রাণীরাও এই যান্ত্রিক বিপ্লবের শিকারে পরিণত হয়েছে। মানবতাবাদী ধর্মগুলো যখন তাদের চর্চিত মূল্যবোধ দ্বারা মানুষের জীবনকে স্বর্গীয় সুষমায় বিভূষিত করছে, সেই একই সময়ে খামারে পালিত গবাদিপশুগুলোকে দেখা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক অনুভূতিহীন উৎপাদনযন্ত্র হিসেবে। আজকের দিনে এই গবাদিপশুগুলোকে শিল্পকারখানায় উৎপাদিত অন্যান্য পণ্যের মতোই বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা হয়, ব্যাবসায়িক চাহিদার কথা চিন্তা

করেই গড়ে তোলা হয় তাদের শারীরিক গড়ন। তাদের পুরো জীবনটা যেন একটি বিশাল শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির নিছক একটা উপকরণ মাত্র। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভ-ক্ষতিই নির্ধারণ করে দেয় তাদের জীবনকাল এবং প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। এমনকি প্রতিষ্ঠানগুলো যখন তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ যত্ন নেয় এবং পর্যাপ্ত দানাপানির জোগান দেয়, তখনো তারা প্রাণীগুলোর সামাজিক ও মানসিক চাহিদার কথা ভাবে না (যদি না এসব চাহিদা উৎপাদনের পরিমাণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়), ব্যাবসায়িক লাভের কথা চিন্তা করেই তারা এমনটা করে।

ডিম পাড়া মুরগির কথাই ধরা যাক, এদেরও আচরণ ও উদ্দীপনাগত চাহিদার একটি জটিল, সূক্ষ্ম জগৎ আছে। নিজস্ব পরিবেশে বেড়ে ওঠা, ঘুরে ঘুরে ঠুকরে খাবার সংগ্রহ করা, সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি করা, বাসা তৈরি এবং নিজেদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলার ব্যাপারে এদেরও আছে তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু ডিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত একটা ছোটো খাঁচার মধ্যে মুরগিগুলোকে বন্দি করে রাখে এবং প্রায়ই দেখা যায় একটি ছোটো খাঁচায় গাদাগাদি করে চারটি মুরগি রাখা, প্রতিটা মুরগির জন্য বরাদ্দ জায়গা যেখানে মাত্র দৈর্ঘ্যে ২৫ ও প্রস্থে বাইশ সেন্টিমিটার। মুরগিগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দেওয়া হয় কিন্তু নিজের বাড়ি বানানো, সামাজিক ও প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন এবং নিজের আবাস বলে ভাবার মতো কোনো জায়গা তার জন্য বরাদ্দ থাকে না। এমনকি খাঁচাগুলো অনেক সময় এতটাই ছোটো হয় যে মুরগিগুলো ঠিকমতো সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা ডানা ঝাপটাতে পর্যন্ত পারে না।

বুদ্ধিমত্তা ও কৌতূহলের বিচারে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হলো শূকর, সম্ভবত নরবানরদের পরেই এদের স্থান। তা সত্ত্বেও খামারগুলোতে পূর্ণবয়স্ক শূকরীদের প্রায়ই এত ছোটো একটি কাঠের খাঁচার মধ্যে রাখা হয় যেখানে তারা হাঁটা বা চরে বেড়ানো তো দূরের কথা, ঘুরে বসতে পর্যন্ত পারে না। বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর চার সপ্তাহ সমস্ত দিন-রাত বাচ্চাগুলোকে শূকরীর সঙ্গে এই আবদ্ধ খাঁচায় রাখা হয়। এরপর বাচ্চাগুলোকে মোটাতাজা করার জন্য মায়ের থেকে আলাদা করা হয় এবং শূকরীকে আবার গর্ভধারণ করতে বাধ্য করা হয়।

অনেক গোরুর খামারেই গোরুগুলোকে তাদের জীবনের পুরোটাই কাটাতে হয় একটি ছোট্ট আবদ্ধ পরিবেশে। নিজেদের মলমূত্রের ওপরই শোয়া, বসা আর ঘুমানোই হয়ে ওঠে তাদের নিয়তি। কতকগুলো যন্ত্র তাদের নিয়মিত খাবার, হরমোন আর ওষুধপত্র সরবরাহ করে। আর কতকগুলো যন্ত্র নিয়মিত এসে দুইয়ে নিয়ে যায় দুধ। গাভিগুলোকে যেন একটি যন্ত্রবিশেষ, যে মুখ দিয়ে কাঁচামাল গ্রহণ করে আর ওলান দিয়ে উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করে। জটিল অনুভূতির জগৎসম্পন্ন এসব প্রাণীকে যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করার ফলে তাদেরকে যে কেবল শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা-ই নয়, তাদের সামাজিক ও মানসিক জীবনেও মানুষের এসব আচরণ তৈরি করছে অসহনীয় চাপ।[৭]

৪০। একটি বাণিজ্যিক মুরগির খামারে কনভেয়র বেল্টের ওপর বসানো মুরগির বাচ্চা। মোরগ ও ত্রুটিযুক্ত মেয়ে মুরগিগুলোকে এখান থেকে আলাদা করা হয়। এরপর গ্যাস চেম্বারে তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয় এবং স্বয়ংক্রিয় মেশিনে কেটে ফেলা হয় বা কখনো তাদেরকে স্রেফ আবর্জনায় ছুড়ে ফেলা হয় এবং পিষে মারা হয়। এ ধরনের বড়ো মুরগি খামারে এভাবে প্রতিবছর কোটি কোটি মুরগি মারা যায়

আফ্রিকানদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে যেমন আটলান্টিক অঞ্চলে দাস-ব্যবসায়ের জন্ম হয়নি, ঠিক একইভাবে প্রাণীদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ থেকেও বড়ো আকারের গবাদিপশু শিল্প গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু, অস্বীকার করার উপায় নেই, আফ্রিকান এবং প্রাণীদের প্রতি উদাসীন মনোভাবই এসব ব্যবসায়ের গতিশীল হওয়ার মূল কারণ। যারা ডিম, দুধ বা মাংসের ভোক্তা তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক মানুষই এসবের সঙ্গে জড়িত মুরগি, গোরু বা শূকরের জীবনের পরিণতি নিয়ে ভাবেন। যে অল্প কজন ভাবেন, তাঁদেরও প্রায়শই বলতে শোনা যায়, যন্ত্রের সঙ্গে এইসব গবাদিপশু বা পাখির তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এই প্রাণীগুলো সংবেদনশীলতা এবং আবেগবর্জিত এবং তাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি নেই। মজার ব্যাপার হলো বিজ্ঞানের যে শাখাটি বাণিজ্যিকভাবে দুধ বা ডিম উৎপাদনের অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করেছে, বিজ্ঞানের সে শাখাটিই সাম্প্রতিক কালে সন্দেহাতীতভাবে এ কথা প্রমাণ করেছে যে, এইসব স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখিদেরও আছে একটি সংবেদনশীল অনুভূতি ও আবেগের জগৎ। তারা যে কেবল শারীরিক সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে তা-ই নয়, মানসিক যন্ত্রণাও তাদের ভোগায়।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী বন্য অবস্থায় বসবাসকালীন গবাদিপশুগুলোর মধ্যে এইসব সামাজিক এবং মানসিক চাহিদার উদ্ভব হয়েছে। সে সময় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং বংশবিস্তারের জন্য এই দুটো ব্যাপার ছিল অপরিহার্য। একটি বন্য গোরুকে জানতে হতো কীভাবে অন্যান্য গোরু এবং ষাঁড়ের সঙ্গে তাকে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কারণ, এটা না জানলে তার পক্ষে আত্মরক্ষা এবং বংশবিস্তার করা সম্ভব ছিল না। এই অপরিহার্য গুণাবলি অর্জনের জন্য অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো বিবর্তন গোরুর বাছুরের ক্ষেত্রেও খেলাধুলার প্রতি একটা তীব্র আগ্রহ গড়ে তুলেছে (স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে খেলাধুলা করা সামাজিক আচরণ শেখার একটা উপায়)। পাশাপাশি বিবর্তন বাছুরের মধ্যে মায়ের সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্কের ভেতর রচনা করে দিয়েছে কারণ মায়ের দুধ এবং যত্ন একটি বাছুরের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।

এখন, একজন পশুপালক যদি একটি মেয়ে বাছুরকে তার মায়ের থেকে আলাদা করে একটি খাঁচায় রাখে, তাকে খাবার, পানি, রোগপ্রতিষেধক টিকা ও ওষুধ দেয় এবং বয়স হলে তাকে একটি ষাঁড়ের শুক্রাণু দিয়ে গর্ভবতী করে, তার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

বস্তুগতভাবে চিন্তা করলে, টিকে থাকা এবং বংশবিস্তারের জন্য বাছুরটির সামাজিক বন্ধন তৈরির বা খেলার সাথির আর কোনো দরকার নেই। কিন্তু বাছুরটির দিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা দেখব, তার মধ্যে মায়ের সঙ্গে বন্ধন তৈরি করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যান্য বাছুরের সঙ্গে খেলাধুলা করার ইচ্ছা এখনো ভীষণভাবে উপস্থিত। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে, বাছুরটি ভীষণরকম মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যায়। এটি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের একটি মৌলিক ধারণা– বন্য জীবনে টিকে থাকার জন্য তৈরি হওয়া সামাজিক চাহিদা বর্তমানে টিকে থাকা এবং বংশবিস্তারের জন্য জরুরি না হলেও তা ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বে থেকে যায়। শিল্পনির্ভর কৃষির একটি দুঃখজনক দিক হলো, এটি কেবল প্রাণীদের বস্তুগত চাহিদার দিকে নজর দেয় এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলো পুরোপুরি এড়িয়ে যায়।

আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ হ্যারি হারলো যখন বানরের বিকাশ নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেই ১৯৫০-এর দশক থেকে এই তত্ত্ব মানুষের জানা। গবেষণার জন্য হারলো জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরই বাচ্চা বানরগুলোকে তাদের মায়ের থেকে আলাদা করলেন। বাচ্চাগুলোকে আলাদা খাঁচায় পুতুল মা-বানরের সঙ্গে রাখা হলো। প্রতিটি খাঁচায় হারলো দুটি পুতুল মা-বানর রাখলেন। এর মধ্যে একটি পুতুল ধাতব তার দিয়ে বানানো যার মধ্যে দুধ ভরা একটি বোতল রাখা আছে যেখান থেকে বাচ্চা বানরটি চাইলে দুধ খেতে পারে। অন্য পুতুলটি কাঠের ওপর কাপড় দিয়ে এমনভাবে বানানো হয়েছিল যাতে সেটাকে দেখতে সত্যিকারের বানরের মতোই লাগে। কিন্তু এই পুতুলটির সঙ্গে বাচ্চা বানরকে খাওয়ানোর মতো কোনো উপকরণ দেওয়া হলো না। ধারণা করা হলো, বাচ্চাটি তার প্রয়োজনের তাগিদেই কাঠ ও কাপড় দিয়ে বানানো মা বানরকে ছেড়ে ধাতব তারে বানানো দুধের বোতলওয়ালা মা বানরের দিকে আকৃষ্ট হবে।

কিন্তু হারলো অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, বাচ্চাটি কাঠ ও কাপড়ে বানানো সত্যিকারের বানরের মতো দেখতে পুতুল মায়ের সঙ্গেই বেশি সময় কাটাচ্ছে। দুটো পুতুল মাকে যখন কাছাকাছি রাখা হলো, তখন দেখা গেল যে, বাচ্চা বানরটি ধাতব তারে বানানো পুতুল মায়ের থেকে দুধ খাবার সময়েও কাপড়ে বানানো মায়ের কাপড়

আঁকড়ে ধরে আছে। হারলো ভাবলেন, হয়তো ঘরের তাপমাত্রা কম, এই কারণে বাচ্চাটি পুতুল মায়ের কাপড় আঁকড়ে আছে। এ কারণে তিনি ধাতব তারে তৈরি মায়ের ভেতর বৈদ্যুতিক বাল্ব স্থাপন করলেন যাতে সেখান থেকে তাপ নির্গত হয়ে জায়গাটা কিছুটা গরম থাকে। এর পরও দেখা গেল, একদম সদ্যপ্রসূত বাচ্চাগুলো ছাড়া প্রায় সব বাচ্চাই কাপড়ের তৈরি মাকেই বেশি পছন্দ করছে।

৪১। হারলোর পরীক্ষার একটি বাচ্চা বানর যেটি ধাতব মায়ের থেকে দুধ খাবার সময়ও কাপড়ে তৈরি মাকে আঁকড়ে ধরে আছে

পরবর্তী গবেষণাগুলো থেকে জানা গেল, মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে নেওয়া হারলোর বাচ্চা বানরগুলোকে সব রকম পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা হলেও তাদের মানসিক বিকাশ মারাত্মকভাবে

ব্যাহত হয়। তারা বানর সমাজে সহজভাবে মিশতে পারে না, অন্য বানরের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারে না, দুশ্চিন্তায় ভোগে এবং তাদের মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব দেখা যায়। এতসব পরীক্ষা একটা কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, বস্তুগত চাহিদার বাইরেও বানরদের মানসিক চাহিদার একটা জগৎ আছে এবং সেই চাহিদা পূরণ না হলে তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হারলোর এতিম বানরগুলো কাপড়ে তৈরি মা-বানরগুলোর সঙ্গে বেশি সময় কাটাচ্ছিল, কারণ কেবল দুধ তাদের চাহিদা ছিল না, তারা চাইছিল মায়ের সঙ্গে একটা মানসিক সম্পর্ক তৈরি করতে। পরবর্তী দশকগুলোতে অনেকগুলো গবেষণা প্রমাণ করে এই মানসিক চাহিদার ব্যাপারটি কেবল বানর নয়, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী এমনকি পাখির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমানে, খামারে পালন করা কোটি কোটি গবাদিপশুর অবস্থা হারলোর মা থেকে আলাদা করা বানরগুলোর মতো, কারণ খামারিরা পৃথকভাবে পালন করার জন্য নিয়মিত বাছুর ও বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের থেকে আলাদা করে সরিয়ে নেয়।[৮]

বর্তমান পৃথিবীতে যান্ত্রিক পশুপালন ব্যবস্থার উপাদান হিসেবে হাজার হাজার কোটি গবাদিপ্রাণী বসবাস করে এবং প্রতিবছর পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৫০০ কোটি গবাদিপশুকে হত্যা করা হয়। শিল্পসম্মত যান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার ফলে কৃষি উৎপাদন এবং মানুষের খাদ্যের জোগান খুব দ্রুত বহু গুণ বেড়েছে। শস্য ও পশুপালনের এসব যান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে তুলেছে আধুনিক পৃথিবীর আর্থসামাজিক কাঠামোর ভিত্তি। কৃষির শিল্পায়নের আগে শস্যখেত বা খামারে উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশই কৃষক এবং খামারের প্রাণীদের খাওয়ানোর কাজেই 'অপচয়'(!) হতো। এসবের পর শিল্পী, শিক্ষক, সাধু-সন্ন্যাসী বা আমলাদের ভোগের জন্য খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট থাকত। এই কারণে, সে সময়ের প্রায় সব সমাজেই মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ ছিল কৃষক। শিল্পবিপ্লবের পর কৃষির যান্ত্রিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে অল্প কিছুসংখ্যক কৃষকের পক্ষে আরো বেশি বেশি কেরানি এবং কারখানার শ্রমিকদের খাদ্যের জোগান দেওয়া সম্ভবপর হলো। আজকের দিনের আমেরিকায়, মোট জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই

২ শতাংশ মানুষ যে কেবল আমেরিকার সব মানুষের খাদ্যশস্যের জোগান দেয় তা-ই নয়, বরং জোগান দেওয়ার পর অতিরিক্ত খাদ্যশস্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানিও করে থাকে।[৯] কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ছাড়া নগরসভ্যতার বিকাশ সম্ভব হতো না, পাওয়া যেত না কলকারখানা এবং অফিসে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত হাত ও মস্তিষ্ক।

কৃষিকাজ এবং পশুপালনের দায় থেকে বেরিয়ে আসা এইসব অগণিত হাত আর মস্তিষ্ক তৈরি করতে লাগল অজস্র নতুন নতুন পণ্যের সমাহার। মানুষ এখন আগের যে-কোনো সময়ের থেকে বেশি পরিমাণে ইস্পাত, বস্ত্র, বড়ো বড়ো দালানকোঠা তৈরি করে। এসব ছাড়াও মানুষ আজকে বৈদ্যুতিক বাতি, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা ও থালাবাসন ধোয়ার যন্ত্রের মতো এমন অনেক পণ্য উৎপাদন কওে, যা আগে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মানুষের উৎপাদন ছাড়িয়ে গেছে তার চাহিদাকে। আর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নতুন একটি সমস্যা– উৎপাদিত এতসব বাড়তি পণ্য কিনবে কে?

কেনাকাটার কাল

একটি হাঙরকে বেঁচে থাকার জন্য যেমন অবিরাম সাঁতরাতে হয়, আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকেও তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াতেই হবে। কিন্তু, শুধু উৎপাদন করাই যথেষ্ট নয়। কাউকে না কাউকে অবশ্যই সেসব উৎপাদিত পণ্য কিনতে হবে। এটা সম্ভব না হলে শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারী উভয়েই পথে বসবেন। এই দুরবস্থা এড়ানোর জন্য এবং শিল্পকারখানার উৎপাদিত পণ্যগুলোর বিক্রিবাট্টা নিশ্চিত করার জন্য নতুন একটি ধারণার উদ্ভব হয়েছে তার নাম 'ভোগবাদ' (Consumerism)।

ইতিহাসের পুরোটা সময় জুড়ে বেশিরভাগ মানুষকেই নানা রকম অভাবের বেড়াজালে বন্দি থাকতে হয়েছে। মিতব্যয়িতা ছিল তাদের জীবনবোধের অংশ। এ-সংক্রান্ত দুটো বিখ্যাত উদাহরণ হলো পিউরিটান (Puritans) ও স্পার্টানদের (Spartans) জীবনদর্শনে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের উপস্থিতি। একজন ভালো মানুষ সব রকম বিলাসদ্রব্য

এড়িয়ে চলবেন, কখনো খাবারের অপচয় করবেন না এবং জামাকাপড় ছিঁড়ে গেলে নতুন জামাকাপড় কেনার বদলে সেলাই করে পুরোনো কাপড় দিয়েই চালানোর চেষ্টা করবেন। কেবল রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিরাই প্রকাশ্যে জমকালো পোশাক পরে, বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারবেন এবং তাঁদের পরিচয় জাহির করতে পারবেন।

অন্যদিকে 'ভোগবাদ' ক্রমাগত নতুন নতুন পণ্য ও সেবা ভোগ করাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখে। অসীম পণ্য ও সেবা ভোগের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ, নিজের ক্ষতিসাধন, এমনকি নিজেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার ব্যাপারেও এটি মানুষকে উৎসাহিত করে। 'ভোগবাদ' অনুযায়ী কৃপণতা বা মিতব্যয়িতা হলো একটি অসুখ, যার আশু প্রতিকার জরুরি। ভোগবাদের এই মূলনীতি বাস্তবে উপলব্ধি করার জন্য আপনাকে খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। দোকান থেকে কিনে আনা একটি পণ্যের মোড়কে লেখা কথাগুলো পড়ুন। এখানে আমি সকালের নাশতার জন্য খাওয়া টেলমা (Telma) নামে একটি কোম্পানির তৈরি আমার প্রিয় সিরিয়ালের প্যাকেটে লেখা কথাগুলো তুলে দিচ্ছি–

কখনো আপনার দরকার তৃপ্তির। কখনো আপনার দরকার একটু বেশি উদ্যম। ওজনের দিকে নজর দেওয়ার অনেক সময় আপনি পাবেন, কখনো কখনো হয়তো কিছুমিছু একটা খেলেই হলো। কিন্তু এখন? টেলমা নিয়ে এসেছে বিভিন্ন স্বাদের মজাদার সিরিয়াল শুধু আপনার জন্য– কোনো দ্বিধা ছাড়া খুঁজে নিন আপনার সবটুকু তৃপ্তি।

একই মোড়কে আরেকটি পণ্য 'হেলথ ট্রিটস'-এর বিজ্ঞাপন বলছে–

হেলথ ট্রিটস পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য, ফল এবং বাদামের সমন্বয়ে আপনাকে দেয় স্বাদ, আনন্দ ও স্বাস্থ্যের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। স্বাস্থ্যের দিকে পুরোপুরি নজর রেখে দুপুরবেলার খাবারে একটু আনন্দ আনার জন্য এর জুড়ি নেই। চমৎকার স্বাদে ভরা একটি পরিপূর্ণ সিরিয়াল।

ইতিহাসের অধিকাংশ সময়েই, কোনো পণ্যের মোড়কে এ ধরনের কথা লেখা দেখলে মানুষ সম্ভবত আকৃষ্ট হওয়ার বদলে বিরক্তই হতো। এই ধরনের প্রচারণাকে তারা স্বার্থপর, মূল্যবোধহীন

এবং সামাজিক অবক্ষয়ের উপাদান হিসেবেই বিবেচনা করত। ভোগবাদ অনেক চেষ্টার মাধ্যমে, 'বেশি না ভেবে করে ফেলো' (Just do it!)– মনস্তত্ত্বের এই জনপ্রিয় ধারণাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে– মিতব্যয়িতা মানেই নিজের ইচ্ছার সঙ্গে প্রতারণা করা, বেশি ভোগের মধ্যেই আছে আনন্দের ফোয়ারা।

ভোগবাদ সফল হয়েছে। আজকে আমরা সকলেই ভালো ভোক্তা। গতকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না এবং আমাদের কোনো দরকার নেই এমন অসংখ্য পণ্য আজ আমরা কিনি। উৎপাদনকারীরা ইচ্ছা করেই স্বল্পমেয়াদি পণ্য তৈরি করেন, ঠিকঠাক কাজ চলছে এমন একটি পণ্যেরও নতুন মডেল উদ্ভাবন করেন এবং আমরা সবার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য সেসব কিনি। কেনাকাটা করা আজ আমাদের অবসর যাপনের অংশ এবং নানা রকম ভোগ্যপণ্য আমাদের পরিবারের সদস্য, জীবনসঙ্গী ও বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্কের সেতু হিসেবে কাজ করে। ক্রিসমাসের মতো ধর্মীয় ছুটির দিনগুলো কেনাকাটার উৎসবে পরিণত হয়েছে। এমনকি, আমেরিকায়, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সাহসী সৈনিকদের স্মরণে তৈরি হওয়া 'মেমোরিয়াল ডে' পরিণত হয়েছে দোকান থেকে বিশেষ ছাড়ে পণ্য কেনার উপলক্ষ্যে। বেশিরভাগ মানুষই এই দিনটিকে কেনাকাটা করার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেন, সম্ভবত কেনাকাটার মধ্য দিয়েই তারা প্রমাণ করতে চান, দেশের স্বাধীনতার জন্য শহিদদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি।

ভোগবাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় খাবারের দোকানগুলোতে। আগেকার গৎবাঁধা কৃষিভিত্তিক সমাজগুলোতে মানুষের সঙ্গে ছায়ার মতো জড়িয়ে থাকত অনাহার। আজকের সম্পৎশালী পৃথিবীতে অন্যতম বড়ো স্বাস্থ্য সমস্যা হলো 'স্থূলতা'। মজার ব্যাপার হলো উন্নত দেশে স্থূলতার এই সমস্যা গরিবদের মধ্যেই বেশি, কারণ তারা পেট পুরে হ্যামবার্গার আর পিজ্জা খেতে ভালোবাসে। অন্যদিকে ধনীদের মধ্যে এই স্থূলতার হার কম, কারণ তারা খায় টাটকা সবজিতে তৈরি সালাদ আর ফলের রসে তৈরি স্মুদি (পানীয়)। প্রতিবছর বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর মুখে খাবার তুলে দিতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, আমেরিকান

জনগোষ্ঠী তার থেকে বেশি অর্থ ব্যয় করে নিজেদের স্থূলতা কমাতে এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে। স্থূলতার ক্ষেত্রে ভোগবাদ দুই দিক থেকে জয়লাভ করেছে। প্রথমত, কম খাওয়ার বদলে মানুষ বেশি খাচ্ছে, ফলে অর্থনীতির সংকোচন হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, অর্জিত স্থূলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা পণ্য কিনছে, ফলে অর্থনীতি আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, পুঁজিবাদে বিশ্বাসী একজন ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফা ব্যয় না করে যিনি নতুন নতুন বিনিয়োগে উৎসাহী, তাঁর ধারণার সঙ্গে ভোগবাদের আরো বেশি ভোগ করার ধারণা কীভাবে একই সময়ে, একই সমাজে সহাবস্থান করে? উত্তরটা সোজা। অতীতের সমাজগুলোর মতো আজকের দিনের সমাজেও ধনী ও গরিবের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা বিদ্যমান। মধ্যযুগের ইউরোপে ধনীরা নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করতেন, আর গরিবদের বেছে নিতে হতো কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবন, হিসাব করে খরচ করতে হতো প্রতিটা পয়সা। আজকে, পাশার দান উলটে গেছে। আজ, ধনীরা তাদের সম্পদ ও বিনিয়োগের যত্ন নেয়, হিসাব রাখে; অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণি প্রয়োজন না বুঝেই নতুন গাড়ি বা হাল ফ্যাশনের টেলিভিশন কিনতে গিয়ে ঋণের চোরাবালিতে ডুবতে থাকে।

ধনতন্ত্র আর ভোগবাদ আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, দুটি পরিপূরক বিধান। এক দলের জন্য অনিবার্য বিধান– ‘বিনিয়োগ’, আর বাকি সবার জন্য অনিবার্য বিধান– ‘ভোগ’।

ধনতন্ত্র ও ভোগবাদের এই সম্মিলিত ধারণা আরেকটি দিক থেকেও বৈপ্লবিক। অতীতের ন্যায়নীতিসংক্রান্ত অধিকাংশ ধারণাগুলোই অনুসরণ করা মানুষের জন্য ছিল দুঃসাধ্য। বেশিরভাগ মতো অনুযায়ী, মানুষ ইহকালে যদি দয়াবান ও সহনশীল হয়, রাগ এবং চাহিদা বিসর্জন দেয় এবং আপন স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে যেতে পারে তবেই কেবল তার পক্ষে ভোগের জন্য স্বর্গ পাওয়া সম্ভব। ইহকালে এত কিছু করা বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই ছিল খুবই কঠিন। ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস তাই দুঃখের ইতিহাস, যেখানে মানুষের

জন্য অনেক মহৎ আদর্শের সন্ধান আছে, কিন্তু মানুষ যেগুলোর কোনোটিই ঠিকমতো পালন করতে পারেনি। বেশিরভাগ খ্রিষ্টান যিশুর জীবনকে অনুকরণ করে চলতে পারেননি, বেশিরভাগ বৌদ্ধ অনুসরণ করতে পারেননি গৌতম বুদ্ধকে এবং বেশিরভাগ কনফুশিয়ানের জীবনযাপন দেখলে কনফুসিয়াস নিজেই হয়তো রাগ সংবরণ করতে পারতেন না।

অন্যদিকে, আজকের দিনের বেশিরভাগ মানুষই ধনতন্ত্র ও ভোগবাদের সম্মিলিত আদর্শ পুরোপুরি মেনে চলে। নতুন এই আদর্শের স্বর্গ প্রদানের শর্ত হলো– ধনীদের সব সময় লোভী থাকতে হবে এবং ব্যস্ত থাকতে হবে আরো বেশি মুনাফা অর্জনের চেষ্টায়, আর সাধারণ মানুষদের লাগামছাড়া চাহিদা আর ইচ্ছার ঘোড়ায় সওয়ার হতে হবে এবং আরো বেশি, আরো বেশি পণ্য কিনতে হবে। এটাই প্রথম ধর্ম, যার অনুসারীরা ধর্ম তাদেরকে যা করার বিধান দিয়েছে ঠিক তা-ই মেনে চলছে। নতুন ধর্মের এতসব বিধান মেনে চলার বিনিময়ে যে স্বর্গ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে তার স্বরূপ কি আমরা জানি? জানি, টেলিভিশনের হাজার হাজার রঙিন বিজ্ঞাপনের মধ্যে বহুবার, বহুভাবে সেই স্বর্গের রূপ আমরা দেখেছি।

অধ্যায় ১৮

চিরস্থায়ী বিপ্লব

শিল্পবিপ্লব প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে প্রয়োজনমতো কাজে লাগানোর মাধ্যমে এবং নানা রকম পণ্য উৎপাদনের নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানবজাতিকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর নিরুপায় নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করেছে। এরপর মানুষ বন জঙ্গল কেটে ফেলেছে, জলাভূমি শুকিয়ে ফেলেছে, নদীতে বাঁধ দিয়েছে, সমতলভূমিতে পানি এনেছে, হাজার হাজার কিলোমিটার রেললাইন বসিয়েছে আর উঁচু উঁচু ইমারতের বিশাল সব শহর বানিয়েছে। যেহেতু মানুষ পুরো পৃথিবীকেই একেবারে ঢেলে সাজিয়েছে শুধু নিজেদের বসবাসের জন্য, সেটা করতে গিয়ে তারা অন্য অনেক প্রাণীর বাসস্থান ধ্বংস করে ফেলেছে আর অনেক প্রজাতি হয়েছে নিশ্চিহ্ন। আমাদের এক সময়কার নীল-সবুজ পৃথিবী এখন হয়েছে কংক্রিট আর প্লাস্টিকের এক বিশাল বাজার।

আজকে পৃথিবীর মহাদেশগুলোতে সব মিলিয়ে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের বসবাস। এতগুলো মানুষকে এক জায়গায় করে একটা বিশাল দাঁড়িপাল্লায় ফেলতে পারলে তাদের মোট ভর হতো প্রায় ৩০ কোটি টন। তারপর যদি আমাদের সব গৃহস্থালি পশুকে নেওয়া হয়, যেমন গোরু, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর আর মুরগি– তাহলে তাদের মোট ভর দাঁড়াবে প্রায় ৭০ কোটি টন। অন্যদিকে বাকি সমস্ত জীবিত প্রাণীদের যদি নেওয়া হয়– শজারু আর পেংগুইন থেকে শুরু করে হাতি আর তিমি পর্যন্ত– সব মিলিয়ে ১০ কোটি টনেরও কম হবে। অথচ আমাদের শিশুদের বই, আমাদের মূর্তিশিল্প কিংবা আমাদের টেলিভিশনের পর্দাগুলো এখনো ভরে থাকে জিরাফ, নেকড়ে আর

শিম্পাঞ্জিতে। সত্যিকার পৃথিবীতে তাদের সংখ্যাটা খুবই অল্প। পৃথিবীতে এখন প্রায় ৮০ হাজার জিরাফ আছে যেখানে গবাদিপশু আছে প্রায় ১৫০ কোটি; ২ লাখ নেকড়ে অবশিষ্ট আছে যেখানে ৪০ কোটি পোষা কুকুর; মাত্র আড়াই লাখ শিম্পাঞ্জি আছে যেখানে কোটি কোটি মানুষ। অস্বীকার করার আর উপায় নেই, মানুষ আসলেই পৃথিবী দখল করে ফেলেছে।[১]

পরিবেশের অবক্ষয় আর সম্পদের ঘাটতি কিন্তু একরকম ব্যাপার নয়। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, মানবজাতির সম্পদের পরিমাণ দিনকে দিন বাড়ছে আর তা হয়তো বাড়তেই থাকবে। সেইজন্যই সব সম্পদ ফুরিয়ে গেলে যে কঠিন দিন আসবে বলে ভয় দেখানো হয় সেটা আসলে ধোপে টেকে না। বরং পরিবেশের অবক্ষয় নিয়ে আমাদের যতটা ভীত হওয়া দরকার ততটা আমরা এখনো হইনি। ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে, মানুষ নতুন নতুন উপকরণ আর শক্তির উৎসের প্রাচুর্য উপভোগ করছে, কিন্তু একই সময় ধ্বংস করে ফেলছে প্রাকৃতিক জগতের যা-কিছু টিকে আছে তার সবকিছুই। সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে বাকি প্রাণিকুল।

সত্যি বলতে কি, পরিবেশের এই অশান্তি মানুষের টিকে থাকাকেই হুমকির মধ্যে ফেলে দেবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ব্যাপক মাত্রার দূষণ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের জন্যই অনুপযুক্ত করে ফেলবে। ভবিষ্যৎ পৃথিবী হয়তো ঘন-ঘনই একটা যুদ্ধ দেখবে– মানুষের ক্ষমতা আর মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের পালটাপালটি যুদ্ধ। যেহেতু মানুষ প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের খেয়ালখুশিমতো অধীনস্থ করে রাখতে চেষ্টা করে, তার ফলে হয়তো আরো বেশি বেশি অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হতে থাকবে। এরপর সেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরো প্রচণ্ড রকমের হস্তক্ষেপ করতে হবে পরিবেশের ওপর, যার ফলাফল হবে আরো ভয়াবহ।

অনেকেই এই প্রক্রিয়াটাকে ‘প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ’ বলছেন। এটা কিন্তু আসলে ঠিক ধ্বংসযজ্ঞ নয়, এটা হলো পরিবর্তন। প্রকৃতি কখনো ধ্বংস করা যায় না। সাড়ে ৬ কোটি বছর আগে একটা গ্রহাণু

এসে পুরো ডাইনোসর প্রজাতিকে মুছে ফেলেছিল, আর তার ফলেই কিন্তু স্তন্যপায়ীদের জন্য নতুন এক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছিল। আজকে মানবজাতি অনেক প্রজাতিকেই বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে, এমনকি সে নিজেও হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ অন্য কিছু জীব কিন্তু বেশ ভালোই আছে। উদাহরণস্বরূপ, ইঁদুর আর তেলাপোকা তো এখন তাদের পূর্ণবিকাশের পথে আছে। এই কঠিন প্রাণের জীবগুলো নিজেদের ডিএনএকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হয়তো একদিন একটা পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের তলা থেকেও হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবে। হয়তো আজ থেকে সাড়ে ৬ কোটি বছর পর বুদ্ধিমান ইঁদুরেরা খুব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে মানবজাতির ওই ধ্বংসযজ্ঞকে, ঠিক যেমন আমরা স্মরণ করি ডাইনোসরদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া গ্রহাণুটিকে।

তার পরও, আমাদের নিজেদের বিলুপ্তির গুজবটা বেশ অকালপক্ব। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষের জনসংখ্যা আগেকার যে-কোনো সময়ের চেয়ে অনেক দ্রুত বেড়েছে। ১৭০০ সালের দিকে দুনিয়ায় মানুষ ছিল প্রায় ৭০ কোটি। ১৮০০ সালে এসে সেটা হলো ৯৫ কোটি। ১৯০০ সালে আমরা নিজেদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করে ১৬০ কোটি করে ফেললাম। আর ২০০০ সালে এসে সেটা প্রায় চার গুণ হয়ে হলো ৬০০ কোটি। আজ আমরা ৭০০ কোটিরও বেশি।

আধুনিক যুগ

যখন এই বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রকৃতির খেয়ালখুশিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সংখ্যায় বেড়েছে তখনি কিন্তু তারা আবার আরো বেশি করে আধুনিক বাণিজ্য আর সরকারের গোলাম হয়ে গিয়েছে। শিল্পবিপ্লব আসলে মানুষের সামাজিকতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক বিরাট সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও মানসিকতায় এসেছে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। এরকম অনেক উদাহরণের মধ্যে একটা হতে পারে– গতানুগতিক কৃষিকাজের প্রাকৃতিক ছন্দের জায়গায় কলকারখানার নিখুঁত উৎপাদনব্যবস্থার আগমন।

মানুষের গতানুগতিক কৃষিকাজ প্রাকৃতিক ঋতুচক্র আর জৈবিক বৃদ্ধির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করত। বেশিরভাগ সমাজই পুঙ্খানুপুঙ্খ সময়ের হিসাব করতে পারত না, এমনকি তাদের তেমন গরজও ছিল না। শুধু সূর্যের ঘূর্ণন আর উদ্ভিদের জৈবিক বৃদ্ধির ওপর ভরসা করে পৃথিবীটা কোনো সময়সূচি ছাড়াই বেশ চলছিল। কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ছিল না। সব কাজের সময়সূচি এক ঋতু থেকে আরেক ঋতুতে দারুণভাবে বদলে যেত। মানুষ জানতো সূর্য এই মুহূর্তে কোথায়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত বর্ষার কিংবা হেমন্তের কিছু লক্ষণ দেখার জন্য। কিন্তু ঠিক দিন তারিখটা তারা জানতো না। কোনো পথভোলা সময়যাত্রী (Time Traveller) যদি মধ্যযুগের এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়ে রাস্তায় কাউকে জিগ্যেস করে 'এটা কত সাল?' তাহলে সেই গ্রামবাসী তার প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে যাবে। কারণ তখনকার দিনে এই প্রশ্নটা হবে ওই সময়যাত্রীর পোশাকের মতোই উদ্ভট।

মধ্যযুগের কৃষক কিংবা মুচির বিপরীতে আজকের আধুনিক শিল্পকারখানা সূর্য আর ঋতুচক্রকে থোড়াই কেয়ার করে। বরং এটি নির্ভুলতা আর অভিন্নতার পুজো করে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগের একটা কারখানায় প্রতিটি মুচিই একটা গোটা জুতো বানিয়ে ফেলত, একদম সোল থেকে শুরু করে ফিতে পর্যন্ত। যদি একজন মুচি কাজে দেরিতে আসত সেটা অন্যদের কাজের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াত না। কিন্তু আজকের জুতো তৈরির কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনে একেকজন শ্রমিক আসলে একেকটা যন্ত্র চালায় যেখানে জুতোর একটা নির্দিষ্ট অংশ তৈরি করে পরের যন্ত্রের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়। ৫ নম্বর যন্ত্রে যে কাজ করে সে যদি ঘুম থেকে দেরিতে ওঠে তাহলে এর পরের সব যন্ত্রকে থেমে যেতে হয়। এই ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য প্রত্যেককে একটা নির্দিষ্ট সময় মেনে চলতে হয়। প্রত্যেক শ্রমিক একই সময়ে কাজে আসে। খিদে লাগুক আর নাই লাগুক প্রত্যেকে একই সময়ে দুপুরের খাবার খায়। হাতের কাজ শেষ হয়ে গেলেই কেউ বাড়ি যায় না, সবাই অপেক্ষা করে একটা বাঁশি বাজার, যেটা জানিয়ে দেবে যে তাদের কর্মঘণ্টা শেষ হয়েছে।
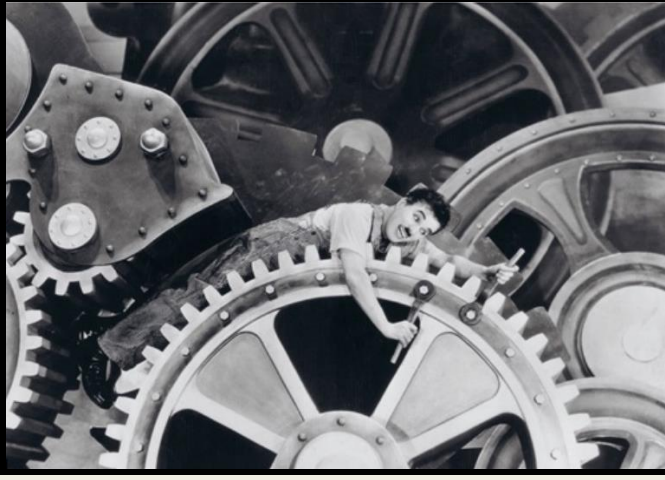
৪২। মডার্ন টাইমস (১৯৩৬) চলচ্চিত্রে একজন সাধারণ কারখানা শ্রমিকের বেশে চার্লি চ্যাপলিন।

শিল্পবিপ্লব সময়সূচি এবং অ্যাসেম্বলি লাইনকে মানুষের সব কাজকর্মের একটা সাধারণ ধাঁচ বানিয়ে ফেলল। কলকারখানাগুলো তাদের নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণা করার পরপরই স্কুলগুলোও সময় বেঁধে দিল, তারপর হাসপাতাল, সরকারি দপ্তর এমনকি মুদি দোকানও। যেসব জায়গায় কোনো অ্যাসেম্বলি লাইন কিংবা যন্ত্র নেই, সেখানেও সময়সূচি হয়ে গেল রাজা। যদি কারখানার কাজ শেষ হয় ঠিক বিকাল ৫টায়, তাহলে মদের দোকানটা ৫টার পরপর খোলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সময়সূচির এই ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে জনপরিবহণের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। যদি শ্রমিকদের ঠিক সকাল ৮টায় কাজ শুরু করতে হয়, তাহলে ট্রেন আর বাসগুলোকেও কারখানার গেটে পৌঁছাতে হবে ঠিক ৭টা ৫৫র মধ্যে। কয়েক মিনিটের দেরিও উৎপাদন ঘাটতি তৈরি করবে, তার ফলে দেরিতে আসা শ্রমিকটা তার চাকরিও হারাতে পারে। ব্রিটেনে ১৭৮৪ সালে নির্দিষ্ট সময়সূচির ঘোষণা দিয়ে একটা পরিবহণব্যবস্থা চালু হয়। এর সময়সূচিতে শুধু কখন ছাড়বে সেটা উল্লেখ করা হতো, কখন পৌঁছাবে সেটা নয়।

সেইসময় প্রতিটা ব্রিটিশ শহরের নিজেদের আলাদা সময়ের মানদণ্ড ছিল, যা লন্ডনের সময়ের সঙ্গে প্রায় আধা ঘণ্টার ব্যবধানে হতে পারত। লন্ডনে যখন দুপুর ১২টা, তখন লিভারপুলে হয়তো ১২টা ২০ আর ক্যান্টারবেরিতে ১১টা ৫০। যেহেতু কোনো টেলিফোন, রেডিও কিংবা টেলিভিশন ছিল না তাই কেউই জানত না অন্য কোথায় কটা বাজে। আসলে কেউ মাথাও ঘামাত না।[২]

প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রেলগাড়ি চলা শুরু হয় লিভারপুল আর ম্যানচেস্টারের মধ্যে, ১৮৩০ সালে। এর ১০ বছর পর প্রথম ট্রেনের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়। ট্রেনগুলো আগেকার পরিবহণগুলোর চেয়ে অনেক দ্রুতগামী ছিল বলে বিভিন্ন এলাকার বিচিত্র সময়ের মানদণ্ড একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৮৪৭ সালে সব ব্রিটিশ ট্রেন কোম্পানি একজোট হয়ে ঠিক করল এখন থেকে সব ট্রেন এলাকাভিত্তিক সময় বাদ দিয়ে গ্রিনিচ মানমন্দিরের সময় মেনে চলবে। এরপর আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ট্রেন কোম্পানি এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকল। অবশেষে ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ সরকার এক অভূতপূর্ব ঘোষণার মাধ্যমে জানাল যে ব্রিটেনের সব সময়সূচি হতে হবে গ্রিনিচ সময় অনুসারে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটা দেশ জাতীয়ভাবে সময়ের মানদণ্ড গ্রহণ করল আর এর মাধ্যমে তার অধিবাসীদেরকে বাধ্য করল সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের চক্রকে ভুলে গিয়ে একটা কৃত্রিম ঘড়ির সময় অনুযায়ী জীবন যাপন করতে।

এই দুর্দান্ত শুরুটা আস্তে আস্তে একটা বিশ্বব্যাপী সময়সূচির সূচনা করল, যেটা কিনা সেকেন্ডের ভগ্নাংশ পরিমাণেও নিখুঁত। সম্প্রচারমাধ্যমগুলো– প্রথমে রেডিও, পরে টেলিভিশন যখন শুভসূচনা করল তারা প্রবেশ করল একই সময়সূচির জগতে আর তারপর আস্তে আস্তে তারাই এর ধারক ও বাহকে পরিণত হলো। রেডিও স্টেশনগুলো প্রথম যে তথ্য সম্প্রচার করত সেটা ছিল সময়, কিছু বিপ বিপ শব্দ যেটা অনেক দূরবর্তী জাহাজ আর বসতিকে নিজেদের ঘড়ির সময়টা ঠিক করে নিতে সাহায্য করত। তারপর রেডিও স্টেশনগুলো প্রতি ঘণ্টায় সংবাদ প্রচারের ধারণা বাস্তবায়ন করল। এখনো যে-কোনো খবর সম্প্রচারের প্রথম উপাদানই হলো সময়, এমনকি এটা যুদ্ধের ঘোষণার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের সময়, নাৎসি অধিকৃত ইউরোপে বিবিসি সংবাদ সম্প্রচারিত হতো। প্রতিটা সংবাদ অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিগ বেনের ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ সরাসরি সম্প্রচারে শোনানো হতো– সে যেন মুক্তির এক জাদুময় শব্দ। কয়েকজন প্রতিভাবান জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী এই সম্প্রচারিত ঢং ঢং শব্দের সামান্য তারতম্য থেকে লন্ডনের আবহাওয়ার অবস্থা বের করে ফেলেছিলেন। এই তথ্য জার্মানদের যুদ্ধবিমানগুলোকে দারুণ সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা যখন ব্যাপারটা জানতে পারল, তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার শব্দ সরাসরি সম্প্রচারের জায়গায় একটা রেকর্ড করা শব্দ শোনানো শুরু করল।

সময়সূচির এই মহাযজ্ঞ চালানোর জন্য সস্তা এবং সহজে বহনযোগ্য ঘড়ি হয়ে গেল সহজলভ্য। আসিরীয়, সাসানিদ কিংবা ইনকা সভ্যতার শহরগুলোতে বড়োজোর হাতে-গোনা কয়েকটা সূর্যঘড়ি থাকত। ইউরোপের মধ্যযুগীয় শহরগুলোতে সাধারণত একটাই ঘড়ি থাকত– শহরের মাঝখানে একটা বড়োসড়ো মিনারের ওপর বসানো এক বিশাল যন্ত্র। ওইসব ঘড়িগুলো বেজায় রকমের ভুল সময় দিত। কিন্তু যেহেতু শহরে আর কোনো ঘড়ি ছিল না যে তারতম্যটা বোঝা যাবে সুতরাং কিছুই আসত-যেত না। আজকের দিনে, একটা সচ্ছল পরিবারে যতগুলো ঘড়ি আছে মধ্যযুগে একটা পুরো দেশেও হয়তো ততগুলো থাকত না! এখন আপনি সময়টা বলতে পারেন হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে, অ্যানড্রয়েড ফোনটার পর্দায় তাকিয়ে, বিছানার পাশে রাখা অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে ভুরু কুঁচকে, রান্নাঘরের দেওয়ালে বড়ো ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে, মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দিকে তাকিয়ে, টেলিভিশন কিংবা ডিভিডি প্লেয়ারের পর্দায় কিংবা চোখের কোণ দিয়ে কম্পিউটারের টাস্কবারে তাকিয়ে। এখন বরং সময়টা না জেনে থাকার জন্য অনেক কষ্ট করতে হবে।

এখনকার একজন সাধারণ মানুষ দিনের মধ্যে প্রায় কয়েক ডজন বার সময় দেখে নেয়, কারণ আমরা যা কিছু করি তার প্রায় সবকিছুই সময়মতো করতে হয়। একটা অ্যালার্ম ঘড়ি আমাদের সকাল ৭টায় উঠিয়ে দেয়, এরপর আমরা আমাদের হিমায়িত খাবারগুলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দিয়ে ঠিক ৫০ সেকেন্ড গরম করে নিই, দাঁত ব্রাশ করি তিন মিনিট ধরে যতক্ষণ না ইলেকট্রিক টুথব্রাশটা একটা বিপ

শব্দ করে জানান দেয়, ৭টা ৪০-এর ট্রেনটা ধরি কাজের জন্য, কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠানটা দেখতে টেলিভিশনের সামনে বসি ৭টার সময়, এর মধ্যে বিরক্ত হই কিছু বিজ্ঞাপন দেখে যেগুলোর প্রতি সেকেন্ডের মূল্য প্রায় ১ হাজার ডলার। নিজেদের সব রাগ ঝাড়ি একজন পেশাদার মনোবিদের কাছে, যাকে একটানা ৫০ মিনিটের বেশি পাওয়া যায় না।

শিল্পবিপ্লব মানবসমাজে ডজনখানেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসে। কলকারখানার সময়ের সঙ্গে জীবনকে মানিয়ে নেওয়া তার মধ্যে একটি মাত্র। অন্যান্য উল্লেখ করার মতো উদাহরণগুলোর মধ্যে আছে নগরায়ণ, কৃষকের সংখ্যা কমে যাওয়া, কলকারখানায় কাজ করা খেটে খাওয়া মানুষের উদ্ভব, সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্রের প্রসার, তারুণ্যনির্ভর সংস্কৃতি এবং পুরুষশাসিত সমাজের ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাওয়া।

এতসব পরিবর্তন যদিও চমকপ্রদ, কিন্তু এর চেয়েও ঢের বেশি চমকপ্রদ পরিবর্তন এসেছে মানুষের সমাজে। ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবটা হলো, পরিবার আর এলাকাভিত্তিক সম্প্রদায়ের পতন এবং তার জায়গায় রাষ্ট্র আর বাজারের উত্থান। ইতিহাসের একদম শুরু থেকে, যতদূর পর্যন্ত আমরা জানতে পারি, প্রায় ১০ লাখ বছরেরও আগে, মানুষ ছোটো ছোটো কাছাকাছি-থাকা কিছু সম্প্রদায়ে বসবাস করত। সেসব সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ সদস্যই ছিল একে অপরের আত্মীয়। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব কিংবা কৃষিবিপ্লব এসেও সেটার তেমন পরিবর্তন ঘটায়নি। সেটা বরং পরিবার আর সম্প্রদায়গুলোকে আরো কাছাকাছি এনে গোষ্ঠী, শহর, রাজত্ব এবং সাম্রাজ্য গঠন করেছে। সেখানেও মানবসমাজের গঠনগত মৌলিক উপাদান ছিল পরিবার কিংবা সম্প্রদায়। অন্যদিকে, শিল্পবিপ্লব এসে মাত্র দুই শতকের মধ্যেই এই মৌলিক উপাদানকে ভেঙে ফেলল। গতানুগতিক যেসব দায়িত্ব পরিবার আর সম্প্রদায় পালন করে আসছিল, তার অনেকগুলোই এর পর থেকে রাষ্ট্র আর বাজারের হাতে চলে গেল।

পরিবার আর সম্প্রদায়ের পতন

শিল্পবিপ্লবের আগে বেশিরভাগ মানুষের দৈনন্দিন জীবন তিনটি কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকত : একক পরিবার, যৌথ পরিবার আর অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়।* বেশিরভাগ মানুষই পারিবারিক ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকত– সেটা হতে পারে পারিবারিক খামার কিংবা পারিবারিক কারখানা। কেউ কেউ হয়তো প্রতিবেশীর পারিবারিক ব্যবসায়েও কাজ করত। পরিবার নিজেই ছিল একাধারে কল্যাণ সংস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, নির্মাণশিল্প-কারখানা, শ্রমকল্যাণ সমিতি, পেনশন তহবিল, বিমা কোম্পানি, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ পত্রিকা, ব্যাংক এমনকি পুলিশ পর্যন্ত।

একজন মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ত পরিবার তার দেখাশোনা করত। একজন বুড়ো হয়ে গেলে পরিবারই তার সমর্থন জোগাত আর তার ছেলেমেয়েরা হতো তার পেনশন তহবিল। একজন মানুষ মারা গেলে পরিবার তার অনাথ শিশুদের দেখভাল করত। কেউ যদি একটা কুঁড়েঘর বানাতে চাইত, পরিবার তাতে হাত লাগাত। কেউ নতুন ব্যবসায় শুরু করতে চাইলে পরিবার দরকারি মূলধনের জোগান দেওয়ার চেষ্টা করত। কেউ যদি বিয়ে করতে চাইত তার জীবনসঙ্গী পরিবারই খুঁজে দিত কিংবা অন্তত গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিত। প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো গোলমাল হলে পুরো পরিবার তাতে জড়িয়ে পড়ত। কিন্তু যদি কারো অসুস্থতা এতই মারাত্মক হতো যে পরিবারের পক্ষে দেখাশোনা করা সম্ভব নয়, কিংবা কারো নতুন ব্যবসায়ের জন্য যে পরিমাণ টাকা লাগবে সেটা পরিবারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না, অথবা প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়াটা রীতিমতো মারামারির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে– এরকম সব অবস্থায় এলাকার মানুষজন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত।

---

* একটি 'অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়' বলতে এমন একদল মানুষকে বোঝায়, যারা নিজেদের খুব ভালোভাবে চেনে এবং টিকে থাকার জন্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

সম্প্রদায়ের মানুষজন এলাকার ঐতিহ্য আর অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বিবেচনা করেই সাহায্য করত। তাদের সাহায্যের ধরন অনেক ক্ষেত্রেই মুক্ত বাজারের চাহিদা আর জোগানের নিয়মকানুনের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। পুরোনো ধাঁচের মধ্যযুগীয় কোনো এক সম্প্রদায়ে আমার প্রতিবেশী অভাবে পড়লে কোনো রকম প্রতিদানের আশা ছাড়াই আমি তার বাড়ি বানাতে আর তার ভেড়ার পাল পাহারা দিতে সাহায্য করতাম। আবার যখন আমি বিপদে পড়তাম, আমার প্রতিবেশীও আমাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করত। একই সময়ে এলাকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিটি হয়তো আমাদের গ্রামের সবাইকে দিয়ে তার প্রাসাদটি বানিয়ে নিত আমাদের কোনো টাকাপয়সা না দিয়েই। এর বিনিময়ে আমরা তার ওপর ভরসা করতাম যে সে ডাকাত কিংবা বর্বরদের থেকে আমাদের রক্ষা করবে। গ্রাম্য জীবনে অনেক লেনদেন হতো কিন্তু সেখানে টাকাপয়সার আদানপ্রদান ছিল না। কিছু বাজারও ছিল যদিও, কিন্তু সেগুলোর অবদান ছিল সীমিত। হয়তো বাজার থেকে দুর্লভ মসলা, কাপড় কিংবা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যেত অথবা উকিল আর ডাক্তারের সেবা পাওয়া যেত। কিন্তু তার পরও সাধারণভাবে ব্যবহার করার মতো জিনিসপত্রের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগেরও কম জিনিস বাজারে পাওয়া যেত। মানুষের বেশিরভাগ প্রয়োজনই মিটে যেত পরিবার আর সম্প্রদায়ের মধ্যেই।

সে সময় রাজত্ব আর সাম্রাজ্যেরও অস্তিত্ব ছিল। সেগুলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজও করত, যেমন যুদ্ধ করা, রাস্তাঘাট বানানো আর প্রাসাদ নির্মাণ করা। এইসব কারণেই রাজারা খাজনা বাড়াত আর মাঝে মাঝে নতুন সৈন্য আর শ্রমিক নিয়োগ দিত। তার পরও অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা পরিবার আর সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করত না। যদি তারা হস্তক্ষেপ করতেও চাইত, তবু বেশিরভাগ রাজাই খুব একটা সুবিধা করতে পারত না। গতানুগতিক কৃষি-অর্থনীতিনির্ভর সমাজে বাড়তি উৎপাদন তেমন একটা হতো না, যা দিয়ে গাদা গাদা সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ, সমাজসেবী, শিক্ষক আর ডাক্তারদের বেতন দেওয়া যাবে। ফলাফলস্বরূপ, বেশিরভাগ শাসকই বড়ো পরিসরে কোনো কল্যাণ তহবিল, স্বাস্থ্যসেবা কিংবা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। তারা

সেসব ব্যাপার পরিবার আর সম্প্রদায়ের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি খুব বিরল কিছু মুহূর্তে, যখন শাসক কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনে জোর করে হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে (যেমনটা হয়েছিল চীন সাম্রাজ্যে), তখনো তারা সেটা করেছে পরিবারের প্রধান কিংবা সম্প্রদায় প্রধানদেরকে হাত করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দূরবর্তী সম্প্রদায়ে যোগাযোগ আর পরিবহণব্যবস্থা এত বাজে ছিল যে, অনেক রাজ্যই খাজনা আদায় কিংবা দ্বন্দ্ব মিটমাটের মতো খুব সাধারণ রাজকীয় দায়দায়িত্বগুলোও সম্প্রদায়ের ওপরই ছেড়ে দিত। উদাহরণস্বরূপ, অটোমান সাম্রাজ্য গৃহস্থালি বিবাদ মিটমাটের ভার পরিবারের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিল, এর জন্য কোনো রাজপেয়াদা নিয়োগ না করেই। যদি আমার ভাই কাউকে মেরে ফেলে থাকে, তাহলে নিহতের ভাই আমাকে মেরে ফেলতে পারে। এই প্রতিশোধটা ছিল অনুমোদিত। যতক্ষণ সবকিছু একটা সীমার মধ্যে থাকছে ততক্ষণ ইস্তানবুলের সুলতান কিংবা প্রাদেশিক প্রতিনিধি এসব দ্বন্দ্বের মধ্যে হস্তক্ষেপ করত না।

চীনের মিং সাম্রাজ্যে (১৩৬৮-১৬৪৪), সব অধিবাসীরা সংগঠিত ছিল 'বাওজিয়া' পদ্ধতিতে। ১০টা পরিবার মিলে হতো একটা 'জিয়া' আর ১০টা জিয়া মিলে তৈরি হতো একটা 'বাও'। কোনো একটা বাওয়ের কোনো সদস্য যদি অপরাধ করত তাহলে ওই বাওয়ের অন্য কোনো সদস্য শাস্তি পেতে পারত, বিশেষ করে বৃদ্ধ সদস্যরা। সরকারি খাজনাও নির্ধারিত হতো বাওয়ের মাধ্যমেই। সরকারি কোনো কর্মকর্তা নয়, বরং বাওয়ের গুরুজনেরাই ঠিক করত কোন পরিবারের কতটুকু খাজনা দিতে হবে। সাম্রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পদ্ধতিটা খুব সুবিধাজনক ছিল। হাজার হাজার খাজনাসংক্রান্ত কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার বদলে এইসব কাজ সম্প্রদায়ের গুরুজনদের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। গুরুজনেরা জানত, প্রতিটি গ্রামবাসীর মূল্য কীরকম আর তাই তারা কোনো রাজপেয়াদার হস্তক্ষেপ ছাড়াই খাজনা আদায় করতে পারত।

অনেক রাজত্ব ও সাম্রাজ্য সত্যিকার অর্থে ছিল নিরাপত্তার স্বার্থে পোষা গুন্ডার মতো। রাজা ছিল গুন্ডাসর্দার, যে এলাকাবাসীর থেকে পয়সা নিত আর বিনিময়ে নিশ্চিত করত অন্য এলাকার গুন্ডাপান্ডারা

যেন তার এলাকায় ঝামেলা না করে। এর বাইরে রাজার তেমন কোনো কাজ ছিল না।

পরিবার আর সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরের জীবন মোটেই আদর্শ ছিল না। অনেক পরিবার কিংবা সম্প্রদায় তার সদস্যদের শোষণ করত। সেই শোষণ এখনকার রাষ্ট্র কিংবা বাজারের শোষণের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়-আশয় ছিল দুশ্চিন্তা আর হিংস্রতায় ভরপুর। তার পরও মানুষের খুব একটা উপায়ও ছিল না। ১৭৫০ সালে যে মানুষ তার পরিবার কিংবা সম্প্রদায় হারিয়েছে সে প্রায় মৃত মানুষের সমান। তার না ছিল কোনো কাজ, কোনো শিক্ষা কিংবা বিপদ-আপদে সাহায্য পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা। কেউ তাকে টাকাপয়সা আর দিত না কিংবা কোনো ঝামেলায় জড়ালে তার পক্ষও নিত না। কোনো পুলিশ, সমাজসেবী কিংবা বাধ্যতামূলক শিক্ষার চল ছিল না। বেঁচে থাকার জন্য সেই মানুষটিকে যত দ্রুত সম্ভব নতুন কোনো পরিবার বা সম্প্রদায়ে যোগ দিতে হতো। যেসব ছেলেমেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাত তারা খুব বেশি হলে অন্য কোনো পরিবারের চাকর হিসেবে বসবাস করতে পারত। কপাল খারাপ হলে তাদের জায়গা হতো সেনাবাহিনীতে কিংবা পতিতালয়ে।

এই সবকিছুই গত দুই শতাব্দীতে বদলে যায় নাটকীয়ভাবে। শিল্পবিপ্লব বাজারব্যবস্থার হাতে নতুন এবং অপরিমেয় শক্তি এনে দেয়। রাষ্ট্রকে দেয় নতুন ধরনের যোগাযোগ আর পরিবহণব্যবস্থা। সরকারের হাতে চলে আসে একগাদা কর্মচারী, শিক্ষক, পুলিশ আর সমাজসেবী। প্রথমদিকে রাষ্ট্র আর বাজারব্যবস্থা আবিষ্কার করল যে, গতানুগতিক পরিবার আর সম্প্রদায় তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অভিভাবক ও এলাকার গুরুজনেরা তাদের সন্তানদের জাতীয়তাবাদী মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষাব্যবস্থায় যোগ দিতে, বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে কিংবা শহুরে শ্রমিক হওয়ার ব্যাপারে বেশ অনিচ্ছুক ছিল।

ধীরে ধীরে রাষ্ট্রযন্ত্র তার ক্রমবর্ধমান শক্তি ব্যবহার করে পরিবারব্যবস্থার গতানুগতিক বন্ধন ভেঙে দিতে সমর্থ হলো। রাষ্ট্র তার পুলিশবাহিনীকে পাঠাতে লাগল পারিবারিক বিবাদ নিরসনে। দরকার হলে আদালত পর্যন্ত গড়াত ব্যাপারটা। বাজারব্যবস্থা পাঠাতে

লাগল তার হকারদের, যার ফলে দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক ঐতিহ্য সরে গিয়ে জায়গা করে দিল নিয়ত পরিবর্তনশীল বাণিজ্যিক ঢং। এতসবও যথেষ্ট ছিল না, পরিবারব্যবস্থার শক্তিকে পুরোপুরি ভাঙার জন্য তাকে আরেকটি নতুন কৌশলের সাহায্য নিতে হলো।

রাষ্ট্রযন্ত্র মানুষজনকে এমন একটা প্রস্তাব দিল, যে প্রস্তাব ফেরানো যায় না। তারা বলল, 'স্বাধীন ব্যক্তি হও। যাকে খুশি তাকে বিয়ে করো, বাবা-মাকে জিগ্যেস করার কী দরকার? যে কাজ করতে ইচ্ছে হয় সেটাই করো, গুরুজনের ভ্রুকুটিকে পাত্তা দিয়ো না। যেখানে খুশি বসবাস করো, তাতে যদি প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যেতে নাও পারো তো কী হয়েছে। তুমি এখন আর পরিবার কিংবা সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল নও। আমরা, রাষ্ট্রযন্ত্র, আমরাই তোমাদের দেখভাল করব। আমরা তোমাদের খাবার দেব, আশ্রয় দেব, শিক্ষা দেব, স্বাস্থ্যসেবা দেব আর কাজ দেব। আমরা পেনশন দেব, বিমা দেব এবং নিরাপত্তাও দেব।'

রোমান্টিক সাহিত্য অনেক সময় ব্যক্তিমানুষকে রাষ্ট্র আর বাজারের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে। এর চেয়ে ডাহা মিথ্যে আর হয় না। ব্যক্তিমানুষের বাবা-মা হলো রাষ্ট্র আর বাজার, তাদের জন্যই সে বাঁচতে পারে। বাজারব্যবস্থা আমাদের কাজ দেয়, বিমা দেয় আর পেনশন দেয়। কোনো কাজ শিখতে চাইলে সরকারি স্কুল কলেজে পড়াশোনা করে আমরা তা শিখতে পারি। আমরা ব্যবসায় করতে চাইলে ব্যাংক আমাদের টাকা ধার দেয়। আমরা বাড়ি বানাতে চাইলে নির্মাণ কোম্পানি আমাদের বাড়ি বানিয়ে দেয় আর ব্যাংক সেটা বন্ধক রাখে, মাঝে মাঝে তো সরকারি বিমাও থাকে। সব রকম ঝামেলা সামলানোর জন্য আছে পুলিশ। আমরা যদি মাসের পর মাস দুর্বল হয়ে পড়ে থাকি, সামাজিক নিরাপত্তা বাহিনী ছুটে আসে। আমাদের যদি সার্বক্ষণিক সেবার দরকার হয় আমরা একজন নার্সকে ভাড়া করে আনতে পারি। হয়তো পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে আসা সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন নার্স আমাদের এমন আন্তরিকতার সঙ্গে দেখভাল করবে, যেটা আমরা নিজের সন্তানের কাছেও আশা করি না। উপযুক্ত কারণ থাকলে, আমরা আমাদের জীবনের সুবর্ণ সময়টা কোনো এক

অপিরিচিত গুরুজনের বাড়িতেও কাটিয়ে দিতে পারি। খাজনা আদায় দপ্তর আমাদের একেকজনকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য করে, তাই আমরা শুধু নিজের খাজনাই দিই, প্রতিবেশীরটা নয়। আদালতও আমাদের ব্যক্তি হিসেবে দেখে, তাই আমাদের কখনো আমাদের আত্মীয়ের করা অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হয় না।

শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই নয়, নারী ও শিশুকেও ব্যক্তিমানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইতিহাস জুড়ে নারী ছিল পরিবার কিংবা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। অন্যদিকে, আধুনিক রাষ্ট্র নারীকে একজন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে দেখে, যে কিনা পরিবার কিংবা সম্প্রদায় ছাড়াই অর্থনৈতিক আর আইনগত অধিকার স্বাধীনভাবে ভোগ করে। তারা তাদের নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখতে পারে, কাকে বিয়ে করবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ করে একা একাই বসবাস করতে পারে।

ব্যক্তিমানুষের এই স্বাধীনতা এসেছে একটা চড়া মূল্যের বিনিময়ে। আমরা অনেকেই এখন দুঃখ করি হারিয়ে যাওয়া শক্তিশালী পরিবার আর সম্প্রদায়ের কথা ভেবে। আমরা নিজেদের খুব নিঃসঙ্গ মনে করি আর সব সময় ভয়ে থাকি যে রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের জীবন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষ দিয়ে গড়া যে সমাজ সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র খুব সহজেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে, যেটা পরিবার আর সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজে সম্ভব ছিল না। যেখানে একই দালানে থাকা দুজন প্রতিবেশী তাদের দারোয়ানকে কত টাকা বেতন দেবে সেই হিসাবেই একমত হতে পারে না, সেখানে তারা রাষ্ট্রকে থামাবে কীভাবে?

রাষ্ট্র, বাজারব্যবস্থা আর ব্যক্তিমানুষের মধ্যেকার বোঝাপড়াটা খুব একটা সহজ নয়। রাষ্ট্র ও বাজারব্যবস্থা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কখনোই একমত হতে পারে না। ওদিকে ব্যক্তিমানুষ অভিযোগ করে, ওই দুই পক্ষই চায় অনেক বেশি কিন্তু দেয় খুব কম। অনেক সময়ই দেখা যায়, ব্যক্তিমানুষ বাজারব্যবস্থার খপ্পরে পড়ে ব্যবহৃত হয় আর রাষ্ট্র তার আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ দিয়ে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে নির্যাতন করে। তার পরও দারুণ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই ত্রিমুখী ব্যবস্থাটা বেশ চলছে, তার যতই খুঁত থাকুক না কেন। এই ব্যবস্থা অসংখ্য প্রজন্ম ধরে চলে আসা

মানুষের সমাজব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এক ধাক্কায়। লাখ লাখ বছরের বিবর্তন আমাদের তৈরি করেছে নিজেদেরকে সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে মনে করে জীবন যাপন করতে। অথচ মাত্র দুই শতকের মধ্যেই আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষে পরিণত হলাম। সংস্কৃতির দুর্দান্ত ক্ষমতার এর চেয়ে ভালো প্রমাণ আর কীই-বা হতে পারে?

এত কিছুর পরও আধুনিক সময়ের দৃশ্যপট থেকে একক পরিবারের ধারণাটা কিন্তু একদম উধাও হয়ে যায়নি। যখন রাষ্ট্রযন্ত্র পরিবারের কাছে থেকে তার বেশিরভাগ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দায়ভার কেড়ে নিল, তখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর দায়িত্ব রেখেও এসেছিল। আধুনিক পরিবার এখনো মানুষের কিছু অন্তরঙ্গ চাহিদা পূরণ করে, যেটা রাষ্ট্রযন্ত্র পারে না (অন্তত এখন পর্যন্ত)। কিন্তু এখানেও পরিবার নিয়মিতভাবেই বাইরের হস্তক্ষেপের শিকার হচ্ছে। দিনকে দিন বাজারব্যবস্থা আরো বেশি করে মানুষের ব্যক্তিগত এবং যৌন জীবনকে প্রভাবিত করছে। যেখানে আগেকার দিনে পরিবারই ছিল মূল ঘটক, আজকের দিনে বাজারব্যবস্থা প্রথমে আমাদের মধ্যে প্রণয়ঘটিত এবং যৌনাচারের পছন্দসই চাহিদা তৈরি করছে, তারপর একটা মোটা ফিয়ের বিনিময়ে সেটা পূরণ করছে। আগেকার সময় বর-বধূর প্রথম দেখা হতো পরিবারের বৈঠকখানায়, তারপর তাদের পিতাদের মধ্যে কিছু টাকাপয়সার আদানপ্রদান হতো। ইদানীং প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম দর্শন হয় বারে কিংবা কফিহাউজে আর টাকা পয়সা যায় প্রেমিকের হাত থেকে ওয়েটারের হাতে। তার চেয়েও বেশি টাকা চলে যায় ফ্যাশন ডিজাইনার, জিম ম্যানেজার, ডায়েটিশিয়ান, কসমেটিশিয়ান ও প্লাস্টিক সার্জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, যারা আমাদের বাজারের চলতি মাপকাঠিতে 'সুন্দর' করে তোলে।

এদিকে অনেক রাষ্ট্রও কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের ওপর বেশ তীক্ষ্ণ নজর রাখে, বিশেষ করে পিতা-মাতা আর সন্তানের মধ্যে। পিতা-মাতা তার সন্তানদের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করতে বাধ্য। যেসব পিতা-মাতা সন্তানদের সঙ্গে হিংস্র আচরণ করে তাদেরকে রাষ্ট্র সংযত হতে বাধ্য করে। দরকার পড়লে রাষ্ট্র সেইসব পিতা-মাতাকে

জেলখানায় পাঠিয়ে দিতে পারে কিংবা তাদের সন্তানদের অন্য পরিবারের কাছে সঁপে দিতে পারে। বেশিদিন আগের কথা নয়, রাষ্ট্র যে পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের প্রহার করা কিংবা অপমান করা থেকে বিরত রাখবে– এই ধারণাটাই খুবই হাস্যকর আর অকেজো শোনাত। অনেক সমাজেই পিতা-মাতার কর্তৃত্ব ছিল পবিত্র। পিতা-মাতাকে সম্মান করা এবং তাদের প্রতি অনুগত থাকা সবচেয়ে পুণ্যের কাজ ছিল। পিতা-মাতার অধিকার ছিল তার সন্তানদের নিয়ে যা খুশি তা-ই করার। তারা চাইলে নবজাতককে হত্যা করতে পারত, সন্তানদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা মেয়েশিশুদের তাদের বয়সের চেয়ে দ্বিগুণ বয়সের পুরুষের সঙ্গে বিয়েও দিতে পারত। আজকালকার দিনে পিতা-মাতার কর্তৃত্ব প্রায় উঠেই যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়াটাকে ততই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। উলটো সন্তানের জীবনের যে-কোনো ঝামেলার জন্য পিতা-মাতাকেই দায়ী করা হচ্ছে। স্ট্যালিনের সময়ের পঞ্চায়েতে যেমন পিতা-মাতারা দাঁড়াত বাদীর আসনে, ঠিক তেমনই এখন তারা হরহামেশাই দাঁড়াচ্ছে ফ্রয়েডের কাঠগড়ায়।

পরিবার ও সম্প্রদায় বনাম রাষ্ট্র ও বাজারব্যবস্থা
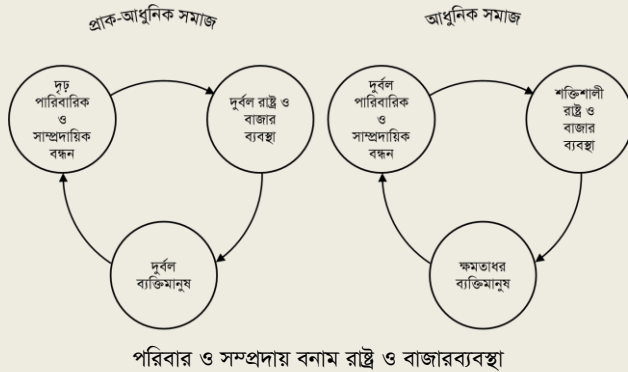
কাল্পনিক সম্প্রদায়

একক পরিবারের মতোই সম্প্রদায়ও কোনো উপযুক্ত প্রতিস্থাপন ছাড়া এমনি এমনি উধাও হয়ে যেতে পারেনি। আগেকার দিনে

সম্প্রদায় আমাদের যেসব বস্তুগত চাহিদা মেটাতে পারত এখনকার রাষ্ট্র আর বাজারব্যবস্থাও সেসবের প্রায় পুরোটাই মেটাতে পারে। কিন্তু শুধু বস্তুগত চাহিদা মেটালেই তো হবে না, সামাজিক বন্ধনেরও তো জোগান দিতে পারতে হবে।

সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য বাজারব্যবস্থা আর রাষ্ট্রযন্ত্র কিছু 'কাল্পনিক সম্প্রদায়' তৈরি করে। এসব সম্প্রদায়ে লাখ লাখ অপরিচিত লোকজন থাকে। সম্প্রদায়গুলো সাজানো হয় রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক প্রয়োজন অনুসারে। একটা কাল্পনিক সম্প্রদায় হলো এমন কিছু মানুষের সম্প্রদায়, যারা একে অপরকে চেনে না কিন্তু কল্পনা করে নেয় যে চেনে। এরকম সম্প্রদায় কিন্তু নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। রাজত্ব, সাম্রাজ্য ও চার্চ এরকমই কাল্পনিক সম্প্রদায় হিসেবে হাজার বছর টিকে ছিল। প্রাচীন চীনে, লাখ লাখ মানুষ নিজেদেরকে একটামাত্র পরিবারের সদস্য মনে করত আর সম্রাটকে মনে করত তাদের পিতা। মধ্যযুগে, লাখ লাখ মুসলমান কল্পনা করত যে ইসলামের পতাকাতলে তারা সবাই ভাইবোন। তার পরও ইতিহাস জুড়ে এরকম কাল্পনিক সম্প্রদায়গুলো আসলে অতটা অন্তরঙ্গ ছিল না, যতটা ছিল কয়েক ডজন কাছাকাছি থাকা পরস্পর বেশ ভালোভাবে পরিচিত মানুষের সম্প্রদায়। ওই অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়গুলো তার সদস্যদের মানসিক চাহিদা মেটাতে পারত এবং ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণও ছিল। গত দুই শতাব্দীতে সেই অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়গুলো ম্লান হয়ে গেছে আর তাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য উত্থান হয়েছে কাল্পনিক সম্প্রদায়ের।

কাল্পনিক সম্প্রদায়ের উত্থানের অন্যতম দুটো বড়ো উদাহরণ হলো জাতি ও ভোক্তাগোষ্ঠী। জাতি হলো রাষ্ট্রের তৈরি কাল্পনিক সম্প্রদায়। ভোক্তাগোষ্ঠী হলো বাজারব্যবস্থার তৈরি কাল্পনিক সম্প্রদায়। এগুলা কাল্পনিক সম্প্রদায়, কারণ আগেকার গ্রামে যেমন সবাই সবাইকে চিনত, আজকের এই সম্প্রদায়গুলোতে সেটা অসম্ভব। কোনো জার্মান লোকের পক্ষে জার্মান জাতির ৮ কোটি লোককে কিংবা ইউরোপের খোলা বাজারের ৫০ কোটি ভোক্তাকে অন্তরঙ্গভাবে চেনা সম্ভব নয়।

ভোগবাদ ও জাতীয়তাবাদ খুব পরিশ্রম করে আমাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে, এই যে আমরা লাখ লাখ মানুষ, আমরা সবাই একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের সবার একই অতীত, একইরকম স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতও একই। এটা ঠিক মিথ্যে নয়, এটা কল্পনা। টাকা, কোম্পানি ও মানবাধিকারের মতো, জাতি আর ভোক্তাগোষ্ঠীও হলো আন্তর্ব্যক্তিক বাস্তবতা (Inter-subjective Reality)। এগুলোর অস্তিত্ব আছে শুধু আমাদের সামষ্টিক কল্পনায়, তবু এর ক্ষমতা অপরিসীম। যতদিন পর্যন্ত লাখ লাখ জার্মান মিলে একটা জার্মান জাতিতে বিশ্বাস করবে, জার্মানির জাতীয় প্রতীক দেখে রোমাঞ্চিত হবে, ততদিন জার্মানি পৃথিবীর বুকে অন্যতম শক্তিশালী জাতি হিসেবে টিকে থাকবে।

একটা জাতি তার কাল্পনিক চরিত্রটাকে ঢেকে রাখার জন্য সব রকম চেষ্টা করে থাকে। বেশিরভাগ জাতিই দাবি করে তারা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এবং অনন্তকালের অবিচ্ছেদ্য এক সত্তা। মাতৃভূমির মাটির সঙ্গে জনমানুষের রক্ত মিলে মিশে তাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এরকম দাবি আসলে বাড়াবাড়ি রকমের মেকি। আগেও অনেক জাতি ছিল পৃথিবীতে, কিন্তু এখনকার তুলনায় তাদের গুরুত্ব ছিল অনেক কম, কারণ রাষ্ট্রের গুরুত্বই তখন ছিল অনেক কম। মধ্যযুগের নুরেমবার্গের একজন অধিবাসী হয়তো জার্মান জাতির প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু সে তার চেয়ে ঢের বেশি অনুগত ছিল তার নিজের পরিবার আর সম্প্রদায়ের প্রতি। কারণ পরিবার আর সম্প্রদায়ই তার বেশিরভাগ প্রয়োজন মেটাত। তার ওপর প্রাচীন জাতিগুলোর প্রভাব যতটুকুই থাকুক না কেন সেসবের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল মাত্র অল্প কিছু। এখনকার জাতিগুলোর মধ্যে বেশিরভাগের উদ্ভবই হয়েছে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে।

মধ্যপ্রাচ্যে এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। সিরিয়ান, লেবানিজ, জর্ডানিয়ান ও ইরাকি জাতিগুলো আসলে ফরাসি আর ব্রিটিশ কূটনীতিকদের বালির ওপর এলোমেলো সীমারেখা টানার ফলাফল। তারা এই রেখা টানার সময় আঞ্চলিক ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ও অর্থনীতিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছিল। এই কূটনীতিকরাই ১৯১৮ সালে ঠিক করল যে কুর্দিস্তান, বাগদাদ আর বাসরার মানুষের সবাই

এখন থেকে ‘ইরাকি’। ফরাসিরাই প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারা হবে সিরিয়ান আর কারা হবে লেবানিজ। সাদ্দাম হোসেন আর হাফেজ আল আসাদ তাঁদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজ-ফরাসি মদদপুষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু চিরায়ত ইরাকি ও সিরিয়ান জাতি নিয়ে তাদের আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা ছিল পুরোটাই ফাঁপা।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কেবল হাওয়া থেকে একটা জাতিকে তৈরি করা যায় না। যারা ইরাক কিংবা সিরিয়া তৈরি করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছিল তারা সত্যিকার ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যবহার করেছিল। সেসবের মধ্যে কিছু কিছু তো হাজার বছরের পুরোনো। সাদ্দাম হোসেন ইরাক জাতিসত্তার সঙ্গে আব্বাসীয় খেলাফত আর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, এমনকি তাঁর একটি সাঁজোয়া বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন হামুরাবি ডিভিশন। কিন্তু এইসব করেও কিন্তু ইরাককে একটি আদি অকৃত্রিম সত্তা বানিয়ে ফেলা যায়নি। আমি যদি গত দুই মাস ধরে পড়ে থাকা আটা, তেল আর চিনি দিয়ে একটি কেক বানিয়ে ফেলি তার মানে এই না যে ওই কেকটাও দুই মাসের পুরোনো।

ইদানীং জাতীয় সম্প্রদায়গুলো ক্রমেই ঢেকে যাচ্ছে বিভিন্ন রকম ভোক্তাগোষ্ঠী দিয়ে যারা একে অপরকে ভালোভাবে চেনে না কিন্তু একই রকম পণ্য ভোগ করে অভ্যস্ত। তাই তারা নিজেদের একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করে। এই ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত শোনালেও আমাদের চারপাশে এরকম উদাহরণের অভাব নেই। যেমন ধরেন, ম্যাডোনার ভক্তরা মিলে একটা ভোক্তাগোষ্ঠী তৈরি করে। তারা নিজেদের সংজ্ঞায়িত করে মোটামুটি তাদের কেনাকাটা দিয়েই। তারা ম্যাডোনার কনসার্টের টিকিট কেনে, সিডি কেনে, পোস্টার কেনে, শার্ট কেনে কিংবা রিংটোন কেনে। এসব কেনার মাধ্যমেই জানান দেয় যে তারা কারা। একইভাবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ভক্তরা, নিরামিষাশীরা ও পরিবেশবাদীরাও বিভিন্ন ভোক্তাগোষ্ঠীর উদাহরণ। তারাও মোটামুটি সংজ্ঞায়িত হয় তারা কোন-সব পণ্য কেনে তা

দিয়েই। এটাই তাদের পরিচয়ের চাবিকাঠি। একজন জার্মান নিরামিষাশী হয়তো একজন জার্মান সর্বভুকের চেয়ে একজন ফরাসি নিরামিষাশীকেই বিয়ে করতে চাইবে।

অবিরাম গতি

গত দুই শতাব্দীর বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলো এতটা যুগান্তকারী এবং এত দ্রুত ঘটেছে যে আমাদের সমাজের একদম মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোই সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শুরুতে আমাদের সামাজিক গঠনটা বেশ কঠিন ও অনমনীয় ছিল। স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা ছিল সুনিশ্চিত। খুব দ্রুত কোনো পরিবর্তন ছিল ব্যতিক্রম এবং যে-কোনো সামাজিক পরিবর্তনই ছোটো ছোটো ধাপের সমন্বয়ে হতো। মানুষ ধরেই নিয়েছিল, মানবসমাজ-কাঠামো অপরিবর্তনীয় ও অনন্ত। পরিবার আর সম্প্রদায় হয়তো সামাজিক কাঠামোতে নিজেদের অবস্থান কিছুটা বদলাতে পারত, কিন্তু সমাজের মৌলিক গঠনটা বদলে ফেলা ছিল অভাবনীয়। মানুষজন সব সময় নিজেদের এভাবেই সান্ত্বনা দিত যে 'এভাবেই তো চলে আসছে, এভাবেই তো চলবে'।

কিন্তু গত দুই শতাব্দীতে পরিবর্তনের গতিটা এত বেড়ে গেছে যে সামাজিক কাঠামোটা খুব গতিময় আর নমনীয় হয়ে গেছে। এটা এখন একটা নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থায় আছে। আধুনিক বিপ্লবের কথা বললে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৮৪৮ সালের ইউরোপের বসন্ত অথবা ১৯১৭ সালের রাশিয়ান বিপ্লব। সত্যি কথা বলতে আজকালকার দিনে প্রতিটা বছরই বৈপ্লবিক। এখন একজন ৩০ বছর বয়সি লোকও তরুণদের গল্প বলতে পারে এভাবে– 'আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখনকার পৃথিবীটা ছিল অন্যরকম।' উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেট জিনিসটাই তো নব্বইয়ের দশকে তৈরি, মাত্র বছর পঁচিশ আগের কথা। অথচ আজ আমরা ইন্টারনেট ছাড়া পৃথিবীর কথা কল্পনাই করতে পারি না।

এই কারণেই আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করাটা অনেকটা কোনো এক বহুরূপীর রূপ বর্ণনা করার মতো ব্যাপার। তার একমাত্র

যে বৈশিষ্ট্যটির ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারি সেটা হলো অবিশ্রান্ত পরিবর্তন। মানুষজন ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারটার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সবাই এখন মনে কওে, সামাজিক কাঠামো আসলে একটা নমনীয় ব্যাপার, আমরা চাইলেই প্রয়োজনমতো এটা বদলাতে পারি। পূর্বাধুনিক যুগের শাসকেরা সাধারণত আশ্বাস দিত যে তারা প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ করবে, এমনকি ফিরে যাবে গৌরবান্বিত সময়ে। কিন্তু গত দুই শতক ধরে দেখা যাচ্ছে শাসকেরা তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করছে পুরাতনকে ছুড়ে ফেলে নতুন পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়। একদম গোঁড়া মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোকেও বলতে দেখা যাচ্ছে না যে তারা সবকিছু আগের মতো রাখার চেষ্টা করবে। সবাই আজকাল সামাজিক সংশোধন, শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন কিংবা অর্থনৈতিক সংশোধনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। মাঝে মাঝে তারা সত্যি সত্যিই সেসব সংশোধন করেও ফেলছে।

ভূতাত্ত্বিকেরা যেমন টেকটনিক স্তরগুলোর নড়াচড়া থেকে ভূমিকম্প কিংবা আগ্নেয়গিরির আশঙ্কা করেন, তেমনি আমরা আশঙ্কা করতে পারি এইসব দ্রুতগতির সামাজিক পট পরিবর্তন হয়তো রক্তাক্ত হিংস্রতা বয়ে নিয়ে আসবে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলেও কিন্তু আমাদের কিছু ভয়ংকর যুদ্ধ, গণহত্যা আর বিপ্লবের কথা বলতে হয়। নতুন জুতো পরা একটি শিশু যেমন রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে লাফিয়ে বেড়ায়, তেমনি ইতিহাসও এক রক্তগঙ্গা থেকে আরেক রক্তগঙ্গার পথে হাঁটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তারপর স্নায়ুযুদ্ধ, আর্মেনিয়ান গণহত্যা থেকে শুরু করে ইহুদি নিধন, রুয়াভার গণহত্যা, রোবস্পিয়ার থেকে লেনিন তারপর হিটলার।

সুতরাং আশঙ্কাটা আসলে সত্যি, কিন্তু এই বহুল পরিচিত দুর্যোগগুলো উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করাটা কিছুটা বিভ্রান্তিকরও বটে। আমরা খানাখন্দে এত বেশি বুঁদ হয়ে থাকি যে, পথে যে শুকনো জায়গাও আছে তা আমাদের চোখে পড়ে না। উত্তরাধুনিক যুগ যে শুধু অভূতপূর্ব রকমের হিংস্রতা আর বর্বরতা দেখেছে তা-ই নয়, সেই সঙ্গে শান্তি ও শুভ্রতার দারুণ নিদর্শনও দেখতে পেয়েছে। চার্লস ডিকেন্স ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ

সময়, আবার এটাই ছিল নিকৃষ্ট সময়।' কথাটা যে শুধু ফরাসি বিপ্লবের জন্য সত্য তা-ই নয়, পুরো যুগটার জন্যও প্রযোজ্য।

কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই সাত যুগের ক্ষেত্রে। এই সময়ে মানবজাতি প্রথমবারের মতো নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে এবং বেশ ভালোসংখ্যক যুদ্ধ ও গণহত্যা দেখেছে। এত কিছুর পরও এই কয়েক যুগই কিন্তু বেশ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অন্য যে-কোনো সময়ের তুলনায় মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে শান্তিময় সময়। এটা খুবই আশ্চর্যজনক, কারণ এই সময়েই কিন্তু আমরা আগের চাইতেই আরো বেশি বেশি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দেখেছি। ইতিহাসের টেকটোনিক স্তরগুলো পাগলের মতো নড়াচড়া করছে, অথচ আগ্নেয়গিরি শান্ত। মনে হচ্ছে, এই নতুন নমনীয় সামাজিক কাঠামো যেন সবকিছু আগলে রাখতে পারে, এমনকি দরকার হলে কোনো হিংস্রতা ছাড়াই প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পারে।[৩]

আমাদের শান্তির যুগ

বেশিরভাগ মানুষই মানতে চায় না আমরা কত শান্তিপূর্ণ এক সময়ে বসবাস করছি। আমাদের কেউই হাজার বছর আগে বেঁচে ছিল না। এই কারণেই বোধহয় আমরা ভুলে যাই পৃথিবী আগে কতটা হিংস্র ছিল। আর যেহেতু যুদ্ধ জিনিসটা আগের চেয়ে অনেক বিরল হয়ে গেছে, তাই এর প্রতি মানুষের আকর্ষণও বেড়ে গেছে। বেশিরভাগ মানুষই এখন আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা বলে। কিন্তু ব্রাজিল কিংবা ভারতের লোকেরা কতটা শান্তিতে বসবাস করছে, সে কথা খুব কম লোকই আলোচনা করে।

আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, পুরো মানবজাতিকে নিয়ে ভাবার চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা ভাবাটা অনেক সহজ। স্থূল দৃষ্টিতে ইতিহাসের গতিপথ বুঝতে গেলে আমাদের আসলে ব্যক্তিগত গল্প না শুনে বড়োসড়ো পরিসংখ্যানের দিকে তাকাতে হবে। ২০০০ সালে যুদ্ধের কারণে মৃত্যু হয় লাখ তিনেক মানুষের। এ ছাড়া হিংস্রতার

দরুন আরো লাখ পাঁচেক মানুষ মারা যায়। এটা সত্য যে প্রতিটি মানুষের মৃত্যুই আসলে একটা জগতের অপমৃত্যু, একটা পরিবারের ধ্বংসযজ্ঞ, বন্ধু ও আত্মীয়দের জন্য সারা জীবনের এক দুঃসহ বেদনা। কিন্তু তার পরও, একটু স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই ৮ লাখ মৃত্যু আসলে ২০০০ সালের মোট সাড়ে ৫ কোটি মৃত্যুর মাত্র শতকরা দেড় ভাগ। ওই একই বছর ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা গেছে গাড়ি দুর্ঘটনায় (মোট মৃত্যুর শতকরা ২.২৫ ভাগ) এবং ৮ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করেছে (শতকরা ১.৪৫ ভাগ)।[৪]

২০০২ সালের সংখ্যাগুলোতো আরো চমকপ্রদ। সাড়ে ৫ কোটি মৃত্যুর মধ্যে মাত্র পৌনে ২ লাখ মানুষ মারা গেছে যুদ্ধের কারণে আর সাড়ে ৫ লাখের মতো হিংস্রতায় (হিংস্রতার কারণে মৃত্যু মোট সাড়ে ৭ লাখের কাছাকাছি)। অন্যদিকে, পৌনে ৯ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করেছে।[৫] দেখ গেল, ৯/১১ এর সন্ত্রাসী হামলার পরের বছর, যখন সবাই সন্ত্রাস আর যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছে, তখন একজন সাধারণ মানুষের অন্যের হাতে মরার চেয়ে আত্মহত্যা করে মরার সম্ভাবনাই বেশি ছিল।

পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রান্তেই মানুষ রাতে যখন ঘুমাতে যায় তখন তাদের এই ভয় করতে হয় না যে, প্রতিবেশী গোষ্ঠীর লোকেরা হয়তো মাঝরাতে হামলা করবে আর সবাইকে মেরে ফেলবে। ব্রিটেনের সচ্ছল লোকেরা প্রতিদিন যখন শেরউড জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নটিংহ্যামে থেকে লন্ডনে যায় তখন তাদের এই ভয়ে থাকতে হয় না যে, এই বুঝি জঙ্গল থেকে রবিন হুড আর তার দলবল বের হয়ে এসে তাদের আটক করবে আর সব ধনসম্পদ লুটে নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে (অথবা তাদের মেরে ফেলবে আর নিজেরাই সব সম্পদ ভোগ করবে)। ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষকের বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয় না, ছেলেমেয়েদের এই ভয়ে থাকতে হয় না যে তাদেরকে তাদের বাবা-মায়েরা অভাবের জন্য দাস হিসেবে বেচে দেবে। আজকের নারীরা এটা জানে যে আইনগতভাবে তাদের স্বামীদের কোনো অধিকার নেই তাদের প্রহার করার কিংবা বাড়ির মধ্যে আটকে রাখার। পৃথিবী জুড়ে এইসব ধারণা খুব দ্রুত বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে।

হিংস্রতার পরিমাণ কমে আসার পেছনে আসলে রাষ্ট্রের অবদানই বেশি। ইতিহাস জুড়ে বেশিরভাগ হিংস্রতাই হতো মূলত পরিবার কিংবা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে। (ওপরের পরিসংখ্যান থেকেও তো এটা পরিষ্কার যে আজকালকার যুগেও আঞ্চলিক অপরাধই কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধের চেয়ে বেশি প্রাণহানির কারণ।) আমরা তো আগেই দেখেছি, প্রথম দিককার কৃষকেরা, যারা আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের বাইরে আর কোনো রকম সংগঠন চোখেই দেখেনি, তারাও প্রতিনিয়ত হিংস্রতায় জড়িয়ে পড়ত।[৬] রাজত্ব আর সাম্রাজ্য যতই শক্তিশালী হতে থাকল ততই তারা সম্প্রদায়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতে থাকল আর ক্রমশ হিংস্রতার পরিমাণ কমে এলো। মধ্যযুগীয় ইউরোপের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সভ্যতায়, প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ৪০ জনই খুন হতো। ইদানীংকালে, যখন রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে উঠেছে সর্বেসর্বা আর সম্প্রদায় প্রথা একরকম হারিয়ে গেছে, তখন হিংস্রতার পরিমাণও অনেকটাই কমে গেছে। সারা পৃথিবীর বিচারে এখন প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে মাত্র নয় জন খুনের শিকার হয়। এইসব খুনোখুনির বেশিরভাগই হয় সোমালিয়া কিংবা কলম্বিয়ার মতো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে। সমগ্র ইউরোপের ক্ষেত্রে এখন সেই সংখ্যাটা প্রতি ১ লাখে মাত্র একজন।[৭]

অবশ্য এমন নজিরও আছে যে রাষ্ট্র নিজেই তার নিজের জনগণকে মেরে ফেলছে। এইরকম ঘটনাগুলোই আমাদের স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে যায়। পুরো বিংশ শতাব্দীতে প্রায় ১ কোটি লোক নিহত হয়েছে তাদেরই দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর হাতে। তার পরও, একটা স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে হয় রাষ্ট্র পরিচালিত আদালত এবং পুলিশবাহিনী সারা পৃথিবীর নিরাপত্তা আসলে বাড়িয়ে দিয়েছে। যদি পূর্বাধুনিক যুগের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে এখনকার দিনের একজন জাঁদরেল একনায়কের আমলেও একজন মানুষের অন্য মানুষের হাতে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা অনেক কম। ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলে সেনাবাহিনীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ওই শাসনেই দেশটা চলেছে। এই ২০ বছরে বেশ কয়েক হাজার ব্রাজিলিয়ান তাদের শাসকের হাতে মারা পড়ে। আরো কয়েক হাজার জেলহাজতে যায় এবং নির্যাতিত হয়। এত কিছুর পরও, সবচেয়ে

খারাপ বছরটাতেও, ব্রাজিলের একজন গড়পড়তা মানুষের অন্য মানুষের হাতে মারা পড়ার আশঙ্কা বরং হুয়ারানি (Waorani), আরাওয়েতে (Arawete) কিংবা ইয়ানোমামোর (Yanomamo) উপজাতিদের তুলনায় অনেক কম। হুয়ারানি, আরাওয়েতে আর ইয়ানোমামোরা হলো আমাজন জঙ্গলের গহিনে বসবাসকারী উপজাতি– যাদের কোনো সৈন্য, পুলিশ কিংবা জেলখানা নেই। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে এসব উপজাতি জনগোষ্ঠীর পুরুষদের প্রায় অর্ধেক মারা যায় পারস্পরিক দ্বন্দ্বে। এসব দ্বন্দ্ব সাধারণত সম্পদ, নারী কিংবা আত্মসম্মানসংক্রান্ত হয়ে থাকে।[৮]

সাম্রাজ্যের পতন

১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাষ্ট্রের অধীনে হিংস্রতা বেড়েছে, নাকি কমেছে– এটা আসলে তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু যে ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেটা হলো, আন্তর্জাতিকভাবে হিংস্রতা এখন ইতিহাসে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে এসেছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পতন সম্ভবত এর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো উদাহরণ। ইতিহাস জুড়ে সাম্রাজ্যগুলো বিদ্রোহীদের শক্তহাতে দমন করে এসেছে। যখন তার শেষের ঘণ্টা বেজেছে, তখন একটি ডুবন্ত সাম্রাজ্য তার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করেছে, যার ফলাফল হয়েছে রক্তগঙ্গা। এর চূড়ান্ত পতন ডেকে এনেছে অরাজকতা এবং যুদ্ধ। কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে বেশিরভাগ সাম্রাজ্যই নিজে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সরে দাঁড়ানোর পথ বেছে নিয়েছে। তাদের পতনের ধরনটা হয়েছে বেশ দ্রুত, শান্ত ও সুশৃঙ্খল।

১৯৪৫ সালে ব্রিটেন পুরো পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ শাসন করত। ৩০ বছর পর শাসন করত কেবল ছোটো ছোটো কিছু দ্বীপ। মাঝের এই কয়েক যুগে ব্রিটেন তার বেশিরভাগ উপনিবেশ থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে সরে এসেছে। যদিও মালয় এবং কেনিয়ার মতো কিছু কিছু জায়গায় তারা অস্ত্রের জোরে টিকে থাকতে চেয়েছে, তবু বেশিরভাগ জায়গাতেই তারা তাদের সাম্রাজ্যের পতনটা কোনো

উচ্চবাচ্য ছাড়াই একরকম অক্ষম দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই মেনে নিয়েছে। তারা তাদের সব প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করেছিল যথাসম্ভব মসৃণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দিকে, ক্ষমতা ধরে রাখার দিকে নয়। মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের জন্য যে পর্বতপ্রমাণ প্রশংসা পেয়ে থাকেন তার কিছুটা কৃতিত্ব আসলে ব্রিটিশ সরকারকেও দিতে হয়। অনেক বছরের তিক্ততা ও হিংস্র লড়াই সত্ত্বেও যখন ব্রিটিশরাজের দিন ফুরিয়ে এলো তখন কিন্তু ভারতীয়দের দিল্লি বা কলকাতার রাস্তায় নেমে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়নি। সাম্রাজ্যের জায়গাটা নিয়েছিল কিছু স্বাধীন রাষ্ট্র, যারা এর আগ পর্যন্ত একসঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। এটা সত্য যে, হাজার হাজার মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে। কিছু কিছু জায়গায় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে জাতিগত দাঙ্গা (বিশেষ করে ভারতে)। তারপর দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করলে ব্রিটিশদের প্রস্থান শান্তি ও শৃঙ্খলার এক উদাহরণ ছিল। ফরাসি সাম্রাজ্য বরং এর চেয়ে অনেক বেশি একগুঁয়ে ছিল। তাদের পতনের সময় পলায়নপর সৈন্যরা হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। ভিয়েতনাম ও আলজেরিয়া তার সাক্ষী হয়ে আছে। তবু ফরাসিরা অন্য সব জায়গা থেকে বেশ দ্রুত ও শান্তিপূর্ণভাবেই প্রস্থান করেছিল এবং রেখে এসেছিল একটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল দেশ।

১৯৮৯ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ছিল আরো শান্তিপূর্ণ। যদিও বলকান, ককেশাস এবং মধ্য এশিয়ার কিছু জায়গায় জাতিগত দাঙ্গা লেগেছিল তার পরও বলা যায়, ইতিহাসে এর আগে এত বড়ো কোনো সাম্রাজ্যের পতন এত দ্রুত এবং এত শান্তভাবে হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওই পতনের সময় এক আফগানিস্তান ছাড়া আর কোথাও সামরিক পরাজয় বরণ করতে হয়নি। কোথাও কোনো বহিরাগতদের আক্রমণ হয়নি, কোনো বিদ্রোহ হয়নি, এমনকি মার্টিন লুথার কিংয়ের মতো বড়ো ধরনের অসহযোগ আন্দোলনও কেউ করেনি। সোভিয়েতদের তখনো লাখ লাখ সৈন্য ছিল, হাজার হাজার ট্যাংক ও যুদ্ধবিমান ছিল। পুরো মানবজাতিকে কয়েক দফা ধ্বংস করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে

পারমাণবিক অস্ত্রও ছিল। লাল সেনা এবং অন্যান্য ওয়ার'শ সেনারাও ছিল অনুগত। সর্বশেষ সোভিয়েত শাসক মিখাইল গর্বাচেভ যদি একবার আদেশ দিতেন, তাহলেই লাল সেনারা সাধারণ জনগণের ওপর প্রকাশ্যে গুলি চালাতে পারত।

এত কিছুর পরও সোভিয়েত অভিজাতর ও কমিউনিস্টপন্থিরা পূর্ব ইউরোপের বেশিরভাগ জুড়েই (রুমানিয়া আর সার্বিয়া ছিল ব্যতিক্রম) সামরিক ক্ষমতার এক ফোঁটাও ব্যবহার করেনি। যখন তাদের সদস্যরা বুঝতে পারল যে কমিউনিজম দেউলিয়া হয়ে গেছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে সব বাহিনী প্রত্যাহার করে নিল, নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিল, তারপর নিজেদের বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। গর্বাচেভ ও তাঁর সহকর্মীরা বিনা সংগ্রামে শুধু যে তাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দখল করা এলাকাই ছেড়ে দিল তা-ই না, তাদের বহু পুরোনো জার আমলের জয় করা বাল্টিক, ইউক্রেন, ককেশাস এবং মধ্য এশিয়াও ছেড়ে দিল। গর্বাচেভ যদি সার্বিয়ার নেতাদের মতো কিংবা আলজেরিয়ায় ফরাসিদের মতো আচরণ করত, তাহলে কী হতো সেটা ভাবলে এখনো শিউরে উঠতে হয়।

আণবিক সমঝোতা

সাম্রাজ্যগুলো সরে গিয়ে যে স্বাধীন দেশগুলো তৈরি হলো, তারা যুদ্ধের ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী ছিল না। ১৯৪৫ সালের পর থেকে, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে কোনো দেশই অন্য কোনো দেশকে দখল করার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়নি। অথচ স্মরণাতীতকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে এরকম দখলদারি হামলা ছিল রীতিমতো হাতের মোয়া। এভাবেই আসলে অনেক বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। বেশিরভাগ শাসক এমনকি মানুষজনও ভেবেছিল এভাবেই চলবে পৃথিবী। কিন্তু রোমান, মোঙ্গল কিংবা অটোমানদের মতো ভোগদখল আজকের দুনিয়ায় প্রায় অসম্ভব। ১৯৪৫ সালের পর থেকে জাতিসংঘ-স্বীকৃত কোনো স্বাধীন দেশই পৃথিবীর ম্যাপ থেকে উধাও হয়ে যায়নি। সীমিত সংখ্যায় যুদ্ধবিগ্রহ এখনো হয় আর তাতে লাখ

লাখ মানুষ প্রাণও হারায় কিন্তু যুদ্ধ এখন মোটেই আর হাতের মোয়া নয়।

অনেকে মনে কওে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যুদ্ধের অনুপস্থিতি পশ্চিম ইউরোপের ধনী দেশগুলোর জন্য একেবারে নতুন একটা অভিজ্ঞতা। সত্যি বলতে কি, প্রথমে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরেই সেটা ইউরোপে পৌঁছায়। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ছিল ১৯৪১ সালের পেরু-ইকুয়েডরের যুদ্ধ এবং ১৯৩২ সালের বলিভিয়া-প্যারাগুয়ের যুদ্ধ। এসবের আগে দক্ষিণ আমেরিকায় বেশ বড়োসড়ো একটা যুদ্ধ লেগেছিল ১৮৭৯-৮৪ সালে চিলির সঙ্গে বলিভিয়া আর পেরুর।

আমরা আরব এলাকাটাকে একদমই শান্তিপূর্ণ মনে করি না। অথচ স্বাধীনতার পর আরব দেশগুলোর মধ্যে মাত্র একবার পুরো মাত্রায় যুদ্ধ বেধেছিল (১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত আক্রমণ)। সীমান্তে বেশ কিছু ঝামেলা হয়েছিল (সিরিয়া আর জর্ডানের মধ্যে, ১৯৭০ সালে), বেশ কিছু সেনা অনুপ্রবেশ (লেবাননে সিরিয়ার প্রবেশ), অসংখ্য গৃহযুদ্ধ (আলজেরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া) এবং অগুনতি সেনা অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহও হয়েছিল। এত কিছুর পরও, এক উপসাগরীয় যুদ্ধ ছাড়া আরব দেশগুলোর মধ্যে কোনো পূর্ণ মাত্রার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এমনকি পুরো মুসলিম জগতের সীমানা বাড়ানোর প্রচেষ্টার উদাহরণও পাওয়া যায় মাত্র একটা, ইরান-ইরাক যুদ্ধ। কখনোই তুরস্ক-ইরান, পাকিস্তান-আফগানিস্তান কিংবা ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া যুদ্ধ বাধেনি।

আফ্রিকার ব্যাপারটা খুব একটা সুখকর নয়। কিন্তু সেখানেও বেশিরভাগ দ্বন্দ্বই ছিল গৃহযুদ্ধ অথবা সেনা অভ্যুত্থান। যেহেতু আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীনতা পেয়েছে অনেক পরে ১৯৬০-৭০-এর দিকে, মাত্র অল্প কয়েকটা দেশই একে অপরের ওপর আক্রমণ করেছে দখল করার আশায়।

অতীতেও তুলনামূলক শান্ত কিছু সময় ছিল, যেমন ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের ইউরোপ। এরপরের সময়টা অবশ্য সব খারাপকে

ছাপিয়ে গেছে। এখন ব্যাপারটা একদম অন্যরকম। সত্যিকার শান্তি কিন্তু শুধু যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়। এখন সত্যিকার অর্থেই শান্তি বিরাজ করছে পৃথিবীতে। ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যেও কিন্তু একটা ইউরোপীয় যুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। তখনকার সেনাবাহিনী, রাজনীতি এবং এমনকি সাধারণ নাগরিকের ওপরও যুদ্ধের আশঙ্কার প্রভাব ছিল। ইতিহাসের অন্য সব শান্তিপূর্ণ সময়ের জন্যও এই একই লক্ষণ প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা চিরন্তন বিধান ছিল : 'যে-কোনো দুটো প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এমন কিছু পরিস্থিতির তৈরি হবে যে তারা বছর খানেকের মধ্যেই একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।' এই 'জঙ্গলের নিয়ম' সক্রিয় ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে, মধ্যযুগীয় ইউরোপে, প্রাচীন চীনে এবং ঐতিহ্যবাহী গ্রিসে। স্পার্টা ও অ্যাথেন্স যদি ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে পারস্পরিক শান্তিতে থেকে থাকে, তাহলে খুব ভালো একটা সম্ভাবনা ছিল যে এর পরের বছর, ৪৪৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দেই তারা আবার যুদ্ধে জড়াবে।

আজ মানবজাতি সেই জঙ্গলের আইন ভেঙে ফেলেছে। অবশেষে শুধু যে যুদ্ধবিগ্রহ মিটেছে তা-ই নয়, সত্যিই শান্তি এসেছে। এখনকার বেশিরভাগ রাজনীতির ক্ষেত্রেই এমন কোনো আশঙ্কা দেখা যায় না যে বছরখানেকের মধ্যেই তারা যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। সামনের বছরেই জার্মানি আর ফ্রান্সের যুদ্ধে জড়ানোর কোনো কারণ আছে কি? অথবা চীন ও জাপান? অথবা ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা? সীমান্তে ছোটোখাটো ঝামেলা হয়তো হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ২০১৭ সালেই যদি রীতিমতো ভয়ংকর অবস্থা তৈরি করতে হয়, তাহলে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার মধ্যে আগেকার আমলের মতো পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধ বাধতে হবে। আর্জেন্টিনা হয়তো তার সেনাবাহিনী দিয়ে সবকিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে রিও-র দরজায় পৌঁছে যাবে আর ব্রাজিলের কার্পেট-বোমা ফেলে হয়তো বুয়েনস আইরেসের আশপাশের এলাকা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে। এরকম যুদ্ধ অবশ্য এখন হতে পারে বেশ কিছু দেশের মধ্যে, যেমন ইসরায়েল আর সিরিয়া, ইথিওপিয়া আর এরিত্রিয়া অথবা আমেরিকা আর ইরান। কিন্তু এগুলো সবই আসলে

ব্যতিক্রম, যেটা প্রমাণ করে যে জঙ্গলের আইনটা আসলে আর টিকে নেই।

ভবিষ্যতে হয়তো এই অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তারপরই হয়তো আমাদের বোধোদয় হবে যে, আজকের দিনের দুনিয়া আসলে খুবই সাদাসিধে। তার পরও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, আমাদের এই সাদাসিধে ভাবটা খুবই চমকপ্রদ। এর আগে কখনো এতটা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসেনি যে মানুষজন যুদ্ধের কথা প্রায় ভুলেই যাবে।

বিশেষজ্ঞরা এই দারুণ সুখের ব্যাপারটা মতো এত বই এবং প্রবন্ধে লিখেছেন যে আপনি পড়েই শেষ করতে পারবেন না। তারা এর কিছু উল্লেখযোগ্য দিকও চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, যুদ্ধের মূল্যটা নাটকীয়ভাবে অনেক বেড়ে গেছে। শান্তিতে নোবেল পুরস্কারটা আসলে রবার্ট ওপেনহাইমার ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গকে দেওয়া উচিত পারমাণবিক বোমা বানানোর জন্য। পারমাণবিক অস্ত্রগুলোর কারণেই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধটা অনেকটা সামগ্রিক আত্মহত্যার মতো হয়ে যায়। আর এই কারণেই অস্ত্রের মুখে পৃথিবী শাসন করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, একদিকে যেমন যুদ্ধের মূল্যটা বেড়েছে একইসঙ্গে তার মুনাফাও কমে গেছে। ইতিহাসের প্রায় পুরোটা জুড়েই রাজনৈতিক শক্তিগুলো শত্রু এলাকায় লুট-দখলের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি করতে পারত। বেশিরভাগ সম্পদই ছিল শস্যক্ষেত্র, গবাদিপশু, দাস ও স্বর্ণ। এগুলো হাতিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল। কিন্তু আজকের দিনে, সম্পদ বলতে মূলত বোঝায় মানবসম্পদ, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ আর ব্যাংকের মতো আর্থসামাজিক কাঠামো। সংগত কারণেই এই জিনিসগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া বা স্থানান্তরিত করা খুবই কঠিন।

৪৩। গোল্ড রাশের (Gold Rush) সময় ক্যালিফোর্নিয়ার খনিশ্রমিকরা

ক্যালিফোর্নিয়ার কথাই ধরুন। প্রাথমিক দিকে এর মূল সম্পদ ছিল বেশ কিছু সোনার খনি। কিন্তু আজ এর ভিত্তিই হলো সিলিকন আর সেলুলয়েড– সিলিকন ভ্যালি এবং হলিউডের সেলুলয়েড পাহাড়। এখন যদি চীনারা ক্যালিফোর্নিয়ায় সশস্ত্র আক্রমণ করে? সানফ্রানসিসকোর সমুদ্রসৈকতে লাখ লাখ সৈন্য নামায়? তারা কিন্তু আসলে খুব বেশি কিছু পাবে না। সিলিকন ভ্যালিতে কোনো সিলিকনের খনি নেই। বেশিরভাগ সম্পদই আসলে আছে গুগলের প্রকৌশলী কিংবা হলিউডের লেখক, পরিচালক কিংবা বিশেষ দৃশ্য নির্মাতাদের মাথায়, যারা কিনা চীনের আক্রমণের আগেই প্রথম প্লেনটা ধরে বেঙ্গালুরু বেঙ্গালুরু কিংবা মুম্বাইয়ে চলে যাবে। এই কারণেই এটা মোটেই কাকতালীয় নয় যে এখনো যেসব পূর্ণমাত্রার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হয়, যেমন ইরাকের কুয়েত আক্রমণ, এগুলো এমন সব জায়গাতেই হয়, যেখানে সম্পদগুলো পুরোনো আমলের মতো বস্তুগত। কুয়েতের শেখরা হয়তো পালিয়ে যেত কিন্তু তাদের তেল খনিগুলো থেকে যেত এবং দখল হয়ে যেত।

যখনই যুদ্ধ ব্যাপারটা অনেক কম লাভজনক হয়ে গেল, শান্তি তখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হতে লাগল। শান্তি যে খুব লাভ এনেছে তা নয়, কিন্তু শান্তি আসায় অন্তত যুদ্ধের মূল্যটা তো এড়ানো গেছে। যদি ১৪০০ সালের ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে শান্তি

বিরাজ করত, তাহলে ফরাসিদের যুদ্ধের জন্য চড়া মূল্যও দিতে হতো না, আবার ভয়ংকর ইংরেজ ধ্বংসযজ্ঞও সইতে হতো না। কিন্তু অন্য কোনোভাবে তাদের পকেটও ভরত না। গতানুগতিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে দূরবর্তী বাণিজ্য কিংবা বৈদেশিক বিনিয়োগ অনেকটা বাড়তি অলংকারের মতো ছিল। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগই সর্বেসর্বা। সুতরাং শান্তি বেশ লাভজনক। যতক্ষণ পর্যন্ত চীন ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে, চীনারা আমেরিকায় পণ্য বেচে, ওয়াল স্ট্রিটে ব্যবসায় করে এবং আমেরিকার বিনিয়োগ নিয়ে নিজেদের উন্নতি করতে পারবে।

৪৪। সানফ্রানসিসকোর কাছকাছি ফেসবুকের সদর দপ্তর। ১৮৪৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ভাগ্য খুলে দিয়েছিল সোনা। আর আজ ক্যালিফোর্নিয়ার ভাগ্য খুলে গেছে সিলিকন দিয়ে। কিন্তু ১৮৪৯ সালে যেখানে সোনা ক্যালিফোর্নিয়ার মাটিতে মিশে ছিল, সেখানে আজকের সিলিকন ভ্যালির সত্যিকার কোষাগার হলো বড়ো বড়ো প্রযুক্তিবিদের মাথার ভেতর

সর্বশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির টেকটনিক প্লেটে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। ইতিহাসের অনেক অভিজাতরা, যেমন হান নেতারা, সম্ভ্রান্ত ভাইকিংরা এবং অ্যাজটেক পুরোহিতেরা যুদ্ধ ব্যাপারটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। অন্যরা এটাকে খারাপ কিছুই মনে করত কিন্তু এও জানত যে যুদ্ধ এড়ানো যাবে না। সুতরাং সেখান থেকে কোনো লাভ করতে

পারলেই ভালো। আমরাই ইতিহাসে প্রথম এমন একটা সময়ে বাস করছি, যখন সব সম্ভ্রান্তই শান্তিপ্রিয়। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী– এরা সবাই সত্যিকার অর্থেই মনে করে যুদ্ধ খুবই খারাপ এবং এটাকে এড়ানোও সম্ভব। (আগেও শান্তিপ্রিয় সম্ভ্রান্ত লোকজন ছিল, যেমন প্রথম দিককার খ্রিষ্টানরা, কিন্তু কালেভদ্রে যখনই তারা ক্ষমতা পেত, তখনই তারা তাদের 'অন্য গাল পেতে দেওয়া'র মন্ত্রটা ভুলে যেত।)

এই চারটি দিকের মধ্যেই কিন্তু আবার একটা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া চক্র কাজ করে। পারমাণবিক হত্যাকাণ্ডের হুমকি শান্তিবাদকে চালিত করে, যখন শান্তির বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন যুদ্ধ দূরে সরে যায় আর বাণিজ্যের প্রসার হয়, আর এই বাণিজ্যের প্রসার পক্ষান্তরে শান্তির লাভ আর যুদ্ধের লোকসানকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া চক্র যুদ্ধের জন্য আরেকটা বাধা তৈরি করে, যেটা হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। জালের মতো ছড়িয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগের শক্ত বন্ধন বেশিরভাগ দেশেরই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে। এর ফলে যেটা হয়, এদের মধ্যে কোনো একটা দেশ যে একা একাই যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে, সেই সম্ভাবনাটা প্রায় নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ দেশই যে পুরো মাত্রার যুদ্ধে আর জড়ায় না তার একটা খুব সহজ কারণ হলো তারা আর মোটেই স্বাধীন নেই। যদিও ইসরায়েল, ইতালি, মেক্সিকো কিংবা থাইল্যান্ডের লোকজন হয়তো স্বাধীনতার একটা মোহ ধারণ করে, কিন্তু সত্যি বলতে তাদের সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীন অর্থনৈতিক অথবা বৈদেশিক নীতি তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। আর নিশ্চিতভাবেই তাদের পক্ষে কোনো পুরো মাত্রার যুদ্ধ নিজে নিজে শুরু করা সম্ভব নয়। এগারো অধ্যায়ে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি একটা বৈশ্বিক সাম্রাজ্যের উত্থান। আগের সব সাম্রাজ্যের মতোই এই সাম্রাজ্যও এর নিজের সীমারেখায় শান্তি নিশ্চিত করে। আর যেহেতু এর সীমারেখা হলো পুরো পৃথিবী, তার মানে এই 'বিশ্বসাম্রাজ্য' কার্যকরভাবেই বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করে।

সুতরাং, আধুনিক যুগ মানে কি মস্তিষ্কবিবর্জিত হত্যাকাণ্ড? যুদ্ধ আর নিপীড়ন? যার চরিত্রায়ণ করা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দিয়ে? হিরোশিমার ওপর পারমাণবিক মেঘ দিয়ে? এবং হিটলারের রক্তাক্ত উন্মাদনা দিয়ে? নাকি এই যুগ হলো শান্তির? যার চরিত্রায়ণ করা যায় দক্ষিণ আমেরিকার খনন না হওয়া পরিখাটি দিয়ে? মস্কো বা নিউ ইয়র্কের মাথার ওপর যে পারমাণবিক মেঘটা কখনো ওড়েনি সেটা দিয়ে? নাকি মহাত্মা গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিংয়ের অমলিন মুখ দিয়ে?

উত্তরটা সময়ই বলে দেবে। অতীত সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা মাত্র ক'বছর আগের কিছু ঘটনার কারণে অনেক সময়েই বিকৃত হয়ে যায়। এই অধ্যায়টা যদি ১৯৪৫ কিংবা ১৯৬২ সালে লেখা হতো, এর চেহারা হয়তো অনেক মলিন হতো। যেহেতু এটা লেখা হয়েছে ২০১৪ সালে এই আধুনিক সময়ে, তাই এটা বেশ প্রাণবন্ত।

আশাবাদী ও নিরাশাবাদী দুই দলকেই খুশি করতে হলে আমরা এভাবে বলে শেষ করতে পারি যে, আমরা স্বর্গ ও নরক দুটোরই খুব কাছাকাছি আছি। খুব অস্থিরভাবে একটার দরজা থেকে অন্যটার অভ্যর্থনাকক্ষের দিকে ছোটাছুটি করছি। ইতিহাস এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি আমরা কোন দিকে শেষমেশ যাব। মাত্র অল্প কিছু ঘটনার যোগসূত্র আমাদের যে-কোনো দিকেই ঠেলে দিতে পারে।

অধ্যায় ১৯

অতঃপর তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল

গত ৫০০ বছরে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি অনেকগুলো শ্বাসরুদ্ধকর উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে গেছে। মিলেমিশে এক হয়ে গেছে তার বিভিন্ন অংশের পরিবেশ ও ইতিহাস। অর্থনীতির বিকাশ হয়েছে প্রায় বিস্ফোরণের মতো। আজ সমগ্র মানবজাতির যত সম্পদ, তার পরিমাণ রূপকথাকেও হার মানিয়ে দেয়। ইতিহাসের এই সময়কালে, বিজ্ঞান আর শিল্পের বৈপ্লবিক উন্নতি মানুষকে প্রায় অতিমানবীয় ক্ষমতা এনে দিয়েছে। খোলনলচে বদলে গেছে সামাজিক কাঠামোর, তার সঙ্গে বদলেছে পৃথিবীর রাজনীতি, মানুষের জীবন ও চিন্তাধারা।

কিন্তু এত পরিবর্তনের পরেও সেই পুরোনো প্রশ্নটা থেকেই যায় : আমরা কি সুখী হতে পেরেছি? গত পাঁচ শতাব্দীর জমা হওয়া সম্পদ কি আমাদের সন্তুষ্টি দিয়েছে? শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছি আমরা, কিন্তু অফুরন্ত শান্তির খোঁজ কি মিলেছে? মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পরবর্তী প্রায় ৭০ হাজার বছরে পৃথিবী কি আগের চেয়ে আরো একটু বেশি বাসযোগ্য হয়েছে? চাঁদের মাটিতে অক্ষয় পদচিহ্ন রেখে আসার সময় নিল আর্মস্টং যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা কি ৩০ হাজার বছর আগের শভে গুহার দেওয়ালে হাতের ছাপ এঁকে দেওয়া নাম-না-জানা যাযাবর মানুষটার চেয়ে বেশি? তা যদি না-ই হবে, তাহলে এতগুলো বছর ধরে কৃষিকাজ, নগর-পত্তন, লেখালেখি, টাকা, সাম্রাজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প– এগুলো কেন করতে গেলাম আমরা?

এই প্রশ্নগুলো নিয়ে অবশ্য ঐতিহাসিকেরা তেমন একটা মাথা ঘামান না। উরুক আর ব্যাবিলনের নগরবাসীরা তাদের শিকারি-সংগ্রাহক পূর্বসূরিদের চেয়ে সুখী ছিল কি না, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর

মিশরের মানুষের জীবন আরেকটু সুন্দর হয়েছিল কি না, অথবা আফ্রিকা থেকে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো উঠে যাওয়ার পর সেখানকার লাখ লাখ মানুষ শান্তি পেয়েছিল কি না– ইতিহাসের পাতায় সেসব নিয়ে আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ ইতিহাস থেকে মানুষের সবচেয়ে বেশি জানতে চাওয়ার বিষয় এগুলোই। এখনকার অধিকাংশ আদর্শগত ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পেছনে তাড়না হিসেবে থাকে এই সুখের সন্ধান। জাতীয়তাবাদীরা বলে রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ই সুখের মূল। সাম্যবাদীরা বলে জীবন সুখের হবে তখনই, যখন নিপীড়িত মানুষেরা সমাজ শাসন করবে। আবার পুঁজিবাদীরা বলবে অন্য কথা। তারা বলবে পণ্যের মুক্তবাজারই পারে মানুষকে সুখী জীবন দিতে। কারণ এভাবেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসবে, আর তার ফলে মানুষের সম্পদ বাড়বে আর তারা আরো স্বনির্ভর হবে।

কিন্তু কোনো উচ্চতর গবেষণা যদি এই দাবিগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে, তখন? অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর স্বনির্ভরতা যদি মানুষকে সুখী করতে না পারে, তাহলে পুঁজিবাদ কী কাজে লাগবে? বড়ো কোনো সাম্রাজ্যের প্রজারা যদি কোনো ছোটো স্বাধীন দেশের নাগরিকদের চেয়ে সুখে থাকে, তাহলে? এই যেমন, যদি প্রমাণ করা যায় যে, আলজেরিয়ার মানুষেরা ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আগেই বেশি ভালো ছিল, তাহলে উপনিবেশবিরোধী রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের সমর্থকেরা কী বলবেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দূরে থাক, এখন পর্যন্ত কোনো ইতিহাসবিদ এই প্রশ্নগুলোই তোলেননি। ইতিহাস পর্যালোচনায় বাদ যায় না কিছুই– রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, লিঙ্গ, রোগব্যাধি, যৌনতা, ভাত-কাপড়– সবকিছু নিয়েই ইতিহাসে আলোচনা হয়, কেবল এগুলো মানুষকে সুখ দিতে পারে কি না সে প্রশ্নে সবাই নীরব।

এই ব্যাপারটা নিয়ে অল্প কিছু মানুষ মাথা ঘামালেও সুখী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞানী থেকে অজ্ঞ– সবারই ধারণা অস্পষ্ট। একদিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, ইতিহাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আসতে আসতে মানুষের সক্ষমতা অনেকটাই বেড়েছে। আর যেহেতু মানুষ সাধারণত দুর্দশা মোচন ও আশা পূরণ করতেই তার অর্জিত ক্ষমতা ব্যবহার করে,

তাই বলা যায় আজকের মানুষ নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের মানুষের চেয়ে বেশি সুখী, প্রস্তর যুগের মানুষের চেয়ে তো বটেই।

কিন্তু এই আশাবাদী যুক্তি আসলে তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা দেখেছি, নতুন নতুন আচরণ ও দক্ষতা মানুষকে উন্নততর জীবন দিতে পারে না। কৃষিবিপ্লবের সময়ে চাষাবাদ করতে শিখে মানুষের সমষ্টিগতভাবে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও বেড়েছিল। অথচ একজন ব্যক্তিমানুষের জীবন হয়ে গিয়েছিল আরো রুক্ষ। একজন সংগ্রাহকের তুলনায় একজন কৃষককে একদিকে কাজও করতে হতো অনেক বেশি, অন্যদিকে তার খাবারের বৈচিত্র্য আর পুষ্টিগুণও ছিল কম। রোগভোগের আশঙ্কাও কৃষকদেরই বেশি ছিল। আবার ইউরোপের দিকে তাকালে দেখা যায়, সাম্রাজ্য-বিস্তারের ফলে তাদের সমষ্টিগত ক্ষমতা অনেক বেড়েছে, তাদের আদর্শ, চিন্তাধারা, প্রযুক্তি আর বৈচিত্র্যময় খাবার ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে, বাণিজ্যের নতুন নতুন পথ তৈরি হয়েছে। অথচ আফ্রিকা, আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ার কোটি কোটি আদিবাসী মানুষকে তা অন্তহীন দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। মানুষের মধ্যে ক্ষমতা পেলেই সেটা অপব্যবহার করার একটা প্রবণতা আছে। কাজেই ক্ষমতার চর্চার মাধ্যমে মানুষ সুখী হবে– এমনটা ভাবা বোকামি।

এই তত্ত্বের বিরোধীদের অবস্থান পুরোপুরি উলটো। তাদের মতে, মানুষের ক্ষমতা ও সুখের মধ্যে সম্পর্কটা আসলে বিপরীত। ক্ষমতা সব সময় মানুষকে দুর্নীতি ও অন্যায়ের পথে চালিত করে। তাই মানুষের হাতে যত ক্ষমতা আসছে, ততই এই পৃথিবীটা একটা শীতল যান্ত্রিক পরিবেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে পরিবেশ আমরা চাইনি। বিবর্তন মানুষকে দেহে-মনে একটা শিকারি-সংগ্রাহক প্রাণী হিসেবেই তৈরি করেছিল। সেখান থেকে প্রথমে কৃষিনির্ভর ও তার পরে শিল্পনির্ভর জীবনে প্রবেশ করে মানুষ তার প্রাকৃতিক জীবন হারিয়েছে। এই কৃত্রিম জীবন তার চাওয়াগুলো পূরণ করতে পারছে না, তার সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রকাশিত হতে দিচ্ছে না। তাই তার সন্তুষ্টিও হচ্ছে না। আদিম মানুষের ম্যামথ শিকারের যে সুতীব্র উত্তেজনা আর বুনো উল্লাস, তা আজকের একটা শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবার কল্পনাও করতে পারবে না। আমাদের

প্রত্যেকটা নতুন আবিষ্কার আমাদেরকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ থেকে একটু একটু করে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।

আবার সব আবিষ্কারই যে খারাপ– তাও নয়। এর বিপরীত উদাহরণও আছে। আমাদের ভেতর থেকে শিকারি-সংগ্রাহক সত্তাটা হারিয়ে গেছে, কিন্তু কিছু কিছু দিক থেকে দেখলে সেটা খুব খারাপও নয়। গত দুই শতাব্দীতে চিকিৎসা ব্যবস্থার যে উন্নতি হয়েছে তাতে শিশু মৃত্যুহার ৩৩ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এর ফলে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া সেইসব শিশু ও তাদের পরিবারের জীবনে যে সুখ এসেছে, তা বিনা তর্কে মেনে নিতেই হবে।

তাই অনেকের অবস্থান এই দুরকম যুক্তির মাঝখানে। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আসার আগের সময়ে ক্ষমতা ও সুখের সম্পর্কটা অস্পষ্ট ছিল। মধ্যযুগের একজন কৃষক হয়তো তার শিকারি-সংগ্রাহক পূর্বসূরির চেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল। কিন্তু গত কয়েক শ বছরে মানুষ তার ক্ষমতাকে আরো বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগাতে শিখেছে। তারই একটা উদাহরণ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি। আরো অন্যান্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সহিংসতার পরিমাণ অনেকখানি কমে আসা, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া, মহামারি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া– এসবের কথা।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাও একদিক থেকে অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। কারণ এই ব্যাখ্যার ভিত্তি হলো খুব অল্প কিছু সময়ের তথ্য। আধুনিক চিকিৎসা পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের নাগালে এসেছে ১৮৫০ সালের পরে। আর শিশুমৃত্যুর হার কমে যাওয়া তো কেবল বিংশ শতাব্দীর ঘটনা। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও পৃথিবীতে বিরাট মহামারি হয়েছে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে যখন চীন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই সেখানে ১ থেকে ৫ কোটি মানুষ মারা গেছে খেতে না পেয়ে। আর আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে কেবল ১৯৪৫ সালের পর, এর মূল কারণ অবশ্য পরমাণু অস্ত্রের ভয়। কাজেই গত কয়েক বছরকে মানুষের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ মনে হলেও এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, এটা কি আসলেই সুন্দর সময়ের শুরু, না কেবল ক্ষণস্থায়ী সুসময়। আধুনিক যুগের বিচার করতে গেলে কেবল একুশ শতকের পশ্চিমা দেশের মধ্যবিত্তের চোখ

দিয়ে দেখলে হবে না, সঙ্গে দেখতে হবে উনিশ শতকের ওয়েলসের কয়লাখনির শ্রমিক, চীনের আফিম-আসক্ত কিংবা তাসমানিয়ার আদিবাসী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকেও। কারণ, ইতিহাসের চোখে আমেরিকার জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র হোমার সিম্পসনের (Homer Simpson) চেয়ে তাসমানিয়ার নির্যাতিত আদিবাসীদের প্রতিনিধি ট্রুগানিনির (Truganini) গুরুত্ব কিন্তু একটুও কম নয়।

তা ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে বিগত অর্ধশতাব্দীকে মানুষের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে মনে হলেও এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু মানুষ রোপণ করেছে তার ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের বীজ। একসময় মানুষসহ সমগ্র জীবজগৎই ছিল প্রকৃতির নিয়মের অধীন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে পরিবেশের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিয়েছে মানুষ। ফলে নিজের প্রয়োজনে পরিবেশকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করার ক্ষমতাও এখন আমাদের আছে। কিন্তু সেই ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে আমরা লাভবান হলেও মোটের ওপর পরিবেশের ক্ষতিই হয়েছে বেশি। আমাদের চাহিদা পূরণের মূল্য দিয়েছে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি। বিশেষ করে গত কয়েক দশকে আমরা যে কতভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছি তার হিসাব নেই। কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি করে মানুষের লাভবান হওয়ার চিন্তা করাটা বোকামি। পৃথিবীজোড়া অগণিত মানুষের বর্তমানের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমরা যে ভবিষ্যতের পৃথিবীকে সম্পদহীন করে ফেলছি, সে কথা ভাবার সময়ও কারো নেই। এর কঠিন পরিণতি একসময় ভোগ করতেই হবে। ইতিমধ্যেই তার কিছু অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে।

অন্যান্য প্রাণীদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বাদ দিয়ে ভাবলে ইতিহাসের এইসব অসামান্য অর্জনের জন্য কৃতিত্বের মুকুটটা মানুষেরই প্রাপ্য বলে মনে হতে পারে। দুর্ভিক্ষ আর মহামারির হাত থেকে আমরা নিস্তার পেয়েছি বটে, কিন্তু তার মূল্য দিতে হয়েছে গবেষণাগারের বানর আর খামারের অসংখ্য গোরু আর মুরগিকে। গত ২০০ বছরে শিল্পের বিকাশের খাতিরে এরকম শত শত কোটি প্রাণীকে যে নিষ্ঠুরতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, তার সমান দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সম্পূর্ণ ইতিহাসে আর একটাও নেই। পশু-অধিকার সংগঠনগুলো যে পরিমাণ নিষ্ঠুরতার হিসাব দেয়, তার ১০ ভাগের

এক ভাগও যদি সত্য হয়, তাহলেও আধুনিক কৃষিব্যবস্থাকে ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ মনে হবে। তাই, সুখের হিসাব করতে গেলে শুধু সমাজের ওপরতলার, অথবা শুধু ইউরোপের, কিংবা কেবল পুরুষ মানুষের হিসেব নিলে চলবে না। সম্ভবত কেবল মানুষের কথা ভাবাটাও অন্যায় হবে।

সুখের মাপকাঠি

এতক্ষণ আমরা সুখী হওয়ার যে মাপকাঠিগুলো দেখলাম, যেমন সুস্বাস্থ্য, খাবার কিংবা সম্পদ– তার সবই বস্তুগত। এদিক দিয়ে দেখলে যে যত ধনী আর স্বাস্থ্যবান, সে তত সুখী। কিন্তু আসলেই কি হিসাবটা এত সহজ? হাজার হাজার বছর ধরে দার্শনিক, ধর্মগুরু আর কবিরা সুখ কী তা জানার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের অনেকেই সুখের জন্য সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে বস্তুগত বিষয়গুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। আজকের সমাজে একজন সচ্ছল মানুষও এত উন্নত জীবনের মধ্যেও একাকিত্বে ভোগে, জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না। অথচ সম্ভবত আমাদের পূর্বপুরুষেরা এতটা সম্পৎশালী না হয়েও সামাজিক বন্ধন, ধর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে আরো বেশি সুখ খুঁজে পেত।

গত কয়েক দশক ধরে এই সুখের সন্ধানের কাজটা করছেন মনোবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীরা। মানুষ কীসে সুখী হয়? টাকা? পরিবার? সৎকর্ম? নাকি জিনের কোনো ভূমিকা আছে এতে? প্রথমে আমাদের জানতে হবে আমরা কী পরিমাপ করতে চাই। সুখের সর্বজনগ্রাহ্য একটা সংজ্ঞা হলো ‘ব্যক্তিগতভাবে ভালো থাকা’। এভাবে চিন্তা করলে সুখ হলো মানুষের মনের ভেতরের একটা অনুভূতি। সেটা তাৎক্ষণিক আনন্দও হতে পারে, আবার দীর্ঘমেয়াদি সন্তুষ্টির অনুভূতিও হতে পারে। যদি এটা মনের ভেতরেরই ব্যাপার হয়, তাহলে বাইরে থেকে সেটা মাপার উপায় কী? একটা উপায় হলো মানুষের কাছে তার অনুভূতি জানতে চাওয়া। এইজন্যই জীববিজ্ঞানী আর মনোবিজ্ঞানীরা মাঝেমধ্যেই সুখী মানুষদের হাতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন রকম জরিপের প্রশ্ন ধরিয়ে দেন।

এসব প্রশ্নে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যে শূন্য থেকে ১০-এর মধ্যে নম্বর দিতে বলা হয়। বক্তব্যগুলো হয় অনেকটা এরকম : 'যেভাবে চলছে সেটাই ভালো', 'জীবন থেকে পাওয়ার অনেক কিছু আছে', 'ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি আশাবাদী' কিংবা 'জীবন আসলেই সুন্দর'। নানাজন নানাভাবে এসব বক্তব্যের সঙ্গে একমত বা দ্বিমত পোষণ করে। তাদের দেওয়া নম্বরগুলো থেকে নানা রকম হিসাব করে বিজ্ঞানীরা তাদের 'ভালো থাকার' পরিমাণটা নির্ণয় করেন।

এসব প্রশ্নোত্তর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিষয়ের সঙ্গে সুখের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। যেমন, ধরা যাক কোনো জরিপে বছরে ১ লাখ ডলার আয় করে এমন ১ হাজার মানুষের মতামত নেওয়া হলো। অন্য কোনো জরিপে এমন ১ হাজার লোকের মতামত নেওয়া হলো যাদের বার্ষিক আয় ৫০ হাজার ডলার। এখন এই দুটো জরিপে যদি দেখা যায় প্রথম দলের 'ভালো থাকার' গড় মান ৮.৭ আর দ্বিতীয় দলের ৭.৩, তাহলে বলা যায় ব্যক্তিগত ভালো থাকার সঙ্গে টাকার একটা সম্পর্ক আছে। সোজা কথায়, যার টাকা বেশি, তার সুখও বেশি। একই পদ্ধতিতে জানার চেষ্টা করা যায় মানুষ গণতান্ত্রিক দেশে বেশি সুখে থাকে না একনায়কের শাসনে, অথবা বিবাহিত মানুষেরা অবিবাহিত, বিধবা ও বিপত্নীক মানুষের চেয়ে বেশি সুখী হয় কি না।

এই তথ্যগুলো ইতিহাসবিদদেরও কাজে লাগে। এখান থেকে তারা অতীতের মানুষের টাকা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা বিবাহবিচ্ছেদের হার কেমন ছিল তা জানতে পারেন। ফলে, যদি দেখা যায়, আগে মানুষ গণতান্ত্রিক শাসনে বেশি ভালো ছিল, তাহলে তারা যুক্তি দেখাতে পারেন, গত কয়েক দশকে গণতন্ত্রের প্রসার মানুষের সুখ বাড়িয়েছে। আবার যদি দেখা যায় বিবাহিত মানুষেরা বেশি সুখী ছিল, তাহলে বলা যায় এখনকার বিবাহবিচ্ছেদের হার বেড়ে যাওয়াটা আসলে মানুষের আরো অসুখী হওয়ার একটা লক্ষ্মণ।

এটা অবশ্য কোনো নির্ভুল পদ্ধতি নয়, তবে এই পদ্ধতির সমস্যাগুলো দেখার আগে এর কিছু ফলাফল দেখা যাক।

একটা মজার পর্যবেক্ষণ হলো, টাকা আসলেই সুখ আনে। তবে সেটা একটা পর্যায় পর্যন্ত, সেটা পার হয়ে গেলে টাকার গুরুত্ব তেমন

থাকে না। অর্থনীতির একেবারে নিচের তলায় যাদের বাস, তাদের কাছে বেশি টাকা মানেই বেশি সুখ। ধরুন, আমেরিকার একজন একা মা মানুষের ঘর পরিষ্কার করে বছরে ১২ হাজার ডলার আয় করছে। এখন সে যদি হঠাৎ একদিন লটারিতে ৫ লাখ ডলার পেয়ে যায়, তাহলে তার 'ভালো থাকার' পরিমাণটা এক লাফে অনেকখানি বেড়ে যাবে, আর সেটা বেশ অনেকদিন থাকবেও। তখন সে দেনায় ডুবে না গিয়েও তার সন্তানদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে পারবে। অথচ যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এমনিতেই বছরে আড়াই লাখ ডলার আয় করছে, সে যদি লটারিতে ১০ লাখ ডলারও পেয়ে যায়, বা কোম্পানি যদি তার বেতন দ্বিগুণ করে দেয়, তার বাড়তি সুখটুকু কিন্তু সপ্তাহখানেকের বেশি থাকবে না। বিভিন্ন জরিপে এমনটাই দেখা যায়। এই বাড়তি টাকা দিয়ে লোকটা হয়তো আরো দামি গাড়ি চালাবে, আরো বড়ো আর বিলাসবহুল বাড়িতে গিয়ে উঠবে, আরো ভালো খাবার আর পানীয় উপভোগ করবে, কিন্তু কিছুদিন পরেই সেটা তার কাছে একটা সাদামাটা ব্যাপারে পরিণত হবে।

শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সুখের সম্পর্কটাও লক্ষণীয়। জরিপে দেখা যায়, অসুখবিসুখ সাধারণত মানুষকে সাময়িকভাবে অসুখী করে। তবে রোগটা যদি যন্ত্রণাদায়ক হয়, অথবা যারা অনেকদিন ধরে কোনো রোগে ভুগছে, তাদের জন্য সেটা বিরাট অশান্তির কারণ। যারা ডায়াবেটিসের মতো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়, তারা প্রথমে কিছুদিন প্রচুর অশান্তিতে ভোগে। কিন্তু তাদের শারীরিক অবস্থার যদি অবনতি না হয়, তাহলে তারা সেই অশান্তির সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের মানিয়ে নেয়, ফলে একসময় তারা সুস্থ মানুষদের মতোই সুখী জীবনে ফিরে আসে। ধরুন, লুসি আর লুক কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই যমজ ভাইবোন। একটা তথ্য সংগ্রহের জরিপে অংশগ্রহণ করে ফেরার পথে দুটো ঘটনা ঘটল। রাস্তায় একটা বাস লুসির গাড়িটাকে ধাক্কা দিল, ফলে গাড়ি তো গুঁড়িয়ে গেলই, লুসির শরীরের অনেকগুলো হাড় ভাঙল, আর একটা পা অকেজো হয়ে গেল সারা জীবনের জন্য। ওদিকে লুকের কাছে একটা ফোন এলো। লুক জানতে পারল, সে ১ কোটি ডলারের লটারি জিতে গেছে! দুবছর পর দেখা যাবে লুসি খুঁড়িয়ে হাঁটছে আর লুক অনেক

দামি গাড়িতে চড়ছে। তখন যদি দুবছর আগের সেই জরিপে আবার তাদের অংশগ্রহণ করতে বলা হয়, সম্ভবত দুজনেরই বেশিরভাগ উত্তর আগের সেই দিনটার মতোই হবে।

সুখের ওপর টাকা আর স্বাস্থ্যের চেয়ে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের প্রভাব আরো বেশি বলেই দেখা যায়। যেসব মানুষের পারিবারিক বন্ধন দুর্বল অথবা যারা অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে খুব বেশি সহযোগিতা পায়নি (অথবা নেয়নি), তাদের চেয়ে দৃঢ় পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনে থাকা মানুষেরা বেশি সুখী হয়। বিয়ে জিনিসটা এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সময়ে নানা সমীক্ষায় দেখা গেছে, সুন্দর বৈবাহিক জীবনের সঙ্গে ভালো থাকা সরাসরি সম্পর্কিত। এই সম্পর্কটা আর্থিক অবস্থা, এমনকি শারীরিক সুস্থতার হেরফের হলেও খাটে। আন্তরিক জীবনসঙ্গী, পরিবার ও উষ্ণ সামাজিক পরিবেশ পেলে একজন হতদরিদ্র অসুস্থ মানুষও একজন একাকী কোটিপতি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সুখী জীবন কাটাতে পারে। তবে দারিদ্র্য খুব বেশি হলে বা কোনো যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হলে ফলাফল কিছুটা ভিন্ন হতেও পারে।

এসব থেকে আরেকটা সম্ভাবনা দেখা যায়। গত ২০০ বছরে মানুষের বস্তুগত দিক থেকে প্রাচুর্য এসেছে। তাই এমনও হতে পারে যে এই প্রাচুর্যই পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দুর্বল হওয়ার ক্ষতি খানিকটা পূরণ করে দিচ্ছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে ১৮০০ সালের একজন মানুষের চেয়ে এখনকার গড়পড়তা একজন মানুষের বেশি সুখী হওয়ার কথা নয়। এমনকি আমরা যে স্বাধীনতাকে এত গুরুত্ব দিই, সেটাই হয়তো আমাদের জন্য খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের এখন জীবনসঙ্গী, বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। আবার তাদেরও তো স্বাধীনতা আছে আমাদের ছেড়ে যাওয়ার! আমাদের নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছামতো সাজানোর স্বাধীনতা যত বাড়ছে, যে-কোনো ধরনের বন্ধনে জড়িয়ে পড়াটাও ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই এসব বন্ধন আলগা হতে হতে আমরা ক্রমেই একাকী জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

তবে এসব গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো, সুখ আসলে সম্পদ, সুস্বাস্থ্য বা সামাজিক বন্ধনের ওপর নির্ভর করে না।

বরং সেটা নির্ভর করে মানুষের অবস্থা ও তার ব্যক্তিগত চাহিদার ওপর। যদি কেউ একটা গোরুর গাড়ি চায়, তাহলে গোরুর গাড়ি পেলেই সে সন্তুষ্ট, আর কিছু দরকার নেই। কিন্তু কেউ যদি একটা ঝকঝকে নতুন ফেরারি গাড়ি চায়, একটা পুরোনো ফিয়াট গাড়ি পেয়ে তার মন ভরবে না, এটাই স্বাভাবিক। এজন্যই লটারি জেতা আর ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনা দুটোই, অনেক সময় পরে, মানুষকে একই অবস্থায় নিয়ে যায়। যখন আমাদের অবস্থা ভালো থাকে, আমাদের চাহিদাগুলোও ফুলেফেঁপে ওঠে, তাই বড়ো বড়ো প্রাপ্তিগুলোও তখন আমাদের সুখ দিতে পারে না। আবার যখন পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায়, তখন আশার বেলুনও চুপসে যায়, তাই সেই খারাপ পরিস্থিতিতেও নিজেকে অসুখী মনে হয় না।

এখন মনে হতে পারে, এ আর নতুন কী, আর এসব জানার জন্য এত গবেষণারই-বা কী আছে। আমরা কী চাই তার চেয়ে আমাদের যা আছে তা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট কি না, এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ– এ কথা তো ধর্মগুরু, কবি আর দার্শনিকেরা কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই বলে আসছে। তবু আমাদের আধুনিক গবেষণার ফল আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিদের চিন্তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, এটা দেখতে ভালোই লাগে।

সুখের ইতিবৃত্ত জানতে হলে আগে আমাদের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হবে। সুখ যদি কেবলই স্বাস্থ্য, সম্পদ আর সামাজিক সম্পর্কের মতো কিছু ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে বিষয়টা একটু সহজ হতো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুখ আসলে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার ওপর নির্ভরশীল, যা প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা আলাদা। তাই সেটা তলিয়ে দেখাটাও বেশ কঠিন। আমাদের এখন অনেক রকম ব্যথানাশক অথবা ঘুমের ওষুধ আছে। কিন্তু সুখ-শান্তির ব্যাপারে আমাদের চাহিদা আর নানা বিষয়ে অসহিষ্ণুতা এত বেড়ে গেছে যে আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে হচ্ছে।

এই চিন্তাধারাটা মেনে নেওয়া একটু কঠিন। সমস্যার শেকড়টা আসলে লুকিয়ে আছে আমাদের মনস্তত্ত্বের গভীরে লুকিয়ে থাকা

একটি ভুল প্রবণতার মধ্যে। আমরা যখন ভাবি যে অন্যরা কতটা সুখী বা আগের মানুষেরা কতটা সুখী ছিল, আমরা সব সময় তাদের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, কারণ এভাবে চিন্তা করতে গেলে আমরা অন্যের ওপর নিজের চাহিদাগুলো চাপিয়ে দিই। এখনকার যে-কোনো সমৃদ্ধ সমাজে প্রতিদিন গোসল করে নতুন কাপড় পরাটাই রীতি। অথচ মধ্যযুগের একজন কৃষক গোসল না করেই মাসের পর মাস কাটিয়ে দিত। কাপড়ও বদলাত কালেভদ্রে। এটা চিন্তা করলে আমাদের গা গুলিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তাদের এতে কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তারা তাদের দীর্ঘদিন গোসল-না-করা শরীর আর ময়লা দুর্গন্ধময় কাপড়েই অভ্যস্ত ছিল। এমন নয় যে তারা নতুন কাপড় চায় কিন্তু সেটা পাচ্ছে না– বরং তাদের যা ছিল সেটা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিল। কাজেই কাপড় যতদিন টেকে ততদিন তারা সুখী।

অবশ্য একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, এতে আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের বিবর্তনীয় আত্মীয় শিম্পাঞ্জিদের কথাই ধরুন। তারাও গোসল করে না বললেই চলে, আর কাপড় বদলানোর ঝক্কি তো তাদের নেইই। আমাদের পোষা বিড়াল-কুকুরও রোজ গোসল করে নতুন কাপড় পরে না। তবু আমরা তাদের কোলে নিই, গায়ে হাত বোলাই। মানবশিশুদের বেলায়ও দেখা যায় তারা গোসল করতে পছন্দ করে না, অথচ বাবা-মায়ের শিক্ষা ও শাসনে থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এই অদ্ভুত রীতিতে দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে যায়। সবই আসলে চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার।

যদি সুখের সংজ্ঞা হয় ইচ্ছাপূরণ, তাহলে বলতে হয় দুটো জিনিস আমাদের সুখের সঞ্চয় খালি করে দিচ্ছে। একটা হলো গণমাধ্যম, অন্যটা হলো বিজ্ঞাপনশিল্প। ৫ হাজার বছর আগের কোনো গ্রামের একজন ১৮ বছর বয়সি মানুষ নির্দ্বিধায় নিজেকে একজন আকর্ষণীয় মানুষ ভাবতে পারত। কারণ তার গ্রামে আর যে জনা-পঞ্চাশেক মানুষ ছিল তাদের বেশিরভাগই হয় বৃদ্ধ নয়তো একেবারে শিশু। কিন্তু আজকের দিনে এরকম বয়সের একজন মানুষ সেই সন্তুষ্টিটুকু না পেয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে। তার স্কুলের বাকি সবাই যদি দেখতে খারাপও হয়, তাতেও তার শান্তি নেই, কারণ সে

নিজেকে তুলনা করছে চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা, খেলোয়াড় কিংবা সুপারমডেলদের সঙ্গে। আমাদের টেলিভিশন, রাস্তার পাশের বিলবোর্ড আর ফেসবুক তাকে এই তুলনাটা করতে বাধ্য করছে।

কাজেই এমনটাও হতে পারে যে, তৃতীয় বিশ্বের মানুষের অশান্তির কারণ শুধু দারিদ্র্য, রোগবালাই, দুর্নীতি আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাই নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্নত বিশ্বের জীবনধারাও। দ্বিতীয় রামেসেস বা ক্লিওপেট্রার যুগের চেয়ে হোসনি মোবারকের মিশরে একজন মানুষের না খেয়ে, রোগে ভুগে বা কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মারা যাওয়ার আশঙ্কা অনেক কম। দুটোকে মিলিয়ে দেখলে ২০১১ সালে মিশরের একজন নাগরিকের তার সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে রাস্তায় নেমে নাচানাচি করার কথা। অথচ তারা মোবারককে গদি থেকে নামানোর জন্য আন্দোলন করছে। এর কারণ হলো তারা নিজেদের অবস্থাকে ফারাওদের মিশরের সঙ্গে তুলনা করে দেখছে না, তুলনা করছে সমসাময়িক ওবামার আমেরিকার সঙ্গে।

যদি এমনই চলতে থাকে, তাহলে অমরত্বও মানুষকে সুখ দিতে পারবে না। ধরুন বিজ্ঞান একদিন সব রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলল, অথবা মানুষের বয়স বেড়ে যাওয়া ঠেকিয়ে দিয়ে মানুষের চিরযৌবনের অধিকারী হওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলল। তাহলে তার অবধারিত ফলাফল হবে পৃথিবী জুড়ে তীব্র আক্রোশ আর প্রবল দুশ্চিন্তার মহামারি।

এই ধরনের কোনো কিছু যদি কখনো আবিষ্কার হয়, তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ, যাদের এটা কেনার সামর্থ্য নেই, তারা রাগে ফেটে পড়বে। ইতিহাসে সব সময় একটা জিনিস দেখা গেছে– গরিব-দুঃখী মানুষ একটা জায়গায় সান্ত্বনা খুঁজে পায়– যে মৃত্যুর কাছে ধনী-গরিব সব সমান। সেই জায়গাটাও আর থাকবে না, দেখা যাবে গরিব মানুষ ঠিকই একদিন মারা যাবে আর ধনীরা চিরযৌবন নিয়ে বেঁচে থাকবে চিরকাল।
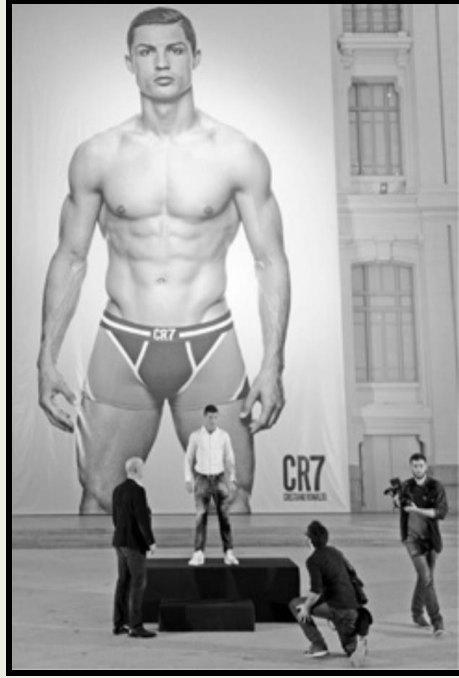
৪৫। আগে সৌন্দর্যের মাপকাঠি ঠিক করে দিত আশপাশের মানুষেরা। আজ সেই কাজটা করছে গণমাধ্যম ও ফ্যাশনশিল্প। তারা আমাদের সামনে সৌন্দর্যের একটা কৃত্রিম আদর্শ রূপ তুলে ধরছে। তারা সারা পৃথিবী খুঁজে সুন্দর মুখগুলো আমাদেরকে দেখায় দিনরাত। কাজেই নিজের চেহারা নিয়ে মানুষের হতাশ হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না।

আবার এই অমরত্ব পাওয়ার সামর্থ্য যাদের হবে তারাও যে খুব সুখে থাকবে– এমন নয়। তাদেরও দুশ্চিন্তা থাকবে। এই ব্যবস্থা আয়ু বাড়াতে পারলেও মৃতকে তো আর জীবন দিতে পারবে না। কাজেই গাড়িচাপা পড়ে বা সন্ত্রাসীদের বোমা হামলার মারা পড়ার আশঙ্কাটা থেকেই যাচ্ছে। তাই অমরত্ব পাওয়া মানুষ ঝুঁকি নিতে ভয় পাবে, সামান্যতম ঝুঁকির ভেতরেও তারা যেতে চাইবে না। আর জীবনসঙ্গী, সন্তান বা বন্ধুর মতো প্রিয়জন হারানোর বেদনাটাও তাদেরই হবে সবচেয়ে বেশি।

রাসায়নিক সুখ

সমাজবিজ্ঞানীরা নানা রকম প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানুষের ভালো থাকার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের সম্পর্ক দেখাতে পারেন। জীববিজ্ঞানীরাও একই পদ্ধতিতেই কাজ করেন, কিন্তু তারা এর মাধ্যমে বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক ও জিনগত বিষয়ের প্রভাব দেখান। তবে তাদের ফলাফলগুলো আরো বিস্ময়কর।

জীববিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের মানসিকতা ও আবেগঘটিত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে কিছু জৈবরাসায়নিক পদার্থ। এই ব্যবস্থাটা লাখ লাখ বছর ধরে তৈরি হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে। অন্যান্য সব মানসিক অবস্থার মতোই আমাদের ভালো লাগার অনুভূতিও বাহ্যিক কোনো কিছুর প্রভাবে হয় না। ভালো বেতন, সুন্দর সামাজিক সম্পর্ক বা রাজনৈতিক অধিকার– এর কোনোটাই আমাদের ভালো লাগার জন্য দায়ী নয়, দায়ী হলো একটা জটিল স্নায়ুতন্ত্র যা গড়ে ওঠে কোটি কোটি নিউরন, সেগুলো যেখানে জোড়া লাগে সেই সব সিনাপস, আর সেরোটনিন, ডোপামিন ও অক্সিটোসিনের মতো কিছু জৈবরাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে।

লটারি জিতে কেউ সুখী হয় না। নতুন বাড়ির মালিক হলেও না, চাকরিতে পদোন্নতি পেলেও না, এমনকি সত্যিকার ভালোবাসার মানুষটাকে পেলেও না। মানুষ কেবল একটা জিনিসেই সুখী হয়– যখন তার শরীরে আনন্দের অনুভূতি হয়, তখন। একজন মানুষ যখন লটারিতে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যায় কিংবা তার প্রিয় মানুষটাকে খুঁজে পায়, তখন তার আনন্দের যে বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, সেটা কিন্তু ওই টাকা বা মানুষটার জন্য নয়। এর জন্য দায়ী তার রক্তস্রোতে ছুটে বেড়ানো বিভিন্ন হরমোন আর মস্তিষ্কের ভেতরে তড়িৎ সংকেতের ঝড়।

তবে দুঃখের ব্যাপার হলো, এই জৈবরাসায়নিক পদ্ধতিটা এমনভাবেই তৈরি হয়েছে যে সেটা আমাদের সুখের মাত্রাটাকে যত খুশি বাড়তে দেয় না। সুখ জিনিসটার ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করে না। এই যেমন একজন সুখী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জিন বিলুপ্ত হয়ে যায়, আবার প্রবল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা-মায়ের জিন ঠিকই সন্তানের

মধ্যে টিকে থাকে। সুখ-দুঃখ মানুষের টিকে থাকা আর বংশবিস্তারে প্রভাব ফেলতে পারে– বিবর্তনে এদের ভূমিকা বড়োজোর এইটুকুই। হয়তো এমনও হতে পারে যে, বিবর্তনই আমাদের এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে আমাদের সুখ-দুঃখ কোনোটাই খুব বেশি না হয়। তাই আমাদের সাময়িক আনন্দের অনুভূতি হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না। আগে হোক বা পরে হোক, সুখটুকু মুছে গিয়ে আবার দুঃখকে জায়গা করে দেয়।

উদাহরণ হিসেবে যৌনতার কথা বলা যায়। বিবর্তন পুরুষের জিন নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াটাকে আনন্দময় করে তুলেছে। এই আনন্দটুকু না থাকলে খুব কম পুরুষই এই কাজে আগ্রহী হতো। আবার একই সঙ্গে বিবর্তন এমন ব্যবস্থাও করেছে, যাতে এই আনন্দ বেশি সময় স্থায়ী না হয়। এই আনন্দ চিরস্থায়ী হলে পুরুষেরা হয়তো খাবার খুঁজতে যেত না, বা অন্য কোনো নারীকেও খুঁজত না।

অনেকে এই জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন। বাইরে তুষারঝড়ই হোক কিংবা রোদে ঝলসে যাক, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ঘরের ভেতরের তাপমাত্রাকে এক জায়গায় স্থির করে রাখে। কোনো কারণে সাময়িকভাবে ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে কিংবা কমে যেতে পারে, কিন্তু এই যন্ত্র আবার সেটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসে।

এসব যন্ত্রের কোনোটা ঘরের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখে, কোনোটা বিশে। মানুষের ব্যাপারটাও এমনই। মানুষের সুখ-দুঃখকে এক থেকে ১০-এর মধ্যে নম্বর দিলে একেক জনের নম্বর একেক রকম হবে। হয়তো দেখা যাবে সহজাতভাবেই হাসিখুশি কোনো মানুষের মানসিক অবস্থা ছয় থেকে ১০-এর মধ্যে ওঠানামা করে, গড়ে আটের আশপাশে থাকে। এইরকম একজন মানুষ যদি কোনো ব্যস্ত শহরে একা থাকে, যদি একদিন শেয়ারবাজারে তার সব টাকা লোকসান হয় আর পরের দিনই তার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে, তবু তাকে খুব একটা দুঃখিত হতে দেখা যায় না। আবার অনেকের মানসিক অবস্থা এমনিতেই তিন থেকে সাতের মধ্যে থাকে, গড়ে পাঁচের কাছাকাছি। এরকম একজন মানুষ অনেক বন্ধুবান্ধবের ভেতরে থেকে, লটারিতে কয়েক লাখ টাকা জিতে অলিম্পিক

অ্যাথলেটদের মতো স্বাস্থ্য নিয়েও মন খারাপ করে থাকে। আসলেই, আমাদের সবচেয়ে মনমরা বন্ধুটা যদি একদিন সকালে উঠেই দেখে সে ১ কোটি টাকার লটারি জিতে গেছে, তারপর দুপুরবেলার মধ্যে এইডস আর ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলে, বিকাল নাগাদ ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনের মধ্যে একটা শান্তিচুক্তি করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখে যে তার কয়েক বছর আগে হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাটা ঘরে ফিরে এসেছে, তবু তার খুশির মাত্রা সাতের ওপরে ওঠে না। ঘটনা যা-ই হোক, তার মস্তিষ্কটাই আসলে খুব বেশি খুশি হওয়ার জন্য তৈরি হয়নি।

নিজের আশপাশের মানুষদের কথাই ভাবুন। এমন একজনকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন যে যে-কোনো অবস্থায় হাসিখুশি থাকতে পারে। আবার এমন কাউকেও পাবেন যে কোনো কিছুতেই খুশি হয় না। আমাদের ধারণাটাই হয়ে গেছে এমন যে আমরা ভাবি একটা ভালো জায়গায় কাজ করলে, বিয়ে করলে, অর্ধেক লেখা উপন্যাসটা শেষ করলে, নতুন একটা গাড়ি কিনলে কিংবা ব্যাংক থেকে ধার নেওয়া টাকাটা শোধ করে দিলে তার মতো সুখ আর কিছুতে নেই। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা পূরণ হয়ে গেলেও দেখা যায় সেই সুখ আর আসে না। কারণ গাড়ি কেনা বা উপন্যাস লেখা আমাদের ভেতরে স্থায়ী কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় না। একটা সাময়িক সুখের অনুভূতি দিতে পারে বড়োজোর, কিন্তু সেটা কেটে যেতেও সময় লাগে না।

তাহলে একটু আগে যে সুখের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল, তার সঙ্গে এই জৈবরাসায়নিক ব্যাখ্যার সামঞ্জস্যটা কোথায়? এই যেমন, বিবাহিত মানুষ অবিবাহিত মানুষের চেয়ে বেশি সুখী হয়– তার ব্যাখ্যা কী? প্রথমে এটা মেনে নিতে হবে যে, বিয়ে করা আর সুখী হওয়া– কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এ দুটো ঘটনা একসঙ্গে হওয়ার উদাহরণ অনেক বেশি আছে বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে একটার কারণে অন্যটা হচ্ছে। হ্যাঁ, একজন গড়পড়তা বিবাহিত মানুষ একজন অবিবাহিত মানুষের চেয়ে সুখী, কিন্তু তাই বলে এটা বলা যাবে না যে বিয়েই তার সুখের উৎস। বরং উলটোটা হতে পারে– সুখটাই আসলে বিয়ের কারণ। আসলে

সেরোটনিন, ডোপামিন ও অক্সিটোসিন– এই তিনটাই বিয়ে হওয়া ও বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য দায়ী। অনেক মানুষ জন্মগতভাবেই হাসিখুশি ধরনের হয়। এরকম একজন মানুষ জীবনসঙ্গী হিসেবেও ভালো হওয়ার কথা, কাজেই তার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার একজন বিষণ্ন মানুষের চেয়ে একজন হাসিখুশি মানুষের সঙ্গে বসবাস করা বেশি উপভোগ্য, তাই এরকম মানুষের বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনাও কম। কাজেই দুদিক থেকেই চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে গড়ে একজন বিবাহিত মানুষ একজন অবিবাহিত মানুষের চেয়ে সুখী, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে একজন বিষণ্ন মানুষ বিয়ে করে ফেললেই রাতারাতি সে একজন সুখী মানুষ হয়ে যাবে।

জীববিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের ওপর জোর দিলেও মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিষয়গুলোকেও তাঁরা উড়িয়ে দেন না। আমাদের মানসিক অবস্থার একটা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা আছে। যে-কোনো দিকেই এই সীমা অতিক্রম করাটা প্রায় অসম্ভব। তবে বিয়ে ও বিচ্ছেদের মতো ঘটনায় সেটা হতেও পারে। যে মানুষ জন্মেছেই গড়ে পাঁচ মাত্রার অনুভূতি নিয়ে, তাকে কখনোই রাস্তায় নাচতে দেখা যাবে না। অথচ একটা সুখী বিবাহিত জীবন পেলে তার সুখী ভাবটা মাঝেমধ্যেই সাত মাত্রায় উঠতে পারে। হয়তো সেটা আর তিনের কাছাকাছি যাবেই না।

যদি আমরা সুখের এই জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা মেনে নিই, তাহলে ইতিহাসের আর তেমন গুরুত্ব থাকে না। কারণ ইতিহাস তো আর এসব জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে না। হ্যাঁ, সেরোটনিন নিঃসরণ করার মতো ঘটনা ইতিহাসে আছে বটে, কিন্তু তাতে তো আর মানুষের রক্তে সেরোটোনিনের মাত্রা বদলায় না। কাজেই মানুষের সুখী হওয়ার পেছনে ইতিহাসের কোনো ভূমিকাও নেই।

চলুন, মধ্যযুগের একজন ফরাসি কৃষকের জীবনের সঙ্গে আজকের প্যারিসের একজন ব্যাংক কর্মকর্তার জীবনকে মিলিয়ে দেখি। কৃষক থাকত একটা কাদামাটির ঘরে, সেটা এমনভাবে তৈরি করা যেন সেখান থেকে শূকরের খোঁয়াড়টার ওপর নজর রাখা যায়। ওদিকে ব্যাংক কর্মকর্তা থাকে আধুনিক প্রযুক্তির জিনিসপত্রে ভরা

একটা বড়ো দালানের সবচেয়ে ওপরতলায়, যার জানালা দিয়ে তাকালেই বিরাট শাঁজেলিসি অ্যাভিনিউ দেখা যায়। এটুকু জেনেই আমাদের মনে হয় কৃষকের চেয়ে এই কর্মকর্তার জীবন কত সুখের। অথচ আসল ব্যাপার হলো, মানুষের সুখের ওপর এই কাদামাটির ঘর, উঁচু দালানের ঘর, শূকরের খোঁয়াড় বা চওড়া রাস্তার কোনো ভূমিকাই নেই। সেরোটোনিনের আছে। সেই মধ্যযুগের কৃষক যখন তার কাদামাটির ঘরটা বানাল, তখন তার মস্তিষ্কের নিউরনে সেরোটোনিন ক্ষরণ শুরু হলো। ধরা যাক সেই মুহূর্তে তার সেরোটোনিনের মাত্রা হলো X। আবার, ২০১৪ সালে ব্যাংক কর্মকর্তাটি যখন তার নতুন বাসার দামের শেষ কিস্তিটা শোধ করল, তখন তারও সেরোটোনিনের মাত্রা দাঁড়াল X-এর কাছাকাছি। অবশ্যই মাটির ঘরের চেয়ে এই দামি বাসায় থাকাটা অনেক বেশি আরামদায়ক, কিন্তু তার জন্য সেরোটোনিন নিঃসরণের কোনো হেরফের হচ্ছে না। কাজেই এই আধুনিক ব্যাংক কর্মকর্তার সুখের পরিমাণ তার কয়েক পুরুষ আগের গরিব কৃষকের চেয়ে একটুও বেশি নয়।

এই ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে যেমন সত্য, সমষ্টিগতভাবেও সেটা একই রকম সত্য। উদাহরণ হিসেবে ফরাসি বিপ্লবের কথাই ধরুন। সে সময়ে বিপ্লবীরা অনেক কিছু করেছিল। তারা রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, কৃষকের হাতে জমির মালিকানা দিয়েছে, মানবাধিকার নিশ্চিত করেছে, অভিজাতদের বাড়তি সুবিধা পাওয়া বন্ধ করেছে, আর তার সঙ্গে সারা ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। কিন্তু এর কোনো কিছুই ফরাসিদের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোনো প্রভাব ফেলেনি। ফলে দেখা গেল এই এত বড়ো রাজনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসার পরেও ফরাসি জাতির সুখের ওপর তার প্রভাব পড়েছে সামান্যই। যারা জন্মগতভাবেই হাসিখুশি তারা বিপ্লবের আগেও যেমন সুখী ছিল পরেও তেমনই ছিল। আবার যারা এমনিতেই বিষণ্ন ধরনের তারা বিপ্লবের আগে রাজা ষোড়শ লুই ও রানি আঁতোয়ানেতকে (Marie Antoinette) নিয়ে অভিযোগ করত, বিপ্লবের পরে তারা

রোবেসপিয়ের (Robespierre) আর নেপোলিয়নের নামে বিষোদগার করতে থাকল।

যদি তা-ই হয়, তাহলে ফরাসি বিপ্লবে লাভটা কী হলো? মানুষের সুখ যদি আগের চেয়ে একটুও না বাড়ে, তাহলে এত বিশৃঙ্খলা, ভয়ভীতি, রক্তপাত, যুদ্ধ– এসব কেন? জীববিজ্ঞানীরা এই বিপ্লব করলে তারা কখনোই বাস্তিল (Bastille) দুর্গ আক্রমণ করতে যেত না। মানুষ ভেবেছিল এই রাজনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক সংস্কার তাদের আরো সুখী করবে, কিন্তু তাদের শরীরের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া বারবার তাদের ধোঁকা দিয়েছে।

তবে একটা ব্যাপারের গুরুত্ব আছে। আজ আমরা জানি, আমাদের সুখের মূলে আছে আমাদের শরীরের কিছু জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া। কাজেই এখন আমরা রাজনীতি, সমাজসংস্কার, সরকারবিরোধী কিংবা নৈতিক আন্দোলন– এসবে সময় নষ্ট না করে বরং সেই জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াটাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেদিকে মনোযোগ দিতে পারি। কারণ সুখের উৎসটা ওখানেই। মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে আর কীভাবে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই গবেষণায় যদি এখন থেকে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যায়, তাহলে একসময় কোনোরকম বিপ্লব ছাড়াই মানুষ এত সুখী হতে পারবে, যা আগে কখনো সম্ভব হয়নি। এই যেমন প্রোজ্যাক (Prozac) নামের ওষুধটা দেশের সরকারকে গদি থেকে নামাতে পারে না, কিন্তু একজন মানুষের শরীরে সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে তার বিষণ্নতা দূর করতে পারে।

আজকাল একটা স্লোগান খুব শোনা যায়– 'সুখের শুরুটা হয় ভেতর থেকে' (Happiness Begins Within)। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর চেয়ে মোক্ষম স্লোগান আর হয় না। আসলেই, টাকা, সামাজিক মর্যাদা, প্লাস্টিক সার্জারি, সুন্দর বিলাসবহুল বাড়ি, ক্ষমতা– এগুলোর কোনোটাই মানুষকে সুখ এনে দিতে পারে না। স্থায়ী সুখ দিতে পারে কেবল তিনটা জিনিস– সেরোটোনিন, ডোপামিন আর অক্সিটোসিন।[১]

১৯৩২-এ প্রকাশিত আলডাস হাক্সলির (Aldous Huxley) কল্প-উপন্যাস *ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড*-এ দেখান হয়েছে, কীভাবে ভবিষ্যতের এক বিষণ্ন সময়ে সুখ হয়ে যায় মানুষের পরমারাধ্য বস্তু, আর কীভাবে মননিয়ন্ত্রক ওষুধ নিয়ে নেয় পুলিশের জায়গা। সেখানে মানুষ প্রতিদিন 'সোমা' (Soma) নামের ওষুধের গুণে সুখে থাকে। পৃথিবী জুড়ে প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বরাজ্যে' যুদ্ধ-বিপ্লব-ধর্মঘট কিছু নেই, কারণ সবাই যার যার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট, কারো কোনো অভিযোগ নেই। জর্জ অরওয়েলের '১৯৮৪' নামক উপন্যাসের চেয়েও হাক্সলির দেখানো এই পৃথিবী পাঠকের কাছে বেশি ভয়ংকর মনে হয়। কিন্তু কেন? এর ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়। আসলেই তো, যদি সবাই সব সময় সুখেই থাকে, তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

জীবনের অর্থ

হাক্সলির উপন্যাসে কল্পিত ভীতিকর পৃথিবীতে যেটা ধরে নেওয়া হয়েছে তা হলো সুখ হচ্ছে আনন্দের অনুভূতি। সুখী হওয়া মানে হলো নিখাদ শারীরিক আনন্দলাভ, আর কিছুই নয়। যেহেতু আমাদের শরীর দীর্ঘ সময় ধরে এই আনন্দের অনুভূতি ধরে রাখতে পারে না, তাই মানুষকে অনেক সময় ধরে সুখে রাখার জন্য শরীরের কলকবজাগুলো একটু এদিক-সেদিক করতেই হবে।

কিন্তু সুখের এই ধারণাটা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিভেদ আছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল কানেম্যান (Daniel Kahneman) একবার একটা বিখ্যাত পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এই পরীক্ষায় কিছু মানুষকে তাদের একটা কর্মদিবসের বর্ণনা দিতে বলা হয়। তাদের বলা হয় দিনের সবগুলো ঘটনা ধাপে ধাপে বর্ণনা করে সেগুলো কতটুকু ভালো বা খারাপ লেগেছে সেটা বলতে। কানেম্যান দেখলেন, এই জরিপের ফলাফল, অর্থাৎ জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ধাঁধায় ফেলে দেয়। উদাহরণ হিসেবে শিশুপালনের কথাই ধরুন। একটা বাচ্চাকে লালনপালন করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় আনন্দদায়ক ও কষ্টদায়ক, দুই রকমেরই কাজ আছে। সত্যি বলতে সেখানে কষ্টদায়ক কাজের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি।

শিশুপালনের বেশিরভাগ জুড়ে আছে বাচ্চার ভেজা কাঁথা বদলানো, প্রচুর থালাবাসন ধোয়া আর তাদের সব উৎপাত সহ্য করা। এর একটাও তো কোনো উপভোগ্য কাজ নয়। অথচ প্রায় সব মা-বাবাই একবাক্যে স্বীকার করবে, তাদের সন্তানই তাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। তার মানে কি এই যে, মানুষ আসলে জানেই না যে তার জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ?

এ তো গেল একটা মত। অন্য একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সুখ কেবল মানুষের আনন্দদায়ক ও কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার যোগবিয়োগের ফলাফল নয়। বরং একজন মানুষের নিজের জীবনকে অর্থপূর্ণ হিসেবে দেখতে পারাটাই সুখ। হ্যাঁ, সুখ কেবল জৈবিক ব্যাপার নয়। এখানে মানুষের চেতনা ও মূল্যবোধেরও একটা জায়গা আছে। সন্তানপালনকে আমরা 'একটা স্বৈরাচারী শিশুর আজ্ঞাবহ দাস হয়ে থাকা' হিসেবে দেখব নাকি 'একটা নতুন জীবনকে ভালোবাসা দিয়ে বড়ো করে তোলা' হিসেবে দেখব, সেটা নির্ধারণ করে আমাদের মূল্যবোধ।[২] নিটশে (Nietzsche) বলেছেন, বেঁচে থাকার পেছনে যদি কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে যেভাবেই হোক, বেঁচে থাকা যায়। কষ্টে ভরা জীবনও প্রচণ্ড স্বস্তিদায়ক হতে পারে, যদি সেই জীবন ধারণের পেছনে কোনো উপযুক্ত কারণ থাকে। আবার একটা অর্থহীন জীবন অনেক আরামের মধ্যেও দুঃসহ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর সব সভ্যতা ও সব যুগের মানুষই প্রায় একই রকমের আনন্দ ও কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছে, তার পরও জীবনের অর্থ একেক মানুষের কাছে একেক রকম। সেদিক থেকে দেখলে সুখ জিনিসটাকে জীববিজ্ঞানীরা যতটা সহজভাবে দেখেন আসলে তা তত সহজ নয়। আর সেটা আধুনিকতার পক্ষেও যায় না। জীবনকে একেবারে প্রতি মিনিট ধরে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মধ্যযুগের মানুষের জীবন ছিল খুবই কঠিন। তখন যারা পরকালের অনন্ত সুখের জীবনের কথা বিশ্বাস করত, তাদের কাছে নিজের জীবন যথেষ্টই অর্থপূর্ণ ছিল। তার তুলনায় এখনকার একজন অধার্মিক মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি হলো অর্থহীন বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া। 'মোটের ওপর তোমার জীবন নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট?' এরকম একটা

প্রশ্ন দিয়ে যদি একটা জরিপ চালানো যেত, সেখানে মধ্যযুগের মানুষেরই বেশি নম্বর পাওয়ার কথা।

তার মানে কি এই যে মধ্যযুগের মানুষেরা পরকালের অলীক কল্পনার মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে সুখী ছিল? আসলেই তাই। যতক্ষণ এই কল্পনার বেলুন চুপসে না যাচ্ছে, ততক্ষণ এই কল্পনায় সুখী হতে বাধা কোথায়? তবে বিজ্ঞানের চোখে দেখলে মানবজীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই মানুষ নামের প্রাণী প্রজাতিটা আসলে অন্ধ ও উদ্দেশ্যহীন বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। আমরা যা কিছু করি তা কোনো মহাজাগতিক পরিকল্পনার অংশ নয়। কাল সকালেই যদি এই পৃথিবী নামক গ্রহটা ধ্বংস হয়ে যায়, তাতে এই মহাবিশ্বের কিছু আসবে যাবে না। বাকি সবকিছু তার নিজের মতোই চলতে থাকবে। অন্তত এটুকু বলা যায় যে মানুষের অনুপস্থিতির কোনো প্রভাব কোথাও পড়বে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষ জীবনের অর্থ নিয়ে যত কথাই বলুক, তার সবটাই আসলে কল্পনা। জীবনের মধ্যে এইসব অপার্থিব অর্থ কেবল মধ্যযুগের মানুষই খুঁজে বের করেনি, সেটা এখনকার মানবতাবাদী, জাতীয়তাবাদী আর পুঁজিবাদী মানুষেরাও যার যার মতো করে যাচ্ছে। একজন বিজ্ঞানী ভাবে, মানুষের জ্ঞানভান্ডার আরেকটু সমৃদ্ধ করাটাই জীবনের অর্থ, সৈনিকের কাছে জীবনের অর্থ হলো তার দেশকে রক্ষা করা, আবার একজন উদ্যোক্তার কাছে জীবনের মানে হলো নিজের গড়া একটা প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগের অনেক মানুষের কাছে জীবন মানে ছিল ধর্মগ্রন্থ পড়া, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা আর ধর্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। তাহলে তাদের সঙ্গে এখনকার এই মানুষগুলোর পার্থক্য আর কী থাকল?

তার মানে সুখ জিনিসটা সম্ভবত শুধু ব্যক্তিগত ভালো থাকা নয়। সুখ হলো সমাজে বিরাজমান সামষ্টিক কল্পনাগুলোর সঙ্গে একজন মানুষের নিজের কল্পনাগুলো এক সুরে মিলিয়ে নেওয়া। যখন একজন মানুষের জীবনবোধ তার আশপাশের আর দশজনের জীবনবোধের সঙ্গে মিলে যায়, তখনই সে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়, নিজেকে সুখী ভাবে।

তবে এই সিদ্ধান্তে আসাটা কিছুটা হতাশাজনকও। সুখ কি আসলেই কল্পনানির্ভর?

নিজেকে জানো

সুখ যদি আনন্দের অনুভূতি হয়, তাহলে সুখী হতে হলে আমাদের শরীরের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর সুখ যদি হয় জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া, তাহলে সুখী হওয়ার জন্য নিজেকে আরো ভালোভাবে ভাসিয়ে দিতে হবে কল্পনায়। এই দুটো ছাড়া সুখী হওয়ার আর কোনো উপায় কি আছে?

এই দুটো ধারণার মধ্যেই একটা জিনিস আছে। সেটা হলো, এখানে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে সুখ হলো একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা আনন্দই হোক বা জীবনের অর্থ। কাজেই একটা মানুষ সুখী কি না তা জানতে হলে তার অনুভূতি জানতে হবে। অনেকের কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হবে, কারণ আমরা এখন বাস করছি একটা উদারনৈতিক সময়ে। এই উদারনৈতিক চিন্তাধারা মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির পক্ষেই যাবে। উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অনুভূতিই মানুষের সব কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক। একজন মানুষের কাছে কী ভালো আর কী মন্দ, কোনটা সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর, কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়– তার সবকিছুই সে ঠিক করে নেয় তার নিজের মতামত থেকে।

উদারনৈতিক রাজনীতির মূল কথা হলো, যারা ভোট দেবে তারাই সবচেয়ে ভালো জানে, তাদেরকে ভালোমন্দের জ্ঞান দেওয়ার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন নেই। উদারনৈতিক অর্থনীতি বলে, ক্রেতার মতামতই শিরোধার্য, এর ওপরে আর কোনো কথা নেই। উদারনৈতিক শিল্পে সৌন্দর্য জিনিসটা আপেক্ষিক, তা কেবল দর্শকের রুচির ওপরেই নির্ভর করে। উদারনীতিতে চলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদেরকে নিজের মতো করে চিন্তা করতে শেখায়। বিজ্ঞাপনগুলো আমাদের বলতে চায়, 'যা করতে ইচ্ছা হয়, করে ফেলো!' এ যুগের চলচ্চিত্র, নাটক, উপন্যাস, গান– সবকিছুর মধ্যেই সেই একই বার্তা– 'নিজের কাছে সৎ থাকো', 'নিজের মনের কথা শোনো' কিংবা 'মন যা চায়, তা-ই করো'। ফরাসি দার্শনিক জাঁ-

জ্যাক রুশো তো সোজাসুজিই বলেছেন, 'যেটা আমার কাছে ভালো, সেটাই ভালো, আর যা আমার কাছে খারাপ, তা-ই খারাপ।'

যে মানুষটা একেবারে শিশুকাল থেকে এসব কথা শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছে, তার কাছে সুখ অবশ্যই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। একজন মানুষ সুখে আছে কি না সেটা নির্ণয় করতে পারে কেবল সে নিজেই, অন্য কেউ নয়। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল এই উদারনীতিতেই দেখা যায়। ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন ধর্ম ও আদর্শিক মতবাদ সুখের নানা রকম নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব মতবাদে সুখ জিনিসটা একজন ব্যক্তির নিজের মতামত বা অনুভূতির ঊর্ধ্বে বলেই মনে করা হয়। ডেলফিতে অবস্থিত অ্যাপোলোর মন্দিরের প্রবেশদ্বারেই তীর্থযাত্রীরা দেখতে পেত লেখা আছে, 'নিজেকে জানো।' এই কথার গূঢ় অর্থ হলো, গড়পড়তা একজন মানুষ তার নিজের সম্পর্কেই আসলে জানে না, তাই সুখের সন্ধানও সে আর পায় না। এই কথাটার সঙ্গে ফ্রয়েডও সম্ভবত একমত হতেন।*

খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। সেইন্ট পল ও সেইন্ট অগাস্টিন বিলক্ষণ জানতেন, যে বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও যৌনতা– এ দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টাই বেছে নেবে। তাহলে কি যৌনতাই সুখের উৎস? পল ও অগাস্টিনের উত্তর হলো, না। এতে কেবল এটাই প্রমাণিত হয় যে, পাপ করাটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মানুষ সহজেই শয়তানের ফাঁদে পা দেয়। খ্রিষ্টধর্মের চোখে বেশিরভাগ মানুষের অবস্থা আসলে হেরোইনে আসক্তদের মতো। ধরুন একজন মনোবিজ্ঞানী মাদকাসক্ত মানুষের কাছে সুখের সন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, মানুষ কেবল মাদক গ্রহণ করলেই সুখী হয়। তাহলে কি তিনি তার গবেষণাপত্রে লিখবেন যে হেরোইনই হলো সুখের চাবিকাঠি?

---

* বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক জরিপের উদ্দেশ্য মানুষের সুখ পরিমাপ করা হলেও মনশ্চিকিৎসার কেন্দ্রীয় বিষয় হলো মানুষকে নিজেকে জানতে ও তাদের নিজেদের ক্ষতি করার মনোভাব থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করা।

অনুভূতি জিনিসটা যে সুখের কোনো নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়, এ কথা কেবল খ্রিষ্টানদের একার নয়। অনুভূতির প্রশ্নে ডারউইন আর ডকিন্সও হয়তো সেইন্ট পল ও সেইন্ট অগাস্টিনের সঙ্গে একই সুরে কথা বলবেন। স্বার্থপর জিনতত্ত্ব (Selfish Gene Theory) বলে, প্রাকৃতিক নির্বাচন অন্যান্য জীবের মতো মানুষের ক্ষেত্রেও জিনের স্বার্থই রক্ষা করে, সেটা যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হয়, তবু। অধিকাংশ পুরুষই তাদের সারা জীবন আরাম-আয়েশ না করে দুশ্চিন্তা, খাটাখাটনি, প্রতিযোগিতা আর মারামারি করেই কাটিয়ে দেয়। কারণ তাদের ডিএনএ তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করতেই তাকে দিয়ে এসব করিয়ে নেয়। অর্থাৎ শয়তান যেভাবে কাজ করে, ডিএনএও ঠিক সেভাবেই মানুষকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে নিজ স্বার্থে কাজ করিয়ে নেয়।

সুখের ব্যাপারে বেশিরভাগ ধর্ম ও আদর্শের অবস্থান এই উদারনীতির চেয়ে আলাদা।[৩] এগুলোর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্ম এই সুখের সন্ধানকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছে, সম্ভবত আর কোনো কিছুই সেটাকে এত গুরুত্ব দেয়নি। আড়াই হাজার বছর ধরে এই ধর্ম মানুষের সুখের কারণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। এ কারণেই বিজ্ঞানীদের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের আদর্শ এবং এই ধর্মের বিভিন্ন রকম ধ্যানের কলাকৌশল নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে।

বৌদ্ধধর্মের যেভাবে সুখের ব্যাখ্যা তার মূল ভাবটা অনেকটা জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মতোই। অর্থাৎ এখানেও বলা হয় যে সুখ মানুষের শরীরেই উৎপন্ন হয়, বাইরে থেকে আসে না। কিন্তু গোড়ার দিকটা একই রকম হলেও এই ধর্ম উপসংহার টেনেছে অন্যদিকে।

বৌদ্ধধর্মমতে মানুষ সুখ বুঝতে পারে আনন্দের অনুভূতি দিয়ে, আর দুঃখ বোঝে কষ্টের অনুভূতির মাধ্যমে। তাই মানুষ নিজের অনুভূতিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। তারা কষ্ট এড়িয়ে আরো বেশি আনন্দ পেতে চায়। তাই আমরা যা-কিছু করি– পা চুলকাই, চেয়ারে নড়েচড়ে বসি, কিংবা বিশ্বযুদ্ধই বাধাই– সবই করি আনন্দের অনুভূতি পাওয়ার জন্যই।

কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে। বৌদ্ধধর্ম বলে, মানুষের এই সুখ আর দুঃখ নিয়ত পরিবর্তনশীল, অনেকটা সাগরের ঢেউয়ের মতো, আসে আর যায়। পাঁচ মিনিট আগেও যে মানুষটা নিজেকে সুখী ভাবছিল, জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিল, পাঁচ মিনিট যেতেই সেই সুখটুকু সরে গিয়ে দুঃখ এসে তাকে গ্রাস করে। তার মানে সুখী হতে হলে তাকে সারাক্ষণ সুখের পেছনে ছুটতে হবে, আর দুঃখ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হবে। অথচ এতে যদি সে সফলও হয়, তাতেও কোনো লাভ নেই। কারণ এই অস্থায়ী সুখটুকু ফুরিয়ে গেলেই আবার সবকিছু শুরু করতে হবে প্রথম থেকে।

তাহলে এই ক্ষণস্থায়ী সুখের পেছনে ছুটে কী লাভ? যা ধরে রাখা যায় না তাকে পাওয়ার জন্য কেন এই পণ্ডশ্রম? বৌদ্ধধর্ম বলে, মানুষের এই দুর্ভোগের কারণ আসলে এই দুঃখ-কষ্ট নয়। সুখ-দুঃখের এই অর্থহীনতাও নয়। বরং সুখের পেছনে এই অবিরাম অর্থহীন ছুটে বেড়ানোই দুঃখের কারণ। এতে সুখের দেখা তো মেলেই না, বরং দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও অপ্রাপ্তিতে ভরে যায় জীবন। সুখের পেছনে ছুটে কেউ কোনো দিন সন্তুষ্ট হতে পারে না। এমনকি ক্ষণস্থায়ী আনন্দের সময়ও মনের ভেতর উঁকি দিয়ে যায় দুশ্চিন্তা, কারণ এই সুখও তো একসময় ফুরিয়ে যাবে।

ক্ষণস্থায়ী সুখ মানুষকে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এর থেকে মুক্তি মেলে তখনই, যখন সে বুঝতে পারে যে সুখ ক্ষণস্থায়ী, আর বুঝতে পেরে সে সুখের পেছনে ছোটা বন্ধ করে। বৌদ্ধধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য এটাই। ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ তার দেহ ও মনকে ভালোভাবে জানতে পারে, অনুভূতির ওঠানামা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে পায়, ফলে বুঝতে পারে এসব কতটা অর্থহীন। এভাবে সুখের সন্ধান বন্ধ করতে পারলেই মনে ধীরতা ও প্রশান্তি আসে। মনের ভেতরে সব রকম অনুভূতি আসবে-যাবে– আনন্দ, ক্রোধ, হতাশা কিংবা কামনা যা-ই হোক– কিন্তু বিশেষ কোনো অনুভূতির জন্য তীব্র বাসনা ত্যাগ করতে পারলেই সবকিছু সহজ হয়ে যায়। কী হতে পারত সেই চিন্তা বাদ দিয়ে কী হচ্ছে সেটাই বড়ো হয়ে ওঠে।

এই মানসিক প্রশান্তির অনুভূতি এতটাই গভীর যে সারা জীবন সুখের পেছনে ছুটে বেড়ানো একজন মানুষ সেটা কল্পনাও করতে পারে না। ধরুন, একজন মানুষ বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে 'ভালো' ঢেউগুলোকে ধরে রাখতে আর 'খারাপ' ঢেউগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। তার সারা জীবন এভাবে কেটে যাবে, কিন্তু এই কাজে সে সফল হবে না কোনো দিন। অথচ সে যদি এই ব্যর্থ চেষ্টা না করে চুপচাপ বসে সবগুলো ঢেউকে আসতে-যেতে দেয়, তাহলেই তার জীবন ভরে উঠবে প্রশান্তিতে।

কিন্তু এই ধারণাটা আধুনিক পৃথিবীতে এত খাপছাড়া লাগে যে এখনকার উদারনৈতিক মানুষ এটাকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। এখনকার ধারণাটা অনেকটা এমন, 'সুখ আসলে বাইরের কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে আমাদের অনুভূতির ওপর। তাই মানুষের টাকা, মর্যাদা এসবের পেছনে না ছুটে তার নিজের মানসিক শান্তির দিকে নজর দেওয়া উচিত।' অথবা আরো কম কথায় বলতে গেলে 'সুখ আসে ভেতর থেকে।' ঠিক এই কথাটাই জীববিজ্ঞানীরাও বলেন, কিন্তু তারা বোঝাতে চান বুদ্ধ যা বলেছেন তার উলটোটা।

এই আধুনিক মতবাদ আর জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে বুদ্ধের বাণীর মিল শুধু এইটুকুই। কিন্তু আসল জায়গাটাতেই, অর্থাৎ অনুভূতির ব্যাপারে অমিল আছে। বুদ্ধ বলেন যে সুখ আসলে আমাদের ভেতরের অনুভূতির ওপরেও নির্ভর করে না। আসলেই, আমরা যতই আমাদের অনুভূতিকে বেশি গুরুত্ব দিই, ততই আমাদের মধ্যে ভালো অনুভূতির চাহিদা তৈরি হয়, আর তাতে আমাদের দুর্ভোগই শুধু বাড়ে। তাই বুদ্ধের পরামর্শ হলো, বাহ্যিক অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়াও বন্ধ করতে হবে।

'ভালো থাকা'-বিষয়ক প্রশ্নে জরিপ চালালে একজন মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তিগত সুখ ও আবেগের খবর পাওয়া যায়। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের মতো কিছু কিছু ধর্ম ও দর্শন বলে, এসব আবেগ-অনুভূতির ঊর্ধ্বে উঠে একজন মানুষের নিজেকে পুরোপুরি জানতে পারা, চিনতে পারার মাধ্যমেই মিলবে প্রকৃত সুখের সন্ধান।

বেশিরভাগ মানুষই যে ভুলটা করে তা হলো, তারা নিজের অনুভূতি, নিজের চিন্তা, পছন্দ-অপছন্দ– এসবের মধ্যে নিজের পরিচয় খোঁজে। এর ফলে সারা জীবন ধরে তারা কিছু অনুভূতির পিছু তাড়া করে, আর কিছু অনুভূতি থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। এসব অনুভূতির কারাগারে আটকে থাকা এই মানুষগুলো কখনো বুঝতেই পারে না, যে সুখ আর দুঃখ নয়, বরং এই ছুটে চলা আর পালানোর মনোবৃত্তিই তাদের কখনো মুক্তি দেয় না।

যদি তা-ই হয়, তাহলে বলা যায় যে সুখের ব্যাপারে আমরা যা যা জেনেছি তার সবই ভুল। একজন মানুষের ইচ্ছাগুলো পূরণ হচ্ছে কি না, বা সে আনন্দ পাচ্ছে কি না– হয়তো সেসবের তেমন কোনো গুরুত্বই নেই। আসল প্রশ্ন হলো মানুষ নিজের সম্পর্কে সত্যটা জানতে পারছে কি না। যদি এদিক থেকেই চিন্তা করি, তাহলে সেই আদিম শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ বা মধ্যযুগের কৃষকদের চেয়ে আমরা এই সত্যটা কতটুকু বেশি জানতে পেরেছি?

সুখের ইতিবৃত্ত নিয়ে জোরেশোরে গবেষণা শুরু হয়েছে অল্প কয়েক বছর হলো। প্রাথমিক কিছু ধারণা তৈরি হচ্ছে, গবেষণা কীভাবে হবে সেসব কর্মপদ্ধতি যাচাই করে দেখা হচ্ছে। কাজেই এখনই এ ব্যাপারে কোনো জোরালো দাবি করা যাচ্ছে না। বরং এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যতভাবে সম্ভব কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সঠিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

ইতিহাসের অধিকাংশ জুড়েই আছে বড়ো বড়ো মনীষীর আদর্শের কথা, বীর যোদ্ধাদের সাহসের কথা, ধার্মিক সন্ন্যাসীদের ত্যাগের কথা আর গুণী শিল্পীদের সৃজনশীলতার কথা। ইতিহাস থেকে জানা যায়– কীভাবে সমাজ গড়ে ওঠে, কীভাবে তা আবার ভেঙে পড়ে, কীভাবে বড়ো বড়ো রাজ্য তৈরি হয়ে আবার একদিন ধ্বংস হয়ে যায়, কীভাবে নতুন নতুন আবিষ্কার হয়, কীভাবে নতুন প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। অথচ ক্ষুদ্র ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখের কথাগুলোর সেখানে ঠাঁই হয় না। সেখানে রয়ে গেছে বিশাল এক শূন্যস্থান। সেই শূন্যস্থান পূরণ করার এখনই সময়।

অধ্যায় ২০

সেপিয়েন্সের শেষের শুরু

পদার্থবিজ্ঞান থেকে রসায়ন, তারপর জীববিজ্ঞান এবং এর উত্তরসূরি হিসেবে মানুষের ইতিহাসকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই বইটির সূচনা। আর সব জীবিত সত্তার মতো মানুষের জীবনও নিয়ন্ত্রণ করে একই প্রাকৃতিক শক্তি, রাসায়নিক বিক্রিয়া ও প্রাকৃতিক নির্বাচনপদ্ধতি। প্রাকৃতিক নির্বাচন হয়তো মানুষকে অন্য সব প্রাণীর থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছে কিন্তু সে বিচরণের সীমারেখাও কিন্তু অসীম নয়। যার কারণে, অনেক চেষ্টা এবং অসংখ্য অর্জন সত্ত্বেও মানুষ এতদিনেও তার শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

অবশ্য, আজ একবিংশ শতকের শুরুতে এসে মানুষ তার শারীরিক এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের এতদিনের নিয়ন্ত্রণহীন নকশাকে ভেঙে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে তৈরি করছে বিবর্তনের নতুন নকশা।

প্রায় ৪০০ কোটি বছর ধরে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণের বিবর্তন ঘটেছে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-এর মাধ্যমে। বুদ্ধিমান স্রষ্টার তৈরি করা কোনো নকশাই প্রাকৃতিক বিবর্তনের এই নিয়মকে সরিয়ে দিতে পারেনি। জিরাফের পূর্বপুরুষদেরকে উঁচু ডাল থেকে খাবার পেড়ে খাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হতো বলেই আজকের জিরাফের গলা এত লম্বা, কোনো বুদ্ধিমান সত্তার খামখেয়ালি নকশার কারণে নয়। জিরাফের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাদের গলা লম্বা ছিল তারা অন্যদের তুলনায় বেশি খাবার সংগ্রহ করতে পারত। ফলে, তাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান দেওয়ার সুযোগও ছিল বেশি। জিরাফ তো নয়ই, অন্য কোনো বুদ্ধিমান সত্তাও নিশ্চয়ই কখনো বলেনি, 'ইস, জিরাফের গলাটা অনেকখানি লম্বা

করে দিলে বেচারা গাছের মগডাল থেকে পাতাগুলো আরামে চিবিয়ে খেতে পারত। দিই ওর গলাটা লম্বা করে।' ডারউইনের তত্ত্বের সৌন্দর্যটা হলো, জিরাফের লম্বা গলার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য তাকে কোনো বুদ্ধিমান নকশার কথা কল্পনা করতে হয় না।

কোটি কোটি বছর ধরে, মানুষের কাছে কোনো বুদ্ধিমান নকশার অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, এমন কোনো বুদ্ধিমত্তারই সন্ধান পাওয়া যায়নি, যার পক্ষে প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর স্বরূপের নকশা তৈরি করা সম্ভব। কিছুদিন আগে পর্যন্তও পৃথিবীতে টিকে থাকা একমাত্র জীবিত বস্তু অণুজীবদের কথাই ধরা যাক। টিকে থাকার জন্য এদেরও আছে কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির শরীরে বসবাস করা একটি অণুজীব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির একটি প্রাণীর জিনগত বৈশিষ্ট্য তার কোষের ভেতর আত্মীকরণ করতে পারে এবং অর্জন করতে পারে নতুন ক্ষমতা। নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা অণুজীবের এই নতুন ধরনের ক্ষমতা তৈরির একটি উদাহরণ। কিন্তু, এত অসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যতদূর জানি, অণুজীবের কোনো নিজস্ব চিন্তা-চেতনা নেই, নেই জীবনের কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার কোনো ক্ষমতা।

একটা সময়ে এসে জিরাফ, ডলফিন, শিম্পাঞ্জি ও নিয়ান্ডার্থালের মতো প্রাণীগুলো বিবর্তনের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার ক্ষমতা অর্জন করল। কিন্তু, সেকালের একজন নিয়ান্ডার্থাল ক্ষুধা পেলে হাত বাড়িয়ে ধরা যায়– এরকম কোনো নাদুসনুদুস, ধীরগতির মুরগির কথা কল্পনা করতে পারলেও, এই কল্পনাকে বাস্তবায়ন করা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তাকে ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তিত হওয়া বন্য পাখি শিকারের ওপরই নির্ভর করতে হতো।

আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে, কৃষিবিপ্লবের সময় থেকে প্রকৃতির ওপর মানুষের এই অসহায় নির্ভরশীল অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হলো। যেসব মানুষ এতদিন নাদুসনুদুস, ধীরগতির মুরগির কথা কল্পনা করত, তারা আবিষ্কার করল যে, যদি তারা সবচেয়ে মোটাসোটা মুরগিটার সঙ্গে সবচেয়ে অলস, ধীরগতির মুরগিটির প্রজনন ঘটায়,

তাহলে তাদের উৎপাদিত সন্তানের একই সঙ্গে মোটা এবং অলস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে উৎপন্ন বাচ্চাগুলো বড়ো হওয়ার পর যদি তাদের নিজেদের মধ্যে প্রজনন ঘটানো যায়, তাহলে আরো অনেক মোটাসোটা, অলস পাখির জন্ম হওয়া সম্ভব। এইভাবে জন্ম নিল মুরগির এমন এক নতুন প্রজাতি, প্রাকৃতিক বিবর্তন যাকে তৈরি করেনি, যার জন্ম হয়েছে একটি বুদ্ধিমান প্রাণীর তৈরি করা নকশা থেকে। এই বুদ্ধিমান সত্তাটি কোনো দেবতা বা ঈশ্বর নন, এই প্রাণীটির নাম মানুষ।

কিন্তু, এত কিছু সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তুলনায় নতুন প্রজাতির জীবের নকশা তৈরিতে মানুষের এই ক্ষমতা ছিল খুবই নগণ্য। মানুষ মুরগির প্রজননকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বড়োজোর কিছু বৈশিষ্ট্যকে বাড়তে না দিয়ে এবং কিছু বৈশিষ্ট্যকে বাড়ার সুযোগ দিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারত। কিন্তু মুরগির জিনে অনুপস্থিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে মুরগির মধ্যে আনা তাদের জন্য অসম্ভব ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে জীবজগতে মানুষ ও মুরগির মধ্যের এই সম্পর্ক, জীবজগতে আগে থেকে বিদ্যমান আরো কিছু সম্পর্কের থেকে খুব বেশি আলাদা কিছু ছিল না। মৌমাছি যেমন পরাগায়নের জন্য উজ্জ্বল ও রঙিন ফুলগুলোকেই বেছে নিয়ে তাদের বংশবিস্তারে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি মানুষও মুরগির প্রজননপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে বেশি বেশি মোটাসোটা ও অলস মুরগির জন্ম নিশ্চিত করেছে।

৪০০ কোটি বছর ধরে টিকে থাকা প্রাকৃতিক বিবর্তনের আধিপত্য আজ সম্পূর্ণ নতুন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি। দুনিয়া জুড়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারেই তৈরি করছেন জীবন্ত প্রাণী। তাঁরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে, দক্ষতার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিবর্তনের এতদিনের নিয়মকানুনকে ভেঙেচুরে প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে জন্ম দিচ্ছেন সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্যের। এডুয়ার্ডো কাক (Eduardo Kac) নামের একজন জীবকৌশল শিল্পী ২০০০ সালে একটি নতুন শিল্পকর্ম তৈরির পরিকল্পনা করলেন। সেটি হলো– অন্ধকারে ফ্লোরোসেন্ট বাতির মতো করে জ্বলা একটি সবুজ জীবন্ত খরগোশ। এরপর, কাক একটি ফরাসি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং উপযুক্ত সম্মানীর বিনিময়ে তাঁর পরিকল্পনামাফিক খরগোশ তৈরির জন্য

ফরমাশ দিলেন। সেখানকার বিজ্ঞানীরা একটি সাধারণ সাদা খরগোশের ভ্রূণ নির্বাচন করলেন, তারপর তার ডিএনএতে সবুজ রঙের আলোজ্বলা জেলিফিসের জিন সংযোগ করলেন। ম্যাজিক! জনাব কাক, এই নিন আপনার কাঙ্ক্ষিত আলোজ্বলা খরগোশ! কাক খরগোশটির নাম রাখলেন 'অ্যালবা'।

প্রাকৃতিক বিবর্তনের নিয়মকানুন দিয়ে 'অ্যালবা'র মতো খরগোশের অস্তিত্ব প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব। সে মানুষের বুদ্ধিমান নকশার ফসল। একই সঙ্গে, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে বুদ্ধিমান নকশা দিয়ে তৈরি যেসব অগণিত প্রাণীর জন্ম হবে, অ্যালবা তাদেরই অগ্রদূত। যদি 'অ্যালবা'র মতো নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীর গুরুত্ব পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করা সম্ভব হয় এবং তার আগেই যদি মানবজাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিজেদেরকে নিশ্চিহ্ন করে না ফেলে, তাহলে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কেবল আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো অনেক বিস্তৃতি লাভ করবে। এটি হতে পারে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পর থেকে ঘটা সবচেয়ে বড়ো জীববৈজ্ঞানিক বিপ্লব। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ৪০০ কোটি বছর পরে, 'অ্যালবা' একটি নতুন মহাজাগতিক যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যে যুগে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে বুদ্ধিমান নকশা। যদি সত্যিই সে যুগের সূচনা হয়, তবে তার আগেকার পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসকেই মনে হতে পারে পৃথিবীতে নানা রকম জীবন ভাঙা-গড়ার একটা খেলা মাত্র। মহাজাগতিক গণ্ডিতে যেখানে এরকম একটি প্রক্রিয়া বুঝতে কোটি কোটি বছর লেগে যায়, যেখানে মানুষ মাত্র কয়েক হাজার বছরে সে রহস্যের কিনারা করে ফেলবে।

তবে এই 'বুদ্ধিমান নকশা' (Intelligent Design) তত্ত্ব পৃথিবী জুড়ে জীববিজ্ঞানীদের রোষের শিকার হচ্ছে। কারণ একদিকে এই তত্ত্ব ডারউইনের প্রচলিত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের বিরোধী, অন্যদিকে এই তত্ত্ব আসলে এটাই প্রমাণ করতে চায় যে, এই সব জটিল জৈবিক নকশা আসলে কোনো এক বুদ্ধিমান স্রষ্টার পূর্বপরিকল্পনারই ফল। হ্যাঁ, এতদিন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সেসবের ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানীদের কথাই ঠিক। কিন্তু এই বুদ্ধিমান নকশা নিয়ে

মানুষের কাজ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই নতুন তত্ত্বকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

পৃথিবী জুড়ে জীববিজ্ঞানীরা 'ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্বের বিরোধিতায় মত্ত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর জীবজগতের অন্তহীন বৈচিত্র্য এবং জটিলতা ইঙ্গিত দেয় যে, এসব সৃষ্টির পেছনে একজন মহান বুদ্ধিমান স্রষ্টার হাত আছে, তার নকশাতেই এসব তৈরি হয়েছে। এই ধারণা ডারউইনের 'প্রাকৃতিক বিবর্তন' তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। 'ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন' এর বিপরীতে বিজ্ঞানীদের এই ধারণা হয়তো এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করা জীবকুলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু হয়তো আগামীর পৃথিবীতে উদ্ভব হওয়া জীবকুলের পেছনে থাকবে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর নকশা। তখন, সে সময়ের জীবকুলের জন্য 'ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকবে না।

এখন পর্যন্ত, 'বুদ্ধিমান নকশা' তিনভাবে 'প্রাকৃতিক বিবর্তন'কে প্রতিস্থাপন করতে পারে– জীববৈজ্ঞানিক প্রকৌশলের ব্যবহারের মাধ্যমে, সাইবর্গ (সাইবর্গ হলো জৈব ও অজৈব অংশ জোড়া দিয়ে তৈরি সত্তা) তৈরির মাধ্যমে বা যান্ত্রিক জীব তৈরির মাধ্যমে।

ইঁদুর ও মানুষ

জীববৈজ্ঞানিক প্রকৌশল হলো মানুষের সচেতন তৎপরতার মাধ্যমে কোনো জীবকে কাকের শিল্পকর্মের মতো কোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ধারণা উপলব্ধি করার উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জীবটির কোনো জৈবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে (যেমন একটি নতুন জিন প্রবেশ করিয়ে) তার আকার, আকৃতি, সক্ষমতা, চাহিদা কিংবা বাসনা বদলে দেওয়ার একটি পদ্ধতি।

অবশ্য জীববৈজ্ঞানিক প্রকৌশল নতুন কোনো বিষয় নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ নিজের এবং অন্যান্য জীবকুলের পরিবর্তন সাধন করার জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। নপুংসক করে দেওয়ার ঘটনাটি এ ব্যাপারে একটি সহজ উদাহরণ হতে পারে। মানুষ প্রায় ১০ হাজার বছর ধরে এঁড়ে গোরু তৈরির জন্য ষাঁড়কে

খোজা করে আসছে। এঁড়ে গোরু ষাঁড়ের থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্থির, তাই তাকে দিয়ে মাঠের লাঙল টানানো সহজ। এমনকি উচ্চগ্রামের সুকণ্ঠী গায়ক কিংবা রাজা-বাদশাহের হারেম বা অন্তঃপুর পাহারা দেওয়ার জন্য মানুষ অনেককাল আগে থেকেই নিজ প্রজাতির তরুণ ছেলেদেরও খোজা করে আসছে।

কিন্তু, জীবের কার্যপ্রণালি সম্পর্কে অর্জিত সাম্প্রতিক জ্ঞান বর্তমানের মানুষের জন্য এমন নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে, যা আগের দিনের মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। মানুষ কাজে লাগাচ্ছে কোষীয় এমনকি নিউক্লিয়ার পর্যায়ে জীবের শারীরতত্ত্বের খুঁটিনাটি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আজকের দিনের মানুষ কেবল অন্য মানুষকে নপুংসক বানাতে পারে তা-ই নয়, বরং চাইলে তার অস্ত্রোপচার এবং হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে তার লিঙ্গগত পরিচয়ই পালটে দিতে পারে। এখানেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়। ভেবে দেখুন, ১৯৯৬ সালের টেলিভিশন ও পত্রিকায় নিচের ছবিটি প্রকাশিত হলে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সেটা কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিল।

৪৬। বিজ্ঞানীরা গোরুর তরুণাস্থির কোষ দিয়ে একটি ইঁদুরের পিঠে একটি কান তৈরি করেছেন। এটা যেন বহুকাল আগে স্ট্যাডেল গুহায় তৈরি সিংহমানবের মূর্তির বাস্তব রূপ। ৩০ হাজার বছর আগে মানুষ নানা রকম জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিশেল ঘটিয়ে নতুন জীব তৈরির কথা কেবল কল্পনাতেই ভাবতে পারত। আজ, মানুষ বাস্তব জগতেই তৈরি করতে পারে সুকুমারের হাঁসজারুকে।

এই ছবিটি কিন্তু চাঁদের মধ্যে সাঈদীর ছবির মতো করে ফটোশপে তৈরি করা হয়নি। এটা একটা পুরোপুরি অবিকৃত আসল ইঁদুরের ছবি, যার পিঠে বিজ্ঞানীরা গোরুর কার্টিলেজ কোষ স্থাপন করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা এই কোষগুলো থেকে উৎপন্ন কলার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন এবং তাকে গড়ে তুলেছেন মানুষের কানের আকারে। এই প্রক্রিয়া হয়তো শিগগিরই বিজ্ঞানীদেরকে কৃত্রিম জৈবিক কান তৈরিতে সহায়তা করবে, যা হয়তো অচিরেই স্থাপন করা হবে আমাদের শরীরে।[১]

এমনকি, জিনগত প্রকৌশলকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে এর চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্যজনক, অসংখ্য যুগান্তকারী আবিষ্কার করা সম্ভব। সে কারণেই, বিজ্ঞানের এ শাখাটি নীতিগত, রাজনৈতিক এবং আদর্শিক দিক থেকে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য প্রশ্নের। শুধু যে একেশ্বরবাদী, ধর্মপরায়ণ মানুষরাই একে 'খোদার ওপর খোদকারি' ভাবছেন এমনটা নয়। অনেক স্বীকৃত নাস্তিক ব্যক্তিরাও একে আশঙ্কার চোখে দেখছেন। এসব ব্যাপারকে তারা দেখছেন প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মের ওপর বিজ্ঞানীদের হস্তক্ষেপ হিসেবে। প্রাণী অধিকার নিয়ে সোচ্চার কর্মীরা এসব গবেষণার জন্য ব্যবহৃত প্রাণীদের ওপর চালানো কষ্টকর, অমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছেন, প্রাণীদের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে শুধু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য খামারে তাদের লালনপালনের পদ্ধতি নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা। মানবাধিকার কর্মীরা আশঙ্কা করছেন, জিনগত প্রকৌশলের উন্নতি একদিন তৈরি করবে 'সুপারম্যান', তখন বাকি মানুষদের 'দাস' হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। জেরেমিয়ানরা জৈব-একনায়কের কথা কল্পনা করছেন, যারা তৈরি করতে পারবে একই রকমের অসংখ্য ভয়হীন যোদ্ধা এবং অনুগত কর্মী। মানুষের ধ্বংস তখন অবধারিত হয়ে পড়বে। মানুষের সমষ্টিগত সাধারণ ধারণা হলো, হুট করে জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন নতুন জীব তৈরি বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা মানুষের যতটা বেড়েছে, এই ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের জ্ঞান এবং এর ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা করার ক্ষমতা মানুষের ততটা বাড়েনি।

ফলে, জিনগত প্রকৌশলের অপার সম্ভাবনার কণামাত্রই আমরা বর্তমানে ব্যবহার করতে পারছি। মূলত উদ্ভিদ, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড়ের মতো রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন জীবগুলোকেই বর্তমানে এ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের অন্ত্রে বসবাসকারী ই-কোলাই (E. coli) ব্যাকটেরিয়ার কথা কথা ধরা যাক। অতীতে ই-কোলাইয়ের সংক্রমণে অনেক নানা রকম রোগব্যাধি দেখা গেলেও বর্তমানে এর জিনগত রূপান্তরের মাধ্যমে জৈব জ্বালানি তৈরিতে একে ব্যবহার করা হচ্ছে।[২] ই-কোলাই ও ছত্রাকের কিছু জাতকে রূপান্তরের মাধ্যমে ইনসুলিন তৈরি উপযোগী করে তোলা গেছে।[৩] যার ফলে কমানো সম্ভব হয়েছে ডায়াবেটিস চিকিৎসার খরচ। মেরু অঞ্চলের মাছের একটি জিনকে আলুর জিনে সংযুক্ত করার ফলে সম্ভব হচ্ছে শীতসহিষ্ণু আলুর জাতের উদ্ভাবন।[৪]

এ ছাড়া কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীকে এই জিনগত প্রকৌশলের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিবছর ম্যাসটাইটিস (Mastitis) নামের একটি রোগের কারণে গবাদিপশু শিল্পের কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়। ম্যাসটাইটিস রোগটি দুধ প্রদানকারী গাভির ওলানের রোগ। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে রূপান্তরিত জিনের গোরুদের নিয়ে গবেষণা করছেন, যাদের দুধে থাকবে লাইসোস্ট্যাফিন (Lysostaphin), একটি জৈব রাসায়নিক যা ম্যাসটাইটিস রোগের জন্য জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করতে পারে।[৫] ইদানীং সবাই শূকরের মাংসে থাকা অস্বাস্থ্যকর চর্বির ব্যাপারে সচেতন হওয়ায় শূকরের মাংসের ব্যবসায়ীরা বিপদে আছেন। তাঁদের জন্য সুখবর হলো, বিজ্ঞানীরা বর্তমানে একটি পরজীবী পোকা থেকে নেওয়া জিন শূকরের শরীরে স্থাপন করে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। পরীক্ষা সফল হলে এই নতুন জিন শূকরের মাংসের ক্ষতিকর ওমেগা ৬ ফ্যাটি সিডকে তার উপকারী জ্ঞাতিভাই ওমেগা ৩-এ রূপান্তরিত করতে পারবে।[৬] আর মানুষের শূকরের মাংস খাওয়া নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না।

জিনগত প্রকৌশলের পরবর্তী প্রজন্মে উপকারী চর্বিসংবলিত শূকর তৈরির ব্যাপারটি ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়াবে। জিনবিজ্ঞানীরা কেবল যে পরজীবীদের গড় আয়ু ছয় গুণ বাড়িয়েছেন তা-ই নয়,

তারা চৌকস ইঁদুর তৈরিতেও সক্ষম হয়েছেন, যাদের স্মৃতিশক্তি ও শেখার ক্ষমতা সাধারণ ইঁদুরের থেকে অনেক বেশি। নেংটি ইঁদুর হলো ছোটো লেজওয়ালা, নাদুসনুদুস ইঁদুরের একটি প্রকরণ এবং এদের বেশিরভাগ প্রজাতিরই যৌনতার ক্ষেত্রে কোনো বাছবিচার নেই।[৭] কিন্তু বিজ্ঞানীরা নেংটি ইঁদুরের এমন একটি প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন, যারা বিপরীত লিঙ্গের মাত্র একজনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী এবং বিশ্বস্ত যৌন সম্পর্ক বজায় রাখে। বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, তাঁরা ইঁদুরের এই একজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য দায়ী জিনকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি স্বেচ্ছাচারী, বহুগামী নেংটি ইঁদুরের শরীরে এই জিনটি সংযুক্ত করা হলে সে যদি একটি একগামী, স্ত্রী অনুরক্ত নেংটি ইঁদুরে পরিণত হয়, তখন 'জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে কেবল ইঁদুর ও মানুষ নতুন শারীরিক বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে না বরং এর মাধ্যমে তাদের সামাজিক কাঠামোও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব'– এমনটা দাবি করাটা কি খুব বেশি অসংগত হবে?[৮]

ফিরে আসবে নিয়াভার্থাল

কিন্তু জিনবিজ্ঞানীরা কেবল জীবিত প্রাণিকুলের পরিবর্তন সাধন করতে চান, এমনটা নয়। তারা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীদেরও উদ্ধারের চেষ্টা করেন। জুরাসিক পার্ক সিনেমার ডাইনোসরই যে উদ্ধার তালিকার একমাত্র সদস্য, এমনটা নয়। রাশিয়া, জাপান ও কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি সাইবেরিয়ার বরফে জমে থাকা একটি প্রাচীন ম্যামথের জিনের সম্পূর্ণ গঠন জানতে পেরেছেন। বর্তমানে তারা আজকের দিনের একটি হাতির নিষিক্ত ডিম্বাণু নিয়ে, তার মধ্যে হাতির ডিএনএকে নতুন তৈরি ম্যামথের ডিএনএ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চাইছেন। এরপর এই প্রতিস্থাপিত ডিএনএর ডিম্বাণুকে তাঁরা হাতির গর্ভে স্থাপন করবেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২২ মাস পর গত ৫ হাজার বছরের মধ্যে প্রথম ম্যামথের জন্ম হবে পৃথিবীতে।[৯]

কিন্তু, মানুষ কেবল ম্যামথেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ চার্চ সম্প্রতি প্রস্তাব করেছেন, নিয়াভার্থাল জিনোম প্রজেক্ট যেহেতু সম্পন্ন হয়েছে, আমরা এখন

চাইলেই ম্যামথের মতো একটি নবগঠিত নিয়ান্ডার্থাল ডিএনএ সংযুক্ত একটি ডিম্বাণু মানুষের গর্ভাশয়ে স্থাপন করতে পারি। আর এটা করতে পারলে গত ৩০ হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবী প্রথমবারের মতো একটি নিয়ান্ডার্থাল শিশুর মুখ দেখবে। চার্চ দাবি করেছেন, মাত্র ৩০ মিলিয়ন ডলার পেলেই তিনি এই কাজের দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন। কয়েকজন নারীও এই কাজের জন্য স্বেচ্ছায়, বিনা পারিশ্রমিকে তাদের গর্ভাশয় ব্যবহারের সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।[১০]

কিন্তু এতদিন পর নিয়ান্ডার্থাল দিয়ে আমরা কী করব? অনেকে দাবি করেন, আমরা যদি সত্যিকারের, জীবিত নিয়ান্ডার্থাল নিয়ে গবেষণা করতে পারি, তবে হোমো সেপিয়েন্সের স্বাতন্ত্র্য বা অসাধারণত্ব নিয়ে বহু বছর ধরে চলে আসা অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারব। একটি নিয়ান্ডার্থালের সঙ্গে একটি হোমো সেপিয়েন্সের মস্তিষ্কের তুলনা করে আমরা হয়তো বুঝতে পারব, কোন জৈবিক প্রক্রিয়া আমাদের অনুভূতি, চেতনা এসবের জন্য দায়ী। এবং এখানে একটি নৈতিক দায়বদ্ধতারও ব্যাপার আছে। অনেকেই দাবি করেন, হোমো সেপিয়েন্স তথা আমরাই নিয়ান্ডার্থালদের বিলুপ্তির জন্য দায়ী। সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তাদের নতুন করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও আমাদের ওপরই বর্তায়। আজকের মানুষের সমাজে নিয়ান্ডার্থাল অন্যভাবেও সহায়ক হতে পারে। অনেক শিল্পপতিই তাদের কারখানায় নিয়ান্ডার্থালদের নিতে চাইবেন। কারণ, তারা হয়তো একজন নিয়ান্ডার্থালকে বেতন দেওয়ার মাধ্যমে তাকে দিয়ে দুজন সেপিয়েন্সের সমান কাজ করিয়ে নিতে পারবেন।

কিন্তু শুধু নিয়ান্ডার্থালেই থেমে থাকলে চলবে কেন? এরপর কি আমরা চাইব না ঈশ্বরের বানানো মানুষের নকশা তৈরির খেরোখাতায় হাত রাখতে আর সেই নকশার উন্নতি ঘটিয়ে উন্নততর সেপিয়েন্স তৈরি করতে? মানুষের সব রকম সামর্থ্য, চাহিদা ও কামনার একটি জিনগত ভিত্তি বিদ্যমান এবং মানুষের জিনগত পরিচয় নেংটি ইঁদুরের থেকে খুব বেশি জটিল নয়। ইঁদুরের জিনোমে ২৫০ কোটি নিউক্লিওবেস থাকে, যেখানে মানুষের জিনোমে থাকে ২৯০ কোটি বেস, তার মানে মানুষের জিনভিত্তিক পরিচিতির তালিকা

ইঁদুরের জিনভিত্তিক পরিচয়ের থেকে মাত্র ১৪ শতাংশ বড়ো। ১১ বর্তমান শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে অর্থাৎ আর মাত্র কয়েক দশক পরে জিনগত প্রকৌশল ও জৈব প্রকৌশলের অন্যান্য শাখাগুলো কেবল যে আমাদের মনস্তত্ত্ব, রোগপ্রতিরোধক্ষমতা ও প্রত্যাশিত আয়ু বাড়ানোর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে তা-ই নয়, মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক এবং আবেগিক দক্ষতার পরিবর্তনেও এদের থাকবে উল্লেখযোগ্য অবদান। জিনগত প্রকৌশল যদি চৌকস ইঁদুর তৈরি করতে পাও, তাহলে চৌকস মানুষ তৈরিতে বাধা কোথায়? আমরা যদি একজন সংগীতে সন্তুষ্ট নেংটি ইঁদুর তৈরি করতে পারি, তবে একজন মানুষও তার একগামিতা নিশ্চিত করতে জিনগত পরিবর্তনের এই সুযোগ নেবে না কেন?

বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব হোমো সেপিয়েন্সের মনস্তত্ত্ব কিংবা মস্তিষ্কের বাহ্যিক আকার আকৃতির কোনো রকম দৃশ্যমান পরিবর্তন ছাড়াই সেপিয়েন্সের মতো একটি গুরুত্বহীন নরবানর প্রজাতিকে পৃথিবীর প্রভুতে পরিণত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিশাল পট পরিবর্তনের জন্য মস্তিষ্কের কাঠামোর কিছু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই যথেষ্ট ছিল। এরকম আরেকটি ছোটোখাটো পরিবর্তনই হয়তো একটি নতুন বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের সূচনা করবে, তৈরি করবে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বুদ্ধিমত্তা বা চেতনা, আর হোমো সেপিয়েন্স নামক প্রজাতিটির খোলনলচে পুরোপুরি পালটে দিয়ে তৈরি করবে ভিন্ন ধরনের কোনো প্রজাতি।

এ কথা সত্য, এইসব পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিভিত্তিক উৎকর্ষ আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি, কিন্তু ভবিষ্যতের 'অতিমানব' তৈরির পথে আমাদের সামনে দুর্লঙ্ঘ্য কোনো প্রযুক্তিগত বাধাও দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। মূলত দার্শনিক ও রাজনৈতিক যুক্তিতর্ক ও বাধাগুলোই মানুষকে নিয়ে গবেষণার গতিকে খানিকটা মন্থর করেছে। এ সংক্রান্ত দার্শনিক দাবিগুলো যতই যুক্তিসংগত হোক, মানুষের সামনে যদি দীর্ঘতর জীবন, জীবনঘাতী রোগের চিকিৎসা এবং তার বুদ্ধিভিত্তিক এবং আবেগিক দক্ষতা বৃদ্ধির মুলা ঝোলানো থাকে, তাহলে এসব দার্শনিক বাধা মানুষ নিয়ে গবেষণাকে খুব বেশি বিলম্বিত করতে পারবে বলে মনে হয় না।

কী ঘটবে যদি আমরা যদি স্মৃতিভ্রষ্টতাজনিত অসুখ আলঝেইমারের চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এমন কিছু আবিষ্কার করে ফেলি, যা সুস্থ মানুষকে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দিতে পারে? মানুষের পক্ষে কি তখন এই সংক্রান্ত গবেষণা স্থগিত রাখা সম্ভব হবে? একবার যদি এই চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েই যায়, তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কি পারবে সুস্থ একজন মানুষকে এই চিকিৎসা নিয়ে অতিমানবীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া থেকে বিরত রেখে কেবল আলঝেইমার রোগীদের মধ্যেই তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখতে?

জৈবপ্রকৌশল সত্যিই পৃথিবীর বুকে আবার নিয়াভার্থালদের ফিরিয়ে আনতে পারবে কি না, সে ব্যাপারটি এখনো অনেকটাই অস্পষ্ট, তবে এটি খুব সম্ভবত পৃথিবীতে হোমো সেপিয়েন্সের নাট্যমঞ্চের যবনিকা টেনে দেবে। না, হোমো সেপিয়েন্সের জিনগত পরিবর্তন যে তার দৈহিক মৃত্যু ঘটাবে, এমনটা নয়। কিন্তু, জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা হয়তো হোমো সেপিয়েন্সকে এতটাই পালটে ফেলব যে তখন আমাদেরকে হোমো সেপিয়েন্স বলে ডাকাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

যান্ত্রিক জীবন

আরেকটি নতুন প্রযুক্তি জীবনের প্রচলিত নিয়মকানুনকে পালটে দিতে পারে, সেটা হলো– সাইবর্গ প্রকৌশল (Cyborg Engineering)। সাইবর্গ হলো মানুষ ও যন্ত্রের মিশেলে গড়া একধরনের প্রাণী, যেমন ধরুন কৃত্রিম হাতওয়ালা মানুষ। আজকের দিনে আমরা সকলেই কমবেশি চশমা, কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র, পা সোজা রাখার যন্ত্র এমনকি কম্পিউটার আর মোবাইলের সাহায্যে (শেষের দুটি আমাদের মস্তিষ্কের ওপর থেকে বাড়তি কাজের বোঝা কমায়) আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাজের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছি বা ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর চাপ কমিয়েছি। সে অর্থে আমরাও কমবেশি বায়োনিক (Bionic) মানুষ। আমরা এখন সাইবর্গে পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি, যখন অজৈব অংশগুলো আমাদের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত

হবে এবং বদলে দেবে আমাদের কর্মক্ষমতা, ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব এবং স্বকীয় পরিচয়।

'ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি (DARPA)' নামে একটি আমেরিকান গবেষণা সংস্থা কীটপতঙ্গকে সাইবর্গ বানানোর চেষ্টা করছে। তাদের লক্ষ্য হলো মাছি বা তেলাপোকার শরীরে ইলেকট্রনিক চিপ, শনাক্তকারী যন্ত্র এবং প্রসেসর বসানো– যার মাধ্যমে মানুষ বা কোনো যন্ত্রচালিত অপারেটরের পক্ষে দূর থেকে এসব কীটপতঙ্গের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং পতঙ্গগুলোকে তথ্য সংগ্রহ এবং সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা যাবে। এরকম একটি মাছি সহজেই শত্রুঘাঁটির হেডকোয়ার্টার্সের দেওয়ালে বসে শত্রুদের গোপন পরিকল্পনার কথা শুনে ফেলতে পারবে এবং মাকড়সা বা অন্য কোনো পতঙ্গ মাছিটিকে খেয়ে না ফেললে সেসব তথ্য সহজেই প্রতিপক্ষের শিবিরে সরবরাহ করতে পারবে।[১২] ২০০৬ সালে আমেরিকার 'নেভাল আন্ডার সি ওয়ারফেয়ার সেন্টার (NUWC)' সাইবর্গ হাঙর তৈরির ঘোষণায় জানায়– 'NUWC মাছের মাথায় প্রতিস্থাপনের জন্য একটি ট্যাগ বা যন্ত্র বানাচ্ছে, যার কাজ হবে মাছের মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা।' এ প্রকল্পের উদ্যোক্তারা মনে করেন, এর মাধ্যমে তারা হাঙরের প্রাকৃতিকভাবে অর্জিত চৌম্বকক্ষেত্র শনাক্ত করার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সাগরের তলদেশে সাবমেরিন ও চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বোমা শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন। হাঙরের এই শনাক্তকরণক্ষমতা কাজে লাগাতে পারলে সেটা মানুষনির্মিত যে-কোনো শনাক্তকারী যন্ত্রের থেকে অনেক ভালো ফলাফল দেবে।[১৩]

সেপিয়েন্স নিজেও ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে সাইবর্গে। কানে শোনার সহায়ক যন্ত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আধুনিকগুলোকে অনেক সময় 'বায়োনিক কান' নামে অভিহিত করা হয়। এই যন্ত্রগুলো কানের সঙ্গে যুক্ত করা হলে তারা কানের বহির্ভাগ থেকে একটি মাইক্রোফোনের সাহায্যে শব্দ শোনে। তারপর যন্ত্রটি শব্দকে ছেঁকে এর থেকে মানুষের শব্দকে শনাক্ত করে এবং সেই শব্দকে তড়িৎ-সংকেতে রূপান্তরিত করে সরাসরি মানুষের কেন্দ্রীয় শব্দবাহী স্নায়ুতে

পাঠিয়ে দেয়, সেখান থেকে এই সংকেত সরাসরি পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে।[১৪]

'রেটিনা ইমপ্ল্যান্ট' নামে সরকারি অনুদানে চলা একটি জার্মান প্রতিষ্ঠান চোখে বসানোর জন্য একটি কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি করছে যেটি অন্ধ মানুষকে আংশিক দৃষ্টি দিতে সহায়তা করবে। দৃষ্টিহীন মানুষের চোখের ভেতরে বসানো হবে একটি ছোটো মাইক্রোচিপ। এই মাইক্রোচিপে বসানো আলোক সংবেদী কোষ চোখের ওপর পড়া আলোকে পরিণত করবে বৈদ্যুতিক সংকেতে, যেটি উদ্দীপিত করবে চোখের রেটিনার সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুকোষগুলোকে। এসব কোষে তৈরি হওয়া উদ্দীপনা উদ্দীপিত করবে মস্তিষ্ককে এবং সেখানে এই সংকেতগুলো দৃশ্যানুভূতিতে পরিণত হবে। বর্তমানে এই প্রযুক্তি একজন অন্ধ ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তার নিজের অবস্থান শনাক্ত করতে, অক্ষর চিনতে এমনকি মানুষের মুখ শনাক্ত করতেও সাহায্য করে।[১৫]

২০০১ সালে জেস সুলিভান নামের একজন আমেরিকান বিদ্যুৎকর্মী এক দুর্ঘটনায় তার দুটি হাতই হারান। বর্তমানে তিনি শিকাগোর পুনর্বাসন কেন্দ্রের সুবাদে দুটি কৃত্রিম হাত ব্যবহার করেন। জেসের ব্যবহার করা কৃত্রিম হাত দুটোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো কেবল মস্তিষ্কের চিন্তা দিয়েই সেগুলোকে ব্যবহার করা যায়। জেসের মস্তিষ্ক থেকে আসা স্নায়বিক সংকেতগুলো মাইক্রো-কম্পিউটারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত হয় এবং সে সংকেতের ওপর নির্ভর করেই কৃত্রিম হাত দুটো নড়াচড়া করে। একজন সাধারণ মানুষ একটি হাত ওঠানোর সময় অবচেতন মনে যেরকম ভাবেন, জেসও একই রকম চিন্তা করেন এবং তার হাতটি ওপরে উঠে যায়। এই কৃত্রিম হাত দুটির কাজের ক্ষমতা জৈবিক হাতের তুলনায় অনেক কম, কিন্তু তা দিয়েই জেসের দৈনন্দিন জীবনের কাজ চলে যায়। এরকমই একটি বায়োনিক হাত সম্প্রতি ক্লডিয়া মিশেল নামক একজন আমেরিকান সৈনিকের শরীরে সংযুক্ত করা হয়েছে, যিনি একটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তার হাত হারিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, খুব শীঘ্রই কৃত্রিম হাত শুধু মানুষের ইচ্ছামতো নড়াচড়া করতে পারবে তা-ই নয়, কৃত্রিম হাত মস্তিষ্কেও সংকেত

পৌঁছে দিতে পারবে। তার অর্থ হলো, এটি হাত-পা হারানো একটি মানুষকে কেবল চলতেই সাহায্য করবে না, তাকে ফিরিয়ে দেবে স্পর্শের স্বাদ![১৬]

৪৭। জেস সালিভান ও ক্লডিয়া মিশেল পরস্পরের হাত ধরে আছে। তাদের এই যান্ত্রিক হাতের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হলো, এটা পরিচালিত হয় শুধু চিন্তা দিয়ে

বর্তমানে এসব বায়োনিক হাত-পায়ের ক্ষমতা আমাদের স্বাভাবিক জৈবিক হাত-পায়ের তুলনায় নগণ্য, কিন্তু এই ক্ষমতার উন্নতির সম্ভাবনা অসীম। উদাহরণস্বরূপ, একটি বায়োনিক হাতকে এত বেশি শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব যে একজন নামজাদা কুস্তিগিরের হাতের শক্তিও তার কাছে অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে হবে। এ ছাড়াও বায়োনিক হাতের সুবিধা হলো, কয়েক বছর পরপরই এগুলো পালটানো যায়, শরীর থেকে খুলে রেখে দূর থেকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সাম্প্রতিক কালে নর্থ ক্যারোলাইনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটিকে একটি বানরের মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড বসিয়ে হাতে-কলমে দেখিয়েছেন। ইলেকট্রোডগুলো বানরের মস্তিষ্ক থেকে সংকেত সংগ্রহ করে অন্য যন্ত্রে পাঠিয়ে দেয়। বানরগুলোকে চিন্তার মাধ্যমে শরীর থেকে

বিচ্ছিন্ন, বায়োনিক হাত ও পা নাড়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অরোরা নামে এরকম একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বানর একই সময়ে তার দুটি জৈবিক হাত নড়ানোর পাশাপাশি চিন্তা দিয়ে দূরে রাখা আরেকটি বায়োনিক হাত নাড়া শিখে ফেলে। অনেকটা হিন্দু দেবদেবীর মতোই অরোরার এখন দুটো নয়, তিনটি হাত এবং তৃতীয় হাতটি থাকতে পারে অন্য কোনো ঘরে, এমনকি অন্য কোনো শহরেও। সে নর্থ ক্যারোলাইনার গবেষণাগারে বসে একহাতে পিঠ এবং অন্য হাতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে একই সময়ে তৃতীয় হাত দিয়ে নিউ ইয়র্কে কলা চুরি করতে পারে (যদিও দূরের হাতের এই চুরি করা কলা দূর থেকেই খাবার প্রক্রিয়াটি এখনো মানুষের স্বপ্নই রয়ে গেছে)। ২০০৮ সালে ইডোয়া নামের এরকম আরেকটি বানর নর্থ ক্যারোলাইনার চেয়ার বসে জাপানের, কিয়োটেতে রাখা বায়োনিক পা নাড়ানোর মাধ্যমে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। এই বায়োনিক পাগুলোর ওজন ছিল ইডোয়ার শরীরের ওজনের প্রায় ২০ গুণ।[১৭]

"লকড-ইন সিনড্রোম" (Locked-in Syndrome) হলো এমন একটি অবস্থা যখন মানুষের মস্তিষ্ক কর্মক্ষম থাকলেও মানুষ তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ানোর সব রকম বা প্রায় সব ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে। এখন পর্যন্ত এই সিনড্রোমে ভোগা রোগীরা কেবল চোখের মণির সামান্য নড়াচড়ার মাধ্যমেই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। এরকম কিছু রোগীর মস্তিষ্কে সংকেত সংগ্রাহক ইলেকট্রোড বসিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে মস্তিষ্কের সংকেতকে কেবল যান্ত্রিক হাতের মতো বাহ্যিক বস্তুর নড়াচড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে শব্দেও রূপ দেওয়ার। এরকম প্রচেষ্টা সফল হলে, লকড-ইন সিনড্রোমের রোগীরা সরাসরি বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন এবং তখন আমরা মানুষের মনের কথা পড়ে ফেলার ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারব।[১৮]

এই ধরনের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক হলো মস্তিষ্ক আর কম্পিউটারের মধ্যে সরাসরি তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা। এই পদ্ধতির ফলে কম্পিউটার সরাসরি মানুষের মস্তিষ্কের সংকেত বুঝতে সক্ষম হবে এবং কম্পিউটার নিজে

মানুষের মস্তিষ্কে বোধগম্য সংকেত পাঠাতে পারবে। এরকম একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি সরাসরি একটি মস্তিষ্ককে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? এ সংযোগ পদ্ধতি দিয়ে যদি একাধিক মস্তিষ্ককে সরাসরি যুক্ত করে একটি মস্তিষ্কের নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়, কেমন হবে সেটা? যদি একটি মস্তিষ্ক একাধিক মস্তিষ্কের স্মৃতিভান্ডারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে তখন একক মানুষের স্মৃতি, তার চেতনা আর অস্তিত্বকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? এরকম একটি পরিস্থিতিতে একজন সাইবর্গ কোনো দিনও না শুনে, না পড়ে, কল্পনা না করে অন্যের মস্তিষ্কে জমা রাখা একটি ঘটনাকে মনে করতে পারবেন এবং সেই ঘটনাকে নিশ্চিতভাবে তার নিজের স্মৃতি বলেই মনে হবে। মস্তিস্কগুলো একসঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকলে মানুষের লিঙ্গগত পরিচয়ের রূপটাই-বা কেমন দাঁড়াবে? 'আমি' বলতে তখন কী বোঝাবে? একজন মানুষের একান্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কি থাকবে? মানুষ কী করে তার স্বপ্নের পেছনে দৌড়াবে, যদি সেই স্বপ্ন তার মস্তিষ্কের অংশ না হয়ে সমষ্টিগত মস্তিষ্কের স্মৃতিতে জমা স্বপ্নভাণ্ডারের অংশ হয়?

এরকম একটি সাইবর্গ আর মানুষ থাকবে না, সম্ভবত সেটা জৈবিক উপাদানে গড়াও হবে না। এটা হবে সম্পূর্ণ নতুন কিছু। এটা মূলগতভাবেই সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সত্তা হবে, যার দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আমাদের কোনো রকম ধারণা নেই।

অন্য জীবন

জীবনের নিয়মগুলোকে পালটানোর তৃতীয় উপায় হতে পারে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক সত্তা তৈরি করা। সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হতে পারে নিজেরাই স্বাধীনভাবে বিবর্তিত হতে পারে, এমন কিছু কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও ভাইরাস।

বর্তমানে কম্পিউটার বিজ্ঞানের জগতের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হলো জেনেটিক প্রোগ্রামিং (Genetic Programming)। এই শাখাটি জীবের জীনগত বিবর্তনের নিয়মগুলিকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। অনেক

প্রোগ্রামারই এমন একটি প্রোগ্রাম তৈরির স্বপ্ন দেখেন যেটি তার স্রষ্টার সাহায্য ছাড়াই নতুন নতুন জিনিস নিজে থেকে শিখতে পারবে এবং নিজে বিবর্তিত হতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রোগ্রামার কেবল প্রোগ্রামটিকে প্রাথমিকভাবে চলার মতো দিকনির্দেশনা দেবেন, কিন্তু এরপর প্রোগ্রামটি নিজেকে কোন উপায়ে বিবর্তিত করবে সে সম্পর্কে তার স্রষ্টার বা অন্য কোনো মানুষের কোনো ধারণা থাকবে না।

এরকম একধরনের প্রোগ্রামের নমুনার সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই কমবেশি পরিচিত– এদের নাম কম্পিউটার ভাইরাস। এরকম নামকরণের কারণ হলো, উৎপত্তির পর এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, নিজের কোটি কোটি অনুলিপি তৈরি করে, তাকে ধরার জন্য ধেয়ে আসা অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামগুলোর সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার চেষ্টা করে এবং অন্যান্য ভাইরাসগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সাইবার জগতে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। একদিন এই ভাইরাস প্রোগ্রামটি নিজের অনুলিপি তৈরির সময় একটু গরমিল করে ফেলে– অনেকটা জৈব মিউটেশনের মতো। এই মিউটেশন সম্ভবত এই কারণে হয় যে প্রোগ্রামার এটিকে এমনভাবে তৈরি করেছেন, যাতে একটি মাঝে মাঝে দৈবচয়নে অনুলিপি তৈরির সময় কিছু ভুলচুক করে ফেলে। সম্ভবত এই মিউটেশন কোনো অনিয়মিত, দৈবভাবে ঘটা কোনো ভুলের ফসল। যদি এই বিবর্তিত ভাইরাসটি তার কম্পিউটারকে দখল করার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে আক্রমণকারী অ্যান্টিভাইরাসকে প্রতিহত করতে অধিকতর সক্ষম হয়, তাহলে সেই বিবর্তিত ভাইরাসটি সমস্ত সাইবার জগতে ছড়িয়ে পড়ে। বিবর্তিত ভাইরাসটি টিকে যায় এবং নতুন নতুন অনুলিপি তৈরি করতে থাকে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাসের বিবর্তন প্রক্রিয়াটিও চলতে থাকে এবং একসময় সাইবার জগৎ এমন চরিত্রের ভাইরাসে ভরে যায়, যাকে কোনো প্রোগ্রামার বানায়নি, যার জন্ম সম্ভব হয়েছে ভাইরাসের অজৈব বিবর্তনের ফলে।

এগুলোকে কি জীবন্ত সত্তা বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে কাকে আমরা 'জীবন্ত সত্তা' বলে সংজ্ঞায়িত করতে পারি তার ওপর। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তারা একটি নতুন

বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল, যে বিবর্তনপ্রক্রিয়া জৈব বিবর্তনের নিয়মকানুন ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত।

আরেকটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যাক। ধরুন, আপনি আপনার মস্তিষ্কের যাবতীয় তথ্য ও স্মৃতি একটি বহনযোগ্য হার্ড ডিস্কে জমা করতে পারেন এবং আপনার ল্যাপটপে সেই চিন্তা ও তথ্যগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আপনার ল্যাপটপটি কী তখন একটি সেপিয়েন্সের মতোই ভাবতে ও অনুভব করতে পারবে? যদি পারে, সেটি কি আপনি হবেন, না অন্য কেউ? কেমন হবে যদি কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে আত্মপরিচয়, চেতনা ও স্মৃতি সংবলিত একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল মন বানিয়ে ফেলে? আপনি যখন এই প্রোগ্রামটি আপনার কম্পিউটারে চালাবেন, তখন সেটি কি একটি নতুন মানুষ? আপনি যদি প্রোগ্রামটিকে কম্পিউটার থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলেন, আপনাকে কি মানবহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হবে?

হয়তো আমরা খুব শিগগিরই এসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব। ২০০৫ সালে 'হিউম্যান ব্রেইন প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্পের সূচনা হয়। এই প্রকল্প কম্পিউটারের ভেতর একটি পূর্ণাঙ্গ মানবমস্তিষ্ক তৈরি করার আশাবাদ নিয়ে শুরু হয়েছে। যেখানে কম্পিউটারের ভেতরকার ইলেকট্রিক সার্কিটগুলো মানবমস্তিষ্কের নিউরনের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পের পরিচালক দাবি করেছেন, যদি যথাযথ অর্থায়ন পাওয়া যায়, তাহলে এক থেকে দুই দশকের মধ্যে কম্পিউটারের ভেতরে মানবমস্তিষ্কের সমকক্ষ একটি মস্তিষ্ক তৈরি করা সম্ভব, যেটি একটি মানুষের মতোই কথা বলতে এবং আচরণ করতে পারবে। এই প্রকল্প সফল হলে, ৪০০ কোটি বছর পর জীবন জৈব যৌগসমূহের সীমাবদ্ধ জগৎ ছাড়িয়ে অজৈব যৌগের অসীম জগতে প্রবেশ করবে। জীবন এমন সব আকার ও আকৃতিতে আবির্ভূত হবে, যার কল্পনা করাও বর্তমানের মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যদিও অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, বর্তমানের ডিজিটাল কম্পিউটার এবং মানুষের মস্তিষ্ক ও চিন্তা ভিন্নরকমভাবে কাজ করে। সেটা সত্যি হলে বর্তমান প্রযুক্তির কম্পিউটার দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবমস্তিষ্ক গড়ে তোলা

হয়তো সম্ভব হবে না। তবে সে চেষ্টা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত এ-সংক্রান্ত ঢালাও মন্তব্য করাটা বোকামির শামিল হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, ২০১৩ সালে এই প্রকল্পটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছ থেকে ১০০ কোটি ইউরো অনুদান লাভ করেছে।[১৯]

সিংগুলারিটি

বর্তমানে, ভবিষ্যতের অসংখ্য সম্ভাবনার একটি ক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কেই কেবল আমরা ধারণা করতে পারছি। কিন্তু তাতেই, এই ২০১৪ সালে এসে, মানুষের সংস্কৃতিকে জীববিজ্ঞানের গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন পথের সন্ধান করতে হচ্ছে। মানুষ কেবল চারপাশের পৃথিবী নয়, বাইরের পৃথিবী ছাড়িয়ে নিজেদের শরীর এবং মনের ভেতর ও বাহির পালটে দেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ফলে জ্ঞানের অনেক শাখা আর প্রচলিত নিয়মকানুনই এখন নতুন নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। আইনজীবীদের নতুন করে পরিচয় ও গোপনীয়তা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে; সরকারকে গোড়া থেকে ভাবতে হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা আর সমঅধিকার নিয়ে; খেলার নিরপেক্ষতা ও অর্জনকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে হচ্ছে ক্রীড়াসংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে; অবসরভাতা ও শ্রমবাজারের আগে যে বয়স ছিল ৬০, এখন তাকে ৩০-এর সমান হিসেবে ভাবতে হচ্ছে। তাদের সবাইকে নীতিনির্ধারণের সময় জৈবপ্রকৌশল, সাইবর্গ ও অজৈব জীবনের মতো ব্যাপারগুলোকে মাথায় রাখতে হচ্ছে।

মানুষের প্রথম জিনোম নকশা তৈরি করতে সময় লেগেছিল ১৫ বছর, আর খরচ হয়েছিল ৩০০ কোটি ডলার। আজকে মাত্র কয়েক শ ডলার খরচ করে মাত্র কয়েক সপ্তাহে আপনি আপনার জিনের নকশা জেনে নিতে পারেন। শুরু হয়েছে ব্যক্তিগত ওষুধপত্রের যুগ–এমন ওষুধ যা কেবল আপনার ডিএনএর সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অচিরেই আপনার পারিবারিক চিকিৎসক অনেকটা নিশ্চয়তার সঙ্গেই আপনাকে জানিয়ে দিতে পারবেন ভবিষ্যতে আপনার যকৃৎ ক্যানসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, হৃদ্‌রোগ নিয়ে আপনার তেমন না ভাবলেও চলবে, সেটার সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি নির্ণয় করতে

পারবেন যে ওষুধটি শতকরা ৯২ জনের জন্য কাজ করে, সেটি আপনার জন্য কার্যকর হবে না। অন্যদিকে, যে ওষুধটি অন্যদের জন্য বিষতুল্য, সেটাও আপনার জন্য যর্থার্থরূপে কাজ করবে। নিখুঁত ওষুধপত্রের দিন আমাদের সামনেই কড়া নাড়ছে।

কিন্তু, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের এতসব উন্নতি অনেক নৈতিক প্রশ্নেরও জন্ম দিচ্ছে। ন্যায়শাস্ত্রবিদ এবং আইনবিদদের গলদঘর্ম হতে হচ্ছে ডিএনএর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি নিয়ে। মানুষের ডিএনএ নকশা জানা সহজলভ্য হওয়ায় জীবনবিমা কোম্পানিগুলো কি সবার কাছে থেকে তাদের ডিএনএর নকশা দাবি করবে? যার জিনে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের সম্ভাবনা বেশি পাওয়া যাবে তার থেকে বেশি পরিমাণ বিমার অর্থ দাবি করবে? চাকরিপ্রার্থীদের কি চাকরির আবেদনপত্রের বদলে ডিএনএর নকশা ফ্যাক্স করে পাঠাতে হবে? একজন চাকরিদাতা কি জিনের নকশা দেখে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করবেন? কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগের ক্ষেত্রে জিনগত বৈষম্যের জন্য কি অভিযুক্ত করা যাবে? যে প্রতিষ্ঠানটি নতুন জীব বা নতুন কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবিষ্কার করবে, সে কি তার ডিএনএ নকশার পেটেন্ট করতে পারবে? এটা স্পষ্ট যে, একজন মানুষ একটি মুরগির মালিক হতেই পারে, কিন্তু একজন মানুষের হাতে একটি পুরো প্রজাতির মালিকানা তুলে দেওয়া উচিত হবে কি?

এই ধরনের অনিশ্চয়তাগুলো গিলগামেশ প্রকল্পের (Gilgamesh Project) নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব এবং আমাদের অতিমানব তৈরি করার নতুন সক্ষমতার সম্ভাবনার কাছে স্তিমিত হয়ে আছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা, বিশ্ব জুড়ে বিদ্যমান সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প, জাতীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প এবং বিশ্বব্যাপী জাতিগুলোর সংবিধান স্বীকার করে নেয় যে, যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া এবং জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা একটি মানবীয় সমাজের আবশ্যক বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত ওষুধগুলো কেবল রোগপ্রতিরোধ এবং অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার কাজে ব্যবহৃত হতো, ততদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা নিয়ে কারো মনে কোনো সংশয় ছিল না। যখন ওষুধগুলো মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে তখন কেমন হবে একটি

দেশের স্বাস্থ্য প্রকল্প? সব মানুষকে কি সমান সুবিধা নিয়ে সমানভাবে তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা হবে, নাকি কেবল ক্ষমতাবানরা এসবের সুবিধা একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করে একেকজন অতিমানব হয়ে উঠবে?

আধুনিক যুগের শেষভাগে এসে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা সব মানুষের জন্য কিছুটা হলেও সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারার জন্য গর্ববোধ করতে শুরু করেছি। যদিও এই সময়েই তৈরি হয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো অসমতা তৈরির সুযোগ। ইতিহাসের পুরোটা সময় জুড়ে অভিজাত শ্রেণির লোকজন নিজেদেরকে সমাজের নিচু স্তরে বসবাসকারী মানুষদের থেকে শক্তিশালী, চতুর ও উৎকৃষ্ট বলে দাবি করে এসেছে। তাদের এই দাবি নিছক তাদের ক্ষমতার দম্ভ ছিল, তার কোনো জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। কৃষকের ঘরে জন্মানো একজন শিশু এবং রাজপ্রাসাদে জন্ম নেওয়া একজন শিশুর সমান বুদ্ধিমান হয়ে জন্ম নেওয়ার সুযোগ ছিল। স্বাস্থ্যসেবার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ফলে ধনিক শ্রেণির এতদিনের এই মিথ্যে অহংকার বস্তুগত সত্যে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এটা কোনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি নয়। অনেক কল্পবিজ্ঞানের গল্পেই আমরা দেখতে পাই এমন একটি বিশ্বকে, যেখানে হুবহু আমাদের মতো দেখতে মানুষ থাকে, কিন্তু তাদের থাকে উন্নততর প্রযুক্তি, আলোর বেগে চলা মহাকাশযান আর লেজার বন্দুক। এসব গল্পের মূল নীতিগত এবং রাজনৈতিক সংকটের দিকগুলো কিন্তু আমাদের বর্তমান পৃথিবী থেকেই নেওয়া, লেখক কেবল ভবিষ্যতের কল্পিত পটভূমিতে আবেগ এবং সামাজিক উত্তেজনার মাধ্যমে সেটাকে উপস্থাপন করেন। যদিও ভবিষ্যতের প্রযুক্তির প্রধান উৎকর্ষ কেবল গাড়ি, মহাকাশযান বা যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে নয়, বরং তার আসল উৎকর্ষ খোদ মানব-প্রজাতিকে, তাদের আবেগ এবং ইচ্ছার প্রকৃতিকেই পালটে দেওয়ার মধ্যে নিহিত। একটা চিরতরুণ সাইবর্গ, যাকে সন্তান উৎপাদন করতে হয় না এবং যাদের পৃথক পৃথক যৌন পরিচয় নেই, যে সরাসরি অন্য সাইবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এবং যার মনোনিবেশ করার এবং তথ্য মনে রাখার ক্ষমতা

মানুষের চেয়ে হাজার গুণ বেশি এবং যে কখনো রাগ ও দুঃখ বোধ করে না, কিন্তু যার আছে আমাদের কল্পনার অতীত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, তার তুলনায় একটা অত্যাধুনিক মহাকাশযানের গুরুত্বও নিতান্ত নগণ্য নয় কি?

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিগুলো আমাদের এ ধরনের ভবিষ্যতের গল্প শোনায় না। কারণ, সংজ্ঞানুযায়ীই এ ধরনের ভবিষ্যতের একটি সঠিক বর্ণনাও হবে মানুষের বোধের অতীত। নিয়ান্ডার্থাল দর্শকের জন্য *হ্যামলেট* সিনেমা বানানো হলে যেমন তা হৃদয়ঙ্গম করা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব, তেমনি ভবিষ্যতের মহা-সাইবর্গদের নিয়ে একটি ছবি বানানো হলে তা বোঝাও আমাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হবে। তার ওপর, আমাদের সঙ্গে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের যে পার্থক্য, বর্তমানের মানুষের সঙ্গে ভবিষ্যতের মানুষের পার্থক্য হবে তার চেয়ে অনেক বেশি। অন্তত নিয়ান্ডার্থাল এবং আমরা দুজনেই মানুষ, কিন্তু আমাদের উত্তরপুরুষরা হয়ে উঠবেন ঈশ্বরপ্রতিম। সুতরাং, বর্তমানের মানুষের পক্ষে তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করাটাই হবে একরকম ধৃষ্টতা।

পদার্থবিজ্ঞানীরা সৃষ্টির শুরুর সময়কার মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাংয়ের নাম দিয়েছেন ‘সিংগুলারিটি’ (Singularity)। এটা এমন একটা সময়, যখন আমাদের চেনা প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সময়েরই কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং মহাবিস্ফোরণের আগে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল কি না, সে প্রশ্নই ছিল অর্থহীন। হয়তো আমরা খুব শিগগির একটি নতুন ‘সিংগুলারিটি’র দিকে ধাবিত হচ্ছি, যেখানে আমি, তুমি, পুরুষ, নারী, ভালোবাসা এবং ঘৃণার মতো যে ধারণাগুলো আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে, সেসবের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। এর পরে যা-কিছু ঘটবে আমাদের বর্তমানের মানুষদের জন্য তা হবে পুরোপুরি অর্থহীন।

ফ্রাংকেনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী

১৮১৮ সালে মেরি শেলি *ফ্রাংকেনস্টাইন* গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গল্পে একজন বিজ্ঞানী একটি কৃত্রিম সত্তা তৈরি করে, যাকে তার স্রষ্টা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন এবং ফলে নেমে আসে বিপর্যয়। গত দুই শতকে, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আমরা এই একই গল্পের অগণিত রূপের মঞ্চায়ন দেখতে পাই। এই গল্পটি বৈজ্ঞানিক কিংবদন্তির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ফ্রাংকেনস্টাইনের গল্পটি আমরা যদি ঈশ্বর সাজার চেষ্টা করি এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন উৎপাদনের চেষ্টা করি, তবে তার পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গল্পটির অর্থ আরো গভীর ও ব্যাপক।

শেষের দিনগুলো দ্রুত ঘনিয়ে আসছে– ফ্রাংকেনস্টাইনের গল্পটি মানুষকে এই সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। যদি কোনো আকস্মিক নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাগড়া না দেয়, প্রযুক্তিগত উন্নতির এই লাগামহীন গতি গল্পের মতো অচিরেই হোমো সেপিয়েন্সকে নতুন কোনো প্রজাতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে ফেলবে। তারা যে কেবল দেখতে আমাদের থেকে আলাদা হবে তা-ই নয়, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতিও হবে আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা। এই ধারণাটিকে বেশিরভাগ মানুষ অস্বস্তির চোখে দেখেন। আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি, ভবিষ্যতের পৃথিবী হবে আরাম-আয়েশে ভরপুর, আমরা চাইলেই মহাকাশযানে চড়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে বেড়িয়ে আসতে পারব। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে আমাদের মতো আবেগ ও পরিচয়-সংবলিত মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না, আমাদের স্থান দখল করবে নতুন কোনো অচেনা জীব যার কাছে আমাদের আজকের দক্ষতা হবে নিতান্তই তুচ্ছ – এরকম একটি ধারণা মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়।

তার চেয়ে আমরা এইভাবে ভাবতেই পছন্দ করি, ড. ফ্রাংকেনস্টাইন একটি জঘন্য দানব তৈরি করেছিলেন, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তাকে হত্যা করতে হয়েছে। আমরা গল্পটিকে এভাবেই বলতে পছন্দ করি, কারণ গল্পটির এই বয়ান পরোক্ষভাবে

স্বীকার করে নেয়, আমরাই সব সৃষ্টির সেরা, অতীতে কখনো আমাদের চেয়ে সেরা কিছু ছিল না, ভবিষ্যতেও কিছু থাকবে না। আমাদের নিজেদের উন্নত করার যে-কোনো চেষ্টা শেষমেশ ব্যর্থ হবে, কারণ চেষ্টায় শরীরের কিছুটা উন্নতি যদি আমরা করতেও পারি, কোনোভাবেই আমরা মানুষের চিন্তা-আবেগ পরিবর্তন করতে পারব না।

বিজ্ঞানীরা যে চেষ্টা করলে কেবল শরীর নয়, মনও নির্মাণ করতে পারেন, ড. ফ্রাংকেনস্টাইন যে মানুষের চেয়েও উন্নত কিছু বানাতে পারেন, আর সেই উন্নত প্রজাতি যে নিয়াভার্থালদের দিকে সেপিয়েন্স যেরকম অবহেলার চোখে তাকাত, সেরকম অবহেলার চোখে আমাদের দিকে তাকাতে পারে, এই সত্যটা হজম করতে আমাদের বেশ কষ্টই হবে।

আজকের দিনের ফ্রাংকেনস্টাইনরা এইসব ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবেন কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার সুযোগ নেই। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ওপরের অনুমানগুলো পুরোপুরি সত্যে রূপান্তরিত হলে আমি বরং একটু অবাকই হব। কারণ, ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অনেক কিছুই শেষমেশ বাস্তবে রূপ নেয় না। সামনে এসে দাঁড়ায় কিছু আকস্মিক বাধা এবং আমলে না আনা নতুন কোনো পরিস্থিতি। ১৯৪০-এর দিকে যখন দুনিয়া জুড়ে পারমাণবিক গবেষণার তোড়জোড়, তখন ২০০০ সালের পারমাণবিক শক্তিচালিত বিশ্ব সম্পর্কে অনেকেই অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন। যখন মহাকাশে স্পুটনিক আর অ্যাপোলো ১১ নিক্ষেপ করা হলো, তখন সবাই শতাব্দী শেষ নাগাদ মানুষ মঙ্গল বা প্লুটোয় উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস শুরু করবে এমনটা ভেবেছিলেন। এসব অনুমানের অধিকাংশই বাস্তবে রূপ নেয়নি। অন্যদিকে, সে সময়ে ইন্টারনেটের মতো কোনো কিছু সম্পর্কে সেদিনের কেউ অনুমানই করতে পারেনি। অথচ, সেটিই আজকের দিনের বড়ো বাস্তবতা।

সুতরাং, ভবিষ্যতের কাল্পনিক কোনো যান্ত্রিক সত্তার দায়ের করা আইনি সালিশ থেকে নিরাপদ থাকতে এখনই আপনার বিমা কোম্পানির কাছে দৌড়ানোর দরকার নেই। ওপরের কল্পনাগুলো বা

দুঃস্বপ্নগুলো কেবল আপনার কল্পনাকে নাড়া দেওয়ার জন্যই। যেটা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার বিষয় সেটা হলো, ইতিহাসের পরবর্তী অংশে আমরা যে কেবল প্রযুক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন দেখতে পাব তা-ই নয়, বরং মানুষের চেতনা ও পরিচিতির ক্ষেত্রেও সূচিত হবে নানা রকম মৌলিক পরিবর্তনের। এসবের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়তো এতটাই বৈপ্লবিক হবে যে তা 'মানুষ' নামক প্রাণীটির পরিচয়কেই প্রশ্নবিদ্ধ করবে। এসবের আগে আমাদের হাতে আর কতটা সময় অবশিষ্ট আছে? সত্যিকার অর্থে, কেউ এ প্রশ্নের উত্তর জানে না। যেমনটা আগেই বলা হয়েছে, ২০৫০ সাল নাগাদ হয়তো কিছু মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। এ-সংক্রান্ত অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইঙ্গিত করে মৃত্যুকে জয় করতে হয়তো মানুষের পরবর্তী শতাব্দী বা পরবর্তী সহস্রাব্দ লেগে যাবে। কিন্তু, সেটাও যদি সত্যি হয়, মানুষের ৭০ হাজার বছরের ইতিহাসের তুলনায় কয়েক সহস্রাব্দ কীই-বা এমন বড়ো সময়?

যদি ইতিহাসের মঞ্চে প্রজাতি হিসেবে সেপিয়েন্সের যবনিকার পর্দা নেমেই যায়, এই প্রজাতির অন্তিম প্রজন্মগুলোর সদস্য হিসেবে একটা শেষ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে কিছুটা সময় আমাদের ব্যয় করা উচিত। প্রশ্নটা হলো– আমরা আসলে কী হতে চেয়েছিলাম? এই প্রশ্নটি, যাকে অনেক সময় মানবিক উন্নয়নমূলক প্রশ্ন হিসেবেও অভিহিত করা হয়, হুট করেই আমাদের বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, পণ্ডিত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত বিতর্ককে কিছুক্ষণের জন্য হলেও স্তব্ধ করে দেয়। যদি আমাদের উত্তরসূরিরা একটি ভিন্নরকম চেতনার অধিকারী হয় (বা অধিকারী হয় চেতনার চেয়েও উচ্চতর কিছুর, যা আমাদের বোধের বাইরে), তাদের কি আদৌ কোনো মাথাব্যথা থাকবে খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম বা আজকের দিনের প্রচলিত অন্য কোনো ধর্ম নিয়ে; সমাজের গঠন সমাজতন্ত্র নাকি পুঁজিবাদ অনুসারে হবে, তা কি তাদের কাছে এতটুকু গুরুত্ব বহন করবে; সমাজের ধারণাটাই কি থাকবে, আজকের মতো অথবা নারী-পুরুষের লিঙ্গগত বৈষম্য বা সমানাধিকার নিয়ে মাতামাতি করার ইচ্ছে হবে তাদের?

তা সত্ত্বেও ইতিহাসের এই বড়ো বড়ো বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষের তৈরি এসব দেবতাদের প্রথম প্রজন্ম বিকশিত হবে মানুষেরই গড়ে দেওয়া ছাঁচে। পুঁজিবাদ, ইসলাম নাকি নারীবাদ– কোন ছাঁচ অনুযায়ী আমরা তাদের গড়ে তুলব? এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের পৃথিবীর ইতিহাস।

বেশিরভাগ মানুষই এসব নিয়ে ভাবতে চায় না। এমনকি জৈব-নৈতিকতার মতো বিষয়গুলোও মূলত আরেকটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেয়। সেটা হলো– 'আমাদের কী কী করা অনুচিত?' জীবিত মানুষের ওপর কি জিনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত অথবা পরিত্যক্ত ভ্রূণের ওপর? স্টেম কোষের ওপর? একটি ভেড়ার হুবহু অনুলিপি তৈরি করা কি যুক্তিযুক্ত? অথবা শিম্পাঞ্জির? কিংবা মানুষের? নিঃসন্দেহে এসব প্রশ্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এরকম ভাবা সত্যিই বোকামি হবে যে, এসব প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের নিজেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তর করে ফেলার মতো এইসব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোকে স্থগিত রাখা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পগুলো গিলগামেশ প্রকল্পের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিজ্ঞানীদের জিগ্যেস করুন– কেন তারা জিনোম নিয়ে পড়াশোনা করছেন বা একটি মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন বা কম্পিউটারের ভেতর মানবমন বা মানবমস্তিষ্ক তৈরির চেষ্টা করছেন। ১০ জনের মধ্যে নয় জন আপনাকে সেই পরিচিত উত্তর দেবেন– আমরা এসব করছি রোগমুক্তির জন্য, মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য। যদিও কম্পিউটারের মধ্যে মানবমস্তিষ্ক তৈরি করার প্রভাব মানসিক রোগ সারানোর চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী, কিন্তু এটিই তাদের কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের সাধারণ ব্যাখ্যা, কারণ কোনো মানুষই এই ব্যাখ্যার বিরূদ্ধে যেতে পারবে না। এই কারণেই গিলগামেশ প্রকল্প বিজ্ঞানের প্রকল্পগুলোর আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এটি বিজ্ঞান যা-ই করুক, তাকেই ন্যায্য বলে বা সঠিক বলে প্রমাণের দায়িত্ব নেয়। এই সুযোগে ড. ফ্রাংকেনস্টাইন গিলগামেশের কাঁধে চড়ে নৃত্য করেন। যেহেতু গিলগামেশকে থামানো অসম্ভব, অসম্ভব থামানো ড. ফ্রাংকেনস্টাইনকেও।

যে একটা কাজ আমরা করতে পারি, সেটা হলো বিজ্ঞানের গতিপথকে কিছুটা হলেও আমরা প্রভাবিত করতে পারি। যেহেতু খুব শীঘ্রই আমরা আমাদের ইচ্ছা ও চাহিদাকে নির্মাণ করাও শিখে যাব, সুতরাং তখন 'আমরা ভবিষ্যতে কী হতে চাই'– এ প্রশ্নটা হবে অবান্তর। তখনকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হবে 'আমরা নিজের ভেতর কী হওয়ার চাহিদা তৈরি করতে চাই?' এই প্রশ্নটা দেখেও এখনো যারা আতঙ্কে শিউরে ওঠেননি, তারা সম্ভবত এখনো ব্যাপারটি নিয়ে বোঝবার মতো করে ভাবেননি।

শেষকথা

যে প্রাণীটি ঈশ্বর হয়ে উঠল

৭০ হাজার বছর আগেও মানুষ ছিল প্রাণিজগতের আর দশটা প্রাণীর মতো সাধারণ একটি প্রাণী। তাদের বিচরণও সীমাবদ্ধ ছিল কেবল আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যেই। পরবর্তী সময়টুকুতে মানুষ হয়ে উঠেছে সমস্ত পৃথিবীর শাসক এবং তাবৎ পৃথিবীর বাস্তুসংস্থানের জন্য হুমকিস্বরূপ। আজ মানুষ নিজেই ঈশ্বর হয়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে, চিরজাগ্রত তারুণ্যকে সে কেবল গ্রাসই করতে চাইছে না, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মতো স্বর্গীয় ক্ষমতাগুলোকেও নিজের আয়ত্তে আনবার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, পৃথিবীতে এতদিন রাজত্ব করেও মানুষ খুব একটা বেশি কিছু করতে পারেনি, যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। পুরো সময়টা জুড়ে মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পেরেছে, বাড়িয়েছে খাদ্যের উৎপাদন, নির্মাণ করেছে নগর-সাম্রাজ্য এবং বিশাল বিস্তৃত ব্যাবসায়িক ক্ষেত্র। কিন্তু এতসব কাজ কি পৃথিবীতে ব্যক্তিমানুষের দুঃখ-কষ্ট-অশান্তির নিরসন ঘটাতে পেরেছে? ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে, মানুষের অর্জিত বিপুল ক্ষমতা মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে কান্না-হাহাকার-ধ্বংসযজ্ঞ। মানুষের নিজের মানসিকতার উন্নতি তো তেমন হয়ইনি, বরং মানুষের কারণে অন্যান্য প্রাণীর জীবন ক্রমাগত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

অবশেষে, গত কয়েক দশকে আমরা এমন কিছু কাজ করতে পেরেছি, যেগুলোকে মানবজাতির কল্যাণকর অবদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দুর্ভিক্ষ নিরসন, মহামারি নিয়ন্ত্রণ এবং যুদ্ধের হার কমিয়ে আনা এগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এসবের পাশাপাশি

অন্য যে-কোনো সময়ের থেকে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। মানবতা, উদারতার যেসব মহৎ বুলি আমরা চারপাশে সম্প্রতি শুনতে শুরু করেছি, সেসব নিতান্তই নতুন এবং ভবিষ্যতে কতদিন সেসব আমরা শুনতে পারব সে ব্যাপারেও আমরা সন্দিহান।

তার ওপর, বর্তমানের মানুষের বিস্ময়কর কাজকর্ম করার ক্ষমতা থাকলেও, আমরা ঠিক জানি না আমাদের লক্ষ্য কী এবং দিনকে দিন আমরা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। আমরা ডিঙি নৌকা থেকে অগ্রসর হয়ে বানিয়েছি বাষ্পচালিত জাহাজ, নির্মাণ করেছি অত্যাধুনিক মহাশূন্যযান– কিন্তু কেউ জানে না মানবজাতির গন্তব্য কী। অন্য যে-কোনো সময়ের থেকে মানুষ আজ অনেক বেশি ক্ষমতাধর, কিন্তু এতসব ক্ষমতা দিয়ে তার কী করা উচিত সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই বললেই চলে। এর চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হলো, আজকের মানুষ আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্বজ্ঞানহীন। আজকে মানুষ নিজেই নিজের ঈশ্বর, তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আছে কেবল পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সূত্র, কিছু প্রাকৃতিক নিয়মকানুন, এ ছাড়া সে আজ আর কারো কাছে দায়বদ্ধ নয়। আরেকটু বেশি সুখ, আরেকটু বেশি আমোদের জন্য আমরা আমাদের আশপাশের প্রাণিকুলের জীবন ও পরিবেশের প্রতি ক্রমাগত হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছি। এত কিছুর পরেও কিন্তু আমরা তৃপ্ত নই, সন্তুষ্ট নই। আমরা অতৃপ্ত, অশান্ত।

একটি পৃথিবীজোড়া অনেকগুলো প্রচণ্ড ক্ষমতাবান, অতৃপ্ত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ঈশ্বর যারা নিজেরাই জানে না তারা কী চায়, তাদের চাওয়ার শেষ কোথায়– এর থেকে মারাত্মক পরিস্থিতি আর কী হতে পারে?

তথ্যসূত্র

১. নিতান্ত সাধারণ একটি প্রাণীর গল্প

1 Ann Gibbons, 'Food for Thought: Did the First Cooked Meals Help Fuel the Dramatic Evolutionary Expansion of the Human Brain?', Science 316:5831 (2007), 1,558–60.

২. জ্ঞানবৃক্ষের বেড়ে ওঠা

1 Robin Dunbar, Grooming, Gossip and the Evolution of Language (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998).

2 Frans de Waal, Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000); Frans de Waal, Our Inner Ape: A Leading Primatologist Explains Why We Are Who We Are (New York: Riverhead Books, 2005); Michael L. Wilson and Richard W. Wrangham, 'Intergroup Relations in Chimpanzees', Annual Review of Anthropology 32 (2003), 363–92; M. McFarland Symington, 'Fission-Fusion Social Organization in Ateles and Pan, International Journal of Primatology 11:1 (1990), 49; Colin A. Chapman and Lauren J. Chapman, 'Determinants of Groups Size in Primates: The Importance of Travel Costs', in On the Move: How and Why Animals Travel in Groups, ed. Sue Boinsky and Paul A. Garber (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 26.

3 Dunbar, Grooming, Gossip and the Evolution of Language, 69–79; Leslie C. Aiello and R. I. M.

Dunbar, ‘Neocortex Size, Group Size, and the Evolution of Language’, Current Anthropology 34:2 (1993), 189. For criticism of this approach see: Christopher McCarthy et al., ‘Comparing Two Methods for Estimating Network Size’, Human Organization 60:1 (2001), 32; R. A. Hill and R. I. M. Dunbar, ‘Social Network Size in Humans’, Human Nature 14:1 (2003), 65.

4 Yvette Taborin, ‘Shells of the French Aurignacian and Perigordian’, in Before Lascaux: The Complete Record of the Early Upper Paleolithic, ed. Heidi Knecht, Anne Pike-Tay and Randall White (Boca Raton: CRC Press, 1993), 211–28.

5 G. R. Summer ayes, ‘Application of PIXE-PIGME to Archaeological Analysis of Changing Patterns of Obsidian Use in West New Britain, Papua New Guinea’, in Archaeological Obsidian Studies: Method and Theory, ed. Steven M. Shackley (New York: Plenum Press, 1998), 129–58.

৩. আদম হাওয়ার দিনলিপি

1 Christopher Ryan and Cacilda Jethá, Sex at Dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality (New York: Harper, 2010); S. Beckerman and P. Valentine (eds.), Cultures of Multiple Fathers. The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America (Gainesville: University Press of Florida, 2002).

2 Noel G. Butlin, Economics and the Dreamtime: A Hypothetical History (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 98–101; Richard Broome, Aboriginal Australians (Sydney: Allen & Unwin, 2002), 15; William Howell Edwards, An Introduction to Aboriginal Societies (Wentworth Falls, NSW: Social Science Press, 1988), 52.

3 Fekri A. Hassan, Demographic Archaeology (New York: Academic Press, 1981), 196–9; Lewis Robert

Binford, Constructing Frames of Reference: An Analytical Method for Archaeological Theory Building Using Hunter-Gatherer and Environmental Data Sets (Berkeley: University of California Press, 2001), 143.

4 Brian Hare, The Genius of Dogs: How Dogs Are Smarter Than You Think (Dutton: Penguin Group, 2013).

5 Christopher B. Ruff, Erik Trinkaus and Trenton W. Holliday, 'Body Mass and Encephalization in Pleistocene Homo', Nature 387 (1997), 173–6; M. Henneberg and M. Steyn, 'Trends in Cranial Capacity and Cranial Index in Subsaharan Africa During the Holocene', American Journal of Human Biology 5:4 (1993): 473–9; Drew H. Bailey and David C. Geary, 'Hominid Brain Evolution: Testing Climatic, Ecological and Social Competition Models', Human Nature 20 (2009): 67–79; Daniel J. Wescott and Richard L. Jantz, 'Assessing Craniofacial Secular Change in American Blacks and Whites Using Geometric Morphometry', in Modern Morphometrics in Physical Anthropology: Developments in Primatology: Progress and Prospects, ed. Dennis E. Slice (New York: Plenum Publishers, 2005), 231–45.

6 Nicholas G. Blurton Jones et al., 'Antiquity of Postreproductive Life: Are There Modern Impacts on Hunter-Gatherer Postreproductive Life Spans?', American Journal of Human Biology 14 (2002), 184–205.

7 Kim Hill and A. Magdalena Hurtado, Aché Life History: The Ecology and Demography of a Foraging People (New York: Aldine de Gruyter, 1996), 164, 236.

8 Ibid., 78.

9 Vincenzo Formicola and Alexandra P. Buzhilova, 'Double Child Burial from Sunghir (Russia): Pathology and Inferences for Upper Paleolithic Funerary

Practices', American Journal of Physical Anthropology 124:3 (2004), 189–98; Giacomo Giacobini, 'Richness and Diversity of Burial Rituals in the Upper Paleolithic', Diogenes 54:2 (2007), 19–39.

10 I. J. N. Thorpe, 'Anthropology, Archaeology and the Origin of Warfare', World Archaeology 35:1 (2003), 145–65; Raymond C. Kelly, Warless Societies and the Origin of War (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000); Azar Gat, War in Human Civilization (Oxford: Oxford University Press, 2006); Lawrence H. Keeley, War before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage (Oxford: Oxford University Press, 1996); Slavomil Vend, 'Stone Age Warfare', in Ancient Warfare: Archaeological Perspectives, ed. John Carman and Anthony Harding (Stroud: Sutton Publishing, 1999), 57–73.

৪. অগণন মানুষের স্রোত

1 James F. O'Connel and Jim Allen, 'Pre-LGM Sahul (Pleistocene Australia – New Guinea) and the Archaeology of Early Modern Humans', in Rethinking the Human Revolution: New Behavioural and Biological Perspectives on the Origin and Dispersal of Modern Humans, ed. Paul Mellars, Ofer Bar-Yosef, Katie Boyle (Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2007), 395–410; James F. O'Connel and Jim Allen, 'When Did Humans First Arrive in Greater Australia and Why is it Important to Know?', Evolutionary Anthropology 6:4 (1998), 132–46; James F. O'Connel and Jim Allen, 'Dating the Colonization of Sahul (Pleistocene Australia – New Guinea): A Review of Recent Research', Journal of Radiological Science 31:6 (2004), 835–53; Jon M. Erlandson, 'Anatomically Modern Humans, Maritime Voyaging and the Pleistocene Colonization of the

Americas', in The First Americans: The Pleistocene Colonization of the New World, ed. Nina G. Jablonski (San Francisco: University of California Press, 2002), 59–60, 63–4; Jon M. Erlandson and Torben C. Rick, 'Archaeology Meets Marine Ecology: The Antiquity of Maritime Cultures and Human Impacts on Marine Fisheries and Ecosystems', Annual Review of Marine Science 2 (2010), 231–51; Atholl Anderson, 'Slow Boats from China: Issues in the Prehistory of Indo-China Seafaring', Modern Quaternary Research in Southeast Asia 16 (2000), 13–50; Robert G. Bednarik, 'Maritime Navigation in the Lower and Middle Paleolithic', Earth and Planetary Sciences 328 (1999), 559–60; Robert G. Bednarik, 'Seafaring in the Pleistocene', Cambridge Archaeological Journal 13:1 (2003), 41–66.

2 Timothy F. Flannery, The Future Eaters: An Ecological History of the Australasian Lands and Peoples (Port Melbourne: Reed Books Australia, 1994); Anthony D. Barnosky et al., 'Assessing the Causes of Late Pleistocene Extinctions on the Continents', Science 306:5693 (2004): 70–5; Barry W. Brook and David M. J. S. Bowman, 'The Uncertain Blitzkrieg of Pleistocene Megafauna', Journal of Biogeography 31:4 (2004), 517–23; Gifford H. Miller et al., 'Ecosystem Collapse in Pleistocene Australia and a Human Role in Megafaunal Extinction', Science 309:5732 (2005), 287–90; Richard G. Roberts et al., 'New Ages for the Last Australian Megafauna: Continent Wide Extinction about 46,000 Years Ago', Science 292:5523 (2001), 1,888–92.

3 Stephen Wroe and Judith Field, 'A Review of Evidence for a Human Role in the Extinction of Australian Megafauna and an Alternative Explanation',

Quaternary Science Reviews 25:21–2 (2006), 2,692–703; Barry W. Brook et al., 'Would the Australian Megafauna Have Become Extinct if Humans Had Never Colonised the Continent? Comments on 'A Review of the Evidence for a Human Role in the Extinction of Australian Megafauna and an Alternative Explanation' by S. Wroe and J. Field', Quaternary Science Reviews 26:3–4 (2007), 560–4; Chris S. M. Turney et al., 'Late-Surviving Megafauna in Tasmania, Australia, Implicate Human Involvement in their Extinction', Proceedings of the National Academy of Sciences 105:34 (2008), 12,150–3.

4 John Alroy, 'A Multispecies Overkill Simulation of the End-Pleistocene Megafaunal Mass Extinction, Science, 292:5523 (2001), 1,893–6; O'Connel and Allen, 'Pre-LGM Sahul', 400–1.

5 L. H. Keeley, 'Proto-Agricultural Practices Among Hunter-Gatherers: A Cross-Cultural Survey', in Last Hunters, First Farmers: New Perspectives on the Prehistoric Transition to Agriculture, ed. T. Douglas Price and Anne Birgitte Gebauer (Santa Fe: School of American Research Press, 1995), 243–72; R. Jones, 'Firestick Farming', Australian Natural History 16 (1969), 224–8.

6 David J. Meitzer, First Peoples in a New World: Colonizing Ice Age America (Berkeley: University of California Press, 2009).

7 Paul L. Koch and Anthony D. Barnosky, 'Late Quaternary Extinctions: State of the Debate', Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 37 (2006), 215–50; Anthony D. Barnosky et al., 'Assessing the Causes of Late Pleistocene Extinctions on the Continents', 70–5.

৫. ইতিহাসের বৃহত্তম ফাঁকি

1 The map is based mainly on: Peter Bellwood, First Farmers: The Origins of Agricultural Societies (Malden: Blackwell Publishing, 2005).

2 Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: W. W. Norton, 1997).

3 Gat, War in Human Civilization, 130–1; Robert S. Walker and Drew H. Bailey, 'Body Counts in Lowland South American Violence', Evolution and Human Behavior 34 (2013), 29–34.

4 Katherine A. Spielmann, 'A Review: Dietary Restriction on Hunter-Gatherer Women and the Implications for Fertility and Infant Mortality', Human Ecology 17:3 (1989), 321–45. See also: Bruce Winterhalder and Eric Alder Smith, 'Analyzing Adaptive Strategies: Human Behavioral Ecology at Twenty-Five', Evolutionary Anthropology 9:2 (2000), 51–72.

5 Alain Bideau, Bertrand Desjardins and Hector Perez-Brignoli (eds.), Infant and Child Mortality in the Past (Oxford: Clarendon Press, 1997); Edward Anthony Wrigley et al., English Population History from Family Reconstitution, 1580–1837 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 295–6, 303.

6 Manfred Heun et al., 'Site of Einkorn Wheat Domestication Identified by DNA Fingerprints', Science 278:5341 (1997), 1,312–14.

7 Charles Patterson, Eternal Treblinka: Our Treatment of Animals and the Holocaust (New York: Lantern Books, 2002), 9–10; Peter J. Ucko and G. W. Dimbleby (eds.), The Domestication and Exploitation of Plants and Animals (London: Duckworth, 1969), 259.

8 Avi Pinkas (ed.), Farmyard Animals in Israel – Research, Humanism and Activity (Rishon Le-Ziyyon: The Association for Farmyard Animals, 2009

[Hebrew]), 169–99; 'Milk Production – the Cow' [Hebrew], The Dairy Council, accessed 22 March 2012, http://www.milk.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=645657_milk&act=show&dbid=katavot&dataid=cow.htm.

9 Edward Evan Evans-Pritchard, The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People (Oxford: Oxford University Press, 1969); E. C. Amoroso and P. A. Jewell, 'The Exploitation of the Milk-Ejection Reflex by Primitive People', in Man and Cattle: Proceedings of the Symposium on Domestication at the Royal Anthropological Institute, 24–26 May 1960, ed. A. E. Mourant and F. E. Zeuner (London: The Royal Anthropological Institute, 1963), 129–34.

10 Johannes Nicolaisen, Ecology and Culture of the Pastoral Tuareg (Copenhagen: National Museum, 1963), 63.

৬. কল্পনার কারাগার

1 Angus Maddison, The World Economy, vol. 2 (Paris: Development Centre of the Organization of Economic Co-operation and Development, 2006), 636; 'Historical Estimates of World Population', U.S. Census Bureau, accessed 10 December 2010, http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html.

2 Robert B. Mark, The Origins of the Modern World: A Global and Ecological Narrative (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2002), 24.

3 Raymond Westbrook, 'Old Babylonian Period', in A History of Ancient Near Eastern Law, vol. 1, ed. Raymond Westbrook (Leiden: Brill, 2003), 36–430; Martha T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, 2nd edn (Atlanta: Scholars Press, 1997), 71–142; M. E. J. Richardson, Hammurabi's

Laws: Text, Translation and Glossary (London: T & T Clark International, 2000).
4 Roth, Law Collections from Mesopotamia, 76.
5 Ibid., 121.
6 Ibid., 122–3.
7 Ibid., 133–3.
8 Constance Brittaine Bouchard, Strong of Body, Brave and Noble: Chivalry and Society in Medieval France (New York: Cornell University Press, 1998), 99; Mary Martin McLaughlin, 'Survivors and Surrogates: Children and Parents from the Ninth to Thirteenth Centuries', in Medieval Families: Perspectives on Marriage, Household and Children, ed. Carol Neel (Toronto: University of Toronto Press, 2004), 81 n.; Lise E. Hull, Britain's Medieval Castles (Westport: Praeger, 2006), 144.

৭. স্মৃতি উপচানো তথ্য

1 Andrew Robinson, The Story of Writing (New York: Thames and Hudson, 1995), 63; Hans J. Nissen, Peter Damerow and Robert K. Englung, Archaic Bookkeeping: Writing and Techniques of Economic Administration in the Ancient Near East (Chicago, London: The University of Chicago Press, 1993), 36.
2 Marcia and Robert Ascher, Mathematics of the Incas – Code of the Quipu (New York: Dover Publications, 1981).
3 Gary Urton, Signs of the Inka Khipu (Austin: University of Texas Press, 2003); Galen Brokaw, A History of the Khipu (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
4 Stephen D. Houston (ed.), The First Writing: Script Invention as History and Process (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 222.

৮. ইতিহাস ন্যায়বিচারের প্রতিচ্ছবি নয়

1 Sheldon Pollock, ‘Axialism and Empire’, in Axial Civilizations and World History, ed. Johann P. Arnason, S. N. Eisenstadt and Björn Wittrock (Leiden: Brill, 2005), 397–451.
2 Harold M. Tanner, China: A History (Indianapolis: Hackett Pub. Co., 2009), 34.
3 Ramesh Chandra, Identity and Genesis of Caste System in India (Delhi: Kalpaz Publications, 2005); Michael Bamshad et al., ‘Genetic Evidence on the Origins of Indian Caste Population’, Genome Research 11 (2001): 904–1,004; Susan Bayly, Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
4 Houston, First Writing, 196.
5 The secretary general, United Nations, Report of the Secretary General on the In-depth Study on All Forms of Violence Against Women, delivered to the General Assembly, UN Doc. A/16/122/Add.1 (6 July 2006), 89.
6 Sue Blundell, Women in Ancient Greece (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995). 113–2.9.131–3.

১০. টাকার গন্ধ পাই

1 Francisco López de Gómara, Historia de la Conquista de Mexico, vol. 1, ed. D. Joaquin Ramirez Cabanes (Mexico City: Editorial Pedro Robredo, 1943), 106.
2 Andrew M. Watson, ‘Back to Gold – and Silver’, Economic History Review 20:1 (1967), 11–12; Jasim Alubudi, Repertorio Bibliográfico del Islam (Madrid: Vision Libros, 2003), 194.
3 Watson, ‘Back to Gold – and Silver’, 17–18.
4 David Graeber, Debt: The First 5,000 Years (Brooklyn, NY: Melville House, 2011).

5 Glyn Davies, A History of Money: From Ancient Times to the Present Day (Cardiff: University of Wales Press, 1994), 15.

6 Szymon Laks, Music of Another World, trans. Chester A. Kisiel (Evanston, Ill.: North-western University Press, 1989), 88–9. The Auschwitz 'market' was restricted to certain classes of prisoners and conditions changed dramatically across time.

7 Niall Ferguson, The Ascent of Money (New York: The Penguin Press, 2008), 4.

8 For information on barley money I have relied on an unpublished PhD thesis: Refael Benvenisti, 'Economic Institutions of Ancient Assyrian Trade in the Twentieth to Eighteenth Centuries BC' (Hebrew University of Jerusalem, unpublished PhD thesis, 2011). See also Norman Yoffee, 'The Economy of Ancient Western Asia', in Civilizations of the Ancient Near East, vol. 1, ed. J. M. Sasson (New York: C. Scribner's Sons, 1995), 1,387–99; R. K. Englund, 'Proto-Cuneiform Account-Books and Journals', in Creating Economic Order: Record-keeping, Standardization and the Development of Accounting in the Ancient Near East, ed. Michael Hudson and Cornelia Wunsch (Bethesda, Md.: CDL Press, 2004), 21–46; Marvin A. Powell, 'A Contribution to the History of Money in Mesopotamia Prior to the Invention of Coinage', in Festschrift Lubor Matouš, ed. B. Hruška and G. Komoróczy (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1978), 211–43; Marvin A. Powell, 'Money in Mesopotamia', Journal of the Economic and Social History of the Orient 39:3 (1996), 224–42; John F. Robertson, 'The Social and Economic Organization of Ancient Mesopotamian Temples', in Civilizations of the Ancient Near East, vol. 1, ed. Sasson, 443–500; M. Silver, 'Modern Ancients', in Commerce and Monetary Systems in the

Ancient World: Means of Transmission and Cultural Interaction, ed. R. Rollinger and U. Christoph (Stuttgart: Steiner, 2004), 65–87; Daniel C. Snell, ‘Methods of Exchange and Coinage in Ancient Western Asia’, in Civilizations of the Ancient Near East, vol. 1, ed. Sasson, 1,487–97.

১১. সাম্রাজ্যবাদী বাসনা

1 Nahum Megged, The Aztecs (Tel Aviv: Dvir, 1999 [Hebrew]), 103.
2 Tacitus, Agricola, ch. 30 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), 220–1.
3 A. Fienup-Riordan, The Nelson Island Eskimo: Social Structure and Ritual Distribution (Anchorage: Alaska Pacific University Press, 1983), 10.
4 Yuri Pines, ‘Nation States, Globalization and a United Empire – the Chinese Experience (third to fifth centuries BC)’, Historia 15 (1995), 54 [Hebrew].
5 Alexander Yakobson, ‘Us and Them: Empire, Memory and Identity in Claudius’ Speech on Bringing Gauls into the Roman Senate’, in On Memory: An Interdisciplinary Approach, ed. Doron Mendels (Oxford: Peter Land, 2007), 23–4.

১২. ধর্মের রীতিনীতি

1 W. H. C. Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church (Cambridge: James Clarke & Co., 2008), 536–7.
2 Robert Jean Knecht, The Rise and Fall of Renaissance France, 1483–1610 (London: Fontana Press, 1996), 424.
3 Marie Harm and Hermann Wiehle, Lebenskunde fuer Mittelschulen – Fuenfter Teil. Klasse 5 fuer Jungen (Halle: Hermann Schroedel Verlag, 1942), 152–7.

১৩. সাফল্যের রহস্য

1 Susan Blackmore, The Meme Machine (Oxford: Oxford University Press, 1999).

১৪. জানি না বলতে শেখা

1 David Christian, Maps of Time: An Introduction to Big History (Berkeley: University of California Press, 2004), 344–5; Angus Maddison, The World Economy, vol. 2 (Paris: Development Centre of the Organization of Economic Co-operation and Development, 2001), 636; 'Historical Estimates of World Population', US Census Bureau, accessed 10 December 2010, http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html.

2 Maddison, The World Economy, vol. 1, 261.

3 'Gross Domestic Product 2009', the World Bank, Data and Statistics, accessed 10 December 2010, http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf.

4 Christian, Maps of Time, 141.

5 The largest contemporary cargo ship can carry about 100,000 tons. In 1470 all the world's fleets could together carry no more than 320,000 tons. By 1570 total global tonnage was up to 730,000 tons (Maddison, The World Economy, vol. 1, 97).

6 The world's largest bank – the Royal Bank of Scotland – has reported in 2007 deposits worth $1.3 trillion. That's five times the annual global production in 1500. See 'Annual Report and Accounts 2008', the Royal Bank of Scotland, 35, accessed 10 December 2010, http://files.shareholder.com/downloads/RBS/626570033}0}278481/eb7a003a-5c9b-41ef-bad3–81fb98a6c823/RBS_GRA_2008_09_03_09.pdf.

7 Ferguson, Ascent of Money, 185–98.

8 Maddison, The World Economy, vol. 1, 31; Wrigley, English Population History, 295; Christian, Maps of Time, 450, 452; 'World Health Statistic Report 2009',

35–45, World Health Organization, accessed 10 December 2010 http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf.
9 Wrigley, English Population History, 296.
10 'England, Interim Life Tables, 1980–82 to 2007–09', Office for National Statistics, accessed 22 March 2012 http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77–61850.
11 Michael Prestwich, Edward I (Berkeley: University of California Press, 1988), 125–6.
12 Jennie B. Dorman et al., 'The age-1 and daf-2 Genes Function in a Common Pathway to Control the Lifespan of Caenorhabditis elegans', Genetics 141:4 (1995), 1,399–406; Koen Houthoofd et al., 'Life Extension via Dietary Restriction is Independent of the Ins/IGF-1 Signalling Pathway in Caenorhabditis elegans', Experimental Gerontology 38:9 (2003), 947–54.
13 Shawn M. Douglas, Ido Bachelet and George M. Church, 'A Logic-Gated Nanorobot for Targeted Transport of Molecular Payloads', Science 335:6070 (2012): 831–4; Dan Peer et al., 'Nanocarriers As An Emerging Platform for Cancer Therapy', Nature Nanotechnology 2 (2007): 751–60; Dan Peer et al., 'Systemic Leukocyte-Directed siRNA Delivery Revealing Cyclin Di as an Anti-Inflammatory Target', Science 319:5863 (2008): 627–30.

১৫. বিজ্ঞান আর সাম্রাজ্যবাদের গাঁটছড়া

1 Stephen R. Bown, Scurvy: How a Surgeon, a Mariner and a Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail (New York: Thomas Dunne Books, St. Martin's Press, 2004); Kenneth John Carpenter, The

History of Scurvy and Vitamin C (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

2 James Cook, The Explorations of Captain James Cook in the Pacific, as Told by Selections of his Own Journals 1768–1779, ed. Archibald Grenfell Price (New York: Dover Publications, 1971), 16–17; Gananath Obeyesekere, The Apotheosis of Captain Cook: European Mythmaking in the Pacific (Princeton: Princeton University Press, 1992), 5; J. C. Beaglehole, ed., The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 588.

3 Mark, Origins of the Modern World, 81.

4 Christian, Maps of Time, 436.

5 John Darwin, After Tamerlane: The Global History of Empire Since 1405 (London: Allen Lane, 2007), 239.

6 Soli Shahvar, 'Railroads i. The First Railroad Built and Operated in Persia', in the Online Edition of Encyclopaedia Iranica, last modified 7 April 2008, http://www.iranicaonline.org/articles/railroads-i; Charles Issawi, 'The Iranian Economy 1925–1975: Fifty Years of Economic Development', in Iran under the Pahlavis, ed. George Lenczowski (Stanford: Hoover Institution Press, 1978), 156.

7 Mark, Origins of the Modern World, 46.

8 Kirkpatrick Sale, Christopher Columbus and the Conquest of Paradise (London: Tauris Parke Paperbacks, 2006), 7–13.

9 Edward M. Spiers, 'The Army and Society: 1819–1914 (London: Longman, 1980), 121; Robin Moore, 'Imperial India, 1858–1914', in The Oxford History of the British Empire: The Nineteenth Century, vol. 3, ed. Andrew Porter (New York: Oxford University Press, 1999), 442.

10 Vinita Damodaran, 'Famine in Bengal: A Comparison of the 1770 Famine in Bengal and the 1897 Famine in

Chotanagpur', The Medieval History Journal 10:1–2 (2007), 151.

১৬. পুঁজিবাদের দর্শন

1 Maddison, World Economy, vol. 1, 261, 264; 'Gross National Income Per Capita 2009, Atlas Method and PPP', the World Bank, accessed 10 December 2010, http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf.

2 The mathematics of my bakery example are not as accurate as they could be. Since banks are allowed to loan $10 for every dollar they keep in their possession, of every million dollars deposited in the bank, the bank can loan out to entrepreneurs only about $909,000 while keeping $91,000 in its vaults. But to make life easier for the readers I preferred to work with round numbers. Besides, banks do not always follow the rules.

3 Carl Trocki, Opium, Empire and the Global Political Economy (New York: Routledge, 1999), 91.

4 Georges Nzongola-Ntalaja, The Congo from Leopold to Kabila: A People's History (London: Zed Books, 2002), 22.

১৭. শিল্পের রথ

1 Mark, Origins of the Modern World, 109.

2 Nathan S. Lewis and Daniel G. Nocera, 'Powering the Planet: Chemical Challenges in Solar Energy Utilization', Proceedings of the National Academy of Sciences 103:43 (2006), 15,731.

3 Kazuhisa Miyamoto (ed.), 'Renewable Biological Systems for Alternative Sustainable Energy Production, FAO Agricultural Services Bulletin 128 (Osaka: Osaka University, 1997), Chapter 2.1.1, accessed 10 December 2010, http://www.fao.org/docrep/W7241E/w7241eo6.htm#2.

1.1percent20solarpercent20energy; James Barber, ‘Biological Solar Energy’, Philosophical Transactions of the Royal Society A 365:1853 (2007), 1007.

4 ‘International Energy Outlook 2010’, US Energy Information Administration, 9, accessed 10 December 2010, http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/0484(2010).pdf.

5 S. Venetsky, ‘Silver’ from Clay’, Metallurgist 13:7 (1969), 451; Fred Aftalion, A History of the International Chemical Industry (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991), 64; A. J. Downs, Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium and Thallium (Glasgow: Blackie Academic & Professional, 1993), 15.

6 Jan Willem Erisman et al., ‘How a Century of Ammonia Synthesis Changed the World’, Nature Geoscience 1 (2008), 637.

7 G. J. Benson and B. E. Rollin (eds.), The Well-being of Farm Animals: Challenges and Solutions (Ames, IA: Blackwell, 2004); M. C. Appleby, J. A. Mench and B. O. Hughes, Poultry Behaviour and Welfare (Wallingford: CABI Publishing, 2004); J. Webster, Animal Welfare: Limping Towards Eden (Oxford: Blackwell Publishing, 2005); C. Druce and P. Lymbery, Outlawed in Europe: How America is Falling Behind Europe in Farm Animal Welfare (New York: Archimedean Press, 2002).

8 Harry Harlow and Robert Zimmermann, ‘Affectional Responses in the Infant Monkey’, Science 130:3373 (1959), 421–32; Harry Harlow, ‘The Nature of Love’, American Psychologist 13 (1958), 673–85; Laurens D. Young et al., ‘Early stress and later response to separation in rhesus monkeys’, American Journal of Psychiatry 130:4 (1973), 400–5; K. D. Broad, J. P. Curley and E. B. Keverne, ‘Mother-infant bonding and the evolution of mammalian social relationships’,

Philosophical Transactions of the Royal Society B 361:1476 (2006), 2,199–214; Florent Pittet et al., ‘Effects of maternal experience on fearfulness and maternal behaviour in a precocial bird’, Animal Behaviour (March 2013), In Press – available online at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003 347213000547).

9 ‘National Institute of Food and Agriculture’, United States Department of Agriculture, accessed 10 December 2010, http://www.csrees.usda.gov/qlinks/extension.html.

১৮. চিরস্থায়ী বিপ্লব

1 Vaclav Smil, The Earth’s Biosphere: Evolution, Dznamics and Change (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002); Sarah Catherine Walpole et al., ‘The Weight of Nations: An Estimation of Adult Human Biomass’, BMC Public Health 12:439 (2012), http://www.biomedcentral.com/1471–2458/12/439.

2 William T. Jackman, The Development of Transportation in Modern England (London: Frank Cass & Co., 1966), 324–7; H. J. Dyos and D. H. Aldcroft, British Transport-An Economic Survey From the Seventeenth Century to the Twentieth (Leicester: Leicester University Press, 1969), 124–31; Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century (Berkeley: University of California Press, 1986).

3 For a detailed discussion of the unprecedented peacefulness of the last few decades, see in particular Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (New York: Viking, 2011); Joshua S. Goldstein, Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide (New York: Dutton, 2011); Gat, War in Human Civilization.

4 ‘World Report on Violence and Health: Summary, Geneva 2002’, World Health Organization, accessed 10 December 2010, http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_annex_en.pdf. For mortality rates in previous eras see: Lawrence H. Keeley, War before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage (New York: Oxford University Press, 1996).

5 ‘World Health Report, 2004’, World Health Organization, 124, accessed 10 December 2010, http://www.who.int/whr/2004/en/reporto4_en.pdf.

6 Raymond C. Kelly, Warless Societies and the Origin of War (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000), 21. See also Gat, War in Human Civilization, 129–31; Keeley, War before Civilization.

7 Manuel Eisner, ‘Modernization, Self-Control and Lethal Violence’, British Journal of Criminology 41:4 (2001), 618–638; Manuel Eisner, ‘Long-Term Historical Trends in Violent Crime’, Crime and Justice: A Review of Research 30 (2003), 83–142; ‘World Report on Violence and Health: Summary, Geneva 2002’, World Health Organization, accessed 10 December 2010, http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_annex_en.pdf; ‘World Health Report, 2004’, World Health Organization, 124, accessed 10 December 2010, http://www.who.int/whr/2004/en/reporto4_en.pdf.

8 Walker and Bailey, ‘Body Counts in Lowland South American Violence’, 30.

১৯. অতঃপর তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল

1 For both the psychology and biochemistry of happiness, the following are good starting points: Jonathan Haidt, The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom (New York: Basic

Books, 2006); R. Wright, The Moral Animal: Evolutionary Psychology and Everyday Life (New York: Vintage Books, 1994); M. Csikszentmihalyi, 'If We Are So Rich, Why Aren't We Happy?', American Psychologist 54:10 (1999): 821–7; F. A. Huppert, N. Baylis and B. Keverne (eds.), The Science of Well-Being (Oxford: Oxford University Press, 2005); Michael Argyle, The Psychology of Happiness, 2nd edition (New York: Routledge, 2001); Ed Diener (ed.), Assessing Well-Being: The Collected Works of Ed Diener (New York: Springer, 2009); Michael Eid and Randy J. Larsen (eds.), The Science of Subjective Well-Being (New York: Guilford Press, 2008); Richard A. Easterlin (ed.), Happiness in Economics (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2002); Richard Layard, Happiness: Lessons from a New Science (New York: Penguin, 2005).

2 Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011); Inglehart et al., 'Development, Freedom and Rising Happiness', 278–81.

3 D. M. McMahon, The Pursuit of Happiness: A History from the Greeks to the Present (London: Allen Lane, 2006).

২০. সেপিয়েন্সের শেষের শুরু

1 Keith T. Paige et al., 'De Novo Cartilage Generation Using Calcium Alginate-Chondrocyte Constructs', Plastic and Reconstructive Surgery 97:1 (1996), 168–78.

2 David Biello, 'Bacteria Transformed into Biofuels Refineries', Scientific American, 27 January 2010, accessed 10 December 2010, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=bacteria-transformed-into-biofuel-refineries.

3 Gary Walsh, 'Therapeutic Insulins and Their Large-Scale Manufacture', Applied Microbiology and Biotechnology 67:2 (2005), 151–9.
4 James G. Wallis et al., 'Expression of a Synthetic Antifreeze Protein in Potato Reduces Electrolyte Release at Freezing Temperatures', Plant Molecular Biology 35:3 (1997), 323–30.
5 Robert J. Wall et al., 'Genetically Enhanced Cows Resist Intramammary Staphylococcus Aureus Infection', Nature Biotechnology 23:4 (2005), 445–51.
6 Liangxue Lai et al., 'Generation of Cloned Transgenic Pigs Rich in Omega-3 Fatty Acids', Nature Biotechnology 24:4 (2006), 435–6.
7 Ya-Ping Tang et al., 'Genetic Enhancement of Learning and Memory in Mice', Nature 401 (1999), 63–9.
8 Zoe R. Donaldson and Larry J. Young, 'Oxytocin, Vasopressin and the Neurogenetics of Sociality', Science 322:5903 (2008), 900–904; Zoe R. Donaldson, 'Production of Germline Transgenic Prairie Voles (Microtus Ochrogaster) Using Lentiviral Vectors', Biology of Reproduction 81:6 (2009), 1,189–95.
9 Terri Pous, 'Siberian Discovery Could Bring Scientists Closer to Cloning Woolly Mammoth', Time, 17 September 2012, accessed 19 February 2013; Pasqualino Loi et al, 'Biological time machines: a realistic approach for cloning an extinct mammal', Endangered Species Research 14 (2011), 227–33; Leon Huynen, Craig D. Millar and David M. Lambert, 'Resurrecting ancient animal genomes: The extinct moa and more', Bioessays 34 (2012), 661–9.
10 Nicholas Wade, 'Scientists in Germany Draft Neanderthal Genome', New York Times, 12 February 2009, accessed 10 December 2010,

http://www.nytimes.com/2009/02/13/science/13neanderthal.html?_r=2&ref=science; Zack Zorich, 'Should We Clone Neanderthals?', Archaeology 63:2 (2009), accessed 10 December 2010, http://www.archaeology.org/1003/etc/neanderthals.html.

11 Robert H. Waterston et al., 'Initial Sequencing and Comparative Analysis of the Mouse Genome', Nature 420:6915 (2002), 520.

12 'Hybrid Insect Micro Electromechanical Systems (HI-MEMS)', Microsystems Technology Office, DARPA, accessed 22 March 2012, http://www.darpa.mil/Our_Work/MTO/Programs/Hybrid_Insect_Micro_Electromechanical_Systems_percent28HI-MEMSpercent29.aspx. See also: Sally Adee, 'Nuclear-Powered Transponder for Cyborg Insect', IEEE Spectrum, December 2009, accessed 10 December 2010, http://spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/nuclearpowered-transponder-for-cyborg-insect?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feedpercent3A+IeeeSpectrum+percent28IEEE+Spectrumpercent29&utm_content=Google+Reader; Jessica Marshall, 'The Fly Who Bugged Me', New Scientist 197:2646 (2008), 40–3; Emily Singer, 'Send in the Rescue Rats', New Scientist 183:2466 (2004), 21–2; Susan Brown, 'Stealth Sharks to Patrol the High Seas', New Scientist 189:2541 (2006), 30–1.

13 Bill Christensen, 'Military Plans Cyborg Sharks', Live Science, 7 March 2006, accessed 10 December 2010, http://www.livescience.com/technology/060307_shark_implant.html.

14 'Cochlear Implants', National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, accessed 22 March 2012,

http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/pages/coch.aspx.

15 Retina Implant, http://www.retina-implant.de/en/doctors/technology/default.aspx.

16 David Brown, 'For 1st Woman With Bionic Arm, a New Life is Within Reach', Washington Post, 14 September 2006, accessed 10 December 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-dzn/content/article/2006/o9/13/AR2006091302271.html?nav=E8.

17 Miguel Nicolelis, Beyond Boundaries: The New Neuroscience of Connecting Brains and Machines – and How it Will Change Our Lives (New York: Times Books, 2011).

18 Chris Berdik, 'Turning Thought into Words', BU Today, 15 October 2008, accessed 22 March 2012, http://www.bu.edu/today/2008/turning-thoughts-into-words/.

19 Jonathan Fildes, 'Artificial Brain '10 years away', BBC News, 22 July 2009, accessed 19 September 2012, http://news.bbc.c0.uk/2/hi/8164060.stm.

20 Radoje Drmanac et al., 'Human Genome Sequencing Using Unchained Base Reads on Self-Assembling DNA Nanoarrays', Science 327:5961 (2010), 78–81; 'Complete Genomics' website: http://www.completegenomics.com/; Rob Waters, 'Complete Genomics Gets Gene Sequencing under $5000 (Update 1)', Bloomberg, 5 November 2009, accessed 10 December 2010; http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aWutnyE4S0Ww; Fergus Walsh, 'Era of Personalized Medicine Awaits', BBC News, last updated 8 April 2009, accessed 22 March 2012, http://news.bbc.co.Uk/2/hi/health/7954968.stm; Leena Rao, 'PayPal Co-Founder and Founders Fund Partner

Joins DNA Sequencing Firm Halcyon Molecular', TechCrunch, 24 September 2009, accessed 10 December 2010, http://techcrunch.com/2009/09/24/paypal-co-founder-and-founders-fund-partner-joins-dna-sequencing-firm-halcyon-molecular/.

ইউভাল নোয়া হারারি

সেপিয়েন্স

মানুষের ইতিহাস

ভাষান্তর

সুফিয়ান লতিফ, শুভ্র সরকার, রাগিব আহসান